ধনধান্য

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

তৃতীয় বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা
২৭শে জুন ১৯৭১ : ৬ই আষাঢ় ১৮৯৩
Vol. III : No : 1&2 : June 27, 1971

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
গগন ঘোষ

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
সুভাষ বসু

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (শিলং)
দীনেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

সংবাদদাতা (ত্রিবান্দ্রাম)
বসন্ত কুমার মিশ্র

সংবাদদাতা (বোম্বাই)
অবিনাশ গোড়বোলে

ফোটো অফিসার
টি. এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট
নন্দলাল মণ্ডল

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নিউ দিল্লী ১
টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮৭০২৬, ৩৮৭৯১০
৩৮৪৮৮১/৪০২
টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী
চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী ১
চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক যুবক বোধহয় ভাবছেন তাঁরা বিপ্লবের এক নতুন পথের সন্ধান দেবেন। তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা দেশের কল্যাণের কথা সর্বাগ্রে মনে রাখুন। ফাঁকা শ্লোগানের বুলি, সর্বনাশা ভাঙ্গাচোরা এবং আত্মঘাতী কার্যকলাপ আমাদের সত্যিকার বিপ্লবের সন্ধান দেবে কি ?

—ইন্দিরা গান্ধী

এই সংখ্যায়

বাজেট ও সামাজিক ন্যায়

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে জনসাধারণ যে আশা সম্ভাবনার প্রত্যাশা করেছে, আমাদের দেশের স্বাধীনতার ২৩ বছরে এমনটি আর দেখা যায়নি। কারণ এবারের অবিসম্বাদিত জয়ের মূলে শাসক গোষ্ঠীর নয়া শ্লোগান "গরিবি হঠাও" জনসাধারণের মনে বহু প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছে। অতএব অর্থমন্ত্রীর লক্ষ্য ছিল এমন একটি বাজেট প্রস্তুত করা, যাতে সরকারের উন্নয়নমূলক অভিযান অপ্রতিহত থাকবে, আবার এই বাড়তি খরচায় জনসাধারণের ওপর বিশেষ চাপও পড়বে না।

এবারের সাধারণ নির্বাচনে জনসাধারণের মনে যে বিপুল প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছে সে প্রসঙ্গে সরকার সম্পূর্ণ সজাগ এবং অর্থমন্ত্রীর নিজের ভাষায়—তিনমাস আগে আমাদের জনসাধারণ শাসক গোষ্ঠীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে সমাজবাদ, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রগতি এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষেই রায় দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন—সামাজিক সাম্য প্রসারের প্রথম স্তর হোল প্রত্যেকের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা। "গরিবি হঠাও" বা দারিদ্র দূরীকরণ শ্লোগানের এটাই মূল লক্ষ্য। অবশ্য আর একটি বিষয়ে বিশেষ ভাববার আছে। আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের বৃহত্তম অংশ উৎপন্ন হয় বেসরকারী তরফে। অতএব অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য দূরীকরণে কেন্দ্রীয় বাজেটের শক্তি সীমাবদ্ধ। অর্থমন্ত্রী এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, তাই তিনি স্বীকার করেন—শুধুমাত্র বাজেটের নীতি ও বিধি নির্দ্ধারণ করে বা একটি মাত্র বাজেটের মাধ্যমে এক নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যাবে, এমন অসম্ভব কথা আমি বলি না। বাস্তবিক আমরা প্রগতিবাদী উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করতে যা যা করতে চাই এ ধরণের সীমায়িত বাজেটে তার সব হাসিল করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। অবশ্য একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর যোগান যাতে অব্যাহত থাকে তার প্রতি আমরা সর্বদা সজাগ থাকবো।

সামাজিক ন্যায়ের পথ সুগম করে তুলতে হলে প্রথমেই চাই কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ। গ্রামীণ এলাকার কাজ কারবার বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে গত মার্চ মাসের অন্তর্বর্তী বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এবারের বাজেটে শহরাঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবকদের দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এঁদের কাজে নিযুক্ত করবার জন্য ২৫ কোটি টাকার একটি আপৎকালীন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য এই ৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগে যে বেকার সমস্যার খুব একটা সুরাহা হবে, তা ভাববার বিশেষ কারণ নেই। উপরোক্ত বিনিয়োগ সার্বিক বিনিয়োগে কিভাবে মদত দিতে পারে, তার উপরই নির্ভর করছে সমস্যার কতটা সুরাহা সম্ভব। আবার শুধু মাত্র ব্যয় বরাদ্দের বৃদ্ধিতে কিছু কিছু কর্মসংস্থান বাড়ানো সম্ভব বটে, তবে সে কাজ স্থায়ী হবে না এবং তার চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ার সম্ভাবনাও কম। শ্রী চাবন স্বীকার করেন, বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে সমগ্র শিল্পের কর্মচাঞ্চল্য বাড়বে, ফলে কাজ কর্মের সুযোগও বাড়বে। তাই বলা হয়েছে, ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হলেও বেকার সমস্যা সুরাহার জন্য সরকার যে সমস্যাটি সম্বন্ধে চিন্তান্বিত এটি তারই বিশেষ ইঙ্গিত।

গত কয়েক বছরে শিল্পক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি হয়নি, তাই কাজের সংস্থানও বিশেষ বাড়েনি। [illegible] সালের পর থেকে সরকারী বিনিয়োগ কমে আসা এর একটি অন্যতম কারণ। অতএব সঙ্গত কারণেই শ্রী চাবন ১৯৭০-৭১ সালের কেন্দ্রীয় বিনিয়োগ ব্যয় ১০৫০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৯৭১-৭২এ দাঁড় করিয়েছেন ১৩৫০ কোটি টাকায়। এর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির পক্ষ থেকেও বিনিয়োগ বাড়াবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবার জন্য এই ব্যয় বরাদ্দ যথেষ্ট নয় বলে কোন কোন পক্ষ সমালোচনা করছেন। তবে ব্যয় বাড়ার সাথে সাথে মুদ্রাস্ফীতিজনিত সংকট বৃদ্ধি পেতে পারে—এমন একটা ধারণা অর্থমন্ত্রীর বিচার্যবস্তু হওয়াই স্বাভাবিক তা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বর্তমানে ধার্য করের হিসেবে এবারের বাজেটে ৩৯৭ কোটি টাকার মত ফাঁক থেকে যাবে। নতুন কর ধার্য হলে এই ফাঁক ২২০ কোটি টাকায় নেমে আসবে। গত বছরের চাইতে এবছরের ঘাটতি কম। বর্তমান মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী বিনিয়োগের মাত্রা আরও বাড়িয়ে তুললে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দরদাম বেড়ে গিয়ে তা সাধারণ মানুষের দুর্দশার কারণ ঘটাতে পারে—এই যুক্তিটি অস্বীকার করবার উপায় নেই। বাস্তবিক সরকারী আয়ের বিভিন্ন পথগুলি খতিয়ে দেখলে অর্থমন্ত্রীর উদ্বেগের কারণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। অধিকন্তু বিনিয়োগের মূলে হ'ল অধিকতর সম্পদ সংগ্রহ। অর্থমন্ত্রী যেসব কর ধার্যের কথা বলেছেন তাদের অধিকাংশই পরোক্ষকর। ১৯৭১-৭২ এর বাজেটে সর্বমোট ২২৯ কোটি টাকা বাড়তি করের ২৭ কোটি

টাকা আসছে প্রত্যক্ষ কর খাত থেকে। বহুদিন থেকে কতগুলি প্রত্যক্ষ কর ধার্যে প্রয়োজনীয়তা বোধ করা হচ্ছিল, যেমন ব্যক্তি বা অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের বাৎসরিক আয় ১৫,০০০ টাকার ওপর অতিরিক্ত করের বর্দ্ধিত হার ধার্য করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী কোম্পানীসমূহ ও কোম্পানী বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানের মূলধনী আয়ের ওপরেও আয়কর ধার্যের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। আবার সম্পদ কর বৃদ্ধি করে শ্রী চাবন ধনী ব্যক্তিদের ক্ষোভের সৃষ্টি করেছেন। সম্পত্তির মূল্য নীট ১৫ লক্ষ টাকার বেশী হলে, তাতে সমান হারে আট শতাংশ কর ধার্য করা হয়েছে। এর আগে ১৫-২০ লক্ষ টাকার নীট সম্পত্তির মূল্যে চার শতাংশ হারে কর ধার্য করা হোত। আবার সম্পত্তির নীট মূল্য ২০ লক্ষের উপর হলে কর ছিল পাঁচ শতাংশ হারে।

বিক্রয়-চুক্তিতে লিখিত মূল্যে সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষমতা সরকারী হাতে বর্তানোর কথাও অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। বেনামীতে সম্পত্তি দখল নিষ্ফল করবার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থার কথাও জানানো হয়েছে আর একটি প্রস্তাব হোল—১৯৭৪ সালের পর থেকে বিনিয়োগে সুবিধা নক রেয়াতগুলির বিলোপ। এইসব রেয়াতের ফলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়েছিল এবং আশা করা যায় রেয়াত পাবার সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে এখন থেকে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষভাগ পর্যন্ত বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। বাজেটে আরও বলা হয়েছে, সরকারী আনুকূল্যভুক্ত বিশেষভাবে চিহ্নিত করা শিল্পের সংখ্যাও কমিয়ে আনা হবে।

লক্ষ্যণীয়, বিভিন্ন উপায় প্রয়োগ করেও যে প্রত্যক্ষ কর খাতে ২৭ কোটি টাকার বেশী ওঠা না সম্ভব হয়নি, তার অর্থ বোঝা কঠিন নয়। এর সরল অর্থ হোল ভারতের মত দেশে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আবার একথাও বলা ঠিক হবে না যে, বিভিন্ন অর্থমন্ত্রীর অর্থ দপ্তরে কর্তৃত্ব থাকাকালে প্রত্যক্ষ কর খাতে সরকারী আয় সম্প্রসারণের চেষ্টা হয়নি। বিভিন্ন দেশের কর ধার্যের একটা তুলনামূলক চিত্র দেখলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। ভারতে এক লক্ষ টাকার উপর ধার্য করের মাত্রা ৫২ শতাংশ। যুক্ত রাজ্য ও ক্যানাডায় ২১ শতাংশ, পশ্চিম জার্মানিতে ২৩ ৭ শতাংশ, জাপানে ২৭ ৮ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে ২৮ ৬ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ৩৬ ৫ শতাংশ।

অতএব সঙ্গত কারণেই পরোক্ষ করের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। শ্রী চাবন ধনিক সম্প্রদায় ব্যবহৃত কতগুলি দ্রব্যসম্ভার সূচীবদ্ধ করেছেন, যার উপর কর ধার্যের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অবশ্য এই সিদ্ধান্তের ফলে নানা কারণে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপরই চাপ পড়বে বেশী—প্রথমত, তাদের আয় ধরা বাঁধা এবং দ্বিতীয়ত, কয়েকটি মাত্র ভোগ্য পণ্য ব্যতীত অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারই ঐসব ভোগ্য পণ্য ব্যবহার করছেন।

শ্রী চাবন আরও বলেন, কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধ এবং কর সংগ্রহ আরও সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত করে তোলার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালানো হবে। এটি একটি সাধু প্রয়াস সন্দেহ নেই। কারণ ইতিমধ্যেই আয়কর ও সম্পদ কর বাবদ ৭০০ কোটি টাকা অনাদায় রয়েছে এবং কালো টাকার অঙ্কের কোন সঠিক হিসাব নেই। বেসরকারী ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরের কর্মীদের সর্বোচ্চ বেতন ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার উপর সীমা বেঁধে দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে সুবিবেচনার পরিচায়ক। অবশ্য এসব প্রচেষ্টার সুফল নির্ভর করবে প্রশাসনিক দক্ষতার উপর এবং কর বিভাগের সমবেত প্রচেষ্টার সুচারু সম্পাদনে।

কৃষি আয় সম্পদ সংগ্রহের একটি বিশিষ্ট পথ। মনে হয় অর্থমন্ত্রী এদিকে বিশেষ কিছুই করতে পারছেন না। ফলে পরিকল্পনায় কৃষি বিনিয়োগের প্রধান ফলভোগী গ্রামীণ ধনিক সম্প্রদায় কর ভার বিবর্জিত, ভারতীয় কর ব্যবস্থার এটি একটি প্রধান দুর্বলতা। যদিও কৃষিগত কর নির্দ্ধারণ ও সংগ্রহের ভার প্রধানত: রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত, সামগ্রিক স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত যথাশীঘ্র রাজ্য সরকারদের সাথে একটি সুষ্ঠু সুচিন্তিত পথ নির্দ্ধারণ করে আয়ের পথ আরও প্রশস্ত করে তোলা। অবশ্য পরোক্ষ ভাবে ট্রাক্টর ও ভারী কৃষি যন্ত্রপাতির উপর করভার বাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষকদের করভুক্ত করবার প্রচেষ্টা চলেছে। অবশ্য এই পরোক্ষ কর চাপিয়েও কৃষি ক্ষেত্র থেকে সরকারী আয় বিশেষ বাড়বে বলে আশা করা যায় না; কারণ সরকার কর বাবদ যা আয় করবেন, তা সাধারণ কৃষকদের সুবিধার্থে তাদের পণ্য যাতে সরকার নির্দ্ধারিত দামের নীচে পড়ে না যায় তার ভরতুকি দিতেই অনেকাংশ ব্যয় হয়ে যায়। অবশ্য সরকারের এতে সুবিধে হোক বা না হোক, অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের এতে লাভ বেড়েছে বই কমেনি। কারণ উন্নত ধরনের চাষাবাদের ফলে প্রতি বছরই কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বেড়ে চলেছে!

কেউ কেউ আবার বলছেন, ২২০ কোটি টাকা ঘাটতি বাজেটের ফলে মুদ্রাস্ফীতি আরও প্রকট হয়ে উঠবে। তবে আমরা সর্বান্তকরণে আশা করবো অর্থমন্ত্রী দরদাম কমিয়ে আনার জন্যে যেসব প্রচেষ্টার কথা বলছেন তা যেন অনেকাংশে ফলে যায়। তবে দুর্ভাগ্যবশত: কার্যত: যা হয়ে আসছে তার উপর নির্ভর করে বলা যায়, গত বারের বাজেটের সময়ও আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল দরদামে সামান্য তারতম্য হবে, যদিও প্রকৃতপক্ষে জিনিষ পত্রের দরদাম বাড়ে ৫ ৫ শতাংশ হারে। আবার ঘাটতি বাজেট যে ২২০ কোটি টাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে এ সম্বন্ধে এখনই নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের জন্য ব্যয়ের একটা মোটামুটি অঙ্ক ধরা হয়েছে ৬০ কোটি টাকা, যদিও এ অঙ্ক বাড়বে না বলে স্থির সিদ্ধান্তে আসা মুস্কিল। দ্বিতীয়ত, রাজ্য সরকারগুলির শোচনীয় আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার চতুর্থ যোজনায় রাজ্য সরকারদের জন্য ব্যয় বাবদ সর্বমোট ৮৫০ টাকার যে ঘাটতি দেখিয়েছেন,

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বাজেট ১৯৭১-৭২

পরিকল্পনায় বর্দ্ধিত বিনিয়োগ ১৫৫ কোটি টাকা; শিক্ষিত বেকারদের কর্মবিনিয়োগ খাতে ২৫ কোটি টাকা; পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের জন্য ৬০ কোটি টাকা; মোট ঘাটতি ৩৯৭ কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রী শ্রী যশোবন্ত রাও চাবন ২৮শে মে সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটে রাজস্ব ও মূলধন খাতে মিলিয়ে মোট ঘাটতি দেখানো হয় ৩৯৭ কোটি টাকা।

গত মার্চ মাসে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করবার সময় পরিকল্পনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির যে সংকেত দেওয়া হয়েছিল, সে প্রসংগে অর্থমন্ত্রী বলেন, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে ১৫৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয়েছে অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটের বিনিয়োগ ১,১৯৫ কোটি টাকা বাড়িয়ে এখন করা হয়েছে ১,৩৫০ কোটি টাকা। ব্যয়ের দিক থেকে ধরলে গত বছরের তুলনায় এ বছর ৩০০ কোটি টাকা আরও বেশী খরচ হবে।

শরণার্থী

পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলী সম্পর্কে শ্রী চাবন বলেন, মানুষের ইতিহাসে এ এক জঘন্যতম কলঙ্ক। শরণার্থীদের দুঃখে ভারত বিচলিত এবং সেজন্য শরণার্থীদের সেবায় সরকার আনুমানিকভাবে ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের সেবায় ভারত যেমন নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে এসেছে, শ্রী চাবন বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন করেছেন, তাঁরাও যেন মানবিকস্বার্থে উদার মনে সাহায্যে ও সামগ্রী নিয়ে শরণার্থী সেবায় এগিয়ে আসেন। শ্রী চাবন আশা করেন বৈদেশিক সাহায্য বাবদ রাজস্ব খাতে ২০ কোটি টাকা জমা পড়বে।

শিক্ষিত কর্মপ্রার্থী, বিশেষকরে ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাজে নিযুক্ত করবার জন্যে সরকার দৃঢ়-সংকল্প। এ খাতে ২৫ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ করা হয়েছে।

ওভার ড্রাফ্‌ট

১৯৭০-৭১ সালের সংশোধিত বাজেট সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্য করে বোঝা যাচ্ছে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২৭০ কোটি টাকা অর্থাৎ অন্তর্বর্তী বাজেটের হিসেবের চেয়ে ৪০ কোটি টাকা বেশী। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ওভারড্রাফটের মাধ্যমে রিসার্ভ ব্যাংক থেকে যখন তখন মোটা অংকের টাকা তোলায় অর্থমন্ত্রী বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ১৪টি রাজ্য গত মার্চ মাস পর্যন্ত ওভার ড্রাফটের মাধ্যমে রিসার্ভ ব্যাংক থেকে ২৬০ কোটি টাকা ধার করেছেন। পরিস্থিতিটি দুঃখজনক, কারণ ১৯৭০-৭১ সালে রাজ্য সরকারগুলিকে ১৯৫ কোটি টাকার বিশেষ সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ব্যয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেননি। শ্রী চাবন রাজ্য সরকারদের কাছে আবেদন জানান যে তাঁরা নিজের নিজের রাজ্যে রাজস্ব খাতে নতুন আয়ের পথের সন্ধানে সচেষ্ট হন; আর কি উপায়ে অপরিকল্পিত ব্যয় ন্যূনতম রাখা যায় সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

কেন্দ্রীয় বাজেটে যেসব প্রধান প্রধান খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে আছে কৃষি ৩২ কোটি টাকা; খাদ্য সংগ্রহ—১৮ কোটি টাকা; জলপথ উন্নয়ন—১৬ কোটি টাকা; বন্দর উন্নয়ন—১৩ কোটি টাকা; সড়ক উন্নয়ন—১০ কোটি টাকা; খনি ও খনিজ দ্রব্য—৯ কোটি টাকা; স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা—১২ কোটি টাকা। এবছরের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের জন্য ইতিমধ্যেই ৭৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এ খাতে খরচা ৭৪ কোটি টাকা আরও বেড়েছে।

পুষ্টিকর আহার

শিশুকল্যাণমূলক প্রকল্প প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী শিশুদের পুষ্টিকর আহার্য বিতরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন, চতুর্থ পরিকল্পনায় উপরোক্ত খাতে ব্যয় বরাদ্দ

(৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

শিল্প বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সমস্যা আলোচনায় যা সবচেয়ে প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হোল শ্রমিক আন্দোলনের আধিক্য, প্রতিবাদ, 'বন্ধ' ইত্যাদি। রাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা যে এর জন্য অংশত দায়ী একথা অনেকেই অস্বীকার করবেন না। কিন্তু এসব বিপত্তি সত্ত্বেও কলকাতার মত সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পাঞ্চল বা সে ক্ষেত্রে সমগ্র পশ্চিম বাংলার শিল্প যে এ দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারবে না, এমন নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করা যুক্তি সংগত নয়।

বিস্তৃতির মধ্যে না গিয়েও প্রাদেশিক শিল্প বিকাশ সম্বন্ধে জানতে হলে, সে প্রদেশে শিল্প লাইসেন্স বিতরণের গতিগতি দেখলেই ব্যাপারটা সহজেই জানা যাবে। শিল্প লাইসেন্স বিতরণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প পরিস্থিতি দেখলে বোঝা যাবে, রাজ্যের শিল্প বিকাশ আশানুরূপ নয়। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৮ এই এক বছরের মধ্যেই লাইসেন্সের সংখ্যা নেমে আসে ৪৮ থেকে ৩৪এ। অবশ্য ১৯৬৯ সালে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়—তা দাঁড়ায় ৬৫টিতে। এটি আশার কথা কারণ গত তিন বছরের নিম্নগতির পর অবস্থার উন্নতিতে শিল্পপতিরা আবার মনে বল ফিরে পাবেন। সমগ্র ভারতের শিল্পোন্নয়ন পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত শিল্প লাইসেন্স বিতরণের হার বেড়েছে, শতকরা হারে ১২.১৪ থেকে ২৮.৯৭ ভাগ। সর্বভারতীয় হারে শিল্প বিনিয়োগে অনুমতি পত্রের (লেটার অব ইনটেন্ট) বিতরণ অবশ্য যথা পূর্বং তথা পরং ভাব—১১/১২ শতাংশ। অবশ্য এতে ১৯৬৯ সালের হিসেবটি ধরা হয়নি। সুখের কথা, চলতি কারখানার কলেবর বৃদ্ধি ও নতুন নতুন জিনিষপত্র তৈরীতে ধীরে ধীরে নতুন আশার সঞ্চার হচ্ছে। যেমন ১৯৬৭ সালে উপরোক্ত কাজে আবেদন পত্রের সংখ্যা ছিল ৫৬। ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ খতিয়ানে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৫ ও ৮৮।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

রাজ্যের শিল্প বিকাশে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। ১৯৬৭ সালের সংজ্ঞানুযায়ী যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্র এবং কলকব্জা বিনিয়োগের পরিমাণ ৭.৫ লক্ষের কম, তাদের ক্ষুদ্র শিল্প বলে অভিহিত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কমিশনার এবং ক্ষুদ্র শিল্প সেবা সংস্থার পরিসংখ্যান থেকে যা জানা যাচ্ছে তা হোল—১৯৬১-৬২ সাল থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত এ রাজ্যে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে ৩,৫৭১টি থেকে ১৬,৮১০ টি। এর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যাবে পাশের ১নং টেবিলে →

১৯৬৯-৭০ সালে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রসার হয়েছে সবচেয়ে বেশী—২,৫৭৯টি। এ রাজ্যের শিল্প বিকাশে এক্ষেত্রটি যে প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত রেখেছে একথা অনেকেই স্বীকার করবেন।

রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বৈদ্যুতিকরণের কাজেও ঊর্দ্ধগতি লক্ষিত হচ্ছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৪,০৮০.৫ অযুত কিলোওয়াট ঘন্টা; ১৯৬৭-৬৮ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫,২৯১ কি.ও.ঘ। ঐ একই সময়ে শিল্প ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিক্রি বাড়ে ২,৯৭৫.৫ অযুত কি.ও.ঘ থেকে ৩,০৮৯ অযুত কি.ও.ঘ।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিদ্যুতিকরণ

পল্লী বৈদ্যুতিকরণে পশ্চিমবঙ্গের স্থান আজ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষায় অনেক নিচে। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ বিতরণের একটা সুষ্ঠু যোগাযোগ সুবিন্যস্ত কার্যসূচী। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২,১৩৩টি গ্রাম বিজলি বাতি পেয়েছে। পথ দীর্ঘ হলেও একাজ সম্পূর্ণ করতে হবে পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক বিকাশের তাগিদে।

১নং টেবিল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে শিল্প ডাইরেক্টোরেটে রেজিষ্ট্রীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান

সাল	শিল্প প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	বাৎসরিক বৃদ্ধি
১৯৬১-৬২	৩,৫১৭	
১৯৬২-৬৩	৫,১২২	১,৬০৫
১৯৬৩-৬৪	৬,৮৮২	১,৭৬০
১৯৬৪-৬৫	৮,১৪৭	১,২৬৫
১৯৬৫-৬৬	৯,৪৩১	১,২৮৪
১৯৬৬-৬৭	১১,১৫১	১,৭২০
১৯৬৭-৬৮	১২,৬৭৩	১,৫২২
১৯৬৮-৬৯	১৪,২৩১	১,৫৫৮
১৯৬৯-৭০	১৬,৮১০	২,৫৭৯

শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক অসন্তোষের ফলে ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কর্ম দিন নষ্ট হয়েছে ৩৯.৬০ থেকে ৫৮.৭১ শতাংশ। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাটকল, কাপড়ের মিল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও চা শিল্পের শ্রমিকরা। ইতিমধ্যে অবশ্য কলকারখানায় নিযুক্ত কর্মীদের উল্লেখযোগ্য বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। ১৯৫৮ সালে যেখানে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ছিল ১,১৮০ টাকা ১৯৬৮ সালে তা বেড়ে দাড়ায় ২,২৪৫ টাকায়।

শিল্প বিনিয়োগ

শিল্প লগ্নীতে ভারতীয় শিল্প বিনিয়োগ করপোরেশন, ভারতীয় শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, ভারতীয় শিল্প ঋণ এবং বিনিয়োগ করপোরেশন, জীবনবীমা করপোরেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন—এসব প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। ১৯৫৬-৬৬ সাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত শিল্প বিনিয়োগ করপোরেশনের বিনিয়োগের খতিয়ানে দেখা যাচ্ছে এই সময়ে সর্বভারতীয় বিনিয়োগ আসে ৩০.৩৭ কোটি থেকে ১৭ ০৩ কোটিতে। একই সময়ে সর্বভারতীয় ও পশ্চিমবাংলার বিনিয়োগের আনুপাতি হার দাড়ায় ১৫.৪১ শতাংশ থেকে ১২.৩৯ শতাংশে। শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ঋণ বাড়িয়েছে ৬০.১৬ কোটি টাকা থেকে ২৬১.৫৫ কোটি টাকায়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নে ৪৬.২১ কোটি থেকে ঋণ বাড়িয়ে করে তুলেছে ৫২.২৩ কোটি টাকা। সর্ব ভারতীয় ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ ৬.৭ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৩.৭ ভাগ। জীবন বীমা করপোরেশন এ রাজ্যের শিল্পের সাধারণ শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে ১২৪.৭৩ কোটি টাকা (১৯৬৫) থেকে ২১০.৩৬ কোটি টাকা (১৯৬৯) বিনিয়োগ করছে। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গের অর্থ করপোরেশন শিল্প বিনিয়োগ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হয়েছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ পায় ৫৭.৭ লক্ষ টাকা ১৯৬৮-৬৯ সালে তা বেড়ে দাড়ায় ৭৬.৪ লক্ষ টাকা।

ক্ষুদ্র সঞ্চয়

স্বল্প সঞ্চয়ের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান উত্তর প্রদেশের ঠিক পরেই। গত কয়েক বছর ধরে স্বল্প সঞ্চয়ের ব্যাপারে বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯-৬৯ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত নীট আয় দাড়ায় ১০.১০ কোটি টাকা। এর আগের বছরে ঠিক একই সময়ে এ অঙ্ক ছিল ৪.৩৫ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের একটা তুলনামূলক ছবি নীচে দেওয়া হল;

২নং টেবিল

রাজ্য	এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৯৬৮	কোটিটাকায় ১৯৬৯
উত্তর প্রদেশ	৯.৭৭	১০.২১
পশ্চিম বঙ্গ	৪.৩৫	১০.১০
বিহার	২.৩০	৮.৬০
পাঞ্জাব	২.৭১	১.৪৩
তামিল নাড়ু	০.৪৮	১.০৭
গুজরাট	(—)০.৫৩	(—)০.০০৪
মহারাষ্ট্র	১.০৪	০.০১
সব ভারতীয়	৩৯.৪৭	৪৭.৬৬

(ইকনমিক রিভিউ, পশ্চিম বাংলা—১৯৬৯-৭০)

৪নং টেবিল

পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় শিল্পোদ্যোগ সংস্থায় বিনিয়োগ

প্রকল্পের নাম	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা	তিনটি পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ	১৯৬৬-৬৯ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ	১৯৫১-৬৯ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ	৪র্থ পরিকল্পনা নির্ধারিত বিনিয়োগ
১. দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (প্রথম ভাগ সম্প্রসারণের কাজ নিয়ে)	—	১৭৮.৭	২৪৬.৭	২৪৬ ৭	৭০	৩১৬.৭০	১৫.০০
২. দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানা ন্যাশেনাল ইনস্ট্রুমেন্টস্ কারখানা	—	—	৩৩ ৩	৩৩ ৩	—	৩৩ ৩	৬.০০
৩. কলকাতা (দুর্গাপুরের চশমার কাঁচের কারখানা নিয়ে)	১.০	০.৪	১.৮	৩.২	৩.৩৮	৬.৫৮	২.০২
৪. চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ	৩৬	১.৮	—	৫.৪০	—	৫.৪০	—
৫. হিন্দুস্থান কেবলস্ রূপনারায়ণপুর	১.৩০	০.৮	৩·৩০	৫.৪০	২.২	৭.৬০	৬.৪৫

রাজ্য সরকারের দায়িত্ব

এ রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। এর মূল উদ্দেশ্য হোল দুর্বল অংশগুলিকে আত্মনির্ভর করে তোলা। ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটে মোট খরচের ৫৮ শতাংশ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ব্যয়িত হচ্ছে। নীচের টেবিলে বিষয়টি দেখানো হয়েছে :

১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিমবাংলার রাজস্ব ও মূলধন (মিলিত) খাতে উন্নয়ন ও অন্যান্য খরচা :

		মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)
উন্নয়ন মূলক কাজের কয়েকটিতে ব্যয় যেমন,		
শিক্ষা	৫৪.৯১	১৬৪.৫১
চিকিৎসা ও লোক		(৫৮.১%)
স্বাস্থ্য	২৯.২৬	
কৃষি	২০.১৮	
রাস্তাঘাট, নির্মাণ কাজ ও জলের ব্যবস্থা	২৩.৬৩	
বহুমুখী নদী উপত্যকা প্রকল্প	৬.৮৪	
সেচ ও জলযান	৪.৬৪	
অন্যান্য খরচার মধ্যে কয়েকটিতে ব্যয়		১১৮.৫৬
কর ও শুল্ক		(৪১.৯০)
আদায় বাবদ খরচ	১১.০২	
ঋণের সুদ	২৯.৬৪	
প্রশাসনিক খরচা	৪৭.২৩	
মোট ব্যয়		২৮৩.০৭
		(১০০%)

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিশেষ ব্যয় বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছেন। চতুর্থ পরিকল্পনায় রাজ্যের মোট ব্যয়ের, ৩২২.৫ কোটি টাকার মধ্যে ২২১ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে। শতকরা হিসেবে এই সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৬৮.৫ ভাগ। প্রসঙ্গত অন্যান্য রাজ্যের পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সাহায্যের শতকরা হিসেবটিতেও চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে ; মহারাষ্ট্র ২৭.৩% পাঞ্জাব—৩৪.৪%, গুজরাট—৩৪.৭%, হরিয়ানা—৩৪.৯%, মহীশূর—৪৯.৪%, উত্তর প্রদেশ—৫৪.৫%, অন্ধ্র প্রদেশ—৫৭.১%.

কেন্দ্রীয় বাজেট

(৩ পৃষ্ঠার পর)

৪ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

অতএব এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটের সংক্ষিপ্ততর স্বরূপটি দাড়াচ্ছে এরকম : রাজস্ব খাতে আয় ৩,৫৬২ কোটি টাকা, ব্যয় ৩,৫৮৭ কোটি টাকা। এর ফলে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে ১১৪ কোটি টাকার যে উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তাতে বর্তমানে ঘাটতি দাড়াবে ২৫ কোটি টাকা। আর মূলধনী খাতে আয় ও ব্যয়ের হিসেব দাড়ায় যথাক্রমে ২,০২৪ কোটি টাকা ও ২,৩৬৯ কোটি টাকা। এর ফলে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭২ কোটি টাকা। এটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে দেখানো ঘাটতির চাইতে ১৮ কোটি টাকা বেশী। রেলযাত্রী ও মালপত্র এবং ডাক ও তার বিভাগের বর্দ্ধিত শুল্ক বাবদ আয়ের অংশ মিলিয়ে ১৯৭১-৭২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৯৭ কোটি টাকা।

কর্মসূচীর সুবিন্যাস

এবারের সাধারণ নির্বাচনে দেশের অগণিত জনসাধারণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। এ অভিষ্ট তখনই সিদ্ধ হবে যখন সবাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর সামাজিক ন্যায় বিচারের অংশীদার হতে পারবে। এই প্রসংগে শ্রী চ্যবন বলেন, দেশের সাম্প্রতিক সমস্যার মধ্যে যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা হোল দেশের প্রতিটি কর্মপ্রার্থী যুবককে কাজে নিযুক্ত করা। সরকার এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে।

অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করবার জন্যে এবং জনসাধারণকে সামাজিক সুবিচারের ভাগীদার করে তুলতে প্রথমেই যা দরকার তা হোল নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ-পত্রের দরদাম স্থির রাখা। অতএব প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম যাতে জনসাধারণের অনুকূলে থাকে তাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। বর্তমান পরিকল্পনা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সামগ্রিক পরিকল্পনার মূল্যায়নেরও একটা প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই সুবিন্যাসের লক্ষ্য হবে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে তাদের সম্পাদন ত্বরান্বিত করা, চাকরি বাকরির ক্ষেত্র বাড়িয়ে তোলা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনা।

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিল্পক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়িয়ে এবং প্রশাসনিক জটিলতা মুক্ত হয়ে রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে বছর বছর নির্দ্ধারিত লাভের অংক কায়েম রাখতে পারে তার ওপর সজাগ থাকতে হবে। অনুন্নত এলাকা প্রসঙ্গে শ্রীচ্যবন বলেন, এসব এলাকা উন্নয়নের জন্য দেশীয় বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক সাহায্য সুচালিত করে কর্মোদ্যম সঞ্চারিত করতে হবে।

গত বছরে বস্তি উন্নয়ন খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ স্থির করা হয়েছিল, এবছরও সে খাতে অনুরূপ ব্যয় বরাদ্দ থাকবে। শ্রীচ্যবন আরও বলেন, যদি রাজ্য সরকার বা পৌরসভা বস্তিবাসীদের জন্য পাকা বাড়ীঘর নির্মাণে যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ে কোন কর্মসূচী প্রস্তুত করতে পারেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাতে আর্থিক সাহায্য দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

সুন্দরবন ব-দ্বীপ প্রকল্প

গৌতম রায়

সুন্দরবন এলাকার জমি যে খুবই উর্বর একথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু উপস্থিত বাঁধের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা সমুদ্রের ঢেউ রোখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফলে প্রায়ই দেখা যায় কোন কোন বাঁধ ভেঙে পড়েছে। এইসব ভাঙনের দরুণ উৎপন্ন শস্যের খুবই ক্ষতি হয় এবং সেখানকার অধিবাসীগণের মনে নিরাপত্তার ভাব হ্রাস পায়। মানুষের মনে এই অনিশ্চিত অবস্থা এই বিস্তীর্ণ উর্বর এলাকার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের পথে প্রধান অন্তরায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নেদারল্যাণ্ডের একটি প্রতিষ্ঠানের সংগে পরামর্শ করেন। প্রতিষ্ঠানটির এ ক্ষেত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নদী গবেষণা সংস্থা, নেদারল্যাণ্ডের এই ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার সহযোগিতায় একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প তৈরীর উদ্দেশ্যে ব্যাপক অনুসন্ধানকার্য চালায়। কারণ এক্ষেত্রে উপযুক্ত কোন তথ্যাদি ছিল না। ১৯৬৪ সালে—তিন পর্যায়ের এই প্রকল্পের জন্যে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। ব-দ্বীপ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের প্রকল্প, যেটি প্রধানতঃ বিবেচনা করা হয় সেটি এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অংশ; তবে সবগুলি পর্যায়ের কাজ শেষ হলে এটিও সেগুলির সঙ্গে একীকরণ করা যাবে।

সুন্দরবন ব-দ্বীপ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ২২৯টি গ্রাম। মোট বসতি এলকা প্রায় সওয়া লক্ষ হেক্টেয়র; জন সংখ্যা ৩.৭০ লক্ষ (১৯৬১), জনবসতি প্রতি বর্গমাইল ৭৭৯। এই এলাকায় উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা হলে এবং জমির লবণাক্তভাব হ্রাস পেলে বহু সংখ্যক ব্যক্তি এই এলাকায় ভীড় কোরবেন বলে আশা করা যায়। উপস্থিত কর্মসংস্থানের হার হোল ৩০ শতাংশ; এরমধ্যে আবার ৮৯ শতাংশ কাজ করেন প্রাথমিক পর্যায়ে।

এই প্রকল্প যে কেবল প্রাথমিক পর্যায়ে কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি কোরবে তাই নয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়েও এটি কর্মসংস্থানের বিরাট সম্ভাবনা এনে দেবে। এক সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে এই এলাকায় বেশ ভাল জাতের কার্পাস উৎপন্ন হতে পারে। বস্ত্রশিল্প আমাদের একটি প্রধান শিল্প এবং এই শিল্পকে বহুল পরিমাণে নির্ভর কোরতে হয় কাঁচামাল আমদানীর ওপর। সুতরাং কার্পাস উৎপাদন যদি বৃদ্ধি করা যায় তাহলে এই শিল্পকে যে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প যাতে প্রচুর পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ কোরতে হয়, সেখানে আগে দেখতে হয় বিনিয়োজিত মূলধন অনুপাতে কতটা লাভ হবে। ব্যয়ের তুলনায় আয় যদি বেশী হয় তবেই সে প্রকল্প হয় অর্থনৈতিক দিক থেকে বিনিয়োগযোগ্য। কিন্তু এধরণের প্রকল্প থেকে সমস্ত লাভের অংশ টাকার হিসেবে গোনা যায় না। কিছু লাভ দেখা যায় প্রত্যক্ষভাবে এবং কিছু থাকে পরোক্ষ ভাবে।

প্রথম পর্যায়ের প্রকল্প থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে যে লাভ হবে তার মধ্যে থাকবে ৫০ হাজার হেক্টেয়র জমি সংরক্ষণ, যার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নয়নমূলক কাজ কর্মের প্রসার ঘটবে। দ্বিতীয়তঃ নোনাজলের পরিবর্তে মিষ্টিজল পাওয়া যাবে, যা পানীয় ও সেচের কাজে ব্যবহার করা যাবে এবং মৎস্য চাষে সাহায্য কোরবে। এই প্রকল্পের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল, সারা বাঁধের দৈর্ঘ্য ৪০০ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে ৭৫ কিলোমিটার করা হবে এবং এর ফলে সংরক্ষণ ব্যয় হ্রাস পাবে। আর একটি প্রত্যক্ষ লাভ হবে পয়ঃপ্রণালী ও জলপথের উন্নয়ন, যে সুবিধা টাকার হিসেবে করা যায় না। এ ছাড়া এই প্রকল্পের ফলে যে নিরাপত্তা দেখা দেবে তাতে বহু ব্যক্তি জনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে সরে গিয়ে এই এলাকায় বসবাস কোরতে পারবেন।

এইসব প্রত্যক্ষ সুবিধাগুলি ছাড়াও পরোক্ষ সুবিধাগুলিও নেহাত কম নয়। সামগ্রিক ভাবে সারা এলাকার অর্থনীতির ওপর এই প্রকল্প উল্লেখযোগ্য ভাবে রেখাপাত কোরবে। বর্দ্ধিত হারে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হওয়ার দরুণ ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে, কেনা বেচার কাজ বাড়বে, পরিবহনের উন্নতি হবে। কৃষকগণের আয় বৃদ্ধি হলে, তাঁদের ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে এবং ভোগ্য পণ্যের জন্যে তাঁরা আরও বেশী পরিমাণে ব্যয় কোরবেন; এর ফলে ছোট খাট ব্যবসা গড়ে উঠবে।

উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-ভিত্তিক শিল্পও গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। কেবল কৃষি ভিত্তিকই নয়, বাগান ভিত্তিক শিল্পও গড়ে তোলা সম্ভব; কারণ কাছে-পিঠে বনজ সম্পদেরও কোন অভাব নেই। হলদিয়া বন্দরও বেশী দূরে নয়, সুতরাং শিল্পোদ্যোগ বৃদ্ধি পাওয়াও সম্ভব। প্রকল্প এলাকাটি কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়, সে কারণে এটি একটি পর্যটন কেন্দ্রেও পরিণত হতে পারে।

এতো গেল সুযোগ সুবিধা লাভের কথা। এখন দেখা যাক এর জন্যে ব্যয় হবে কত। নদী গবেষণা সংস্থার হিসেব মত এই প্রকল্পের জন্যে ব্যয় হবে ১৮.৭৫ কোটি টাকা—অবিশ্যি এই ব্যয় হবে ৮ বছরে। তবে চতুর্থ বছর থেকে এই প্রকল্পের থেকে আয়ও হতে থাকবে।

মৌল শিল্পের জন্য জটিল যন্ত্রপাতি তৈরীর উদ্যোগ
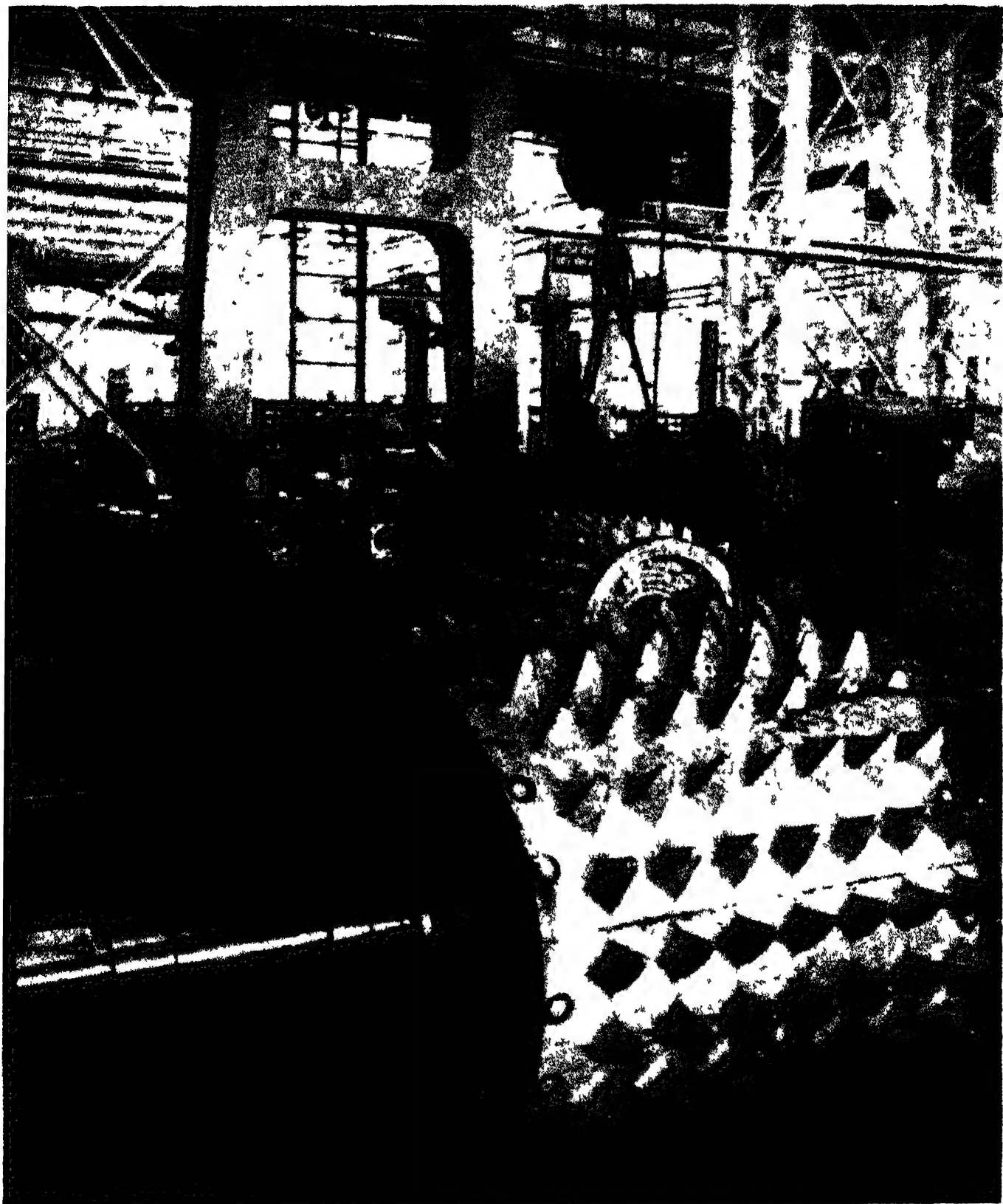
হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন

আজ ভারত যে কেবল নানা শ্রেণীর ভোগ্য পণ্যই প্রচুর পরিমাণে তৈরী করছে তাই নয়, ইস্পাত, সিমেন্ট, সার, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং বহু মৌলিক শিল্পদ্রব্যও এখন এখানে প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা এখন কিছু কিছু যন্ত্র তৈরীর উপযোগী যন্ত্রপাতি তৈরী করতে আরম্ভ করেছি। এছাড়া এই সমস্ত বিরাট যন্ত্র যথাযথ স্থাপনের জন্য অন্য যে সব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, সেগুলিও এখানে তৈরী হচ্ছে। ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প সকল দেশের শিল্পোন্নতির জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই সব শিল্প সংগঠন করবার জন্য বেশ কয়েক বছর সময়ের দরকার। এই সমস্ত শিল্প থেকে ঠিক মত উৎপাদন এবং সেই উৎপন্ন দ্রব্য থেকে উপযুক্ত লভ্যাংশ পেতে অনিবার্যভাবে আরো কিছু বেশী সময়ের দরকার। দেখা গ্যাছে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং প্রচুর সম্পত্তিপূর্ণ বড় বড় শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও যথাযথ শিল্প সংগঠন, উৎপাদন এবং সেই উৎপন্ন দ্রব্য থেকে লভ্যাংশ উপার্জন করবার মত পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে ১৫ থেকে ২০ বছর লেগে যায়। আমাদের দেশে এই সমস্ত কাজ একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়েছে। এজন্য বিকাশের ঐ পর্যায়ে উঠতে আমাদের দেশের শিল্পের নিশ্চয় আরো কয়েক বছর সময় লাগবে। উদাহরণ হিসেবে হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনকে নেওয়া যেতে পারে। রাঁচিতে প্রতিষ্ঠিত হেভী

রাঁচীর হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের তৈরী এই অতিকায় বয়লার ড্রামটি মালয়েশিয়ায় রপ্তানির জন্য পাঠানো হয়েছে।
বাঁয়ের ছবি—উপরোক্ত কারখানায় তৈরী ২ রোল ক্রাশার যন্ত্রপাতির একাংশ।

হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার রোলিং শপে তৈরী এই রোলগুলি শীঘ্রই বাজারজাত করা হবে।

বাই-প্রোডাক্টস্ পিরোগিকরণ ইত্যাদি প্রস্তুত করে থাকে। অন্য বিভাগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাঝারি অথবা ছোট যন্ত্র শিল্পের বিভাগ, বিভাকসান গিয়ার বিভাগ এবং স্ট্রাকচারাল ফাব্রিকেশন ওয়ার্কশপ বিভাগ ইত্যাদি।

ফাউণ্ড্রি, ফর্জ বিভাগ

ফাউণ্ড্রি ফর্জ কারখানাটি ১১,০০০ বর্গমিটার বিস্তৃত। এখানে ৪০,০০০ টনেরও বেশী পরিমাণ ভারী যন্ত্র বসানো হয়েছে। আবার এই ফাউণ্ড্রি ফর্জ সংস্থাটি অন্য দুটি ইউনিটকে, নির্মিত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। এছাড়াও এই সংস্থাটি অন্যান্য বহু বেসরকারী অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাকে তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে থাকে।

হেভী মেশিন টুলস কারখানাটি বছরে ২৭৩ টি পূর্ণাঙ্গ যন্ত্র উৎপাদন করে। এই সমস্ত যন্ত্রের গড় পড়তা ওজন হচ্ছে প্রায় ৩০ টনের মত। এবং সবচেয়ে ভারী যন্ত্রটির ওজন ১৮০ টনের মত হবে।

সম্প্রতি HEC সংস্থাটি এই প্রথম কিছু কিছু নতুন ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরী করতে আরম্ভ করেছে। যেমন বল মিল, কোক কোয়েঞ্চিং কার, চার্জ ডিস্ট্রিবিউটার, ফুলিং মেশিন এবং চেন রোলস্ ইত্যাদি যন্ত্র। বোকারোর ইস্পাত গলাবার কেন্দ্রের জন্য একটি ১৮০ টন ওজনের আইরণ লেড্‌ল, একটি ১৪০ টন ওজনের আয়রণ লেড্‌ল কার, ইলেকট্রিক ট্রাক এবং অটো ডাম্প কার, নির্মাণের কাজ চলেছে। বোকারোর জন্য ৯০ টন ওজনের একটি ওয়াগান টিপলার ইতিপূর্বেই তৈরী হয়েছে।

উৎপাদন এবং বিক্রয়

হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই এর উৎপাদনের কাজও শুরু হয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারী যন্ত্রশিল্প নির্মাণ কারখানার উৎপাদন ছিল ১০৯৮০ টনের মত, এবং এই উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ছিল প্রায় ২৮ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। ১৯৬৮-৬৯ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,৮৫১ টনের মত হয় এবং এর মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১০৬ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার মত। ফাউণ্ড্রি ফর্জিং ইউনিটটি ১৯৬৫-৬৬ সালে ,৪৬৬ টনের মত যন্ত্র উৎপাদন করে, তার মূল্য ৪৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। ১৯৬৮-৬৯এ এই পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬, ৬৪২ টন এবং তিন কোটি চোদ্দ লক্ষ সাত হাজার টাকার মত। ভারী কলকব্জা নির্মাণের কারখানাটি ১৯৬৪-৬৫ সালে ত্রিশ লক্ষ পনেরো হাজার টাকা মূল্যের যন্ত্র উৎপাদন করে। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই উৎপাদনের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে দশ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। বর্তমান বছরের উৎপাদন ৩০ কোটি টাকার মত হবে বলে আশা করা যায়। পূর্ণ ক্ষমতায় উৎপাদন শুরু হলে এই সংস্থা বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার মত বিদেশী মুদ্রা বাঁচিয়ে দিতে পারবে, যা আগে বিদেশ থেকে যন্ত্র আমদানী করবার জন্য ব্যয় করতে হতো।

HEC তে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বিপুল। যখন এর প্রত্যেকটি ইউনিট পূর্ণ ক্ষমতায় চালু হবে তখন দুহাজার ইঞ্জিনিয়ার সহ ২০,০০০ কর্মী এতে নিযুক্ত থাকবেন।

৩,০০০ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট মোটর

ভূপালের হেভী ইলেকট্রিকালস্ কোম্পানী সম্প্রতি ৩০০০ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট একটি বৈদ্যুতিক মোটর নির্মাণ করেছেন। এই ধরণের মোটর নির্মাণ ভারতে এই প্রথম। এই মোটরটির জন্য প্রয়োজনীয় নক্সা ও ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণরূপে ভারতেই তৈরী এবং ভারত হেভী ইলেকট্রিকালস্ এর ইঞ্জিনিয়ারা এটি সার্থকভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। বি এস ২৬১৩ শ্রেণী এবং বি ক্লাস ইনসুলেশনে মোড়া এই মোটরটি এক নাগাড়ে দুই ঘন্টা ধরে ২৫ শতাংশ বেশী বিদ্যুৎ চাপ সহ্য করতে সক্ষম।

পাঠক পাঠিকাদের প্রতি

মুদ্রণ গোলযোগে 'ধনধান্যে'র সংখ্যা যথাসময়ে আপনাদের হাতে না তুলে দিতে পারায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। পরবর্তী সংখ্যার আকর্ষণ বাংলাদেশ সম্বন্ধে কতগুলি বিশেষ রচনা। দাম আগের মতই মাত্র পঁচিশ পয়সা।

লবন হ্রদ উপনগরী

পার্থ মুখোপাধ্যায়

"গ্রাম থেকে শহর ঘেরো"। অত্যাধিক জন সংখ্যার চাপ পাথরের মত কলকাতার বুকে চেপে বসেছে। কলকাতাকে বাঁচাতে গেলে এবং এর উন্নতি করতে গেলে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপ থেকে কলকাতাকে মুক্ত করতেই হবে। পশ্চিম বাঙলার প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় ডা: বিধান চন্দ্র রায়ের মনে এসেছিল একথা। তারই ফলস্বরূপ ত্রিবেনী, কল্যানী প্রভৃতি উপনগরী তৈরী হতে দেখা গেল। কিন্তু সেগুলো তেমন জমজমাট হলনা। যার প্রধান কারণ খুব সম্ভবত: কলকাতা থেকে এগুলির দূরত্ব। এবার নজরে পড়ল কলকাতারই গায়ে লবন হ্রদের ওপর।

ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজ কায়েম হওয়ার পর ইংরেজরা বাংলার অন্যান্য অনেক জিনিষের মত মাছেরও বেশ ভক্ত হয়ে উঠল। কলকাতা শহরে মাছ যোগানের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য কলকাতার একেবারে পূর্বপ্রান্তে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড নিয়ে বিরাট বিরাট জলা তৈরী হল মাছের চাষের জন্য। আর খাল কেটে এসব জলার সঙ্গে গঙ্গার যোগাযোগ করা হল। আস্তে আস্তে তারপর এই সব জলাই বিরাট বিরাট মাছের ভেড়ীতে পরিণত হল। জোয়ারের সময় মাঝে মাঝে খালের বাঁধ ভেঙে গঙ্গার নোনা জল ঢুকে ভেড়ীর সব জল নোনা হয়ে যেত। তাই থেকে এই যায়গার নাম হল লবন হ্রদ। মোটামুটি এই হল লবন হ্রদ সৃষ্টির ইতিহাস।

মূল পরিকল্পনা ডা: রায়ের হলেও উনি কিন্তু লবন হ্রদ পরিকল্পনার কাজ সুরু হওয়া দেখে যেতে পারেন নি। ডা: রায়ের মৃত্যুর পর থেকে মোটামুটি কাজ সুরু হয়ে এখন পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। লবন হ্রদ জলার মধ্যে তো আর বাড়ী করা যাবেনা।

বিদ্যাসাগর কো-অপারেটিভ সংস্থার চারতলা ফ্ল্যাট
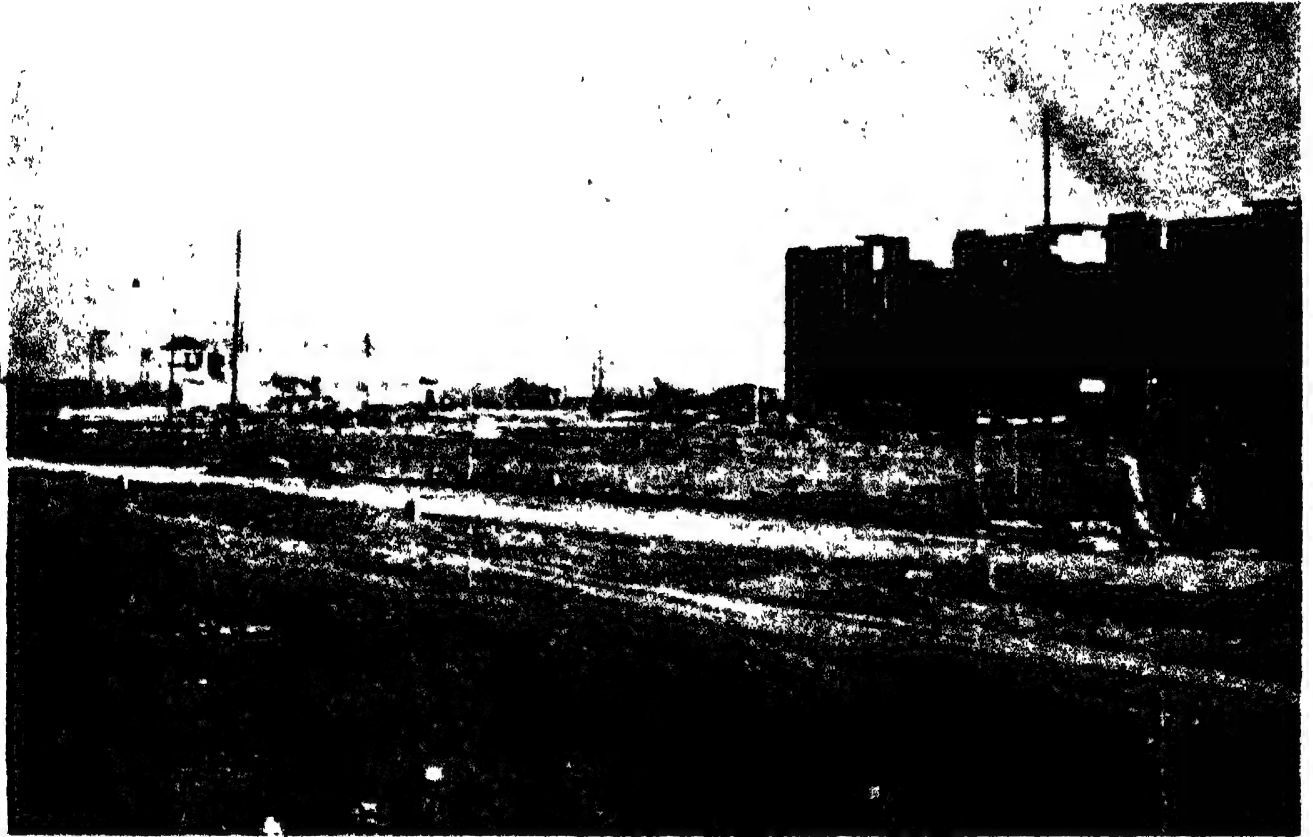
লবণ হ্রদে 'এ' সেক্টরে সদ্য নির্মিত কমিউনিটি মার্কেট সেন্টার

এর জন্য চাই শক্ত মাটি। তাই গঙ্গা থেকে লোহার পাইপ লাইন দিয়ে পলিমাটি শুদ্ধ জল এনে লবণ হ্রদের মধ্যে ঢালা হচ্ছে। পলিটা জমছে আর জলটা আবার গঙ্গায় ফিরে যাচ্ছে। এইভাবে ভরে উঠছে লবণ হ্রদের বুক এই ভরাট করার কাজের ভার দেওয়া হয়েছে যুগোশ্লাভিয়ার "ইনিস্টিটিনোভিক্ ওয়াটার ওয়েজ কোম্পানী"কে।

সমস্ত লবণ হ্রদ এলাকাকে পাঁচটি 'সেক্টার' এ ভাগ করা হয়েছে। এই পাঁচটা সেক্টার মিলিয়ে মোট যায়গার পরিমাণ হল সাড়ে সাত বর্গ মাইল। পাঁচটা সেক্টারের মধ্যে 'এ' আর 'বি' এই দুটো সেক্টার পুরো ভরাট হয়ে গেছে। বাড়ীগুলোর কাজও জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। আগেই বলেছি পুরো এলাকাটাকে পাঁচটা সেক্টারে ভাগ করা হয়েছে। আবার ১২টি ব্লক নিয়ে তৈরী হচ্ছে এক একটি সেক্টার। প্রত্যেক 'সেক্টার'এ থাকছে দুটো প্রাইমারী স্কুল, একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, দুটো পার্ক, একটা কমিউনিটি মার্কেট সেন্টার ও একটি হেল্থ সেন্টার। এছাড়া সমস্ত লবণ হ্রদ উপনগরীতে থাকছে ছেলেমেয়েদের জন্য একটা আণ্ডার গ্রাজুয়েট কলেজ, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, একটা সেণ্ট্রাল সেমিনারী ও একটি হস্পিটাল, সেটাকে আর একটা মেডিক্যাল কলেজ করার কথাও ভাবা হচ্ছে। এসব ছাড়া প্রত্যেক সেক্টারে সিনেমা হল রেস্তোরাঁ, হোটেল তো থাকবেই। আর যে বিশেষ আকর্ষণীয় জিনিষ এই উপনগরীতে আছে সেটা হল একটা স্টেডিয়াম। এই উপনগরীর জন্য ইলেকট্রিসিটি আসছে 'স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এর কাছ থেকে। পানীয় জল সরবরাহের জন্য নিজস্ব ব্যবস্থা থাকছে। প্রত্যেক বাড়ীতে গ্যাস যোগানেরও ব্যবস্থা থাকছে। সমস্ত লবণ হ্রদ উপনগরী জুড়ে কলকাতার তুলনায় অনেক বেশী চওড়া বিরাট বিরাট অনেক রাস্তা তৈরী করা হচ্ছে। রাস্তার দুধারে গাছও লাগান হচ্ছে অনেক। 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড ড্রেনেজ' এর ব্যবস্থাও খুব ভালভাবে করা হয়েছে যাতে জল জমার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। এখানকার সমস্ত ময়লা ও

(২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গোষ্ঠী উন্নয়নে পঞ্চায়েতি রাজ

অমিয় কিশোর মণ্ডল

ভারত আজ বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন। বন্যার কবল হতে মুক্ত হওয়ার জন্য একদিকে যখন বন্যা নিরোধ প্রকল্প তৈরী হচ্ছে ঠিক সেই সময় অনাবৃষ্টি খরার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হচ্ছে। জনসংখ্যাকে সীমিত করার জন্য যখন পরিবার কল্যাণমূলক সূচী প্রস্তুত, সেই সময় বাংলাদেশ হতে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা ভারতের কাছে আশ্রয় প্রার্থী। জনসংখ্যার চাপে আজ তাই আমাদের দেশ পর্যুদস্ত। সুতরাং কোন প্রকল্পে হাত দেওয়ার সাথে সাথে তার মূলনীতি পরিবর্তন সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই গত চব্বিশ বছর ধরে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছে না।

তবুও এই সমস্যার সুষ্ঠু মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু কেমন করে? ভারতীয় সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে। শহরের জাঁকজমক, সুখসুবিধার প্রতি সবারের দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু গ্রামের চিরঅবহেলিত দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি আমাদের চিন্তাধারা আজ পর্যন্ত কতটুকু প্রসারিত হয়েছে? অথচ একথা অনস্বীকার্য যে শিরাধমনীর অচলাবস্থাতে দেহের কাজ যেমন অচল হয়ে যায় সেইরূপ গ্রামের উন্নতি ছাড়া দেশের অগ্রগতি অসম্ভব। সুতরাং গ্রামীণ অর্থনীতিকে সর্বাগ্রে সুদৃঢ় করা একান্ত প্রয়োজন।

অতীতে এই কল্প প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়নে বিভিন্ন প্রকল্প তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সুষ্ঠু রূপায়নের ক্ষেত্রে যে বাধা ও বিপত্তি ছিল তা অতিক্রম করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো পুরোপুরি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কোন প্রকল্পকে কার্যকরী করতে হলে জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। সমষ্টি তৈরী হয় ব্যষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কার্যে রূপায়িত করে এবং এও ঠিক যে এই গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য একটি সুষ্ঠু পরিচালিত সংস্থার প্রয়োজন। বলাবাহুল্য গ্রামের জনসাধারণের পক্ষে সব থেকে সহজলভ্য সংস্থা হচ্ছে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান। পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার তিনটি ধাপ রয়েছে। গ্রাম স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লক স্তরে আঞ্চলিক পরিষদ বা পঞ্চায়েত, সমিতি ও জেলা স্তরে জেলাপরিষদ। এই তিনটি একে অপরের সাথে যোগসূত্রে আবদ্ধ। অথচ প্রত্যেকটি স্তর নিজ নিজ ক্ষমতার মধ্যে সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজ সহজভাবে করে যেতে পারে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের সমস্যার সাথে খাপ খাইয়ে প্রকল্প তৈরী করবেন এবং আর্থিক সঙ্গন অনুযায়ী সেইগুলি কার্যে রূপায়িত করার চেষ্টা করবেন। এই ধরনের সংস্থা কিভাবে সাহায্য করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

১) বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাস করে বেশী কাজের সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো;

২) চাষের সাথে কুটীর শিল্প, ক্ষুদ্র-শিল্প ও কৃষিভিত্তিক শিল্পকে গড়ে তোলা;

৩) গ্রামীন রাস্তাঘাট, পানীয় জলের কুয়া ইত্যাদির উন্নতি সাধন;

৪) গ্রাম্য কলহের নিষ্পত্তি করা;

খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রম সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ :—

১) প্রতি পরিবারের লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে গ্রামীণ পরিকল্প প্রস্তুত করা;

২) আবর্জনা ও মলমূত্রকে কম্পোষ্ট সারে পরিবর্তন করার জন্য গ্রামবাসীর উৎসাহ বর্দ্ধন করা;

৩) কীটানুনাশক ঔষধ পত্র কৃষকের হাতের কাছে পাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা;

৪) নানাবিধ কৃষিযন্ত্রপাতি, সারবীজ ইত্যাদি কৃষকের সহজলভ্য করে দেওয়া;

৫) উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্বন্ধে তালিম দেওয়া ও কৃষকদের মধ্যে তালিম দেওয়ার ব্যবস্থা করা;

৬) সবুজ সার তৈরী করার ব্যাপারে উৎসাহ দান;

৭) শাক সব্জী ও ফলচাষে সাহায্য করা;

৮) সর্ব্বসাধারনের জমিতে বাগান করা ও বিভিন্ন ফসলের ও পদ্ধতির জন্য প্রদর্শনী ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা;

৯) ফলমূল ও সব্জী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;

১০) গো-মহিষাদি ও মুরগী পালন ব্যবস্থায় উৎসাহ বর্দ্ধন করা;

পঞ্চায়েত সমিতির কাজ :—

১) গ্রামীণ পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করে আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা;

২) উন্নত ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষন, মেরামতী ব্যবস্থা ও চাষীদের মধ্যে ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা;

৩) ছোট ছোট জলসেচের কাজগুলি দেখাশুনা করা;

৪) সেচহীন এলাকায় ছোট ছোট প্রকল্প তৈরী করে খাদ্য উৎপাদনে বহুফসলী চাষের বন্দোবস্ত করা;

জেলা পরিষদের কাজ :—

১) পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা;

২) বিভিন্ন ফসলের উন্নত ধরনের বীজ-চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তাই থানা স্তরে বীজখামার প্রতিষ্ঠিত করা ও নিয়মিত দেখাশুনা করা;

৩) ভালো জাতের জীবজন্তু যাতে পাওয়া যায় তারজন্য পশু পালনের ব্যবস্থা করা ;

৪) রোগ ও পোকামাকড়ের হাত থেকে ফসল রক্ষা করার ব্যবস্থা করা ;

৫) উদ্যান উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা ;

৬) ছোট ছোট জল সেচের কাজ কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে সাহায্য করা ;

৭) নতুন নতুন প্রণালী যাতে কাজে লাগানো যায় তারজন্য ফসল প্রতিযোগিতা পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা ,

৮) জেলা স্তরে ও ব্লক স্তরে বীজ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা ;

৯) সার ইত্যাদির বন্টন ব্যবস্থা করা ,

খাদ্য উৎপাদন ছাড়া গ্রামীণ রাস্তাঘাট মেরামত ও তৈরী করা, অকেজো নলকূপ পুন: খনন করা, ছোট খাটো মামলার সালিসী ও আপস মীমাংসা করা ইত্যাদি সব রকমের জনকল্যাণমূলক কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে গ্রামবাসীকে প্রগতির পথে টেনে নিয়ে যাওয়াই হোল এই সংস্থার আসল উদ্দেশ্য ।

পঞ্চায়েতি রাজের জয়যাত্রা কয়েকটি প্রদেশে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে । পাঞ্জাবের লুধিয়ানার কাছে বাদেওয়াল গ্রামের চাষীরা অধিক ফলনশীল বীজ বুনে আশ্চর্য্য রকম ফল পেয়েছে । হাই ব্রিড ভুট্টা চাষীদের অনেকের ক্ষেতে চালু হয়েছে । এখানকার গমের জমিতে শতকরা ৭৫ ভাগ উচ্চ ফলনশীল গম স্থান পেয়েছে । বহু ফসলী চাষ এখানে প্রায় প্রতি কৃষকই করে থাকেন । এখানে চাষীরা বুঝতে পেরেছেন যে গ্রামের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করতে হলে একটা সংস্থা থাকা দরকার । এই সংস্থার মাধ্যমে তাঁরা সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে । নিজের নিজের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যাপারে এই ধরনের সংস্থা একটি কেন্দ্ররূপে কাজ করতে পারে ।

অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার নন্দিগামা তালুকে বাড়ীতে বাড়ীতে বিজলী বাতির প্রসার । ওখানকার লোকেরা তাই আনন্দে মেতে উঠে বলে "এ আমাদের বিজলী । আমরা নিয়ে এসেছি আমাদের গাঁয়ে ।" সত্যিই ঠিক কথাই ওরা বলেছে । ওরা বিনিপয়সায় গ্রানাইট ভেঙেছে, মাটি কেটেছে । লাইন দাঁড় করিয়েছে, খুঁটি বয়ে আনবার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেছে । বলদগাড়ী ৩৬৩ বার বিনিপয়সায় গেছে আর এসেছে । ২০৮৩ দিন শ্রম খাটিয়েছে । তামিলনাড়ুর শতকরা ৫০ ভাগ গ্রামে বিজলী পৌঁছে গেছে ।

কেরালার শতকরা ৩৯.৭৩ গ্রামে বিজলীর বাতি জ্বলছে । মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও গুজরাটে পঞ্চায়েতি রাজ সাফল্যের দিক দিয়ে বেশ অগ্রণী । মহারাষ্ট্রের থানা জেলা পরিষদ অতিরিক্ত ৪,০০০ একর জমিতে ফল বাগিচা চাষ করেছে । ১৫,০০০ একর জমিতে কাজুবাদাম চাষ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে । কয়েকটি জেলায় নয়াল সময় জেলা পরিষদগুলি চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ করে "সোচ্চি কুয়া" খুড়ে প্রায় আট হাজার একর জমি সেচের আওতায় এনেছে । কৃষি ভিত্তিক শিল্পের উন্নতির জন্য নাগপুর জেলাপরিষদে বিশেষ ধরনের প্রকল্প তৈরী করা হয়েছে । এই সব প্রকল্পের জন্যে পরিষদের পক্ষ থেকে সাতকোটি পাঁচিশ লক্ষ টাকা জুগিয়ে দেওয়া হয়েছে । রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ছয় লক্ষ টাকা 'ম্যাচিং গ্রান্ট'ও দেওয়া হয়েছে । রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের কয়েকটি স্থানে এই ব্যাপারে গত কয়েক বছরে বিশেষ সাফল্য অর্জন করা গেছে ।

উপরোক্ত সাফল্যের খতিয়ান একদিকে যেমন সবাইকে উৎসাহিত করবে আবার এর উল্টোদিকটাও অত্যন্ত নৈরাশ্য ব্যঞ্জক । কোন কোন এলাকায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রাক্কালে যে উৎসাহ, যে আশা, যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল নির্বাচনোত্তর কালে তা আদৌ কার্য্যকরী হয়নি । কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর হতে আরম্ভ করে জেলা স্তর পর্যন্ত সদস্যদের অনুপস্থিতিতে কোরামের অভাবে বৈঠক দিনের পর দিন স্থগিত রয়ে গিয়েছে । আলোচনার কথাও ছেড়েই দিলাম । গঠনমূলক কাজের জন্য গড়ে খাটানোও বাদই দিলাম । আর্থিক সঙ্গতিকে বাড়ানোর জন্য টাকা আদায়ের কোন উৎসাহ দেখা যায়নি । অনেকে আবার নির্বাচনের কথা মনে রেখে ট্যাক্স আদায়ের মত অপ্রীতিকর কাজে মাথা ঘামাতে ভয় বা দ্বিধা করে থাকেন । ফলে দিনের পর দিন ট্যাক্স অনাদায় থাকল । কর্মচারীদের মাহিনাও পর্যন্ত জোগান দেওয়া দায় হয়ে দাঁড়াল । অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা গেছে গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলিতে পাবলিক ফান্ডের হিসাব ঠিকমত রাখা হয় নি । গ্রামে বা অঞ্চলে বাস করেন না এমন বহু সদস্যের অভাব নেই । গঠনমূলক কাজ কি বাইরে থেকে অথবা সহরে বাস করে সম্ভব হয় ? গ্রামের কাজ করতে হলে গ্রামের সমস্যাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হয় । রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বা মতানৈক্যের ফলে গঠনমূলক কাজ যে ব্যাহত হচ্ছে এই রকম সংবাদও আজকাল বহু পাওয়া যাচ্ছে ।

কেন সাধারণ গ্রামবাসী এই প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা পাচ্ছে বঞ্চিত ? আমরা কি চিন্তা করেছি যে এর আসল গলদ কোথায় ? কেন এই দুরবস্থা ? আমাদের দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের । যেখানে একটা আইন ভালভাবে কাজ করে সাফল্য অর্জন করেছে, অন্যত্র তা ব্যর্থ হয়েছে । মহারাষ্ট্রের চাষীরা ভাল মাটি, জলবায়ু ও অন্যান্য অনুকূল অবস্থাতে যতটা অগ্রসর হতে পারে, বাংলা দেশের কৃষক সেই অনুযায়ী উন্নতি

পারে না। পাঞ্জাবের কৃষক সেচের জল ব্যবহার করে যতটা সাফল্য আনতে পারছে, রাজস্থানের চাষী মরুঅঞ্চলিত পরিস্থিতিতে ততোটা অগ্রসর হতে পারছে না। এছাড়া বিভিন্ন দেশের চাষীর আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্নতো আছেই। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকাতে সাধারণ গ্রামবাসীর উৎসাহ ভিন্নমুখী। কোথাও ক্লাব-লাইব্রেরী করার কথা বললে ছেলেরা সোৎসাহে উঠে পড়ে লাগে, আবার সেখানে রাস্তা-ঘাটের জন্য শ্রমদান করতে বললে পিছিয়ে আসে। পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ টাকা দিতে বললে economic depression এর দোহাই দেওয়া হয় অথচ যাত্রাগানের আসরে ঐখানেই এক-রাত্রে ১০ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে এমন নজিরও আছে। সুতরাং গ্রামবাসীর উৎসাহের ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার উপর গঠনমূলক কাজ অনেকাংশে নির্ভরশীল। তৃতীয়তঃ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকগুলিতে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ে কিছু অনুদানের ব্যবস্থা থাকে কিন্তু তৃতীয় পর্য্যায়েও ব্লকের হাতে টাকা একদম থাকে না। তাই গঠনমূলক কাজকর্ম একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্থতঃ পঞ্চায়েত-রাজের হাতে এমন কিছু ক্ষমতা দেওয়া থাকে না যার প্রয়োগে সাধারণ গ্রামবাসী এঁদের কাছে আসতে বাধ্য হবেন। এদের জনপ্রিয়তা অর্জন করার সুযোগ দিন দিন বাড়িয়ে দেবে। এরা উৎসাহ কেমন করে পাবে? পঞ্চায়েতের খাতে সরকারী অনুদান যে নগণ্য একথা আর নাই বললাম। অনগ্রসর দেশে গঠনমূলক কাজের জন্য যে সরকারী অনুদান একটা বিশেষ সময় পর্য্যন্ত চালিয়ে যাওয়া উচিত একথা অনেকে বুঝলেও জাতীয় তহবিলের অভাবে সব সময় সম্ভব হবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত আইন-কানুনের মধ্যে মৌলিক গলদ রয়ে গিয়ে থাকবে। সরকারী কর্মচারী ও নির্বাচিত সদস্যদের অনভিজ্ঞতার ফলে পঞ্চায়েতের কাজের সমন্বয়ের অভাবে কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে।

বর্তমানে গ্রামসভা গঠিত হয় কয়েকটি গ্রামের প্রতিনিধি নিয়ে। সব গ্রাম হতে প্রতিনিধি গ্রাম সভাতে পাঠানো হয় না ফলে গ্রাম্য কলহ, রেষারেষি বেড়ে যায়। কোন গ্রাম হয়ত প্রতিনিধির অভাবে একেবারেই সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক গ্রাম হতে সদস্য নির্বাচিত হলে গ্রামবাসীর আত্মচেতনা বাড়বে। সমস্ত ভোটার নিয়ে যে গ্রামসভা হবে তার আকার বৃহৎ এবং এর সাথে পঞ্চায়েত সমিতির যোগসূত্র রাখা সম্ভব নয়। তাই প্রতি ৫জন সদস্য পিছু একজন করে নিয়ে এই গ্রামসভাকে পল্লী জীবনের মূল ভিত্তি বজায় রেখে উপযুক্ত কাজের ভার দিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম পরিষদ গঠন করা হবে। এই গ্রাম পরিষদ হতে ১৫-২০ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হবে। অনুরূপভাবে অঞ্চল ও জেলাস্তরে পরিষদ ও পঞ্চায়েত গঠিত হবে। গ্রাম পরিষদের জন্য প্রতি ৫ জন ভোটারের এক একটি নির্বাচন ক্ষেত্র হবে। অঞ্চল পরিষদে ১০০ জন ভোটারের একটি নির্বাচন ক্ষেত্র হবে। প্রত্যেক নির্বাচন গ্রাম অঞ্চল ও জেলায় সবাসরি হবে। তিনটি নির্বাচন পৃথক হবে। প্রথমে গ্রাম, পরে অঞ্চল ও তারপরে জেলা। ২০টি গ্রাম নির্বাচন ক্ষেত্রকে এক করে একটি অঞ্চল নির্বাচন ক্ষেত্র হবে এবং একটি নির্বাচন ক্ষেত্রকে দুভাগ করে প্রত্যেকটি অঞ্চলে দুটিকরে জেলা নির্বাচন ক্ষেত্র হবে। প্রত্যেক স্তরে গোপন ভোট হবে। রাজ্যসরকারের অধীনে পরিচালিত জেলার পুরাতন শাসন ব্যবস্থা যথা বজায় রাখা হবে। কোন ক্ষেত্রে মতদ্বৈধ দেখা দিলে রাজ্যসরকার এই ব্যাপারে নিষ্পত্তি করবেন। এইভাবে ক্ষমতার কাঠামো তৈরী হবে। গ্রামকে তার স্বাধীন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে। অঞ্চলের সীমানার মধ্যে তার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা হবে। এর সাথে গ্রাম, অঞ্চল ও জেলার গণশাসনের পরস্পরের কাজ তদারক ও নিয়ন্ত্রণের ধারায় পরিচালিত হতে থাকবে।—এইভাবে ব্যবস্থা রাখতে হবে। উল্লিখিত ব্যবস্থা যে গণতান্ত্রিক বিধিসম্মত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন একটা দীর্ঘ ও জটিল ব্যবস্থার বাস্তব রূপ দেওয়া সময় সাপেক্ষ। কারণ সাধারণ গ্রামবাসী, মন্ত্রিসভা ও বিধান সভার মত অনুরূপ জটিল কার্য্যকরী ব্যবস্থা সহজে হৃদয়ঙ্গম করে বাস্তব রূপায়নে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন। গ্রামীণ উন্নয়ন ঢিমেতালে চলতে থাকবে। সুতরাং স্থান বিশেষে সেখানকার পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বর্তমান শাসন ব্যবস্থার কাঠামোকে সেখানকার উপযোগী করে তোলার ব্যবস্থা করার জন্য কিছু রদবদল করা দরকার। প্রতিটি গ্রামের প্রতিনিধি যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থান পায় সেই জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রয়োজনবোধে পুনঃগঠন করে বাড়ানো যেতে পারে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতই হবে পঞ্চায়েতিরাজের মূল ভিত্তি প্রস্তর। গ্রামীন সমস্যাবলীর সম্যক অনুধাবন পূর্ব্বক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সদস্যকে এই ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে সেই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। এরাই গ্রামের মূল প্রকল্প তৈরী করবেন। "Planning from below" এই নীতি রূপায়নের জন্য এদের উৎসাহ, কর্মপ্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ন না হলে গ্রামের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে না। বর্তমান কাঠামোতে অঞ্চল পঞ্চায়েতেরই শুধু এক্তিয়ার আছে অঞ্চল ট্যাক্স আদায় করার ও গ্রামের মূল প্রকল্পগুলি অনুমোদন করে কার্য্যকরী করার ভার গ্রামসভাকে ছেড়ে দেওয়া। গ্রাম উন্নয়নের জন্য বিবিধ নিয়মাবলী তৈরী অঞ্চল পঞ্চায়েতই করে থাকেন। ট্যাক্স আদায়ের দায়িত্ব পুরোপুরি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া উচিত। আদায়ের বেশীরভাগও প্রয়োজন মাফিক যাতে সেই পঞ্চায়েতে খরচা করা যায় সেই

(২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সংবাদ পরিক্রমা

সেচ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার

সুভাষ বসু

কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ পর্ষদ দামোদর থেকে তার দক্ষিণ অববাহিকায় আরও গভীর করবার জন্যে একটি বিরাট প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এতে ১৫ কোটি টাকার মত খরচ পড়বে। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে দামোদরের নিম্ন উপত্যকা অঞ্চলে প্রায় [illegible] কোটি টাকা মূল্যের শস্য উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়। বিশেষতঃ, আমন ধানের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়বে। তাছাড়া, প্রতি বছর হাওড়া এবং হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দামোদরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের যে ৩০ লক্ষ টাকার মত রিলিফ দেওয়া হয়, সেটাও বাঁচবে। প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ে ২৫ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে এবং এদের মধ্যে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা হবে এক হাজারের মত।

এ ছাড়া, হুগলী জেলায় জলসেচ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে জেলা কর্তৃপক্ষ এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী [illegible] ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ১০০০ অগভীর নলকূপ বসানো হচ্ছে এবং পাম্প কেনার জন্যে চাষীদের প্রায় এক কোটি টাকার মত অনুদান দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। [illegible] একরের মত জমিতে জলসেচ করতে পারে এমন ১৬টি গভীর নলকূপ বসানোর কাজও বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলেছে। নদী থেকে জল তুলে সেচ ব্যবস্থার জন্যে [illegible]টি প্রকল্পও রূপায়িত হচ্ছে। প্রতিটি প্রকল্প ২০০ একরের মত জমিতে জলসেচ করতে সক্ষম। বর্তমানে সারা জেলায় কমপক্ষে ১১৫টি গভীর ও ২০০০ অগভীর নলকূপ এবং প্রায় ১০০ নদীভিত্তিক সেচ প্রকল্প চালু আছে।

পুরুলিয়া জেলাতেও জলসেচের জন্যে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সর্বপ্রথম ১৯৬১ সালে কেয়ার ফাউণ্ডেশন-এর আর্থিক সাহায্যে এবং রাজ্যসরকারের সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে এ জেলার জলাশয়গুলি সংস্কার করে তাদের সাহায্যে জলসেচের এক বিরাট প্রকল্পের রূপায়ণ কার্য সুরু হয়। এই প্রকল্পে জেলার ৬৩৯ টি জলাশয়ের মধ্যে ৫১২ টির সংস্কার করা হয়। এযাবৎ খরচ পড়েছে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। এতে ১৩ হাজার একর জমিতে জলসেচ হচ্ছে এবং প্রায় ৯১ হাজার টাকা করে রাজস্ব আদায় হচ্ছে। ১৯৬৯-৭০ সালে এই প্রকল্পের খাতে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এ ছাড়া চতুর্থ পরিকল্পনাকালে জেলার জলাশয়গুলির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্যে ৫০ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫০টি জলাশয়ের জন্যে গত আর্থিক বছরে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এতে ১২০০ একরের মত চাষের জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা সম্ভব হয়। আশা করা যায়, ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে আরও ১০ হাজার একর জমি সেচের জল পাবে।

মালদহ জেলাকেও খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে তুলতে রাজ্যসরকার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন সে অনুযায়ী এই জেলাতে অন্ততঃ এক হাজার অগভীর নলকূপ বসানো হচ্ছে। এতে খরচ পড়বে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। বিহার থেকে আনীত বিদ্যুতের সাহায্যে এগুলিকে চালু করা হবে। এছাড়া জেলায় কয়েকটি অঞ্চলে অগভীর নলকূপ থেকে পরিমিত জলসেচের সাহায্যে একই জমি থেকে তিনটি ফসল তোলারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা সরকার পর্যায়ক্রমে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রাম্যমান সেচ কেন্দ্র চালু করে জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার করবেন বলে স্থির করেছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শালগড়ায় গোমতী নদীর উপত্যকায় এই রকম একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কেন্দ্রটি ১২৫ একর জমিতে জলসেচ করতে পারে। অনুরূপ আর একটি কেন্দ্র মহারাণীতে শীঘ্রই চালু করা হবে।

ক্ষুদ্র সঞ্চয় সম্পর্কে কেন্দ্রের অনুসৃত নীতি হল, যে রাজ্য থেকে যে পরিমাণ ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগৃহীত হবে, তার দুই-তৃতীয়াংশ সেই রাজ্যেরই উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হবে।

এই নীতি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ ১৯৬৯-৭০ সালে তার সংগৃহীত ৩০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মধ্যে ২০ কোটি টাকা উন্নয়নের জন্যে ফেরৎ পায়।

ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ

উক্ত বছরে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে নদীয়াই ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। সে বছর এই জেলায় ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানতের লক্ষ্যসীমা ছিল ৪৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু সে জায়গায় ৬৪ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। প্রকাশ, যে ১৯৭০-৭১ সালেও নদীয়া তার ৪১ লক্ষ টাকা আমানতের লক্ষ্যসীমা স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

হুগলী জেলাতেও ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। ১৯৭০-৭১ সালে এই জেলা আমানত সংগ্রহের

নির্দ্ধারিত লক্ষসীমা ৭৩ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে।

পুরুলিয়া জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে একটি করে আদর্শ ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারি গ্রাম বেছে নেওয়া হচ্ছে। পুরুলিয়া ব্লকের ডাদশা গ্রাম এই জেলার প্রথম আদর্শ গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ গ্রামের ৯০টি পরিবারের মধ্যে ৮১টি পরিবারই ডাকঘরে তাঁদের সঞ্চয় এ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এ বিষয়ে স্থানীয় যুবসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে গ্রামীন জনসাধারণের অনুকূল মনোভাব গঠনে রাজ্য-সরকার যে নিবিড় অভিযান চালাচ্ছেন তা অনেকাংশে ফলপ্রদ হতে সুরু করেছে। যেমন, ১৯৭০-৭১ সালে দার্জ্জিলিং জেলার জন্যে স্বল্প সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হয়েছিল ৫৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু কালিম্পং সহরে ঘরে ঘরে সংগ্রহ অভিযান চালিয়ে এক দিনেই ১লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সহরে অনুরূপ নিবিড় প্রচার কার্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বলে প্রকাশ।

দার্জ্জিলিং

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুদ্রচাষী উন্নয়ন এজেন্সীকে দেড় কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। দার্জ্জিলিং এর এই এজেন্সী ছোট ছোট চাষীদের আর্থিক মান উন্নয়নের জন্যে ১৯৬৯ সাল থেকে কয়েকটি প্রকল্প বেশ সাফল্যের সঙ্গেই রূপায়িত করছেন। এই জেলার তিনটি পার্বত্য মহকুমা—কালিম্পং, কার্শিয়াং এবং সদর মহকুমায় ৬ ০০০ ক্ষুদ্র চাষী পরিবার এই প্রকল্পগুলির আওতাভুক্ত। এই পরিবারগুলির মোট জমির পরিমাণ ১২ হাজার একরের মত এবং প্রত্যেকের জমির গড় পরিমাণ দুই একরেরও কম। ১৯৭০-৭১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই সব চাষীর জন্যে ৬ লক্ষ ২৪ হাজার টাকার সাহায্য মঞ্জুর করেন। এর মধ্যে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দেড় হাজার একর জমিতে সেচ কার্যে, ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা জমি উন্নয়নে; ২৭ হাজার টাকা ১০০ একর জমিতে ফল ও সব্জীর চাষে এবং ৪৭ হাজার টাকা বিভিন্ন সাহায্য খাতে যেমন কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত, ট্রাক্টর ভাড়া, বীজ সরবরাহ ইত্যাদিতে খরচ হবে বলে ঠিক।

ক্ষুদ্রচাষী উন্নয়ন ব্যবস্থা

এছাড়া চতুর্থ যোজনাকালে এ অঞ্চলে ডেয়ারী এবং হাঁস মুরগী পালনের উদ্দেশ্যে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ১৯৭০-৭১ সালে আট লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং রাজ্যসরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর কয়েকটি ছোট ছোট প্রকল্পে এই টাকাটা খরচ করছেন।

এছাড়া, সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি শিল্প উন্নয়নের জন্যে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফল এবং সব্জী সংরক্ষণের একটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবও রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন।

* * * *

১৯৬৮ সালের বিধ্বংসী বন্যা এবং ধ্বস নামার পর থেকে দার্জ্জিলিংএর পার্বত্য অঞ্চলে রঞ্জিত নদীর ভাঙ্গন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই ভাঙ্গনের হাত থেকে পুলবাজার ও বিজন বাড়ীকে রক্ষা করার জন্যে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী পুলবাজার ও বিজন বাড়ীর কাছে বড় বড় পাথরের চাঁই এবং কংক্রীটের চাপড় দিয়ে রঞ্জিতে নদীর উভয় তীর পর্যন্ত ঢাল তৈরি করা হবে। এতে ধ্বস তো বন্ধ হবেই, তাছাড়া, নদীর ভাঙ্গন থেকে তীরবর্তী অঞ্চলও রক্ষা পাবে।

জলপাইগুড়ি

তিস্তা নদীর বন্যার হাত থেকে মণ্ডল ঘাটকে রক্ষা করার জন্যে রাজ্য সরকারের জলসেচ বিভাগ প্রায় ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মণ্ডলঘাট থেকে বিবিগঞ্জ পর্যন্ত নদীর উপকূলবর্তী স্থানে বাঁধ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এতে অন্ততঃ ৪৫ বর্গমাইল স্থান এবং দুই লক্ষ অধিবাসী বন্যার হাত থেকে রেহাই পাবে।

প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ে তিস্তার সিম্ আববাহিকায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০ হাজার ফুট বাঁধ দেওয়া হচ্ছে।

এ ছাড়া, ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত পানবাড়ী অঞ্চলকে জলঢাকা নদীর ভাঙ্গন থেকে বাঁচাবার জন্য একটি প্রকল্প ও রূপায়িত করা হচ্ছে। এর জন্যে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

* * *

জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালটিকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এর ফলে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা আরও দেড়শ বাড়বে। খরচ পড়বে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। তা'ছাড়া আলিপুর দুয়ার মহকুমায় তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ শিলিগুড়ি কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৩৭ লক্ষ টাকার এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

এই কর্মসূচী অনুযায়ী শিলিগুড়ি কেন্দ্রে ১'৫ মেগাওয়াট শক্তিবিশিষ্ট দুইটি ডিজেল জেনারেটর বসানো হচ্ছে। এতে এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫'৫ মেগাওয়াট বেড়ে যাবে। এই প্রকল্পটি শেষ হলে জলঢাকা কেন্দ্র কোন কারণে বিদ্যুত সরবরাহে অক্ষম হলেও শিলিগুড়ি অঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে কোন অসুবিধা হবে না।

কোচবিহার

কোচবিহার জেলার মেকলিগঞ্জ থানার সিজিমান গ্রামের কাছে তিস্তা নদী দিক

পরিবর্তন করায় মেকালিগঞ্জ একটা বড় বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। মেকলিগঞ্জকে রক্ষা করবার জন্যে জলপাইগুড়ি জেলার হেলাপাকড়িতে তিস্তার বর্তমান বাঁধের কাছে আর একটি বাঁধ বা 'spur' দিয়ে নদীর এই দিক—পরিবর্তণ বন্ধ করা হচ্ছে। এতে মোট খরচ পড়বে ৯ লক্ষ টাকা।

পশ্চিম দিনাজপুর

• পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন জমি বন্টন নীতি অনুসারে পশ্চিম দিনাজপুরে এই প্রথম সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে স্থায়ী স্বত্ব দিয়ে বন্টন করা হয়েছে। আগে এ রকম জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিলি করা হলেও তাদের স্থায়ী স্বত্ব দেওয়া হতনা।

নতুন নীতি অনুসারে এই জেলার রায়গঞ্জ মহকুমায় প্রায় ১০০০ একর খাস জমি সাতশ' ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। তাছাড়া, ঐ জেলারই কালিয়াগঞ্জ এবং হেমতাবাদ ব্লকে প্রায় তিনশ চাষীদের মধ্যে এক হাজার বিঘা জমিও বিলি করে দেওয়া হয়েছে।

*　　　*　　　*

গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রসারের কর্মসূচী অনুযায়ী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া পশ্চিম দিনাজপুরের চাকুলিয়া এবং মালদহের গাজোল, হরিশচন্দ্রপুর ও চাঁচালে একটি করে সাব-অফিস খুলেছে। দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতেও দুইটি করে অফিস খোলা হয়েছে।

মালদহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ সম্প্রতি মালদহ জেলার ৫০টি এবং দার্জিলিং জেলার ৪০টি গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের জন্যে একটি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই কাজের জন্যে রাজ্য সরকারের বন বিভাগ উত্তর বঙ্গের দুর্গম অঞ্চল থেকে এক লক্ষ শালের খুঁটি বিদ্যুত পর্ষদকে সরবরাহ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এ ছাড়া মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুরে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাবার জন্যে বিহারের বারাউনি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বর্তমানে এই কেন্দ্রে উৎপাদিত বাড়তি বিদ্যুতের মধ্যে তিন মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে তা বাড়িয়ে ১০ মেগাওয়াট করা হবে। এই উদ্দেশ্যে বিহারের পুর্ণিয়া থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের ডালখোলা পর্যন্ত ট্রান্সমিশন গ্রিড্ লাইন টানা হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ

সম্প্রতি বহরমপুরের নিউ জেনারেল হাসপাতালে মুর্শিদাবাদ জেলা রেড্ক্রশের আর্থিক সাহায্যে একটি পোলিও নিরোধক কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই কেন্দ্র স্থাপনে মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও নদীয়া জেলার অধিবাসীরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

বর্দ্ধমান

বর্দ্ধমান সহরের উন্নয়ন করে আসানসোল প্ল্যানিং সংস্থা একটি "মাষ্টার প্ল্যান" তৈরি করেছেন। এতে সহরে পানীয় জল সরবরাহ এবং নিকাশনী ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় যে এই প্ল্যান রূপায়ণে ৭০ লক্ষ টাকার মত সরকারী অনুদান পাওয়া যাবে।

জেলার পরিবহণ সমস্যার সমাধানের জন্যেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ঐ সংস্থার এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে যে জেলার যে কোন স্থানেই পরিবহনের সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম। সমীক্ষার এই ফলাফলের ভিত্তিতে বর্দ্ধমান জেলার আঞ্চলিক পরিবহন অধিকার ১১০টি বাসকে এই জেলায় চলাচলের জন্যে পারমিট দেবেন বলে স্থির করেছেন। এ ছাড়া সরকারি পরিবহনের নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে বোর্ড আছে তার জায়গায় একটি কর্পোরেশন গঠণ করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

বর্দ্ধমান জেলার টেলিফোন ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতিবিধান করা হচ্ছে। ডাক ও তার বিভাগ স্থির করেছেন যে বর্দ্ধমানে বর্তমান টেলিফোন এক্সচেঞ্জের জায়গায় এক হাজার লাইন বিশিষ্ট একটি এক্সচেঞ্জ বসানো হবে এবং এ সম্পর্কে কাজও শুরু হয়ে গেছে। এছাড়া দুর্গাপুর ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে রাণীগঞ্জ সহ সাতটি সহরে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বসাবার কাজও বেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

মেশিনারী করপোরেশন

দুর্গাপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের মাইনিং এ্যাণ্ড এ্যালায়েড্ মেশিনারী কর্পোরেশন মাদ্রাজ বন্দরে মাল ওঠানো নামানোর জন্যে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের ১০ হাজার মেট্রিক টন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করে সরবরাহ করবেন বলে জানা গেছে। কাজটি ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই কর্পোরেশন হলদিয়া বন্দরে জাহাজে কয়লা এবং খনিজ আকর (ore) বোঝাই করার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের অর্ডারও পান। এই যন্ত্রপাতির মধ্যে বেশ কিছু অংশ সরবরাহও করা হয়েছে।

আবার কেন্দ্রীয় সরকারের ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস্ কর্তৃক পরিকল্পিত ও নির্মিত একটি বয়লার ভারত সরকারের দুর্গাপুর সার কারখানায় চালু করা হয়েছে। এই বয়লারটি ৬০ টনের মত বাষ্প উৎপাদন করতে সক্ষম। ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস্ এর তৈরি এধরনের বয়লার এই প্রথম চালু করা হল।

ভারতে নিরক্ষরতা দূরীকরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ

মোহিত রায়

ওয়েলথি ফিসার

গৌরী।

লখনউ থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে সরোজিনীনগর ডেভেলপমেন্ট ব্লক এলাকার একটি গাঁয়ের নাম গৌরী। একদিন এই গাঁটি ছিল অজ্ঞানতার অন্ধকারের অতলে নিমজ্জিত। নিরক্ষর ছিল গাঁয়ের সকলেই। আর এই নিরক্ষরতাই ছিল গৌরীর গ্রামবাসীদের জীবনে নিদারুণ অভিশাপ। গৌরী গাঁয়ের এই অভিশাপ মুক্ত করলেন ভারতে নিরক্ষরতা দূরীকরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা লখনউ লিটারেসী হাউসের প্রতিষ্ঠাত্রী তথা ওয়ার্লড এডুকেশনের সভানেত্রী রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজী শিষ্যা ডক্টর ওয়েলদি ফিসার। আজ গৌরী গাঁয়ের সাবালকদের ভিতরে আর কেউ নিরক্ষর নেই, তাদের জীবনের মান আজ উন্নত। গৌরীর গ্রাম গ্রন্থাগার থেকে রোজ বই লেনদেন হয়—গাঁয়ের সাবালক নরনারী সকলেই বই পড়তে পারে। সাক্ষরতার মধ্যে দিয়েই অজ্ঞানতা থেকে ঘটেছে তাদের মুক্তি। শুধু গৌরী নয়, গৌরীর মতো উত্তর প্রদেশের হাজার হাজার গ্রাম আছে যেখানে নতুন জীবনের আলো দিয়েছেন ডক্টর ফিসার। সেখানে ছেলেবুড়ো নারীর সকলেরই মুখে মুখে ফেরে তাঁর নাম।

ডক্টর ফিসারের জন্ম হয় আমেরিকার নিউ ইয়র্কের রোমে ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯। বাবা ছিলেন লোহার কারখানার মালিক, বিরাট ধনী। ছোটবেলায় ওয়েলদির স্বপ্ন ছিল সাইরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে নৃত্যশিল্পী হবার। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি আমেরিকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ করতেন। তার সাথেই চলতে লাগল নৃত্যগীত চর্চা।

এমন সময় একটি ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল: নিউ ইয়র্কের কারনেগী হলে মেথডিস্ট চার্চ এক ধর্মসভার আয়োজন করেছে। পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মনের খেয়ালে ঢুকে পড়লেন ধর্মসভায়। একজন যাজকের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হল তাঁর হৃদয়। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তাঁর এতদিনের স্বপ্ন: নৃত্যশিল্পী হবার বাসনার ঘটল অপমৃত্যু। সবস্ব ত্যাগ করে যোগ দিলেন মেথডিস্ট চার্চে—উৎসর্গ করলেন মানুষের সেবায়।

কর্মের আহ্বান এল। পাড়ি দিলেন সুদূর চীনে। চীনের নানচুঙে মেথডিস্ট চার্চ পরিচালিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকারূপে কাজ করতে লাগলেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে সেই বিদ্যালয়টিকে আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড়ে তুললেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বিদ্যালয়টি। নীরবে অশ্রুবিসর্জন করলেন মুহূর্তমাত্র। তার পরেই ছুটে এলেন আমেরিকায়। এক বছর দিনের পর দিন বক্তৃতা দিয়ে, সংগীত পরিবেশন করে অর্থসংগ্রহ করে আবার চলে এলেন নানচুঙে। নতুন করে গড়ে তুললেন পুড়ে যাওয়া বিদ্যালয়টিকে।

প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল। তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে ওয়াই.এম.সি.এর কর্মী হিসাবে কাজ সুরু করলেন। মেথডিস্ট চার্চের কাজের মাধ্যমেই তিনি ভারত ও ব্রহ্মদেশের মেথডিস্ট চার্চের বিশপ ডক্টর ফ্রেডারিক বন ফিসারের সান্নিধ্যে আসেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন (১৯২২ সালে)। এই সময় তিনি মেথডিস্ট পত্রিকা ওয়ার্লড আউটলুক'এর সম্পাদনাও করতেন।

বন ফিসারের সাথে মিসেস ফিসার এলেন ভারতে। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর পবিত্র সান্নিধ্যে এলেন। তাঁদের কাছে পেলেন এই দুই মহামানবের আশীর্বাদ। জহরলালের কাছ থেকেও তাঁরা পেলেন উৎসাহ আর প্রেরণা।

১৯৩৮ সালে বন ফিসার অকালে দেহ

রাখলেন। মিসেস ফিসার ফিরে গেলেন আমেরিকায়। গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত থাকলেন কয়েকবছর। তারপর পরিভ্রমণ করলেন সারা পৃথিবী।

গান্ধীজির সাথে

১৫ ডিসেম্বর ১৯৪৭ : মিসেস ফিসারের সঙ্গে গান্ধীজীর শেষ সাক্ষাৎ হল। গান্ধীজী তাঁকে বললেন ; 'India is village. When you come back to India, go to villages and help them. If you do not help the Villages, you donot help India.' গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ হল। প্রতিমুহূর্তে ফিসারের মনে হতে লাগল গান্ধীজীর অন্তিম নির্দেশ। তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। যে বয়সে সকলে অবসর জীবন যাপন করে, সে বয়সে (৭৩) ফিসার ফিরে এলেন ভারতে পাকাপাকিভাবে। গেলেন গ্রামে। প্রতিষ্ঠা করলেন সাক্ষরতা নিকেতন (Literacy House) ১৯৫৩ সালে এলাহাবাদের চারপাশে কাজ সুরু করলেন। গাঁয়ের অগণিত জনগণকে সাক্ষর করে তুলতে লাগলেন। পদে পদে বাধা অনেক, সংশয় অনেক, প্রশ্ন—সকলের মনে। অবিচলিত অনমনীয় সংকল্পে কঠিন ফিসার। কিছুতেই পিছোবেন না। লেখাপড়া না জানার জন্যই গাঁয়ের মানুষের এত কষ্ট এত অসুবিধা। খুব সহজ সরল কথা দরদ দিয়ে বোঝাতে লাগলেন নিরক্ষর গ্রামবাসীদের। এমন ভাবে তো কেউ বলেনি আগে? এমনভাবে তো কেউ বোঝেনি আগে? অনেক দিনের অনেক চেষ্টার পর লোকে পড়তে শিখল, লিখতে শিখল। আনন্দ আর তাদের ধরে না। ফিসার উৎসাহিত হলেন। নতুন উদ্যমে বৃদ্ধা কর্মের পরিধি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। ছাপালেন হাজার হাজার বর্ণপরিচয়ের বই। কর্মীরা সাইকেলে চেপে ছড়িয়ে পড়ল বই শ্লেট পেনসিল কেরোসিন লণ্ঠন নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে। ১৯৫৪ সালে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ডক্টর কে. এম. মুনশি ফিসারকে লখনউতে সাক্ষরতা নিকেতন স্থাপনের আহ্বান জানালেন। আমেরিকা থেকে আনা ৫০ হাজার ডলারে ফিসার লখনউ শহরের উপকণ্ঠে কুড়ি একর জমি কিনে সাক্ষরতা নিকেতন গড়ে তুললেন। ১৯৬১ সালে সাক্ষরতা নিকেতনের মধ্যস্থলে অবস্থিত অনুপমস্থাপত্যকীর্তি প্রার্থনাগৃহের দ্বার খুলে দিলেন তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ এস. রাধাকৃষ্ণণ। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনও একসময় সাক্ষরতা নিকেতনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন এখানে চলেছে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সর্ববিধ কর্মযজ্ঞ। ১৯৫৭ সালে ফোর্ড ফাউনডেশনের অর্থে (৬৯ হাজার ডলার) সহজ রচনা ও গণসংযোগের পদ্ধতি শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ফিসার। পুতুল নাচ, নাটক, সিনেমা, মুকাগীত, দেওয়াল পত্রিকা শিক্ষণ, চিকনের শাড়ি উৎপাদন ও উন্নত নিবিড় অধিক ফলনশীল শস্যের চাষেরও ব্যবস্থা আছে সাক্ষরতা নিকেতনে। আছে হাসপাতাল, ভোজনাগার, ছোটদের খেলার পার্ক আরও কত কি?

তিব্বতিদের মাঝে

দালাইলামা তিব্বত ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেবার পর তিব্বতীদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা করেন ফিসার। আন্তর্জাতিক পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সাক্ষরতার ক্ষেত্রে উল্লেখ্য অবদানের জন্য ১৯৬৪ সালে ফিসার ফিলিপাইনের র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার (৭৫ হাজার টাকা) লাভ করেন। সমুদয় অর্থে লখনউ-এর অদূরে গড়ে উঠল চাষী বিদ্যালয় (Young Farmers Institute). গাঁয়ে গাঁয়ে পরিবার পরিকল্পনারও সুব্যবস্থা করলেন। ফিসার এখন 3R-এর বদলে 3F-এর কথা বলতে চান—Functional Literacy, Food Production—Farming, Family welfare Planning. নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যই ১৯৬২ সালে জনসুনুর জি. কে. ওয়াটুমুল পুরস্কার পেলেন ফিসার। ১৯৬৮ সালে প্রথম নেহরু পুরস্কার, ১৯৬৯ সালে কনকোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার এবং ১৯৭০ সালে ইউনেসকোর মহম্মদ রেজা পহলবী ও নাডেজ্দা পহলবী ও নাডেজ্দা ক্রুপসকায়া পুরস্কার লাভ করেন ফিসার। পুরস্কার প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ তিনি ভারতে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যয় করেছেন।

সাহিত্য কর্ম

'To light a candle' হল তাঁর আত্মজীবনী, একটি মনোজ্ঞ সাহিত্যকর্ম। এ ছাড়া তাঁর লেখা অন্যান্য বই হল: Twins Travelogues, Beyond the Moongate, String of Chinese Pearls, Top of the world, Freedom, Frederick Bonn Fisher—World Citizen, Hand book of Ministers' Wives. সাইরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক এম এ. ও ডকটরেট এবং ফ্লোরিডা কলেজ তাঁকে সম্মানসূচক ডকটর অব লিটারেচার উপাধিতে ভূষিত করেন।

৯২ বছরের বৃদ্ধা ফিসার ; কিন্তু জরা তাঁর নেই, নেই ক্লান্তি কর্মে। তাই তিনি নিজেকে অক্লান্ত কর্মে নিয়োজিত রেখেছেন আজ এই বয়সেও। তিনি বলেছেন : I have learnt more than I have taught and gained more than I have given.

ভারতের কোটি কোটি মানুষ সাক্ষর হয়ে নিজেদের জীবনকে উন্নত করুক এই হল ফিসারের ইচ্ছা :

'We donot want only to educate the villagers. We want them to put that education to work for bettering their lives'.

এক নজরে এবারের বাজেট

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আয়

	১৯৭০-৭১ বাজেট	১৯৭০-৭১ সংশোধিত	১৯৭১-৭২ বাজেট
কর বাবদ আয়	৩,১১৪	৩,১৯৭	৩,৪০১ +২২০*
রাজ্য সরকারদের দেয় কর বাবদ আয়ের অংশ	৭৪৪	৭৫৫	৮৫০ + ৪৩*
কর বাবদ কেন্দ্রের নীট আয়	২,৩৭০	২,৪৪২	২,৫৫১
অন্যান্য আয়	৯০০	৯৪৯	১,০০০
কেন্দ্রের মোট আয়	৩,২৭০	৩,৩৯১	৩,৫৬২ + ১৭৭

রাজস্ব ব্যয়

	১৯৭০-৭১ বাজেট	১৯৭০-৭১ সংশোধিত	১৯৭১-৭২ বাজেট
নাগরিক উন্নয়ন ব্যয়	১,৪৯৮	১,৫২৪	১,৭২৫
প্রতিরক্ষা ব্যয়	১,০১৮	১,০৪০	১,০৭৯
বিধানসভাযুক্ত রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের জন্য অনুদান সাহায্য	৬৩৬	৬২৯	৭৮৩
মোট রাজস্ব ব্যয়	৩,১৫২	৩,১৯৩	৩,৫৮৭
রাজস্ব উদ্বৃত্ত (+)	+ ১১৮	+১৯৮	(—) ৩৫
ঘাটতি (—)			+ ১৭৭*

মূলধনী আয়

	১৯৭০-৭১ বাজেট	১৯৭০-৭১ সংশোধিত	১৯৭১-৭২ বাজেট
বাজার থেকে নেওয়া ঋণ (নীট)	১৬২	১৩৬	১৬৮
বাইরের সাহায্য (পি.এল ৪৮০ সাহায্য বাদে)	৪০০	৩৫৫	৩২৪
পি. এল ৪৮০	১৩২	১২২	১১৩
ঋণ পরিশোধ	৮২৫	৯৩০	৯৩০
অন্যান্য আয়	৩০৫	৫৬২	৪৮৯
মোট মূলধনী আয়	১,৮২৪	২,১০৫	২,০২৪

* বাজেট প্রস্তাবের ফলস্বরূপ

মূলধনী ব্যয়

	১৯৭০-৭১ বাজেট	১৯৭০-৭১ সংশোধিত	১৯৭১-৭২ বাজেট
নাগরিক উন্নয়ন ব্যয়	৫২৫	৬৮৪	৪৯১
প্রতিরক্ষা ব্যয়	১১৪	১৪৩	১৬৩
রেলওয়ের মূলধনী খাতে বিনিয়োগ	১৫০	১২৬	১৫১
ডাক ও তার বিভাগের মূলধনী বিনিয়োগ	৩৫	১৬	৩৮
ঋণ ও অগ্রিম :			
(১) রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	৮৭৪	১০৪০	৯৬৬
(২) অন্যান্য অঞ্চল	৪৬৭	৫২৪	৫৮৭
মোট মূলধনী ব্যয়	২,১৮৯	২,৫৩৩	২,৩৯৬
মূলধনী খাতে ঘাটতি (—)	৩৬৫	(—) ৪২৮	(—) ৩৭২
সর্বমোট ঘাটতি (—)	২২৭	(—) ২৩০	(—) ৩৯৭ (+) ১৭৭*

বাজেট ও সামাজিক ন্যায়

২ পৃষ্ঠার পর

তা শেষ পর্যন্ত বেড়ে যাবার সম্ভাবনাই খুব বেশী। অন্তবর্তী বাজেটে রাজ্য সরকারদের প্রয়োজনানুগ অধিক সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও তারা ১৯৭১-৭২ এ। বাজেটে ২০৯ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেটে পেশ করেছে। এই ২০৯ কোটি ঘাটতি হোল এ বছরের ২৩৯ কোটি টাকা দেনার ওপর। ১৯৭১ এর মার্চ মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত ১৪টি রাজ্য ওভার ড্রাফটের মাধ্যমে রিসার্ভ ব্যাংক থেকে ২৬০ কোটি টাকা উঠিয়েছে। রাজ্য সরকারদের আর্থিক ক্ষেত্রে অব্যবস্থা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বেড়ে যাবে আর একটি কারণে; তা হোল, তৃতীয় বেতন কমিশনের সম্ভাব্য বর্দ্ধিত আয় ভাতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতেও ব্যয় বরাদ্দ আরও বাড়বে আশা করা যায়।

অবশ্য সামগ্রিক অর্থনীতিতে যদি যথেষ্ট গতিবেগ সৃষ্টি হয়, তবে অন্যান্য চাপ সত্ত্বেও অর্থনীতি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে বলেই মনে হয়। এবারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সবুজ বিপ্লবের কল্যাণে শিল্প সম্প্রসারণ দ্রুততর হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, শিল্প বিনিয়োগ আশানুরূপ বাড়ছে না। এর মূল কারণ খুঁজতে অর্থনীতিজ্ঞরা বিশেষ সহায়তা করতে পারেন। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন কর্ম চাঞ্চল্য যুবক উৎপাদনের গতি অব্যাহত রাখতে পারবে, নিঃসন্দেহে তখনই সামাজিক ন্যায়ের সুষ্ঠু সম্প্রসারণ সম্ভব।

এক টাকায় তিনটাকা লাভের উপায়

এক টাকা ব্যয়ে তিন টাকা লাভের ব্যবসা সত্যিই লোভনীয়। বিশেষ করে তা যদি চাষ বাসের ব্যাপারে হয় তবে তো কথাই নেই। শুনতে অবাক লাগলেও ভারতীয় কৃষি সংস্থার বিজ্ঞানীরা বলেন যে, শুষ্ক অঞ্চলে ধান ও গম চাষে আধুনিক পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে সহজেই লাভের মাত্রা তিনগুণ বাড়িয়ে তোলা যায়। কৃষিবিদরা আরও বলেন যে, শুষ্ক অঞ্চলে ধান ও গম চাষে পর্যাপ্ত মাত্রায় সেচাভাব থাকার দরুণ প্রয়োজনীয় মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করেও আশানুরূপ ফলন পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ দেশের সবুজ আন্দোলনকে সফল করে তুলতে শুষ্ক অঞ্চলকেও এখন পর্যাপ্ত ফলনে সমান্তরাল করে তোলা একান্ত দরকার।

এই বিষয়ে তাই তাঁরা নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ধান ও গমের পাতায় ইউরিয়া স্প্রে করে বৃষ্টিপাতহীন অঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণে ফসল তুলে সেচ সমস্যা দূর করা সম্ভব। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অল্প সময়ে বেশী জমিতে স্প্রে করতে হলে এরোপ্লেনের সাহায্য নেওয়া সুবিধাজনক। পুনা থেকে ইউরিয়া স্প্রে করার জন্য মধ্যপ্রদেশের রায়পুর ও বিলাসপুরের বৃষ্টিনির্ভর অঞ্চলের ৪,৮০০ হেক্টার জমিকে বাছা হয়। তাছাড়া রাজস্থানের ২০০০ হেক্টার ক্ষেতেও এই ভাবে ইউরিয়া স্প্রে করা হয়েছে। ফলে দেখা গেছে যে, ইউরিয়া প্রয়োগে ধান ও গমের পাতা নষ্ট তো হয়ইনি বরং অল্প সময়ের মধ্যেই পাতাগুলি ঘন সবুজ হয়ে গাছের বাড় ভালো করে তুলেছে।

শতকরা ২০ ভাগ ইউরিয়া মিশ্রণ (১৭.৮ কেজি ইউরিয়া অথবা ৮ কেজি নাইট্রোজেন ৮৯ লিটার জলের সংগে মিশিয়ে) স্প্রে করায় দেখা গেছে যে, ধানের ফলন শতকরা ১৫.৪ ভাগ বেশী হয়েছে। হিসেবে আরও জানা যায় যে, প্রতি কিলো নাইট্রোজেন (ইউরিয়ার মাধ্যমে) স্প্রে করায় গড় ফলনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৪.৬ কেজি। অর্থাৎ প্রতি হেক্টারে প্রায় ৩ কুইন্টাল ধানের বাড়তি ফলন হয়েছে।

রাজস্থানের বালবী একলানিয়া গমের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রেও আকাশ থেকে ইউরিয়া স্প্রে করায় ভালো ফল পাওয়া গেছে। শতকরা ২৩.৫ ভাগ ইউরিয়া মিশ্রণ (প্রতি হেক্টারে ১৭ কেজি ইউরিয়া অথবা ৭.৬ কেজি নাইট্রোজেন ৭৩ লিটার জলে মিশিয়ে) স্প্রে করায় গমের ফলন বেড়ে গেছে শতকরা ৩১ ভাগ।

হিসাবে জানা গেছে যে প্রতি হেক্টার জমিতে ৪২ টাকার ইউরিয়া মিশ্রণ স্প্রে করায় ধান ও গমের বাড়তি ফলন হতে লাভের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১০ ও ১২৫ টাকা। অর্থাৎ হিসেবমত মোট খরচের তুলনায় লাভের মাত্রা হয়েছে তিন গুণ বেশী। সুতরাং শুষ্ক অঞ্চলের ধান ও গম চাষীরা আকাশ থেকে ইউরিয়া স্প্রে করে আয়ের পথ বাড়িয়ে তোলার সুযোগ গ্রহণে দেরী করবেন না।

ইটালিতে ভারতীয় পণ্য রপ্তানির উজ্জ্বল সম্ভাবনা

সম্প্রতি ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থার উদ্যোগে একটি ব্যবসায়ী দল ইটালিতে ভারতীয় পণ্যের কদর কি রকম এবং তা আরও বাড়ানো যায় কিনা তা সরেজমিনে পরীক্ষা করে ফিরে এসেছেন। তাঁদের মতে ইটালিতে ভারতীয় পণ্য রপ্তানির ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে আরও সাত কোটি টাকা রপ্তানি আয় বাড়ানো সম্ভব।

যেসব রপ্তানির উপর জোর দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে খেলাধূলো (রপ্তানি সম্ভাবনা ৪২ লক্ষ টাকা), কেমিক্যাল (৫ লক্ষ টাকা), তৈরী জামা কাপড় (৬ লক্ষ টাকা)। অন্যান্য যেসব পণ্যের প্রতি উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তা হ'ল— গাড়ীর কলকব্জা, ব্যাটারি এবং মশলা ইত্যাদি।

ইটালির অন্যতম ব্যবসায়ীরা ভারতীয় দলকে বিপণন এবং সহযোগী ব্যবস্থা স্থাপিত করে যার জন্য মিলান, ত্রোল তুরিন এবং জেনোয়া শহরে বিক্রয় কেন্দ্র খোলবার পরামর্শ দেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতের ব্যবসায়ীদের সাথে যুগ্ম উদ্যোগ আরম্ভ করার সম্বন্ধেও উৎসাহী হয়েছেন।

'৭0 এর ডিসেম্বরে রেকর্ড রপ্তানি

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের রপ্তানি ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নজির স্থাপন করেছে। এ সময় ভারত ১৫২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানি করেছে—যা একটা সর্বকালের রেকর্ড। এই রপ্তানির পরিমাণ ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসের রপ্তানির চেয়ে ৩২ কোটি টাকা বেশী। গত বছরের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর এই ন' মাসে মোট রপ্তানির দাঁড়ায় ১০৯৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা, যা ১৯৬৯ এর সমকালীন রপ্তানির চেয়ে ৫২ কোটি টাকা বেশী।

এর ফলে ভারতের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত মাত্র ৫.২ শতাংশ হারে বাড়ে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে ১৩২.২৬ টাকার পণ্য ইত্যাদি আমদানি হয়। ১৯৭০ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট আমদানির পরিমাণ ১২১৪ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা।

লবণ হ্রদ উপনগরী

১৩ পৃষ্ঠার পর

অতিরিক্ত জল 'বাগজোলা স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট'এ পড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গত বন্যার সময় কলকাতা যখন জলে থৈ থৈ করছিল, তখন সমস্ত লবন হ্রদ এলাকা ছিল শুকনো খট্‌খটে। এই উপনগরীর আরও একটা মস্ত সুবিধে হল যে এখানে ধোঁয়া, ধুলার কোন অত্যাচার থাকবেনা। কারণ এই উপনগরীতে কোনও কল কারখানা করতে দেওয়া হচ্ছেনা। এটা তৈরী হচ্ছে একান্তই বসবাসের জন্য। তবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কতকগুলি দপ্তর এখানে তুলে নিয়ে আসবার কথা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় আণবিক গবেষণা কেন্দ্র ৩০ একর জমি নিয়ে এখানে তাদের একটি শাখা খুলছে।

এই উপনগরীর মধ্যে নিজস্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়াও মূল কলকাতার সঙ্গেও অল্প সময়ের মধ্যে বেশ ভালই যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকছে। এখনই কয়েকটি প্রাইভেট বাস চলছে। উল্টাডাঙ্গা ষ্টেশনের কাছে নেমে একটু এগোলেই পাবেন এই উপনগরীর 'এ' সেক্টার। এছাড়া 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' ওষুধের কোম্পানীর পাশ দিয়ে গিয়ে একটু হাঁটলেও গিয়ে পড়বেন লবন হ্রদ এলাকায় যেখানে 'বিদ্যাসাগর কো-অপারেটিভ্ সংস্থা' তাদের বাড়ী তৈরী করছে। আরও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আরও দু' একটা বাসের রুট কলকাতা থেকে একেবারে লবন হ্রদের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে।

এখানকার জমির দামও এমন একটা বেশী নয়। তিন কাঠার প্লট। ২৭০০ টাকা করে প্রতি কাঠা। তিন কাঠার বেশীও প্লট আছে তবে তার দাম কিছু বেশী। এর মধ্যেই ওখানে অনেকে বাড়ী তৈরী করে বসবাস সুরু করে দিয়েছেন। আরও অনেকের বাড়ী তৈরী প্রায় শেষের পর্য্যায়ে। 'বিদ্যাসাগর কো-অপারেটিভ' সংস্থার চার তলার বিরাট বিরাট অনেকগুলি ফ্ল্যাটও তৈরী হয়ে গেছে—যার কথা আগেই বলেছি।

'এখানে বাড়ী তৈরী করলে নাকি ভীত্ বসে যাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করেছিলাম লবন হ্রদ উপনগরী সংস্থার এক ইঞ্জিনিয়ারকে। সঙ্গে সঙ্গেই উনি বললেন, "মুখের কথায় কাজ কি। একেবারে সরেজমিনেই দেখে যান"। প্রথমেই উনি ওদের দোতালা অফিস ঘর—সেটি বছর চারেক হল তৈরী হয়েছে—দেখালেন। তারপর ওখানে তৈরী হওয়া আরও কয়েকটা বাড়ী দেখালেন। না—সেরকম কিছু দেখা গেলনা। উনি আরও বললেন। লোকের মনে এই সন্দেহ কি করে এল জানিনা। যদি তাই হত তবে 'বিদ্যাসাগর কো-অপারেটিভ্ সংস্থা এত বড় বাড়ী এখানে কি করে করেছেন।"

কলকাতা মহানগরীর হাজারো অসুবিধা বাদ দিয়ে ও সুযোগ সুবিধাগুলি বজায় রেখে যদি কোন জায়গায় বাড়ী করতে হয় 'লবন হ্রদ উপনগরীর' মত যায়গা আর হয়না।

পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা

পরিবার পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৭০এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৫৮,৬৫৫ জনকে নির্বীজকরণ করা হয়েছে, এঁদের মধ্যে ৭,০৬৮ জন মহিলা। ৬,৬৯০ জন মহিলা ব্যবহার করছেন লুপ। এছাড়া ৫,০০০ জন মহিলা নিয়মিত জন্মনিরোধক 'পিল' ব্যবহার করছেন।

স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও সরকার স্বীকৃত প্রায় সব রকমের দোকান থেকে বিনামূল্যে অথবা সরকারী সহায়তায় সুলভ মূল্যে প্রায় ৯৩ লক্ষ নিরোধ প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। এসব ছাড়াও ১,২৫,১৪৩টি প্যাকেট বা টিউবে ভরা বিবিধ জন্মনিরোধক, যেমন জেলি ক্রিম টিউব, ফোম ট্যাবলেট্, ডায়াফ্রাম, প্রভৃতি বিতরণ করা হয়েছে। এইসব বিভিন্ন জন্মনিরোধক ব্যবহারের ফলও ফলছে প্রায় হাতে হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্মহার সংক্রান্ত একটি গণনায় জানা গেছে এর ফলে এ রাজ্য ১,৩৫,২১৮টি সন্তান সম্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে।

গোষ্ঠী উন্নয়ন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা দরকার। অঞ্চল পঞ্চায়েত শুধু বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক দাখিলীকৃত প্রকল্পগুলি পরীক্ষা, বিবেচনা ও অনুমোদন করে গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে কর্মসূচী প্রণয়নের ভার ছেড়ে দেবেন। অঞ্চল পঞ্চায়েতের মূল চিন্তা থাকবে কেমন করে অঞ্চলের মধ্যে আয় বাড়ানো যায় এবং সময়োপযোগী কর ধার্য্য করে গ্রামোন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করা যায়।

ব্লকস্তরে ও জেলা স্তরে পরিষদগুলির মূল লক্ষ্য হবে নিজ নিজ এলাকার আয় বৃদ্ধি করা। সরকার মত আইন প্রণয়ন করার জন্য রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া এবং তা কার্যকরী করে গ্রামের বর্তমান সমস্যাবলীর সমাধান করা।

REGD. NO. D-233

★ ভারত সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত তিনটি ইস্পাত কারখানা গত বছরের চাইতে এবার উৎপাদন ও বিপনন বেশী করেছে। ১৯৬৯-৭০ সালে ইস্পাত পিণ্ডের উৎপাদন ১.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে—৩.৭২ অযুত মেট্রিক টন থেকে ৩ ৭৮ অযুত মেট্রিক টন। আবার ঐ একই বছরে বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের উৎপাদন বেড়েছে ৬ ৫ শতাংশ বেশী—২.৬২ অযুত মেঃ টন থেকে ২ ৭৮ অযুত মে টন।

১৯৬৮-৬৯ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে ইস্পাত বিপনন বেড়েছে ২ ৮১ থেকে ২.৮৯ অযুত মে টন। লৌহ পিণ্ড ও বিপনন-যোগ্য ইস্পাতের উৎপাদন বেড়েছে ০ ৮ ও ০ ৩ শতাংশ হারে। ১৯৬৮-৬৯ থেকে ১৯৬৯-৭০এ সালে উৎপাদন বাড়ে ৩২০ ৪ কোটি থেকে ৩৮১ ৩ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৯ শতাংশ বেশী।

★ ১৯৭০ এর ৩১শে মার্চ মাসের হিসেব অনুযায়ী সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের পরি-চালনাধীন ৯১টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে ৪,৩০১ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। এর মধ্যে মূলধন গঠনে প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োজিত হয়েছে ৩,৩২১ কোটি টাকা।

এর মধ্যে ৮১টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের লাভ হয়েছে ১৩৯ কোটি টাকা। বিনি-য়োগে আয় দাঁড়াচ্ছে ৪ ২ শতাংশ; গত বছরে এই আয়ের অনুপাত ছিল ২.৮ শতাংশ।

একশ চল্লিশ কোটি টাকা দেয় সুদ ও যেসব রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান লাভ দেখিয়েছে তার উপর কর বাবদ ১৮ কোটি বাদ দিয়ে নীট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ ৪০ কোটি টাকা।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে সর্বমোট বিনিয়োজিত ধনের অর্থাৎ ৪,৩০১ কোটি টাকার, সাধারণ শেয়ার মারফৎ তোলা হয় ২,১০১ কোটি টাকা এবং বাজার থেকে ঋণ নেওয়া হয় ২,২০০ কোটি টাকা।

★ ১৯৬৯-৭০ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতি-ষ্ঠানগুলি ৮৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে। হিন্দুস্থান স্টীল ১৯৬৮ ৬৯ সাল থেকে ১৯৬৯-৭০-এ তাদের রপ্তানি বাড়ায় ৪১ ৫৫ কোটি টাকা থেকে ৪৫.০৬ কোটি টাকা। জাতীয় খনিজ উন্নয়ন করপোরেশন জাপানে লৌহ আকর রপ্তানি করে ২৯.৩৪ কোটি টাকার। রপ্তানি ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে ইণ্ডিয়ান রেয়ার করপোরেশন, ইণ্ডিয়ান টেলিফোন কোম্পানী, হিন্দুস্থান মেশিন টুলস, এয়ার ও শিপিং করপো-রেশন।

১৯৬৯-৭০ সালে ২৪টি প্রগতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ১২ ৬৫ কোটি টাকার লভ্যাংশ বিতরণের কথা ঘোষণা করে। গত বছর এর পরিমাণ ছিল ১১ ৬৫ কোটি টাকা। তিন থেকে একুশ শতাংশ হারে এই লভ্যাংশ বিতরিত হয়।

ধনধান্যে

পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে, তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য। এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যথার্থ রূপ তুলে ধরা 'ধনধান্যে'র অন্যতম উদ্দেশ্য।

নিয়মাবলী

ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়।

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মতৎ-পরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশ-কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা এবং কোনোও রচনার প্রাপ্তি স্বীকৃতি জানানো সম্ভব নয়।

নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ে, এই ঠিকানায় পাঠাবেন—

"যোজনা"
যোজনা ভবন
পার্লামেন্ট স্ট্রীট,
নিউ দিল্লী—১

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ-
বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্স্ ডিভিশন,
পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১,
এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

তৃতীয় বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা
২২শে আগষ্ট ১৯৭১ : ৩১শে শ্রাবণ ১৮৯৩
Vol. III :No : 5&6 : August 22, 1971

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী ১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ ৩৮৫৪৮১/৪০২

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রৈবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

প্রত্যেক সরকারের লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ। সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ যা কার্যতঃ শাসিত এবং শাসকবর্গের সর্বাধিক সংখ্যককে অধিকতম স্বাচ্ছন্দ দিতে সক্ষম।

—রবার্ট ওয়েন

এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

সবার জন্য বই

যে কোন ক্রমোন্নত দেশে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অগ্রগতি কতটা হোল তার একটা মাপই হোল শিক্ষার মাত্রা। দেশের অগ্রগতি বলতে কেবল বৈষয়িক অগ্রগতি নয়, কি ধরণের মানুষ গড়ে উঠছে তার দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। এই কারণে জাতীয় পরিকল্পনায় গোড়া থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ সুবিধার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভারত হোল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ, সেই কারণে আমাদের প্রচেষ্টা হোল জনশিক্ষার মান উন্নত করা। এ বিষয়ে আমরা কতটা সাফল্য অর্জন করেছি তা বোঝা যাবে স্বাধীনতা উত্তর কালে কি বিপুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে তা দেখে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার এই বিরাট সম্প্রসারণের ফলে দিন দিন কত বেশী সংখ্যক ব্যক্তি উপকৃত হচ্ছেন সে দিকে নজর দিলে।

ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রসারের কাজ নিতান্ত সহজ নয়। কোটি কোটি ব্যক্তির প্রয়োজন মেটাবার পথে রয়েছে বহু ভাষার সমস্যা। অবস্থাপন্ন মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তির প্রয়োজন মেটাবার চেয়ে অসংখ্য দরিদ্র জনসাধারণ রয়েছেন তাঁদের চাহিদা আগে মেটানো দরকার। এরজন্যে দেশের অর্থনীতির ওপর যে ভীষণ চাপ পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। সে যাইহোক, বিগত দু'দশকে এদিকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করা গেছে। সর্ব পর্যায়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ সুবিধা এত বেশী প্রসার লাভ করেছে যা এর আগে আর কখনো চিন্তাও করা যায়নি।

স্বাধীন জাতীয় উন্নয়নের জন্যে শিক্ষা যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষা প্রসারের কার্যকরী হাতিয়ার হোল পুস্তক। গণ সংযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি সত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে পুস্তকের প্রাধান্য একটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য পুস্তকের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬৮ সালে সংসদে গৃহীত একটি প্রস্তাবে এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এতে বলা হয়:

"শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্যে ভারতীয় ভাষাগুলির এবং সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। এ না হওয়া পর্যন্ত জনগণের সৃজনী প্রতিভা বিকশিত হবেনা, শিক্ষার মান উন্নত হবে না, জনগণের মধ্যে জ্ঞান প্রসার ঘটবে না এবং বুদ্ধিজীবি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান থেকেই যাবে বরং বৃদ্ধিই পাবে।"

শিক্ষা বিস্তারের পথে গ্রন্থ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং এ ক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের জন্যে ব্যাপকভাবে পুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণের কাজ হাতে নিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক প্রকাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল এগুলি সস্তায় বিক্রির ব্যবস্থা করা। এই কারণেই পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনের বিষয়টি "জাতীয়করণ" করা হয়েছে। ফলে আজ আমরা বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য পুস্তকগুলি দেখি সরকারী ক্ষেত্রে প্রস্তুত হচ্ছে। আঞ্চলিক ভাষাগুলি ক্রমশ: শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হওয়ায়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও পাঠ্য পুস্তকগুলির প্রকাশ দ্রুত রাষ্ট্রায়ত্তে আনা হচ্ছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে এই উদ্যোগের ক্ষেত্রটি বে-সরকারী ক্ষেত্র থেকে সরকারী ক্ষেত্রে সরিয়ে আনা অন্যায় হবে। তাঁরা যুক্তি দেখান যে উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক উৎপাদনের জন্যে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সরকারী প্রতিষ্ঠানের সে যোগ্যতা নেই। এর কিছুটা হয়তো সত্যি কিন্তু জাতীয় স্বার্থ উন্নয়নমূলক এ ধরণের এক কাজ থেকে সরকারী সংস্থার সরে আসারও কোন যুক্তি নেই। পাঠ্য পুস্তকগুলি যদি সত্যিই দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তির হাতে পৌঁছে দিতে হয়, তাহলে সরকারকে এদিকে এগিয়ে আসতেই হবে এবং শুধু তাই নয় খুবই ব্যাপকভাবে একাজ হাতে নিতে হবে। বস্তুত: বর্তমানের চাহিদা মেটাবার জন্যে যে বিরাট প্রচেষ্টার প্রয়োজন সরকারী ক্ষেত্রে তার আংশিক মাত্র কাজ হবে।

সারা বিশ্বের পুস্তক প্রকাশনের যে কাঠামো রয়েছে তাতে ভারতের স্থান সপ্তম। এক বছরে যে পরিমাণ পুস্তক প্রকাশিত হয় তার সংখ্যা দেখতে খুব বেশী হলেও, দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে মাথাপিছু হিসেব করলে সেটা খুব বেশী দাঁড়ায় না। এর কয়েকটা কারণ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কারণ হোল—কাগজের একান্ত অভাব। চাহিদার তুলনায় পুস্তক প্রকাশনের জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজের পরিমাণ খুবই সীমাবিত। এ সমস্যার সমাধান, অন্তত: আংশিকভাবে হয়তো হতে পারে, পাঠ্য পুস্তক ছাপার জন্যে কাগজ আমদানি কোরে। উপস্থিত কাগজ আমদানির ওপর আমদানি শুল্ক দিতে হয় কিন্তু এই শুল্ক তুলে দিয়ে যদি কাগজ ও মুদ্রণের সরঞ্জাম আমদানি করা যায় তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে এটা আমদানি করা পুস্তকের চেয়ে অনেক সস্তা পড়বে এবং ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদাও বেশ খানিকটা মেটানো যাবে।

ফসল ফলন অভিযানে অগ্রণী

অনিল সোম

ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সমবেত প্রয়াস ও প্রগতিশীল মন— এই তিনের সমন্বয়ে কি আশ্চর্য সাফল্য লাভ করা সম্ভব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল ধানগ্রাম-জয়পুর গ্রাম। নামেই ধান দিয়ে। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন ব্লকের এই অঞ্চলটি অধিক ফলন বীজ ব্যবহার করে উৎপাদন তিন চার গুণ বাড়িয়ে ফেলেছে। তিন বছর আগেও এখানে একর প্রতি উৎপাদন ছিল মাত্র দশ থেকে বিশ মণ। আর আজ প্রতি একর জমিতে যে জায়গায় উৎপাদন পঞ্চাশ থেকে ষাট মন ধান। আই-আর-৮ জাতীয় বীজ থেকে প্রতি একরে ৬০ মণ ধানও ফলেছে।

ধানগ্রাম-জয়পুর গ্রামে ১৫০ চাষীর বাস। একদা ঘন জঙ্গল ঘিরে রেখেছে গ্রামটাকে। প্রতিকূল প্রকৃতির এই শোষণকে এ গ্রামের চাষীরা হতাশ হয়ে মেনে নেয়নি। এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ দশ বছর ধরে এরা সংগ্রাম করেছে, বাঁচবার লড়াই চালিয়েছে। ১৯৫৭ সালে গ্রামের নদীটির বাঁধ ভেঙে যায়। অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল ১৯৬৭ সালে, যখন প্রচণ্ড বন্যায় আমন ধান নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু তবুও এদের হতোদ্যম করা সম্ভব হয় নি। অনতিবিলম্বেই গ্রামবাসীরা সেই রিলিফের মাধ্যমে গ্রামের ছোট একটি নদীর জল ধরে রাখার জন্য দীর্ঘ এক মাটির বাঁধ তৈরীর কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করল। এর আগে [illegible] কংসাবতী নদীতে শুধু শুধুই বয়ে যেত, সেচের কোন কাজেই লাগছিল না। এই বাঁধের সঙ্গে সঙ্গে এক মাইল লম্বা খালও তৈরী করা হল ধানক্ষেতে নদীর জল নিয়ে যাবার জন্যে।

এভাবে সেচের জল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে ধানগ্রাম জয়পুরের চাষীরা সুরু করল অধিক ফলন বীজের চাষ। প্রথমে ষাট একর জমিতে তাইনান-৩ এবং আই-আর-৫ দিয়ে বোরো ধান বোনা হল। একই সময়ে সোনারা-৬৪ এবং লারমারোজো বীজে গমেরও চাষ করা হল।

১৯৬৮-৬৯ সালে সেচের জল পাওয়া পুরো ২০০ একর জমিতেই অধিক ফলনশীল বীজ দিয়ে আমন ধান বোনা হল। আই-আর-৮ ছাড়াও এন-সি-৬৭৮ ধানের বীজ ব্যবহার করা হ'ল।

অধিক ফলনশীল বীজে রাসায়নিক সার বেশী প্রয়োগ করলে ফসলের ক্ষতি হয়, এ রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা চাষীদের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ধানগ্রাম-জয়পুরের চাষীদের মধ্যে এরকম সাফল্যই পরের বছরগুলিতে তাদের উৎসাহিত করে তুলছে অধিক ফলনী বীজের চাষে। এবারের আমন ফসলও হয়েছে ভাল। ফসল বাড়ানোর জন্যে এ গ্রামের চাষীরা নতুন জাতের অধিক ফলন বীজ জয়া এবং পদ্মারও চাষ সুরু করেছে।

সমবেত প্রয়াস এবং অধিক ফলনশীল বীজের আশীর্বাদ কী সাফল্য বয়ে আনতে পারে জাম্বেদিয়া গ্রামেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বলা চলে। ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে মাত্র দশ একর জমিতে আই-আর-৮ ধানের চাষ হয়েছিল। আর এবার সেখানে ১৯ টি পরিবারের আবাদী ১২৫ একর জমিতে অধিক ফলনশীল বীজের চাষ হয়েছে। এবার আমন ফলেছে। এখানে আই-আর-৮ ছাড়াও এন সি-৬৭৮, রত্না, জয়া এবং পদ্মা বীজে। এবার চাষীরা ঠিক করেছে, আমন ধান কাটা হয়ে গেলে তারা সোনালিকা এবং কল্যাণ সোনা বীজ দিয়ে গম ফলাবে। ছোট নদী চম্পায় একটা বাঁধ দিয়েছে এবং ক্ষেতে জল নিয়ে যাবার জন্যে পাম্পসেট কিনেছে।

চুবকা গ্রামও এদিক থেকে কোন পিছিয়ে নেই। এ গ্রামের শতকরা ৭৫ ভাগ চাষীই উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারে আগ্রহী। এ বছর এদের ক্ষেত অধিক ফলনী বীজের ধানে ভরে আছে।

উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজের মধ্যে আই, আর ৮ এবং এন. সি-৬৭৮ এর জনপ্রিয়তাই বেশী। পদ্মাও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আই, আর-৮ এবং পদ্মা জাতীয় ধান কমবেশী ১০৫ দিনের মধ্যেই ফলে। এর ফলে একই জমিতে তিনবার ফসল ফলানো সম্ভব হয়। তাছাড়া চিরাচরিত বীজের তুলনায় অধিক ফলনী বীজের ধানে চালও বেশী হয়, কেননা তার খোসার পরিমাণটা হয় স্বল্প।

★ ১৯৬৯ এর জুলাই মাসে ১৪টি বড় বড় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের পর থেকে ব্যাঙ্কগুলির শাখা সম্প্রসারণের কাজ অত্যন্ত আশাজনকভাবে এগিয়েছে। একটি সাম্প্রতিক খতিয়ানে দেখা গ্যাছে ১৯৬৮, ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে শাখা সম্প্রসারণের কাজ এগিয়েছে যথাক্রমে ৬৭৭, ১৩৬৯ এবং ২১৩৪টি। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগ পর্যন্ত বেসরকারী ব্যাঙ্কের মোট শাখা দাঁড়ায় ১১,১৮৪টি। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব হবার আগে এই সংখ্যা ছিল ৮,২৮৪ টি।

অভূতপূর্ব জনস্রোত

ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও শরণার্থীদের চাপ

সুব্রত গুপ্ত

বাংলাদেশে জঙ্গীশাহীর বর্বরোচিত আক্রমণ ও গণহত্যা যজ্ঞের ফলে সেদেশ থেকে যে বিপুলসংখ্যক শরণার্থী ভারতে চলে এসেছেন —তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। গত মে মাসে অর্থমন্ত্রী শ্রী চ্যবণ লোকসভায় বাজেট পেশ করার সময়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যা ছিল, —তার দুই মাস পর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের চাপই এই বিপর্যয়ের কারণ। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার শরণার্থীদের পুনর্বাসন এবং আশু প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব নিয়েছেন,—তবুও এই সমস্যা মারাত্মক ভাবে জর্জরিত করেছে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে। আশঙ্কা করা হচ্ছে,—এই বিপর্যয়ের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। বিদেশের কাছে ভারত সরকার শরণার্থীদের ত্রাণ কার্যের জন্য যে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন তাতে খুব অল্পই সাড়া পাওয়া গেছে। যেখানে প্রয়োজন হল ৪০০ কোটি টাকার সেখানে পাওয়া গেছে মাত্র ১০ কোটি টাকা। কিন্তু এই সংকট কাটিয়ে ওঠা আজ ভারতের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৭১-৭২ সালের চূড়ান্ত বাজেটে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য ভারত সরকার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থা তার বেশি টাকা বরাদ্দ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই বরাদ্দ খুবই সামান্য। গত বাজেটেই বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বেকার সমস্যার তীব্রতাও এত বেড়েছে যে একমাত্র বছরে ২৫ কোটি টাকার সংস্থান এই সমস্যার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে খুবই সামান্য। বাংলাদেশে যদি পাকিস্তান সরকারের বর্বরোচিত নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হত, তবে ভারতের উপর শরণার্থীদের এই চাপ পড়ত না এবং ভারত সরকারের পক্ষেও বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে আরও ৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা সম্ভব হত; এবং ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলও নির্বাচনের আগে যে "গরিবী হঠাও" শ্লোগান দিয়েছিলেন, তার প্রতি কিছুটা ন্যায়বিচার করতে পারতেন।

বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের এদেশে চলে আসার ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য ভারত সরকার নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু এই সমস্যা যে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে কতটা বিপর্যস্ত করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও কতটা করতে পারে সে সম্পর্কে সরকারের দুশ্চিন্তা থাকলেও যতটা সাহসিকতার সঙ্গে গোড়ায় এই সমস্যার মোকাবিলা করা উচিত ছিল,—সরকার তা করেননি। বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীদের অবিশ্রান্ত আগমন সামগ্রিকভাবে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করলেও এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে রুদ্ধ করলেও সব রাজ্য সমানভাবে প্রভাবিত হয়নি। উড়িষ্যা সরকার ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, শরণার্থীদের ভার গ্রহণ করা সেই রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্য এবং পশ্চিম ভারতের কয়েকটি রাজ্যের পক্ষেও এই সমস্যা গুরুতর হয়নি। এই সমস্যার চাপ অনুভূত হয়েছে সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবঙ্গে; ত্রিপুরা রাজ্যের উপরেও এই সমস্যার চাপ কম গুরুতর নয়। তার পর রয়েছে আসাম ও মেঘালয় রাজ্য। এখন যে শরণার্থীরা আসছেন, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হল পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় খোঁজা। মাত্র হাজার শরণার্থীকে ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশের নানা অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে। এক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশ সরকারের সহযোগিতা প্রশংসনীয়। সমস্যাটি একক-ভাবে কোন রাজ্যের নয়,—সমগ্রদেশের পক্ষেই এই সমস্যার গুরুত্ব অপরিসীম। দুঃখের বিষয় ভারতের সবগুলি রাজ্য এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমস্যাটির বিবেচনা করছে না, মনে হচ্ছে দায়িত্ব যেন পশ্চিমবঙ্গেরই।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ভাবা যাক। ভারতে বেকার সমস্যার তীব্রতা সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবঙ্গে; কলকারখানার অশান্তি, শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে মন্দা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সর্বোপরি কলকাতা শহরের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা—সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক জীবন গত কয়েকবছর ধরে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ আজ এগিয়ে এসেছেন বাংলাদেশের ভাইবোনদের আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য। সরকারী হিসাবে ৭০ লক্ষ শরণার্থী ভারতে এসেছেন, কিন্তু সরকারী হিসাবের বাইরে শরণার্থী যে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে এসে উঠেছেন, তার হিসাব কে রাখে? সরকারী সাহায্যের উপর তাঁদের নির্ভর করতে হচ্ছে না,—নির্ভর

শরণার্থী শিবিরে একটি পুনর্বাসিত পরিবার

করতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের উপর। যদিও পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মনে বাংলাদেশের দুর্গতদের জন্য সহানুভূতি ও মমতার শেষ নেই, তবুও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সঙ্গতি এতই সীমিত যে সমস্যার সমাধানের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু করা তার পক্ষে অসম্ভব। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার সব আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন,—তবুও এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিপুল ব্যয়ভার বহন করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৈনিক প্রায় দুই কোটি টাকার প্রয়োজন হচ্ছে শরণার্থীদের খাদ্য ও আশ্রয়ের সংস্থান করার জন্য। অন্য অঞ্চলে শরণার্থীদের পাঠানো হচ্ছে ঠিকই,—কিন্তু শরণার্থীদের গ্রহণ করার মত ক্ষমতা এই অঞ্চলের কতটা আছে তা-ও ভাবতে হবে। বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থীদের ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন—কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হবে না।

যাঁরা সরকারের নির্দেশে নতুন আবাসে যাবেন—তাঁদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা কিভাবে হবে? যাঁরা কৃষিজীবী তাঁদের দিতে হবে নতুন জমি, যুবকদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে হবে যদিও তা করা এখন সরকারের ক্ষমতার বাইরে; অথচ দিনের পর দিন বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের জন্য আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ভারত সরকারের পক্ষে এককভাবে সম্ভব কি? বিদেশী রাষ্ট্রগুলি যদি এই সমস্যার সমাধানের জন্য সক্রিয়ভাবে এগিয়ে না আসেন তবে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘেরও একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে এবং সেই দায়িত্ব পালন করতে রাষ্ট্রসংঘ ব্যর্থ হয়েছে। যদিও রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট শরণার্থীদের ত্রাণ কার্যের জন্য ভারতকে মুক্ত হস্তে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন,—এই আবেদন নেহাৎ মামুলী ধরণের হয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে। কারণ, শরণার্থীদের আগমন সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের যা করণীয় ছিল তা কিছুই হয়নি। বৃহৎ শক্তিবর্গের বিভিন্ন আদর্শবাদের বুলি আওড়ানো অনেকের মনেই রেখাপাত করবেনা, আর—কারণ, এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে,—বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মানবিক অধিকার যে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে তাতেও বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থেই চুপ করে আছেন। বরং এই ঘটনার পরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান সরকারকে সমরাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছেন যা পরিণামে প্রয়োগ করা হবে নিরস্ত্র স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের জনসাধারণের উপর। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ববঙ্গে যে বিধ্বংসী সাইক্লোন হয়েছিল, তার ত্রাণকার্যের জন্য যে সব জলযান পাওয়া গিয়েছিল—সেগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলাদেশে পাক সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণের কাজে।

বিশ্বের বহুদেশের এখনও ধারণা যে পাকিস্তানের রক্ত-পিপাসু জঙ্গী শাসকচক্র বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ করে ঠিক কাজই করেছে। অনেকেই আজ বলছেন, শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেবার অবস্থা তখনই সৃষ্টি হবে যখন বাংলাদেশের অধিবাসীর একটি রাজনৈতিক সমাধান হবে। কিন্তু এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান যে কোনদিনই হবে না এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। রাজনৈতিক ঘটনাবলী একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে বাংলাদেশে শীঘ্র শান্তি ফিরে আসার কোন লক্ষণ নেই। এক্ষেত্রে শরণার্থীদের আগমনজনিত সমস্যার সমাধান ভারত সরকারকেই করতে হবে। বিশ্বের কয়েকটি দেশ কিছু সাহায্য পাঠিয়েছেই নিশ্চয়; এই বিরাট সমস্যার সমাধানে পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রই যে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসবে না তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। ভারত সরকারকে যদি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের যে চিহ্ন দেখা যাচ্ছে তা প্রতিরোধ করতে হয়, যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হয় এবং মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা অর্জন করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হয়, তবে অবিলম্বে নিজের দায়িত্বেই এই সমস্যার সমাধানে তৎপর হতে হবে।

১৯৭০-৭১ সালে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুব খারাপ যায়নি। পর পর দুইবছর ভারতের জাতীয় আয় শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগ বেড়েছে; গত বছর রপ্তানি বেড়েছে শতকরা ৮ ভাগ। চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য থেকে তা বেশি। শিল্পোৎপাদনও সাড়ে ছয় ভাগ বেড়েছে। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কয়েকটি শ্রম-নিবিড় প্রকল্প গ্রহণ করার কাজেও সরকার হাত দিয়েছেন। খাদ্যশস্য উৎপাদনও ১০৭ মিলিয়ন টন হয়েছে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পথে এখন সবচেয়ে বড় বাধা হল শরণার্থীদের চাপ। সামগ্রিক ভাবে ভারতের পক্ষে এখন এই সমস্যাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা আরও জটিল। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়,—সীমান্তবর্তী আটটি জেলার প্রশাসনিক ব্যবস্থাও শরণার্থীদের চাপে বিপর্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পদত্যাগের যে কারণ দেখানো হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল, শরণার্থীদের চাপের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার অসামর্থ্য। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ যেখানে দুবেলা দুমুঠো ভাতের সংস্থান করতে হিমসিম খাচ্ছে—সেখানে অনেকেরই আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের আত্মীয়দের বাড়িতে এসেছেন; তার ফলে জিনিসপত্রের সরবরাহ কমেই যাচ্ছে এবং দামের ঊর্ধ্বগতিও ক্রমেই অপ্রতিরোধ্য হচ্ছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের

(১৮ পাতায় দেখুন)

আসামের কৃষি জগতে পালা বদল

শিবসাগর জেলায় একটি কৃষি-শিক্ষণ শিবিরে কৃষকদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে

বেশ কয়েক বছর আগেও বনানী বহুল আসামের এমন শস্যশ্যামল সজীব রূপ ছিল না, ছিলনা সেখানে কৃষি লক্ষ্মীর এমন অকৃপণ আশীর্বাদ। কিন্তু আজ সেখানে ক্ষেতের পর ক্ষেত জুড়ে ধান ও গমের সোনালী বন্যা কৃষকের নতুন উদ্যমকে সফল করে তুলেছে শস্য সম্পদে তাদের গোলা ভরিয়েছে উপচে। স্বভাবতই তাই সবার মনে জেগেছে বিস্ময়, কার যাদু স্পর্শে এই পরিবর্তন, কিসের প্রেরণায় আসামের পাহাড় উপত্যকা আজ এমন ঝলমল করে উঠেছে।

কিন্তু কোন বিস্ময়ই যে চিরস্থায়ী নয়, আসামের কৃষি জগতের এই সম্ভবনাময় পরিবর্তনের গুপ্ত রহস্য ভেদ করে তা প্রমাণ করলেন সেখানের কৃষি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক শ্রী আর কে চৌধুরী। কারণ তিনি বলেন, "চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত কৃষি শিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যসূচীর বাস্তব রূপায়ণের ফলেই আজ আসামে এই পরিবর্তনের সাফল্য সম্ভব হয়েছে।" শিক্ষণ কেন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে চাষবাস করায় আসামের চাষীরা আজ বিশেষ ভাবে লাভবান। কারণ ধানচাষ সেখানে চলে আসলেও, গম চাষ সেখানে ছিল বিলুপ্ত আর তার প্রধান কারণ ছিল কৃষি কৌশলের অভাব। কিন্তু বর্তমানে সেখানে, কৃষি-কুশলীর সাহায্যে ধানের সাথে সাথে গমের পর্যাপ্ত ফলন চাষের লাভের মাত্রা দিয়েছে বাড়িয়ে, সেই সংগে নতুনকে বরণ করে নেবার শক্তিও বেড়েছে তাদের মনে।

আসামের শিবসাগর জেলার চারাওয়া গাঁয়ে ও বাড়ফসলি 'আহু' ধানের বেশী ফলন তোলার জন্য কৃষি-শিক্ষণ শুরু হয়েছে। তবে অনেক চাষীই, যেমন, বোগাধার ফুকন, সুরেশ গোঁসাই এবং সুরেশ হাসা মিচা, চেইনান-৬৩ ও আই-আর—৮ ধান চাষ করতেই বেশী উৎসাহী, কারণ তাঁরা জানেন যে স্থানীয় ধানের তুলনায় এই জাতীয় ধানগুলি থেকে পাঁচগুণ বেশী ফলন পাওয়া যায়। তাছাড়া আবার অনেকে পাঞ্জাব গমের পর্যাপ্ত ফলন হয় জেনে বেঁটে জাতের গম চাষ করে প্রতি হেক্টারে ৬ কুইন্টাল গম তুলে লাভের মাত্রা বাড়াতে বেশী মনোযোগী। কারণ তাঁরা স্থির নিশ্চিত যে যদি কমকরে ৩ কুইন্টাল ও গম তোলা যায়, ঐ অঞ্চলের পক্ষে তাও কিছু কম কথা নয়।

তবে হাঁ, কিষাণ কুমার কুনারের মত চাষীরা অবশ্য অন্যের জমির ফলাফল না দেখে কিছু করতে ভরসা পান না। তাই কুনাররাও যাতে গম চাষে এগিয়ে আসে তার জন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ফলে কুনাররাও এখন গম চাষে সমান উৎসাহী।

"জমির মাটি তৈরী থেকে ফসল তোলার কৌশল প্রভৃতি, সব কিছুই চাষীদের হাতে কলমে শিখিয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষণ শিবিরের অধিকারীরা সর্বদাই প্রস্তুত। একথা বলেন প্রধান শিক্ষক শ্রী চৌধুরী। "উন্নত প্রথায় চাষবাস করার সমস্ত কলাকৌশলই সেখানে কৃষকদের হাতে দেখিয়ে শেখানো হয়।"

কৃষি-শিক্ষণ কেন্দ্রে চাষবাসের কাজই যে শুধু হাতে কলমে শেখানো হয়, তা নয়; তার সমস্যা সম্বন্ধেও যাতে কৃষকদের মধ্যে আলোচনা হয়, তার জন্য চর্চামণ্ডল গঠন করাও এই কেন্দ্রের অন্যতম কর্তব্য। শ্রী চৌধুরী আরও বলেন যে, "আসামের কামরূপ জেলায় ২০৮টি পুরুষ চর্চামণ্ডল এবং ৫২ টি মহিলা চর্চামণ্ডল গঠিত হয়েছে। এই সব চর্চামণ্ডলে প্রায় ৫০০০

৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা ৩৭১ কোটি। এর মধ্যে ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় ১৫ শতাংশ ভারতের। আকার ও আয়তনের দিক থেকে সপ্তম এবং জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়। জনসংখ্যার হিসাবে চীনের পরেই ভারতের স্থান। চীনের জন সংখ্যা ৭৫ কোটি।

১৯৭১ সালের ১০ই মার্চ ১২ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশী গণনাকারী এক বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে গিয়ে জন্ম মৃত্যুর হার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ করেন। কাজের ব্যাপকতার ভিত্তিতেই শুধু নয়, উৎকর্ষ ও সর্বাধুনিক পদ্ধতির জন্যও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আদমশুমারী ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভারতের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনা হয়। ১৯৭১ সালের এটা একাদশ আদমশুমারী। এবারকার বৈশিষ্ট্য— এই প্রথম দেশের লোক সংখ্যা গণনায় যন্ত্র প্রয়োগের সূত্রপাত হচ্ছে। দেশব্যাপী গণনা কাজ চালিয়ে দেখা যায় ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত জনসংখ্যা ছিল ৫৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৪৫। ১৯৬১ সালে ছিল ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৮২। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৬৩। মোটামুটি ভাবে হিসাব ধরতে হলে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এ-ক্ষেত্রে ২৪.৫৭ শতাংশ। আগের দশকে এই হার ছিল ২১.৫ শতাংশ। অতীত অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি

দেশে এবারকার গণনায় সময় নারী পুরুষের জন্ম মৃত্যু হার, রাজ্য ভিত্তিক হিসাব এবং দেশের সাক্ষর অভিযানের বিকাশ প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে সমীক্ষা চালানো হয়। ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২৮ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৮৭ জন পুরুষ এবং ২৬ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৫৭ জন নারী। ফলে স্ত্রী পুরুষের হার দাঁড়াচ্ছে প্রতি এক হাজার পুরুষ পিছু ৯৩২ জন নারী। দেশে মোট সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ২৯.৩৫ শতাংশ। তারমধ্যে পুরুষ ৩৯.৪৯ এবং নারী ১৮.৪৭ শতাংশ।

বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৩৭১ কোটির শতকরা ১৫ ভাগ ভারতে হওয়ার দরুণ এ-দেশের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ৩২.৭ লক্ষ বর্গ কিলোমীটার এলাকা নিয়ে ভারত। আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম দেশ। জনসংখ্যার অনুপাতে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ রূপে গণ্য। চীনের মূল ভূখণ্ডের জনসংখ্যার (৭৫ কোটি) পরেই ভারতের স্থান। এর পরেই উল্লেখ করা যেতে পারে সোভিয়েট ইউনিয়নের নাম। সে দেশের জনসংখ্যা ২৪ কোটি ৩০ লক্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০ কোটি, পাকিস্তানে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ ; জাপানে ১০ কোটি ৩০ লক্ষ ; ক্যানাডায় ২ কোটি ১০ লক্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভি-য়েট ইউনিয়ন এবং জাপানের মোট জনসংখ্যা মিলিয়ে ভারতের প্রায় সমান দাঁড়াচ্ছে।

রাজ্য ভিত্তিক গণনায় দেখা গেছে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হার ভিন্ন ভিন্ন। শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রেও সামান্য কিছু হের ফের নজরে এসেছে। লক্ষ্য করা গেছে কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ১৯৬১ এবং ১৯৭১ উভয় সালেই সর্বভারতীয় হিসেবের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী হয়েছে। অন্য কয়েক-টিতে আবার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু রাজ্যে ১৯৬১ সালে সর্ব ভারতীয় গড়পড়তা হিসাবের চেয়ে কম ছিল, কিন্তু এবার সেখানে সেই সংখ্যা লক্ষণীয় ভাবে বাড়তির দিকে। এর কারণ খুঁজে বের করা খুব একটা মুস্কিল নয়। ১৯৬১ সালের জনগণনার পর কয়েকটি রাজ্যের সীমান্তের কিছু পরি-বর্তন হয়েছে। কিছু নতুন রাজ্য আত্মপ্রকাশ করেছে। পাঞ্জাবকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে—পাঞ্জাব, নতুন রাজ্য হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রদেশের মধ্যে অঞ্চল সমূহ বণ্টন করা হয়েছে। চণ্ডীগড় এক পৃথক কেন্দ্রশাসিত এলাকা রূপে গণ্য। মেঘালয়, আসামের মধ্যে একটি স্বায়ত্ত শাসিত রাজ্য হিসেবে গঠিত। হিমাচল প্রদেশ এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল একটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল সম্প্রতি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা তাকে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬১ সালে নাগাল্যাণ্ড ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ছিল ; কিন্তু কিছুদিন পরেই পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে পরিণত হয়। কাজেই ১৯৬১ সালে রাজ্যের সংখ্যা যেখানে ছিল ১৫, ১৯৭১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৮ তে। ১৯৬১ সালে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ছিল ১৩টি কিন্তু, ১৯৭১ সালে দাঁড়ায় ১১। রাজ্য-গুলির মধ্যে উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এই রাজ্যে মোট জনসংখ্যা ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ, বিহারে ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ এবং মহারাষ্ট্রে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ। অতএব বিহার ও মহারাষ্ট্রের যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান। এই তিনটি রাজ্যে ১৯৬১ সাল থেকে একই অবস্থা বজায় রয়েছে। ১৯-৬১ সালে পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ। তালিকায় স্থান ছিল পঞ্চম। কিন্তু, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন অন্ধ্র প্রদেশকে সে ছাড়িয়ে গেছে। ফলে, অন্ধ্র প্রদেশের এখন পঞ্চম স্থান। দশ বছর আগে মধ্য প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১৫ লক্ষ ; সপ্তম স্থানের অধিকারী ছিল সে তখন। ১৯৭১ সালে তার স্থান হয় ষষ্ঠ। তামিলনাড়ু পিছিয়ে পড়েছে। এই রাজ্যের জনসংখ্যা এখন ৪ কোটি ১১ লক্ষ। একমাত্র আসাম ছাড়া অবশিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে কম বেশী মোটামুটি ১৯৬১ সালের অবস্থা বজায় রয়েছে। আসামে লোক সংখ্যা বাড়তির দিকে যাওয়ায়, চতুর্দশ স্থানের পরিবর্তে বর্তমানে তার স্থান ত্রয়োদশ। ১৯৬১ সালে দিল্লীর স্থান ছিল অষ্টাদশ এখন হয়েছে সপ্তদশ হিমাচল প্রদেশের ওপরে এখন দিল্লীর স্থান। হিমাচল প্রদেশের লোক সংখ্যা ৩০ লক্ষ।

সর্বভারতীয় গড়পড়তা হিসাবকে ছাড়িয়ে যে সব রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলি হোল গোয়া, দমন ও দীউ (৬১৫%) এই সব স্থানে বৃদ্ধির হার ৬০০% এরও বেশী। জম্মু ও কাশ্মীরে ২১৪%, নাগাল্যাণ্ডে ১৮২%, মিনিকয়, লাক্ষাদ্বীপ ও আমিনদিবি দ্বীপপুঞ্জে ১১৮%, তামিলনাড়ু ৮৬%, পণ্ডিচেরী ৬৭%, অন্ধ্র প্রদেশ ৩২%, ওড়িশা ২৬%, মেঘালয় ২৬%, উত্তর প্রদেশ ১৮%, মধ্য প্রদেশ ১৬% এবং মহারাষ্ট্র ১৫%।

১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই ১০ বছরে, তার আগের দশকের তুলনায় যে সব রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত এলাকার জনসংখ্যার হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে সেগুলি হল চণ্ডীগড় ৭%, ত্রিপুরা ৫৪% এবং দাদরা ও নগর হাভেলী ২৯%।

১৯৭১ সালের আদমশুমারীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্কট সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কমিটির আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। কারণ, বিশেষজ্ঞ কমিটির হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা এতদিন ৫৬ কোটি ১০ লক্ষ হওয়ার কথা। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে জনসংখ্যা এক কোটি ৪০ লক্ষ কম হওয়ার প্রধান দুটি কারণ হোল মৃত্যু হার এবং পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অভিযান চালু রাখার কার্যকর প্রভাব। বিশেষজ্ঞ কমিটি আশাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনুমান করেছিলেন ১৯৬৩ সালে যেখানে মৃত্যু হার ছিল প্রতি হাজারে শতকরা ১৭.৬ ভাগ, ১৯৬৮ সালে তা কমে দাঁড়াবে হাজারে ১৪ ভাগ এবং ১৯৭৩ সালে তা আরও কমে

গিয়ে হবে প্রতি হাজারে ১১'৩ জন। এদিকে রেজিস্ট্রার জেনা-রেলের দপ্তরে নমুনা হিসাবে সংগৃহীত তথ্য থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, ১৯৬৮ সালে মৃত্যুহার ছিল শতকরা ১৬'৮ ভাগ এবং ১৯৬৯ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা ১৯'৩ ভাগে। অতএব এই দুটি হিসাব থেকে প্রমাণ হয় বিশেষজ্ঞ কমিটির অনুমান ঠিক প্রতিপন্ন হয় নি। তাঁদের হিসাব মত মৃত্যুহার কমে নি।

জনগণনা কমিশনারের মতে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা ১৯৫৮-৫৯ সালে শিশু মৃত্যু হারের যে খতিয়ান দেয় তার ওপর ভিত্তি করেই হয়তো ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, ১৯৬১-৭০ সালে সাধারণ ভাবে মৃত্যু হার হ্রাস পাবে। যাই হোক, জনগণনার সাময়িক হিসাবে প্রকাশ, যে রকমটি মাপা করা গিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক ভালভাবে এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিবার পরিকল্পনার তাৎপর্য্য সবাই উপলব্ধি করেছেন।

(স্ত্রী-পুরুষের হার)

জনগণনার সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য তথ্য হ'ল নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যাধিক্য, দেখা গেছে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা ৯৩২। আর এটা শুধু এবারকার জনগণনার বিশেষত্ব নয়, গত কয়েক দশক প্রায় সব বয়েসের স্ত্রী পুরুষের ক্ষেত্রে এই রেওয়া চলে আসছে।

এই পার্থক্যের কারণ পুরোপুরি ব্যাখ্যা না করলেও জনগণনা কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন।

১। তাঁদের মতে পুত্র সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলা। ২। বিশেষ কয়েকটি কারণ বশতঃ স্ত্রী মৃত্যুর হার বেশী এবং ৩। মাতৃত্ব জনিত অথবা প্রসূতি মৃত্যু এর অন্যতম প্রধান কারণ।

যে কয়েকটি রাজ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী, সেগুলি হোল কেরালা, দাদরা ও নগর হাভেলী এবং ওড়িশা। কেরালার প্রতি ১ হাজার পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ১০১৯। দাদরা ও নগর হাভেলীতে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু ১০০৭ জন নারী। ওড়িশায় ১৯৬১ সালে এক হাজার পুরুষের অনুপাতে নারী ছিল ১০০১। কিন্তু এখন সেখানে অবস্থা বিপরীত দশা। ইদানীং সে রাজ্যে হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা ৯৮৯।

সাক্ষরতা

একনাগাড়ে প্রাথমিক শিক্ষার অভূতপূর্ব্ব সম্প্রসারণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কিত অভিযান ও বিভিন্ন কার্যসূচী রূপায়নের ফলে ১৯৭১ সালে সাক্ষরের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ২৯'৩৫ ভাগ। ১৯৬১ সালে ছিল শতকরা ২৪'০৩ ভাগ। এরমধ্যে ১৯৭১ সালে শিক্ষিত মহিলাদের সংখ্যা হয় শতকরা ১৮'৪৭ ভাগ। গত দশকে এই সংখ্যা ছিল ১২'৯৫ ভাগ। সাক্ষরতা অভিযানের ক্ষেত্রে চমকপ্রদ সাফল্য চোখে পড়ছে না, তার প্রধান কারণ ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা দেশকে সার্বজনীন সাক্ষরতা লাভের পথে আরও পিছিয়ে দিচ্ছে।

সাক্ষরতা অভিযানে এগিয়ে চলেছে চণ্ডীগড়। ১৯৭১এ কেরালা আরও এগিয়ে এসেছে। পূর্বে তার স্থান ছিল তৃতীয়। ১৯৬১ সালে দিল্লীর স্থান ছিল সবার ওপর। কিন্তু এখন সে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। সপ্তম স্থান থেকে গোয়া চতুর্থ স্থানে পৌঁছেছে। কেন্দ্রশাসিত লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয়, এবং আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জের ১৯৬১ সালের তালিকায় স্থান ছিল পঞ্চদশ, কিন্তু, এবার ষষ্ঠ। অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে মোটামুটি স্থিতাবস্থা বহাল রয়েছে। তবে দশ বছর পূর্বে ওড়িশা ষোড়শ স্থানের অধিকারী থাকলেও এবং অন্যান্য ১৯৭১ সালে স্থান অনেক নীচে চলে গিয়েছে। এখন তার নম্বর ২২।

আসামের কৃষি-জগতে পালাবদল

৬ পৃষ্ঠার পর

পুরুষ ও মহিলা কৃষক নিয়মিত যোগদান করে কৃষি বিষয়ক নানারকম আলোচনা করেন। ১৯৬৮ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত [illegible] পাড়ার শিক্ষণ কেন্দ্রে ৩৬ দফায় প্রায় [illegible]০০ চাষীকে শিক্ষণ দেওয়া হয়। এর [illegible] প্রায় ১৬০ টি শিক্ষণ শিবিরে উন্নত [illegible] ধান ও গম উৎপাদনের কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। কৃষকদের শিক্ষণ কার্য্য সূচী কতটা সাফল্য লাভ করেছে কামরূপের [illegible] গ্রামের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের ফিল্ডমে-নেজমেন্ট কমিটিকেও এই শিক্ষণ কার্য্য-সূচী পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে। প্রতি হেক্টরে উৎপন্ন ফসলের ২ কুইন্টালের বিনিময়ে এক, এম কমিটি চাষীদের ব্যবহারের জন্য পাম্প ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকে। যোরণীর ফিল্ডম্যানেজমেন্ট কমিটির অধীনে এখন প্রায় ৫০টি কৃষি খামার আছে, যার প্রতিটির আয়তন প্রায় ৫০ একর। সমগ্র কামরূপ জেলায় এরকম প্রায় ১৮ টি কমিটি বর্তমান।

পর্য্যাপ্ত ফলন ফলালেও যোরণী এখনও সমস্যা হীন নয়। কারণ প্রতি বছরই প্রায় সেখানে ভুটান-পাহাড়ী বন্যাপ্লাবিত হয়ে যোরণীর 'আউ' ধানের ক্ষেত বেশ ভাসিয়ে, ফলে সেখানের কৃষকদের রোজগারের জন্য মেতে হয় গৌহাটি বা রোজাতে। অবশ্য উন্নত প্রথায় চাষবাসের শিক্ষা পাওয়ায় যোরণীতেও এখন গম চাষেরও চেষ্টা চলছে।

নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্বেও আসামের কৃষি-জগতে যে নতুন অধ্যায় সূচীত হচ্ছে, কৃষি শিক্ষণ কেন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রম ও জনসাধারণের সাহায্য ছাড়া তা হয়ত কোন দিনই সম্ভবপর হতো না।

রাজ্যগুলির সংখ্যা

১৯৭১ সালের জনগণনার সাময়িক হিসাব

		১৯৬১ সালের জনসংখ্যা এবং শ্রেণী বিন্যাস		১৯৭১ সালের জনসংখ্যা এবং শ্রেণী বিন্যাস		১৯৭১ সালের প্রতি কিলোমীটার এলাকার জনসংখ্যা
	ভারত	৪৩৯,০৭২,৫৮২		৫৪৬,৯৫৫,৯৪৫		১৮২*
১।	অন্ধ্র প্রদেশ	৩৫,৯৮৩,৪৪৭	(৪)	৪৩,৩৯৪,৯৫১	(৫)	১৫৭
২।	আসাম	১১,৮৭২,৭৭২	(১৪)	১৪,৮৫৭,৩১৪	(১৩)	১৪৯
৩।	বিহার	৪৬,৪৫৫,৬১০	(২)	৫৬,৩৮৭,২৯৬	(২)	৩২৪
৪।	গুজরাট	২০,৬৩৩,৩৫০	(৯)	২৬,৬৬০,৯২৯	(৯)	১৩৬
৫।	হরিয়ানা	৭,৫৯০,৫৪৩	(১৫)	৯ ৯৭১,১৬৫	(১৫)	২২৫
৬।	হিমাচল প্রদেশ	২,৮১২,৪৬৩	(১৭)	৩.৪২৪,৩৩২	(১৮)	৬২
৭।	জম্মু ও কাশ্মীর	৩,৫৬০,৯৭৬	(১৬)	৪,৬১৫,১৭৬	(১৬)	(পাওয়া যায়নি)
৮।	কেরালা	১৬,৯০৩,৭১৫	(১২)	২১,২৮০,৩৯৭	(১২)	৫৪৮
৯।	মধ্য প্রদেশ	৩২,৩৭২,৪০৮	(৭)	৪১,৪৪৯,৭২৯	(৬)	৯৩
১০।	মহারাষ্ট্র	৩৯.৫৫৩,৭১৮	(৩)	৫০,২৯৫,০৮১	(৩)	১৬৩
১১	মহীশূর	২৩,৫৮৬,৭৭২	(৮)	২৯,২২৪,০৪৬	(৮)	১৫২
১২।	নাগাল্যাণ্ড	৩৬৯,২০০	(২৩)	৫১৫,৫৬১	(২৩)	৩১
১৩।	ওড়িশা	১৭,৫৪৮,৮৪৬	(১১)	২১,৯৩৪,৮২৭	(১১)	১৪১
১৪।	পাঞ্জাব	১১,১৩৫,০৬৯	(১৩)	১৩,৪৭২,৯৭২	(১৪)	২৬৮
১৫।	রাজস্থান	২০,১৫৫,৬০২	(১০)	২৫.৭২৪,১৪২	(১০)	৭৫
১৬।	তামিলনাড়ু	৩৩,৬৮৬,৯৫৩	(৬)	৪১,১০৩,১২৫	(৭)	৩১৬
১৭।	উত্তর প্রদেশ	৭৩,৭৪৬,৪০১	(১)	৮৮,২৯৯,৪৫৩	(১)	৩০০
১৮।	পশ্চিম বাংলা	৩৪,৯২৬,২৭৯	(৫)	৪৪.৪৪০,০৯৫	(৪)	৫০৭

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল এবং অন্য এলাকা

১।	আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৬৩,৫৪৮	(২৭)	১১৫,০৯০	(২৭)	১৪
২।	চণ্ডীগড়	১১৯,৮৮১	(২৬)	২৫৬,৯৭৯	(২৬)	২২৫৪
৩।	দাদ্রা ও নগরহাভেলী	৫৭,৯৬৩	(২৮)	৭৪,১৬৫	(২৮)	১৫১
৪।	দিল্লী	২,৬৫৮,৬১২	(১৮)	৪,০৪৪,৩৩৮	(১৭)	২৭২৩
৫।	গোয়া, দমন ও দীউ	৬২৬,৬৬৭	(২২)	৮৫৭,১৮০	(২২)	২২৫
৬।	লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় এবং আমিনদিবি দ্বীপপুঞ্জ	২৪,১০৮	(২৯)	৩১,৭৯৮	(২৯)	৯৯৪
৭।	মণিপুর	৭৮০,০৩৭	(২০)	১,০৬৯,৫৫৫	(২০)	৪৮
৮।	মেঘালয়	৭৪৪,৮৩৩	(২১)	৯৮৩ ৩৩৬	(২১)	৪৪
৯।	নেফা	৩৩৬,৫৫৮	(২৫)	৪৪৪,৭৪৪	(২৫)	(পাওয়া যায়নি)
১০।	পণ্ডিচেরী	৩৬৯,০৭৯	(২৪)	৪৭১,৩৪৭	(২৪)	৯৮২
১১।	ত্রিপুরা	১,১৪২,০০৫	(১৯)	১,৫৫৬,৮২২	(১৯)	১৪৯

* নেফা এবং জম্মু ও কাশ্মীর বাদে

হিন্দুস্তান এরোনটিকস্

রাষ্ট্রায়ত্ত হিন্দুস্তান এরোনটিকস্-এর বাঙ্গালোর শাখা হাল্কা বিমান, হেলিকপ্টার নির্মাণের জন্যে একটি নতুন কারখানা স্থাপন কোরছে। এই বছরেই নির্মাণ কার্য্য শুরু হবে এবং প্রায় দু' বছরের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ হবে। কারখানাটি চালু হলে, হেলিকপ্টার ও হাল্কা ধরনের বিমান তৈরীর কাজ এখানে স্থানান্তর করা হবে।

হিন্দুস্তান এরোনটিক্সের বাঙ্গালোর শাখা হোল দেশে বিমান তৈরীর প্রাচীনতম সংস্থা। এখান থেকে এখন "আলুয়েত" হেলিকপ্টারের কাঠামোটি ফ্রান্সের সুদ এভিয়েশনে রপ্তানি করা হচ্চে। এই ফরাসী প্রতিষ্ঠানটির সহযোগিতায় এখন এখানে হেলিকপ্টার তৈরী হচ্চে। যুক্তরাজ্যের রোলস্ রয়েস্ কোম্পানীকেও এই কারখানা থেকে টারবাইন্ ব্লেড্ সরবরাহ করা হচ্চে। ন্যাট্ বিমানের জন্যে কিছু কঠিনসাধ্য কাষ্টিং ও ফরজিং-এর কাজও বাঙ্গালোর শাখায় হচ্চে; অরফিয়াস্ ৭০৩ ইঞ্জিনের জন্যে ভেরীভারী কেসিংও তৈরী হচ্চে। আগে এগুলি বাইরে থেকে আমদানি কোরতে হোত।

১৯৬৯-৭০ সালে বাঙ্গালোর কারখানাটিতে তৈরী পণ্যাদির বিক্রয় দাঁড়ায় ৩২.৫২ কোটি টাকায়। তার আগের বছর এর পরিমাণ ছিল ২২.২৭ কোটি টাকা। এই বিভাগটির লভ্যাংশ ছিল ১৪ কোটি টাকা। এর আগে আর কখনো এই পরিমাণ লাভ হয়নি।

১৯৬৯-৭০ সালে মিগ্ বিমান তৈরীর জন্যে স্থাপিত কোরাপুট বিভাগও মিগ্ ইঞ্জিন তৈরীর লক্ষ্য মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কারখানাটিতে উৎপাদন শুরু হয় এবং ১৯৬৯-৭০ সালে কারখানাটি প্রথমেই লভ্যাংশ দেখায় ২২ লক্ষ টাকা।

আগামী বছরের শেষের দিকে হিন্দুস্তান এরোনটিক্স্-এর লখনৌ শাখায় বিমানের যন্ত্রাংশ ও কলকব্জা তৈরী শুরু হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। শীঘ্রই এই নতুন বিভাগটির কারখানা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

পরবর্ত্তী দু'বছরে কানপুর বিভাগ আরও দশটি এইচ্ এস ৭৪৮ বিমান ভারতীয় এয়ার লাইন্সকে সরবরাহ কোরবে। ১৯৬৯-৭০ সালে ৬টি এইচ্ এস ৭৪৮ বিমান ভারতীয় এয়ার লাইন্সকে সরবরাহ করা হয়।

১৯৬৯-৭০ সালে হিন্দুস্থান এরোনটিকস্-এর পাঁচটি কারখানায় রেকর্ড উৎপাদন হয় - ৬৭.২৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য। তার আগের বছরের তুলনায় এটি ১৪.৬৮ কোটি টাকা বেশী। ঐ বছরে প্রতিষ্ঠানটির লাভ হয় ৩.৮৪ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো হয় ৩২ লক্ষ টাকার।

লাক্ষাদ্বীপের পরিকল্পিত অগ্রগতি

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ, মৎস্য চাষ উন্নয়নের জন্যে বিরাট পরিকল্পনা, একটি সুপরিচালিত সমবায় বিপনন সংঘ, উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা আরব্য সাগরে অবস্থিত লাক্ষাদ্বীপ পুঞ্জের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে।

১৯৫৭ সালে এই প্রবাল দ্বীপপুঞ্জটি এক কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। তারপরই একটির পর একটি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োজিত অর্থের পরিমাণ হোল ২ কোটি টাকা। এ ছাড়া ৮৫ লক্ষ টাকা পৃথক করে রাখা হয়েছে বন্দর উন্নয়ন ও নানা সুযোগ সুবিধার জন্যে।

দ্বীপবাসীদের প্রধান অবলম্বন হোল নারকোল চাষ। এটিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হচ্চে। নারকোলের নার্সারীগুলি দ্বীপ বাসীদের সুবিধা দরে ভালজাতের বীজ সরবরাহ করে। শাকসব্জি চাষও জনপ্রিয় কোরে তোলা হচ্চে এবং কৃষকদের বিনামূল্যে শাকসব্জীর বীজ ও চারা গাছ সরবরাহ করা হচ্চে। পাম্পসেটও বসানো হয়েছে। দ্বীপপুঞ্জে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার ফলে এবং সমবায় বিপনন সংঘ থাকায় ফড়িয়া ও ব্যবসাদারগণ আর তাঁদের শোষণ কোরতে পারেন না।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

দ্বীপপুঞ্জে বেতার কেন্দ্র এবং আভ্যন্তরীণ টেলিফোন ব্যবস্থা সবে চালু করা হয়েছে। বসতিপূর্ণ দশটি দ্বীপের মধ্যে ৮টিতে এখন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্চে। দ্বীপপুঞ্জ এবং মূল ভূখণ্ডের মধ্যে একটি জাহাজ সর্বদা যাতায়াত করে।

লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জের অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হোল মৎস্য চাষ। যন্ত্র চালিত নৌকোর সাহায্যে সংকীর্ণ ও গভীর সমুদ্রে মৎস্য চাষের উন্নয়নের জন্যে ৪.৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত নিয়মিত শিক্ষা বিভাগ বলে কিছু ছিল না এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ছিল খুবই কম। বর্ত্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে এক পূর্ণ বিভাগ রয়েছে এবং কেবল বালিকাদের জন্যে বিদ্যালয় সমেত ১৩৮টি বিদ্যালয় রয়েছে। ১৯৫৬ সালে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১,৫২১; এখন

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

পুস্তক জগৎ

১৯৭২ সাল "আন্তর্জাতিক পুস্তক বর্ষ" রূপে পালনের জন্য ইউনেস্কোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আগামী বছরের প্রথম দিকে নতুন দিল্লীতে "বিশ্ব পুস্তক মেলা" অনুষ্ঠিত হবে। ২২ শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিক ভাবে এই মেলার উদ্বোধন করা হবে এবং ১৬ দিন পর ৬ ই ফেব্রুয়ারী তার সমাপ্তি ঘটবে। ভারতে এ ধরনের মেলা এই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভারতীয় প্রকাশক পুস্তক বিক্রেতা সঙ্ঘের সহযোগিতায় জাতীয় পুস্তক ট্রাস্ট এর উদ্যোক্তা।

ভারতের প্রকাশনা জগতের ইতিহাসে আগামী বছরের বিশ্ব পুস্তক মেলা এক বিশেষ তাৎপর্যময় ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, রুমানিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড সমেত বহু দেশের প্রকাশক মেলায় অংশ গ্রহণে রাজী হয়েছেন। এই মেলার প্রধান অংশ গ্রহণকারী হবেন ইউনেস্কোর প্রকাশনা। বৃহৎ মেলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব থাকবে সবচেয়ে বেশী। ভারতীয় প্রকাশকদের ইংরাজী ও অন্য সব ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকগুলি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশনা জগতের একটা সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

মেলার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে ২২ শে জানুয়ারী থেকে নিয়ে ৩০ শে জানুয়ারী পর্যন্ত "পুস্তক সপ্তাহ" পালন করা হবে। উদ্দেশ্য হ'ল সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে পাঠ প্রীতি বাড়ানো এবং পাঠাভ্যাসে উৎসাহ দান। জনসাধারণ যাতে আরও বেশী বই কেনে এবং পড়ে তার অনুকূল পরিবেশ রচনায় সাহায্য করতে দেশবাসী এই "পুস্তক সপ্তাহ" পালনে বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রভৃতি সকলেই যোগ দেবে।

পুস্তক প্রকাশনা এবং পুস্তক পাঠের অভ্যাস বৃদ্ধি করে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইতিমধ্যে কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মেলা চলতে থাকা কালে, "সর্বসাধারণের জন্য সহজলভ্য পুস্তক" এই শীর্ষকে তিনদিনের একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে উন্নত দেশগুলির প্রকাশকরা শুধু যে তাঁদের ব্যাপক প্রকাশনা কার্যসূচীর পর্যালোচনা করার সুযোগ পাবেন তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পোন্নত এবং উন্নতিশীল দেশগুলির প্রকাশকগণ যাতে সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হতে পারেন, সেই বিষয়েও সাহায্য করতে পারবেন। ঐতিহ্য পরম্পরা মতে ছেলে মেয়েদের জন্য গল্প বলার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া, ভারতীয় নৃত্যগীত সমেত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠান কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই পুস্তক প্রদর্শনীর বিশেষত্ব হ'ল, সারা বিশ্বের প্রকাশনা ক্ষেত্রের একটা

ব্যাপক ও সু-বিস্তীর্ণ রূপ তুলে ধরার প্রয়াস। স্বাধীনতা লাভের পর ইংরাজী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত এমন কয়েক হাজার বিখ্যাত পুস্তক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া থাকবে শিশুদের জন্য পুস্তকের বিশেষ প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগে সুলভ সমাদৃত সুলভ সংস্করণের বইগুলি দেখাবার ব্যবস্থা করা হবে। প্রদর্শনীর আন্তর্জাতিক বিভাগে বিদেশে প্রকাশিত ভারতীয় পুস্তকগুলি দেখা যাবে। এর সঙ্গে থাকবে বিদেশী প্রকাশনা উৎকর্ষের কিছু নমুনা।

মেলায় পুস্তক শিল্পের গুরুত্বের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হবে। প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল সরাসরি এই ব্যবসার উন্নতির দিকে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশী পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার উন্নতির দিকটি দেখানো এবং পুস্তক প্রণেতাদের প্রতিযোগিতার উৎসাহ দেওয়া। বিভিন্ন দেশের প্রকাশকরা যাতে একত্রে মিলিত হয়ে পারস্পরিক আদান প্রদানের ভিত্তিতে মত বিনিময় এবং আলোচনার মাধ্যমে পুস্তক শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথে সাহায্য করতে পারেন। সেই অভিপ্রায়ে এই মেলা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা করা হয়।

গত দুই দশকে ভারতের পুস্তক শিল্পের লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে। উন্নত মানের পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সরকারী বে-সরকারী উভয় ক্ষেত্রে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষায় সুলভ সংস্করণের অসংখ্য বই বাজারে ছাড়া। এর অতিরিক্ত, ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষাগুলিতে শিশুদের জন্য রং চংএ বইয়ের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত বিশ্ব বিখ্যাত লেখকদের রচনা ইদানীং খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা মূলক পুস্তকের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর বহু সংখ্যক পাঠ্যপুস্তকও প্রকাশিত হচ্ছে।

ইউনেস্কোর ১৯৬৯ সালের পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জীতে দেখা যায় ১৯৬৮ সালে সারা বিশ্বে ৪ লাখ ৮৭ হাজার শিরোনামার পুস্তক প্রণীত বা রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ভারতের অবদান ১১ হাজার ৪১৩। ভারতের মোট প্রকাশিত পুস্তকের শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অর্থাৎ ভারতে প্রকাশিত ১১ হাজার ৪১৩টি পুস্তকের মধ্যে ৮ হাজার ৮৬টি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লেখা হয়েছে। তিন হাজার ৩০৬টি ইংরাজীতে এবং ২১ টি অন্য ভাষায়। অর্থাৎ ইংরাজী লিটারেচার সর্বাধিক। তারপর হিন্দী— প্রকাশিত সংখ্যা (২,৭০০), বাংলা (১,১২৭); মারাঠী ১,০৬৪, তামিল ৮০২; গুজরাতী ৭৬২ মালায়লম ৪১৮; কানাড়া ৩৭২, তেলেগু ১১০; পাঞ্জাবী ১৫২, উর্দু ১৩০, ওড়িয়া ৬৪, অসমীয়া ৮১; এবং সংস্কৃত ৭৪।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে মুদ্রণ বিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। হরফ সাজাবার কাজে যান্ত্রিক পদ্ধতি মুদ্রণ শিল্পের জগতে বিস্ময়কর পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আধুনিক উন্নতমানের প্রকাশকে যেমন ছাপ হচ্ছে বিশেষ ধরনের শিক্ষা ও চারু কলা বিষয়ক পুস্তক অন্যদিকে ব্যবসায়িক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে অসংখ্য ক্যালেন্ডার (ভাঁজ করা কাগজে বিজ্ঞাপন), ফোলিওর (স্মারক পুস্তিকা) মুদ্রণ প্রদর্শন পত্র (পোস্টকার্ড), প্রাচীর পত্র এবং নানা ধরনের মোড়ক পত্রাদি। গুণাগুণের দিক থেকে ছাপার মান এত উন্নত যে বিশ্বের যে কোনো দেশের সঙ্গে অনায়াসে তার তুলনা চলে।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী যুগে শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে ব্যাপক হারে পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। পুস্তকের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি পুস্তক প্রকাশনা ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের যাবতীয় পাঠ্য পুস্তক বর্তমানে সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আঞ্চলিক ভাষার প্রবর্তন হওয়ার দরুণ রাজ্য সরকারগুলি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ভাষায় পুস্তক প্রকাশনার জন্য নিজস্ব এজেন্সী স্থাপন করেছেন। সরকার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাছা বাছা ভারতীয় পুস্তক-প্রকাশনার কাজে পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে একটি কার্যসূচী প্রবর্তন করেছেন।

প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পুস্তকের চাহিদা এখনও আমাদের পূরণ করতে হচ্ছে হয় আমদানী মারফৎ নাহয় ভারতের প্রকাশিত স্বল্প মূল্যের বিদেশী পুস্তকের সাহায্যে। পরিপোষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং লেখকদের সংস্থান রেখে সরকার ভারতীয় লেখকদেরও উৎসাহ দিচ্ছেন।

লাক্ষাদ্বীপের অগ্রগতি

১৪ পৃষ্ঠার পর

হয়ে দাঁড়িয়েছে ৭,৫০০ টন। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কাবারত্তিতে একটি জুনিয়র কলেজ চালু করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নারকোলের দড়ি তৈরী (কয়ার) এবং তা দিয়ে নানা রকম জিনিষপত্র উৎপাদনের জন্যে কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই দিয়ে শিল্প স্থাপনের সূত্রপাত হোল। দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শিল্প হোল 'কয়ার'।

লাক্ষাদ্বীপে সাতটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ এখন সাফল্যের সঙ্গে কুষ্ঠ এবং অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণ কোরতে পারে। কবারত্তীতে একটি বড় হাসপাতাল তৈরী হচ্ছে যাতে একটি একস্‌রে ইউনিট এবং একটি যক্ষা চিকিৎসার ওয়ার্ড রয়েছে।

পরিকল্পনা ও শিক্ষা

শক্তি কুমার সরকার

যে কোন অনুন্নত ও অনগ্রসর দেশের উন্নয়নে পরিকল্পনা বা যোজনা বিতর্কাতীত ব্যবস্থা বলেই স্বীকৃত। ঠিক তেমনি পরিকল্পনায় শিক্ষার যথাযোগ্য স্বীকৃতি না দিলে তা শিরহীন যজ্ঞের শামিল হবে। অধ্যাপক গলব্রেথের মতে অনগ্রসর দেশের উন্নয়ন শিক্ষাই প্রথম মূলধন হওয়া উচিত। উন্নতিকামী ভারতের নেতারা এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে শিক্ষা প্রসারে মোটামুটি অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

কিন্তু শিক্ষার সংজ্ঞা কি ও তার লক্ষ্য কি এ নিয়ে মতভেদ বিস্তর। সুনাগরিক সৃষ্টি করা অন্যতম লক্ষ্য, এ বিষয়ে কিন্তু মতভেদ অন্তত: আজকের পৃথিবীতে নেই বলা চলে। গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী বা একনায়কতন্ত্রবাদী দেশে শিক্ষা সুনাগরিক সৃষ্টিতে কার্যকরী অবদান রাখবে বলে সবাই স্বীকার করে। অবশ্য সুনাগরিকের সংজ্ঞা ব্যাপক অর্থবোধক ও কিছু কিছু জায়গায় অস্পষ্ট ও বিতর্ক নির্ভর। দেশের রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের দাবী মেটাতে যে নাগরিক সক্ষম হবে ও তার সক্ষমতা আনতে যে যে ধরনের শিক্ষা দরকার তাকেই পরিকল্পনাভুক্ত করা হয়।

রাষ্ট্রিক প্রয়োজন গড়ে ওঠে দেশের সংবিধানের দাবী অনুযায়ী বা আরও পরিষ্কার করে বললে দাঁড়ায়, যে রাজনৈতিক দর্শনের উপরে। এই দর্শন আবার কোথাও উদার সংকীর্ণ কোথাও। আবার কোথাও নমনীয় কোথাও দৃঢ়। কোথাও বা রেজিমেন্টেড করার প্রবণতা স্পষ্ট।

আমাদের দেশের সংবিধানে শিক্ষার যথাযোগ্য মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো এমন পরিষ্কার যে সেগুলো আমাদের শিক্ষার গাইডলাইনের কাজ করছে। জাতীয় নেতারা সংবিধানের সাথে সাথে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজবাদ যে আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য তাও অনবরত ঘোষণা করে চলেছেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো মোটামুটি কেন্দ্রাবেগ ধর্মী হওয়ায় কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ও রাজ্য ক্ষমতাকে ১ নং তালিকা (কেন্দ্রীয়) ও ২ নং তালিকা (রাজ্য) করে দুটি বিস্তৃতভাবে ভাগ করা হয়েছে। অবশ্য শিক্ষা বিষয়ে রাজ্যের ক্ষমতা অনেকটা সার্বভৌম গোছের দেওয়া আছে সংবিধানে। ফলে স্ব স্ব রাজ্যে এই ক্ষমতার অপপ্রয়োগও ঘটেছে ও এমনকি আদালত পর্যন্ত তা মামলা আকারে গিয়েছে। এখন মোটামুটি ভাবে স্থির হয়েছে যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত রাজ্যের অধিকারে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করবেনা। উচ্চ শিক্ষা ছাড়া কারিগরী, উচ্চ বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা ইচ্ছা করলে কেন্দ্রীয় সরকার দেখবে। ইতিমধ্যে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন গঠন হয়েছে ও মোটামুটি তারা বিশ্ববিদ্যালয় এক্তিয়ারভুক্ত শিক্ষা সমূহকে তদারক করছে। শিক্ষার প্রসার লাভে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে রাজ্য সরকারের ক্ষমতার বিভাজন ও ক্ষমতা প্রয়োগের সীমা ইত্যাদি প্রশ্নে মতভেদের অবকাশ কমে এসেছে। তাছাড়া বিভিন্ন স্তরে সরকারের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে একটা কাঠামো ও রূপরেখা গড়ে উঠেছে।

কিন্তু বিগত কয়েক বছরে ছাত্র অসন্তোষ ও যুব বিক্ষোভ যে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে তা যে কোন সুধীজনের চিন্তার কারণ ঘটিয়েছে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে ভারতবর্ষে শিক্ষার হার, বিশেষত: উচ্চশিক্ষার হার, যে হারে বেড়েছে সে তুলনায় জীবিকার উপাদান ও উপকরণ অনেক পিছিয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে ডজন ডজন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ইনজিনিয়ারিং ও কারিগরী কলেজ ও বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় এবং কয়েক শতাধিক সাধারণ স্নাতক কলেজ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা লাভের পর কঠিন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া পথ কোথায়? কলকারখানা, অফিস, আদালত ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান যেটুকু বেড়েছে তা ঐ শিক্ষিত বেকারদের ঘুচাতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের পরিকল্পনা ও পরিকল্পনাবিদদের ত্রুটি এইখানে। তারা যথার্থ ভবিষ্যত দ্রষ্টা হতে পারে নি। সাধ ও সাধ্যের পরিমাপ করার ক্ষমতার উপরে পরিকল্পনার সার্থকতা ও পরিকল্পনাবিদদের যোগ্যতা নির্ভরশীল।

আমাদের শিক্ষার প্রচলিত পরিকল্পনা তাই সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাবার দাবী করে। আমাদের পরিকল্পনাবিদদের অতীতের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মূল্যায়ন করতে হবে সর্বপ্রথম। 'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে' জাতীয় কোন মানসিকতা বা কোন দৃষ্টিভঙ্গি কোথাও কোন অঙ্কুরের মত থাকলে তা প্রথমেই ভেঙে ফেলতে হবে। রোগের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন শুধু মৌলিক কারণটা বা কারণগুলো অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করা দরকার। সর্বিনয়ে মনে রাখতে হবে যে এখনও ভারতবর্ষে 'শ্রী আর' জ্ঞান শতকরা ৪০ ভাগ লোকের ভাগ্যে জোটেনি। উচ্চশিক্ষিতের অঙ্কের চেহারা দর্শনীয় হলেও দেশের বিরাটত্বের কাছে মোটেই তা তারাক্রান্ত নয়। সীমাহীন অন্ধকারে তারা জোনাকি পোকার মত ক্ষীণদীপ্ত দিয়ে আছে। আবার তারাই দেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের এই আনুপাতিক হার থাকা সত্ত্বেও যদি শিক্ষিতেরা এই দেশের ভাগ্য
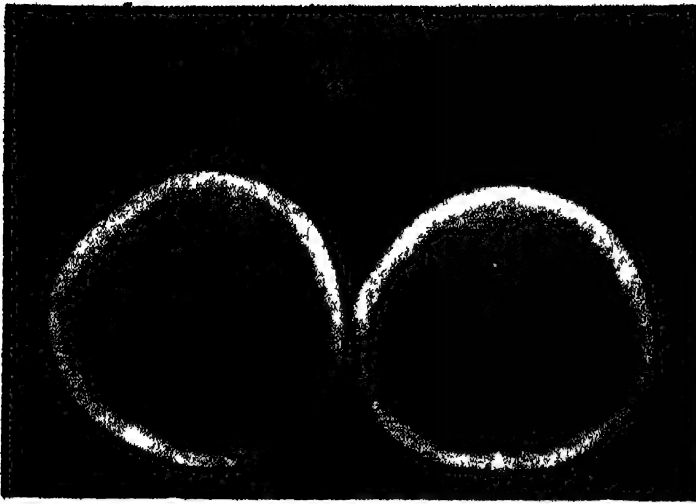
তৃষ্ণাহারী তরমুজ

সাধারণত একটি তরমুজের ওজন প্রায় ৫ থেকে ৬ কিলো পর্যন্ত হয়। তবে ২০—৩০ কিলো ওজনের বৃহদাকার তরমুজও পাওয়া যায়। তবে নানারকমের সুবিধার জন্য ছোট-খাটো মাঝারি আকারের তরমুজের চাহিদাই বেশী। সে বিষয়ে যুক্ত রাষ্ট্রের 'সুগার বেবীর' তুলনা নেই বললেই চলে। উজ্জ্বল নীলাভ রংএর প্রায় ৫ কিলো ওজনের গোলাকৃতি এই তরমুজের ফলনও হয় বেশী। প্রতি গাছে সুগার বেবীর গড় ফলন সংখ্যা প্রায় ৩ থেকে ৪টির মত।

দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা 'পুষা—বেদানা' নামের একরকম নতুন জাতের বীজহীন তরমুজ উদ্ভাবিত করেছেন। গাঢ় গোলাপী রংএর এই জাতীয় তরমুজের স্বাদ খুব মিষ্টি। 'পুষা বেদানা' সংকর জাতীয় বলে এর বীজ অংকুরিত করার সময় বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার।

নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেই শুধু তরমুজের চাষ সীমাবদ্ধ না রেখে পালাক্রমে ফসল চাষেও তরমুজের চাষ লাভজনক। নীচে দেওয়া নির্দেশানুসারে তরমুজের চাষে সুফল পাওয়া যাবে।

হেক্টার প্রতি ১৮ কেজি ফস-ফোরিক এ্যাসিড ও পরিমাণানুসারে ভাল-মত পচা সার জমির মাটির সংগে বেশ করে মিশিয়ে দিন। গর্ত বা নালি কেটে বীজ বুনুন। প্রতি হেক্টারে ২—৩ কেজি বীজ প্রয়োজন। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার ১৫ ২০ দিন পরে পরে প্রতি হেক্টার ক্ষেতে ৩৫ থেকে ৪৫ কেজি নাইট্রোজেন আর ২৫ কেজি পটাশ সার চাপান দিন। তরমুজের লাল বীটল রোধ করতে বীজ অঙ্কুরিত হওয়া মাত্রই প্রতি হেক্টারে শতকরা ২—৫ ভাগ বি এইচ্ সি গুঁড়ো ছড়ানো দরকার। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে মাব-পোকার আক্রমণ রোধ করতে মেটাসিসটক্স অথবা ম্যালাথিন (১০ লিটার জলে ১৩ থেকে ১৭ সি সি অনুপাতে) স্প্রে করা উচিত। গাছে ফুল আসার সময় শতকরা ০ ২ ভাগ মোরেসটান কিংবা থিরাস অথবা শতকরা ০'২৫ ভাগ জিনেব স্প্রে করা উচিত। আর ফল ধরার সময় পাউডারি মিলডিউ দমন করতে হেক্টার প্রতি শতকরা ৪০ থেকে ৫০ কেজি কারাথেন স্প্রে করা দরকার। পোকায় খাওয়া তরমুজ নিয়মিত তুলে ফেলা দরকার।

পরিকল্পনা ও শিক্ষা

সমস্যা সংকুল করতে পারে তা হ'লে পরিকল্পনাবিদদের এইখানেই প্রথম দৃষ্টিদান করা দরকার।

আমাদের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার 'শিক্ষা ও জনশক্তি' এই অধ্যায়ে শিক্ষার আলোচনা হয়েছে। শিক্ষা যে জনশক্তি এই কথা পরিকল্পনাবিদেরাও মেনে নিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার "উপযুক্ত পদ্ধতি" সামাজিক পরিবর্তনকে দ্রুত করতে ও উন্নত করতে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখতে সক্ষম। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে উন্নয়নের নির্দিষ্ট কর্মসূচীকে ত্বরান্বিত করতে ও সবার উপরে এক অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করবে। পরিকল্পনাবিদরা স্বীকার করেন যে ভারতীয় সংবিধান মত যে প্রতিশ্রুতি দশ বৎসরের মধ্যে সারা দেশে অবৈতনিক বা বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কথা ছিল তা পালন করা হয়নি। তাঁদের পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যাবে অগ্রগতি যা হয়েছে তা বিস্ময়কর না হলেও উল্লেখযোগ্য—তা প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে উচ্চতর শিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত। কারিগরি বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ে অগ্রগতি যথেষ্ট হয়েছে বরং সে অনুপাতে জীবিকা সংস্থান প্রসারতা ঘটেনি। কোন দৃষ্টি ভঙ্গিতে আমাদের চলতে হবে তা'ও তারা তিনটে পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা রূপরেখা খাড়া করেছেন। বিজ্ঞানের প্রসারতা ও উন্নতি স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়ন, ভারতীয় ভাষার উন্নয়ন ও পুস্তক প্রকাশ ইত্যাদি সকল বিষয়কে যথাযথ স্থান দেওয়া হয়েছে। এমন কি কারিগরি শিক্ষা যে স্বতঃই নিজস্ব জীবিকা গড়ে তুলতে পারে সে লক্ষ্যেরও উল্লেখ আছে। শিক্ষা কর্মসূচী অধিকতর সামাজিক ও আর্থিক লক্ষ্যমুখী করা হবে। অর্থাৎ শিক্ষা ও জনশক্তি যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত তার স্বীকৃতি ও গুরুত্বদান ঘটেছে।

কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রসঙ্গে

ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়

কৃষিতে উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কৃষি বিষয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক চর্চা ও গবেষণা এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শুরু হয়, কিন্তু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্য বিজ্ঞানের শিক্ষা দীক্ষা যতখানি প্রশস্ত ভূমিকা গ্রহণ করে কৃষি বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণা ততোখানি হয়নি। আর ভারতবর্ষে—যেখানে জাতির জনবল ও ধনবল একান্তভাবে কৃষি নির্ভর সেখানে চাষের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থায় শিক্ষা ও গবেষণার বিস্তার নিতান্তই হাল আমলের এবং দিনের পরাধীন দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের নৈরাশ্যজনক অগ্রসরতার ফলশ্রুতি।

প্রকৃত পক্ষে আমরা স্বাধীনতার পরই অনুভব করলাম—আমাদের কৃষি নির্ভর অর্থনীতির উন্নতির জন্য চাষবাসের বৈজ্ঞানিক পন্থার পালা-বদল অনতিবিলম্বে দরকার। তারপরই কৃষি-শিক্ষা ও গবেষণার উদার উৎসাহের জোয়ার দেখা দিল। সেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কৃষি শিক্ষাকে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত চালু করে দেওয়া এবং চাষের ফলন বাড়ানোর জন্য কৃষি উৎপাদনের উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে চর্চা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কর্মোদ্যম তখন থেকেই পরিলক্ষিত হয়। তার জন্য অবশ্য প্রথম সংযুক্ত ভারত-মার্কিন সমীক্ষক দলের ভারতীয় কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ দলই প্রথমে কৃষি শিক্ষা ও গবেষণাকে স্কুল কলেজ স্তরে বিস্তৃত করে দেবার সুপারিশ করেন এবং পশু পাখি পালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মোদ্যম সম্পর্কীয় উন্নতির জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন। এই সুপারিশের ফলেই প্রতি প্রদেশে কৃষি কলেজ, পশু পালন কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ধুম পড়ে যায়। সেটা ১৯৫৪ সালের কথা এবং ভারতে কৃষি শিক্ষা বিস্তারের এমন প্রকল্প অনুসারে আজ প্রায় সব রাজ্যেই কৃষি শিক্ষার কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়—কোথাও দু'টোই, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গেও সে সুপারিশক্রমে কৃষি শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় এবং তদনুসারে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার কাজ হাতে নেওয়া হয়। তাছাড়া কৃষির উন্নতির জন্য সরকারী কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে রূপায়িত করবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মিদের ট্রেনিং সেন্টারগুলোর প্রতিষ্ঠা ও কৃষি শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম প্রধান অঙ্গরূপে স্বীকৃত। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার সাংগঠনিক কাঠামোকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা কেন্দ্র স্তরে কৃষি বিদ্যার পঠন পাঠন ও গবেষণা এবং দুই সরকারী প্রশাসনিক বিভাগ ও ট্রেনিং সেন্টার স্তরে কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা। আজ থেকে এক দশক আগে উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্য সূচীতে মানবিক বিষয়, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার মতো কৃষি বিদ্যার শাখাটিও খোলা হয় কিন্তু সংখ্যায় গ্রামের স্কুলে এবং তারও ছ' বছর আগে ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম কৃষি কলেজ স্থাপিত হয় মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম প্রান্তে ঝাড়গ্রামে। তারপর কলেজটি অবশ্য কল্যাণীতে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে পশু চিকিৎসার কলেজটি বহু প্রাচীন, বৃটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত এবং বেলগাছিয়াতেই আছে। কৃষি, শিক্ষা, গবেষণা সম্প্রসারণ সম্পর্কীয় ১৯৫৪ সালের সংযুক্ত ভারত-মার্কিন সমীক্ষক দলের সুপারিশ ক্রমে ভারতে প্রথম কিস্তিতে যে ক'টি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয় পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (কৃষি ভিত্তিক) তাদের অন্যতম, যেখানে কৃষি বিজ্ঞান ও অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় পঠন-পাঠন ও গবেষণার কম বেশী ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে, বিশেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীতে, কৃষি বিজ্ঞান ও কৃষি অর্থনীতির পাঠ্যক্রম চালু আছে। তদুপরি পশ্চিমবঙ্গে বে সরকারী সংস্থার মধ্যে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউট-এ কৃষি গবেষণামূলক কর্মধারা অব্যাহত আছে। এ প্রসঙ্গে জুট রিসার্চ ইনসটিটিউটের কাজকর্ম বিশেষ উল্লেখ্য।

সরকারী তরফ থেকে কৃষি সম্পর্কীয় শিক্ষা ও গবেষণা মূলক কর্মধারা প্রবর্তনের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের অধীনস্থ কৃষি অর্থনীতির মূল্যায়ন সংস্থা এবং বেসরকারী লোকদের হাঁস-মুরগি পালন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, গ্রাম সেবক দল জন সামাজিক ও কৃষিভিত্তিক শিক্ষার জন্য ট্রেনিং সেন্টার, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারদের জন্য ট্রেনিং সেন্টার, ব্লক ভিত্তিক সরকারী কর্মীদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র এবং ধান ও পাট সম্পর্কে গবেষণা কেন্দ্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একথা অনস্বীকার্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাধীন কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প অনুসারে সামাজিক শিক্ষা ও দৃষ্টি ভঙ্গির আকাঙ্খিত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষি শিক্ষার কাঠামো ও কৃষি গবেষণার কর্ম কাণ্ড স্থিরীকৃত হয়েছে, কিন্তু এ শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রয়োগ ক্ষেত্রের স্তরে সন্তোষজনক ভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। প্রথমতঃ স্কুল স্তরে যে যে ছাত্র কৃষি বিদ্যা বিভাগে উত্তীর্ণ হন তার কর্ম সংস্থানের অথবা পুনরায় উচ্চ শিক্ষার ভবিষ্যৎ একান্ত সীমিত এবং কৃষি

বিদ্যার কলেজ স্তরে বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষিত যুবকের সামনে ও তার অধীত বিদ্যার প্রয়োগ খোলা নেই। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কৃষি বিজ্ঞান ও কৃষি অর্থনীতি নিয়ে যে সব গবেষণা এখানে হচ্ছে তাকেও ব্যবহারিক কাজে লাগানোর দায়িত্ব কেউ উপলব্ধি করেন না। এ সবই শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় অবহেলা ও শিক্ষা ও তার প্রয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবেরই দুঃখজনক ফল। কী এক অজ্ঞাত কারণে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ও আমাদের জাতীয় আশা আকাঙ্খাকে মূর্ত করে তুলতে পারছে না। অথচ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কৃষি বিদ্যালয়গুলি কত বেশী কর্মতৎপর ও তাৎপর্যপূর্ণ। তবে সরকারী কৃষি বিভাগের সমীক্ষা সংস্থা ও ধান ও পাট নিয়ে গবেষণা কেন্দ্রগুলি কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছে সন্দেহ নেই। ইদানিংকালের উন্নত ধান বীজের আবিষ্কার ও তার সুফলকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, উন্নত কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা দরকার, অসংখ্য অশিক্ষিত, প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন জোতবিহীন চাষীদের ভূমির মালিকানা, আর্থিক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া তা সম্ভব নয়। যতদিন না অবস্থা সে পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে ততদিন কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার পূর্ণ ফল আমাদের লভ্য নয়।

শরণার্থীদের চাপ

৫ পৃষ্ঠার পর

উপর যে চাপের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব থেকে অন্যান্য রাজ্যও মুক্তি পাবে না। ভারত সরকার কি এখনও করে পাকিস্তানের যথেচ্ছাচারী জঙ্গী শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত জাগ্রত হবে তার অপেক্ষায় থাকবেন? সমস্যার সমাধানের পথ ভারত সরকারকেই খুঁজে নিতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজন হলে রাজনৈতিক ঝুঁকিও নিতে হবে। কারণ, রাজনৈতিক ঝুঁকি গ্রহণ করার যৌক্তিকতা বিচার করা থেকেও মানবতার দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এখন ভারত সরকারের কর্তব্য—অন্ততঃ ভারতের জনমত এই যুক্তিই পোষণ করে থাকে।

বাঁশ চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

গোপাল চন্দ্র দাস

পশ্চিম বাংলার কাগজের মিল গুলি বাঁশের জন্য আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার উপর নির্ভরশীল। এমনকি বাংলা দেশের শরণার্থীদের অস্থায়ী গৃহ নির্মানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সেদিনও আসাম থেকে বাঁশ আমদানী করতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই বনমহোৎসবের প্রাক্কালে অন্যান্য বনজসম্পদের সঙ্গে বাঁশ চাষের কথাও ভুললে চলবেনা।

পশ্চিম বাংলার জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি উন্নত প্রথায় বাঁশ চাষের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিক। কেননা, মৌসুমী অঞ্চলের আর্দ্র আবহাওয়া বাঁশ চাষের সম্পূর্ণ অনুকূলে জল নিকাশী বৃষ্টি বহুল অঞ্চলে বাঁশের গড়ণ ও বৃদ্ধি সবচেয়ে ভাল হয়। একমাত্র হিমালয়ের বরফে ঢাকা পাহাড়ী অঞ্চল বাদে পশ্চিম বাংলার আর সব স্থানের মাটিতেই বাঁশ চাষ করা সম্ভব।

উঁচু ও মাঝারি জমির দোঁ-আশ মাটিতে বাঁশ ভাল জন্মে। তবে বাঁশ চাষের জন্য সমতল ও আবাদী জমি না হলেও চলে। ডাঙ্গা জমি, ঢালু জমি বা অন্যান্য পতিত জমিতে যেখানে জল সহজে দাঁড়ায় না বা অন্যান্য শস্য ফসলের চাষ করা সম্ভব হয় না, এধরনের অকেজো এবং মজাপুকুর, খাল ও বিলের উঁচু পাড়ে অথবা বাগানের চারিদিকের পরিত্যক্ত অংশেও সামান্য যত্নে বাঁশের ঝাড় করা যায়।

বাঁশ রোপনের জমি সম্পূর্ণটা চাষ না করলেও চলবে। অন্যান্য ফলগাছের মত গাদা বা গর্ত করে বসালেই যথেষ্ট। রোপনের এক/দেড় মাস আগে এক মিটার লম্বা ও চওড়া এবং ৫০ সেন্টিমিটার গভীর করে গাদার মাটি খুঁড়ে তোলা দরকার। তারপর ঐ গর্তে মজা পুকুরের পাঁক মাটি, আবর্জনা, সার ও কাঠের বা তুষের ছাই মিশিয়ে ভর্তি করে রাখা দরকার। আর প্রতি গাদার দূরত্ব থাকা চাই ৪ থেকে ৫ মিটার। সাধারণতঃ বীজ, ডেউঁড় এবং শিকড় যুক্ত কাণ্ডের টুকরা বা কাটিং রোপন করে বাঁশ চাষ করা হয়।

বাঁশেরও কীট শত্রুর অভাব নেই—ডেঁতুলে বিচ্ছা বা চেলা, কাঠ পিপড়ে ও ডাঁয়ে পিঁপড়েরা কাঁচা বাঁশের কাণ্ড ছিদ্র করে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে ও রস খেয়ে বাঁশের পুষ্টি লাভের খুবই ক্ষতি করে। শুকনো বাঁশের বড় শত্রু উই ও ঘুন পোকা। লারভি জাতের পোকার আক্রমনেও বাঁশ ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়। প্রতিকার হিসাবে উচ্চ শক্তির বি. এইচ. সি বা ডিডিটি গুড়া ছড়ান দরকার। তাছাড়া পাইনান অর্থাৎ জলে ডুবান শোধিত বাঁশে কীট-পতঙ্গের উপদ্রব কম হয়। বাঁশের কোঁড় পচা, শিকড় মরা, সুপারী গাছের মত এক পিঠে হওয়া ইত্যাদি ছত্রাক রোগ দেখা যায়। সময় মত চুন, ব্লাইটক্স বা ডিডিটি ছড়ান হলে উপকার পাওয়া যায়।

অসংখ্য রকমের বাঁশ দেখা গেলেও পশ্চিম বাংলায় চাষের উপযোগী ও বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত কয়েকটি বাঁশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো। বাঁখুনে বাঁশ—মাঝারি জাতের এ বাঁশ ঘরের চালের কাঠামো ও রাজ মিস্ত্রীদের ভারা বাঁধার কাজে বেশী ব্যবহৃত হয়। তল্লা বাঁশ—ঝুড়ি, চাটাই ইত্যাদি ছাড়াও এর মণ্ড থেকে লেখার জন্য ভাল কাগজ তৈরী হয়। তাছাড়া কাগজের মণ্ডের জন্য কোঠা বাঁশ, পেঁচা বাঁশ, লাঠি বা কাবাইন বাঁশ অন্যতম।

একচেটিয়া কারবার ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ

অমিয় চক্রবর্ত্তী

শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যে সমৃদ্ধি আসে তা যে স্বভাবতই সমবন্টন নিয়ে আসবে এমন কোন কথা নেই। বস্তুতঃ ব্যবসায়িক মহলের শ্রী বৃদ্ধি কখনই সমান তালে ঘটতে দেখা যায় না। একথা অবশ্য মনে রাখা ভাল যে বৃহৎ ব্যবসায়ী মাত্রই কিছু একচেটিয়া কারবারী এমন কোন কথা নেই। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য বেশীর ভাগ দেখা যায় যে বৃহৎ ব্যবসায়ী মাত্রেই পরিনামে একচেটিয়া কারবারীতে পরিণত হয়েছে।

ব্যবসায়িক জীবন প্রতিটি দেশেই যদিও মোটামুটি এক এবং ব্যবসায়িক রীতি-নীতিও প্রায়ই সামগ্রিকভাবে একটা নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করেই চলে, তথাপি দেশ বিশেষের সামাজিক ব্যবস্থা ও চরিত্র যে তার অর্থনৈতিক জীবনকে একটা বিশেষ রূপ দিয়ে থাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বোধ করি এটা বেশী করে সত্য। যুগ যুগ ধরে একধরন ভারতীয় তার কর্মজীবনকে জন্মগত ভিত্তিতে পরিচালিত করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কর্ম বিভাগ ক্রমে একটা জাতিগত প্রথায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিদেশী অর্থনীতিবিদরাও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনের এই বৈষম্যটির উপরে দৃষ্টিপাত করে বিশেষ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন*। উৎপাদন, বণ্টন ও যোগান, ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের এই তিনটি দিকের দিকপালেরা সকলেই প্রায় মাড়োয়ারী, গুজরাটি অথবা পার্শী, এর কোন না কোনও সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীভুক্ত

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই আইনসভার ভিতরে ও বাইরে রাজনীতিজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদেরা জাতীয় সম্পদ ও আয়ের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন দেখা যায়। সরকার শ্রী পি সি. মহলানবিশকে এ বিষয়ে তথ্য নির্দ্ধারণের ভার দিন। মহলানবিশ কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর একচেটিয়া কারবার সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়।

একচেটিয়া কারবার বিধি প্রণয়ন

সরকার ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে একচেটিয়া কারবার অনুসন্ধান কমিশনের নিয়োগ ঘোষণা করেন। কমিশন ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করলে দেখা যায়, বেসরকারী উদ্যোগের প্রায় সবটাই মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারের উপর বিধিনিষেধ আরোপের দাবী আবার মুখর হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯৭০ সালের ১লা জুন আইনসভা একচেটিয়া কারবার বিধি প্রণয়ন করে একদিকে যেমন একটি বহু আকাঙ্খিত প্রত্যাশা পূরণ করলেন অপর দিকে তেমনি দেশের অর্থনৈতিক জীবনের এক সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে হোল প্রাথমিক পদক্ষেপ।

এই বিধির মুখবন্ধে এর প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারনা পাওয়া যায়। মুখবন্ধে বলা হ'য়েছে, "অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন ভাবে যেন পরিচালিত না হয় যাতে সমষ্টি স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের প্রসার ঘটায়, একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণাধীন হয় ও বাণিজ্যিক আচরণ রীতি বাধা বাধকতা থেকে মুক্ত থাকে, এই উদ্দেশ্যে এই আইনটি রচিত হ'ল।"

এই মুখবন্ধের গোড়ার দিকে যা বলা হ'য়েছে, সেটা ভারতীয় সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ধারায় উল্লিখিত রাষ্ট্রের করণীয় অন্যতম অনুশাসনের প্রতিধ্বনি বলা যায়। বস্তুতঃ এই আইনের প্রধান প্রধান ধারাগুলির প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সাংবিধানিক অনুশাসনের ভিত্তিতে বিচার সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে মূল হচ্ছে জনস্বার্থ। কোনটি জন স্বার্থের পরিপন্থী তার ওপর নির্ভর করবে কার্যক্ষেত্রে সরকার একচেটিয়া কারবার ও বাধ্যবাধকতামূলক ব্যাপারিক আচরণবিধির কোন ধারাটি কিভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন।

প্রয়োগ ক্ষেত্র

একচেটিয়া কারবার বিধির সামগ্রিক পর্য্যালোচনায় দেখা যায় এর দু'টি বিশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্র রয়েছে। প্রথমটি হ'চ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ।

*ভারতে বিদেশী উদ্যোগ—মাইকেল কিডরন। মর্থ ক্যারোলিনা য়্যুনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত। লেখকের মতে, "নিঃসন্দেহে পার্শি, গুজরাটি ও মাড়োয়ারীরা সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী ... সর্বভারতীয় ভিত্তিতেও মাড়োয়ারীরাই প্রধান ব্যবসায়িক শ্রেণী হিসাবে উল্লেখনীয়। লেখক আরও বলেন, "দুইটি বৃহৎ জাতিগোষ্ঠি—বাঙালী ও মারাঠিরা কিন্তু শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়ে অনগ্রসর রয়ে গিয়েছে।

আর দ্বিতীয়টি হ'চ্ছে বিক্রয়মূল্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা। উৎপাদকেরা অধিকাংশ উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে কতকগুলি বাধ্যবাধকতা আরোপ ক'রে থাকেন। উৎপন্ন সামগ্রির বন্টন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে অবাধ লেন-দেনের পরিপন্থী কতকগুলি বাণিজ্যিক বা ব্যাপারিক রীতিনীতি প্রথা হিসাবে হোক বা অন্য কোন ভাবে হোক, উৎ-পাদকেরা প্রচলন করে থাকেন, তা সে প্রতিযোগিতা থেকে স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্যকে রক্ষা করবার জন্য হোক, অথবা মুনাফা বাড়াবার জন্যই হোক। এই প্রথাগুলির মধ্যে আবার সব চাইতে অনিষ্টকারী হচ্ছে বিক্রয়মূল্যের স্বতঃসংরক্ষণ। এই প্রথা অনুযায়ী খুচরা ব্যাপারী হস্তান্তর ক্রিয়া নির্দ্ধারিত ন্যূনতম মূল্য সীমিত রাখতে বাধ্য হন। নির্দ্ধারিত মূল্য থাকায় ক্রেতা হয়ত দরকষাকষির ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতে পেরে একটু স্বস্তি বোধ করেন। তবুও বুদ্ধিমান ক্রেতা এটা ভেবে অবাক হন যে দোকানপাটের ভিন্নতা সত্ত্বেও কি ক'রে দরের অভিন্নতা বজায় থাকে। প্রতিযোগিতার এমন অভাব কোন ইন্দ্রজাল বলে সম্ভব হয় যে মূল্য হ্রাসের দ্বারা খরিদ্দার আকৃষ্ট করবার চেষ্টা বিক্রে-তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়? অর্থাৎ বন্টন ও যোগান ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে উৎপাদক, পাইকারী বিক্রেতা ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন একটা স্থায়ী বোঝাপড়া নিশ্চয়ই আছে যাতে করে ক্রেতার পক্ষে দ্রব্য বিশেষের নির্দ্দিষ্ট মূল্য দেওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। ভোগ্য সামগ্রির প্রায় শতকরা পঁচিশ ভাগ ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে বিক্রয়মূল্যের এই ধরণের সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে দেখা যায়। উৎপাদকের ছাপযুক্ত প্রায় সকল সামগ্রির ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থার সার্বিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই হ'লো দ্বিতীয় প্রয়োগটির সর্বপ্রধান দিকটির মোটা-মুটি বিবরণ। অতঃপর প্রথম প্রয়োগক্ষেত্রটি সম্পর্কে কিছু বলা যাক। অর্থনৈতিক ক্ষমতার কুক্ষীকরণের ধারাগুলি প্রথমতঃ সেই সকল উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের সম্পত্তির মূল্য বিশ কোটি টাকার কম নয়। অন্যত্র এই সম্পত্তি মূল্য এক কোটি টাকা ও তদূর্দ্ধে নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে এই ভিত্তিতে যে, উদ্যোগটির নিয়ন্ত্রণ সীমা এককভাবে বা যৌথভাবে অন্য কতক-গুলি পরস্পর সম্বদ্ধ উদ্যোগের সহায়তায় ন্যূন পক্ষে উৎপাদন, যোগান বা বন্টনের এক তৃতীয়াংশের কম নয়। উভয় ক্ষেত্রেই সম্প্রসারণ ও নতুন উদ্যোগ স্থাপনের প্রতিটি পরিকল্পনা এই আইনের আওতাভুক্ত হবে। জনস্বার্থের অনুকূল হলে তবেই ভারত সরকার এই সকল পরিকল্পনায় অনু-মোদন করবেন। দুই বা ততোধিক উদ্যোগের সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রেও আইনে অনুরূপ ব্যবস্থা সংরক্ষিত হয়েছে।

জনস্বার্থ

যদিও আইনে জনস্বার্থের কোনও সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয় নি, তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যায় এটা বেশ ব্যাপক অর্থেই ব্যব-হৃত হয়েছে। যে বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হলে আইনের ধারাগুলির জনস্বার্থের অনুকূলে প্রয়োগ হয়েছে বলে ধরা যাবে, তার একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় এই আইনের ২৮ ধারায় উল্লিখিত বিষয়-গুলি অনুধাবন করলে। এই ধারায় ভারত সরকার ও একচেটিয়া কারবার আয়োগের প্রতি কতকগুলি এমন নির্দ্দেশ প্রদত্ত হয়েছে যা দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইনের অন্যান্য ধারাগুলির যথাযথ প্রয়োগে অবশ্যই পালিত হবে বলে আশা করা যায়। প্রথমেই বলা হয়েছে সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যয় সং-ক্ষেপের দ্বারা উৎপাদন, যোগান ও বন্টন ব্যবস্থাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে যে উৎপাদনের মূল্য, গুণাগুণ ও পরিমাণ যথাযথ স্তরে বজায় থাকে এবং একদিকে তা যেমন ভারতের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মেটায়, অন্যদিকে তেমনি অন্ত-র্দেশীয় ও বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সহা-য়তা করে। ব্যবসা বাণিজ্যের দক্ষ ও পরিচালনার সংগঠনে প্রতিও দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে। উৎপাদন ক্ষমতা ও মনুষ্য সৃষ্ট সম্পদের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও ব্যবহারের প্রতিও নজর রাখতে হবে। বাণিজ্যিক দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন ও উৎপন্ন সামগ্রির বিক্রয় ক্ষেত্রের প্রসার আইনের এই ধারায় অন্য তম লক্ষ্য হিসাবে বিধৃত হয়েছে। এত-দ্ব্যতীত অর্থনৈতিক ক্ষমতার কুক্ষীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ হিসাবে নতুন উদ্যোগ স্থাপনের সহায়তা করতে হবে জনস্বার্থের কথা স্মরণ রেখে। তাছাড়া সমষ্টির মঙ্গলের জন্য যাতে ব্যক্তির অর্থনৈতিক সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। পরিশেষে অন্য যে আর একটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেটি হল বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে বৈষম্যের দূরীকরণ। এই ব্যাপারে অনুন্নত অঞ্চল-গুলির সম্পর্কে বৈষম্যের হ্রাসের দিকটিতে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

এই হল একচেটিয়া কারবার ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রচিত আইনটির মোটা-মুটি রূপরেখা। একদিকে যেমন সমাজ-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনে এই আইনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে, তেমনি এর যথাযথ প্রয়োগে ব্যর্থতা নিয়ে আসতে পারে এমনি এক বিপর্যয় যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থায়ী প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে জাতিকে সমূহ সঙ্কটের সম্মুখীন করতে পারে। আইনটির উদ্দেশ্য স্বচ্ছ হলেও এর ধারাগুলি যে ত্রুটি মুক্ত নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ত্রুটিগুলির প্রভাব যে এসে পড়তে পারে এমন সম্ভা-বনাকেও তাই অস্বীকার করা যায় না।

বহির্বাণিজ্যের পরিস্থিতি

১৯৭১ সালের মে মাসের পরিমানে দেখা গেছে ভারত ঐ মাসে ১৩২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে। গত বছরের মে মাসের তুলনায় এই রপ্তানির পরিমাণ ১৪ কোটি টাকা বেশী।

কবি চিত্তরঞ্জন

অপর্ণা দেবী

চিত্তরঞ্জন দাশকে দেশবাসী দেশপ্রেমিক, রাজনৈতিক নেতা ও দেশের প্রকৃত বন্ধু, 'দেশবন্ধু' বলেই জানে এবং বিখ্যাত আইনবিদ, ঐশ্বর্যশালী দাতা, ভোগী ও যোগীর রূপেও দেশবাসীর কাছে তিনি পরিচিত। কিন্তু এসব ছাড়াও তাঁর মধ্যে যে কবি প্রতিভা লুকিয়ে ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ যে কাব্য প্রীতি ছিল কবি চিত্তরঞ্জনের সেই রূপটির সঙ্গে হয়তো অনেকেই পরিচিত নন। তাই তাঁর সেই রূপটিই আজ দেখাতে চেষ্টা করবো।

কিশোর বয়সে লেখা তাঁর কয়েকটি কবিতা এবং তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ—"মালঞ্চ"। মালঞ্চের পর চিত্তরঞ্জনের আরো ৪ খানা কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯১২ সালে 'মালা'—আত্ম প্রকাশ করে। মালঞ্চের পর ১৯১৩ সালে "সাগর গীত" এবং ১৯২৪ সালে "অন্তর্যামী" এর পরে ১৯২৫ সালে "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকায় "কিশোর কিশোরী" আত্মপ্রকাশ করে।

আশৈশব সাহিত্য সেবায় চিত্তরঞ্জনের একটা আকুলতা থাকলেও ঘটনাচক্রে তা সম্পূর্ণ ফুটে উঠতে পারেনি। দেশমাতৃকার আকুল আহ্বানে, তিনি 'পুঁথিতে বাঁধেন তোর অশ্রুসিক্ত হইয়া।' অন্যায় অত্যাচার রোধ করতে মহাপ্রভু যেমন দুবাহু তুলে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর অতিপ্রিয় অধ্যাপনা ত্যাগ করে, তেমনই চিত্তরঞ্জনকে বড় কষ্টেই সাহিত্য সাধনা ত্যাগ করতে হয়েছিল দেশমাতৃকার মুক্তি যজ্ঞে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাবার আহ্বানে। এ সত্ত্বেও জাতির সাহিত্য ভাণ্ডারে তিনি যা দান করে গিয়েছেন তাঁর কর্মবহুল রাজনৈতিক জীবনের ফাঁকে ফাঁকে, তা বড় কম নয়। চিত্তরঞ্জনের ঘটনাবহুল জীবন হতে যদি সঙ্গীত ও সাহিত্য সেবাকে আলাদা করে নেওয়া যায় তবে যে গভীর শূন্যস্থান দেখা যাবে তা অপূরণীয়।

চিত্তরঞ্জনের বিভিন্ন ভাব তরঙ্গ কবিতাতেই প্রথম আত্ম প্রকাশ করে। এই প্রকাশ প্রথম ফুটে উঠেছিল তাঁর অপরিণত বয়সের পদ্য সমূহে। ১৮৮৫ সালে তাঁর রচিত 'কেন কাঁদে হৃদয়' কবিতাতেই অন্তরের আকুলতায় এক আশার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই কিশোর কবি প্রশ্ন করলেন,—

"দুর্বল শিশুর মত জাগিবি কি অবিরত
মিছে আশা বুকে করে"?

আর সে আশা যদি পূর্ণ না হয়? তার জন্য কি শুধুই অশ্রু সম্বল করব—তাই বললেন তিনি—

'মোছ অশ্রুজল
কাঁদিয়ে বল কি ফল
কাঁদিবি কাহার তরে?'

ক্রন্দন তো আশা পূর্ণ করবার বা আশা ভঙ্গে সান্ত্বনার একমাত্র পথ নয়। তাই সাহসে ভর করে কিশোর কবি বললেন,—

সাহসে করিয়া ভর
আনিয়া হৃদয়ে বল
দাও তরী ভাসাইয়া

বড় ঝঞ্ঝাকে ভয় কি? যাক না তরী ডুবে। তাই বল্লেন তিনি—

'কি ভয় কি ভয়'? তোর
তরে হৃদয় আমার
উঠিবিরে দাঁড়াইয়া।

কিশোর অন্তরের দুর্নিবার আশা সফল করবার বাসনা ফুটে উঠেছিল কিশোর কবি চিত্তরঞ্জনের এই অপরিণত জীবনের মধ্যে। উত্তাল সমুদ্রে পরবর্তী জীবনে তরী ভাসিয়েছিলেন তিনি এবং 'দাঁড়াইয়া' তাঁকে উঠতেই হবে এই দৃঢ় সংকল্প যে তখন থেকেই তাঁর হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কি? ১৮৯৭ সালে তাঁর রচিত কবিতা 'নির্মাল্য' প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পরে মাসিক পত্রিকাতেও তাঁর রচিত কবিতা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হোত। দেশমাতৃকার ভবিষ্যত সাধক পুত্র তখন দেশজননীর উদ্দেশ্যে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করছিলেন। দেশমাতৃর কণ্ঠে তিনি বল্লেন,

ভক্তি পুষ্প দিয়ে মাগো,
গাঁথিয়াছি মুণিহার
বড় সাধ দিব তুলে ওই চরণে তোমার।
তুমি যদি আলো করে থাক মা হৃদয় পাবে
দুঃখ মোর সুখ হবে ঘুচে যাবে অন্ধকার।

এ কবিতায় চিত্তরঞ্জনের দেশাত্মবোধের উন্মেষ লক্ষিত হয়। মাতৃপ্রেমের যে দীপ শিখায় তাঁর কিশোর মন প্রথম আলোকিত হয়েছিল, সেই প্রেমালোক ছড়িয়ে পড়েছিল যৌবনে তাঁর কাব্যের ছন্দে ছন্দে। চিত্তরঞ্জনের জীবনের তরুণ প্রভাতে যে সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল জীবনের অপরাহ্নে সেই একই সুর বিপুল উচ্ছ্বাসে ঝঙ্কৃত হোল।

চিত্তরঞ্জনের পরবর্তী জীবনে সাহিত্য সাধনায় বাধা এলেও কাব্য ও সাহিত্য থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। যে বৈষ্ণব কাব্য তাঁর জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিল

পরবর্তী জীবনে সেই বৈষ্ণব ভক্তি রসে সিক্ত হয়েই তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে সর্বত্যাগী হতে পেরেছিলেন, তাই—

'সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয়ই হইলাম দাসী'

—বলে তনু মনপ্রাণ দেশমাতৃকার সেবায় তিনি সমর্পণ করলেন। সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে তিনি সাহিত্য সাধনাকে গৌণ করে মাতৃসেবায় অগ্রসর হলেন। নতুবা রাজনৈতিক সাধনা তাঁর সাহিত্য সাধনার বাধা স্বরূপ হলে, তিনি সম্পূর্ণভাবে দেশ সেবায় জড়িয়ে পড়তে কখনই পারতেন না।

যৌবনকাল থেকে চিত্তরঞ্জনের হৃদ মালঞ্চে যে ভাবরূপ ফুল ফুটে উঠেছিল তাই নিয়েই তিনি বাণীর চরণে অঞ্জলি দিলেন। ১৮৯৬ সালে তাঁর এই অর্ঘ 'মালঞ্চ' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। মালঞ্চের তরুণ মালাকার প্রাণ বসন্তের হিল্লোলে উচ্ছ্বসিত হয়েই প্রেমের সঙ্গীত গেয়ে উঠলেন। 'তোমার প্রেম' কবিতায় তরুণ কবি এই প্রেমের স্বরূপ জানতে ব্যাকুল হোলেন। কেমন সে প্রেম? তাঁর মনের প্রশ্ন কবিতায় রূপ পেল—

'তোমার ও প্রেম সখি, শাণিত কৃপাণ
দিবানিশি করিতেছে হৃদিরক্ত পান।
নিত্য নব সুখ ভারে
ঝলসিছে রবি করে
রজনীর অন্ধকারে সে আলো নির্বাণ।

মালঞ্চে প্রকাশিত 'ঈশ্বর' কবিতাটির জন্য চিত্তরঞ্জন ঈশ্বর বিদ্রোহী, নাস্তিক আখ্যা পেয়েছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের ঈশ্বর সেবকদের কাছ থেকে। তরুণ প্রাণের আশা তিনি ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করলেন —কিন্তু যাঁকে নিবেদন করছেন, তাঁকে উপলব্ধি করবার বাসনা তাঁর মনে জেগে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। বার বার তাঁর আবেদনের উত্তর না পেয়ে সন্দেহের ঘাত প্রতিঘাতে অভিমানে কবি-মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল—সে বিদ্রোহের ভাব অতি স্বাভাবিক, তাই কবি চিত্তরঞ্জন বল্লেন,—

'ঈশ্বর-ঈশ্বর বলি অবোধ ক্রন্দন
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি গগন ভরিয়া
আমাদের সুখ শান্তি নিতেছে হরিয়া
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন।

অন্যায় অসঙ্গতির বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জন আজীবন যুদ্ধ করে গিয়েছেন—ধর্মপ্রচারকদের কপটতায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তাঁর ধার্মিক কবিতায় বিদ্রূপ করে বলেন,—

শুধাও দলের কথা দিবস রজনী
সাক্ষী দিয়া ঈশ্বরের কথায় কথায়
বক্তৃতা শুনিয়া শুধু শঙ্কিত ধরণী
'আহা' 'আহা' বলি তব চরণে লুটায়
ধরণীর সুখ দুঃখ অবহেলা করি
আঁকিছ স্বর্গের ছবি নাসিকা কুঞ্চিয়া
নিয়েছে নিঃশ্বাস ফেলি ভগবানে স্মরি
মানবের শতপাপ দেও দেখাইয়া।

এখানে কবি আকাঙ্খিত কল্পনার পদ্ম ছেড়ে বাস্তব জগতে আসন বিছালেন। তথাকথিত ঈশ্বরকে নিজের রূপে দেখে সাজিয়ে মান অভিমানের অবতারণা করে বল্লেন—

'তুমি যাও আমি থাকি আপনারে লয়ে
ডুবিয়া হৃদয়তলে গভীর গভীর।
আমারি নন্দন আমি করি আবিষ্কার
মধুর সুন্দর এক অপূর্ব নন্দন

আকুল পরাণ লয়ে ব্যাকুল নয়নে
তোমার চরণতলে আসিবনা আর.

তরুই ভগবানকে অভিমান ভরে এমন কথা বলতে পারেন। চিত্তরঞ্জন বিদ্রোহ করেছিলেন ধর্ম প্রচারকদের কল্পিত এক দেবীর নির্দিষ্ট ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের বিরুদ্ধে নয়।

মালঞ্চে চিত্তরঞ্জনের একখানি প্রসিদ্ধ কবিতা 'বার বিলাসিনী'। এই কবিতার জন্যে তাঁর বিবাহে ব্রাহ্ম সমাজের কোন কোন প্রচারক অনুপস্থিত ছিলেন। অভিশপ্ত নারীর অন্তরের জ্বালা যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করলেন চিত্তরঞ্জন। চিরলাঞ্ছিতার করুণ জীবনের কাহিনী তাঁর সমস্ত হৃদয় মথিত করলো। পুরুষের অন্যায়ে নিপীড়িতা সমাজ পরিত্যক্তা উপেক্ষিতা বারবিলাসিনীর অস্ফুট ক্রন্দন এ কবিতাতে মুখর হয়ে উঠেছে। ছন্দে ও ভাব মাধুর্যে 'বারবিলাসিনি' রবীন্দ্রনাথের পতিতার পাশেই স্থান করে নিল।

ওগো আমি যৌবনে যোগিনী
এ বাসনা ছাই
সর্বাঙ্গে মাখিয়া তাই
চলিয়াছি কলঙ্ক বাহিনী
চিরদিন যৌবনে যোগিনী

মালঞ্চে 'অভিশাপ' কবিতাটিতে চিত্তরঞ্জনের প্রাণের সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা পাই। তিনি বল্লেন—

স্বর্গ সহচরগণ
আজি হতে আমি হব
ধরণীর প্রাণ
বাজিবে আমার বুকে জগতের দীর্ঘশ্বাস
শত দুঃখ তাপ
চির অশ্রুজল চোখে আসিয়া বহিব লয়ে
পূর্ণ পরিতাপ
বক্ষেতে বিধিয়া রবে শাণিত কৃপাণ সম
এই অভিশাপ।

অন্তর মথিত করা তার এই বাণী স্বর্গ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সুরপতির মোহ চূর্ণ করে দিল। অবহেলিত জনগণের তীব্র আর্তনাদ শঙ্কিদেশের মত বিদ্ধ হয়ে রইল তাঁর হৃদয়ে। প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় মালঞ্চে প্রকাশিত এই ''অভিশাপ' কবিতায়।

বনধারো ২২শে আষাঢ় ১৩৭১ পৃষ্ঠা ২২

নবসাক্ষরসাহিত্য

মোহিত রায়

নিরক্ষরতা সমাজের অভিশাপ। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ভারত নিরক্ষর প্রধান দেশ। নিরক্ষরতা দূরীকরণ সহজ কাজ নয়, তাই বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে নবসাক্ষরসাহিত্য অপরিহার্য। নবসাক্ষরসাহিত্য প্রণয়ন, প্রকাশন ও বিতরণ দীর্ঘদিন ধরে ছিল অবহেলিত।

বয়স্কদের লেখা ও পড়ার কৌশল আয়ত্ত করার সমস্যার বিজ্ঞাননির্ভর সমাধানের পথের জন্য ইউনেসকোর সহযোগিতায় ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলেছে। এছাড়া, সরকারী বেসরকারী বহু সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষ এই সমস্যার সমাধানে চিন্তা ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করেছেন।

একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলাই শেষ কাজ এবং বয়স্ক সাক্ষরদের সাহায্যে বাদ বাকী নিরক্ষররা ধীরে ধীরে সাক্ষরতা অর্জন করবে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে ধারণাটি ভুল। শব্দ চিনতে পারার যে প্রাথমিক ক্ষমতা বিপুল অধ্যবসায় ও শ্রমে অর্জিত হয় এবং বই না পড়ায় তা হারিয়ে যায় এবং বই পড়ার আগ্রহও আর থাকে না। অর্থাৎ পড়া ত্যাগ করার পর উপযোগী বোধগম্য সাহিত্যের অভাবে পড়ার অভ্যাস আর থাকে না। সে কারণেই সাক্ষর হবার পর তাদের উপযোগী ক্রমাগত সাহিত্য চাই-ই। এছাড়া, সাক্ষরতা শিক্ষার অর্থ হল যে নিরক্ষর মানুষকে সমাজ ও দেশের বিপুল কর্মক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ স্থান অধিকার করতে এবং যোগ্য নাগরিক করতে সাহায্য করা। তারজন্যও তাদের উপযোগী সাহিত্য চাই।

নবসাক্ষরসাহিত্য এমন হওয়া উচিত যাতে নবসাক্ষরেরা পড়ে শিক্ষা, আনন্দ, প্রেরণা পেতে পারে, ব্যক্তিসমষ্টিজীবনে লাভবান বা উপকৃত হতে পারে এবং সামাজিক অর্থনৈতিকাদি ক্ষেত্রে তাদের মানের ক্রমোন্নতি হতে পারে। এই সাহিত্য সহজ সরল ভাষায় লেখা হবে। তবে প্রচলিত বাক্যরীতি ও প্রবাদাদি মিশিয়ে লেখা হতে পারে। ছোট ছোট বাক্য জোরালো ভাষায় হবে। প্রযুক্তি-বিজ্ঞাননির্ভর শব্দ এড়িয়ে যেতে হবে। জানা থেকে অজানা বিষয়ে যেতে হবে। বইতে মূলভাব বারবার যেন ঘুরে আসে। গল্প-নাটিক-বর্ণনা বা কথোপকথনের মাধ্যমে এই সাহিত্য লেখা হতে পারে। অদরকারী অলংকার ও অপ্রচলিত যুক্তাক্ষর থাকবে না। সুপরিচিত উপমা থাকতে পারে। নির্ভুল তথ্যসমৃদ্ধ হবে। প্রকাশভঙ্গী হবে সহজ মনোজ্ঞ। স্বাভাবিক আকারের বই হবে। দাম হবে কম। নবসাক্ষরসাহিত্য লেখকদের জানা দরকার তাঁরা কেন লিখছেন। কাদের জন্য লিখছেন। বিষয় সম্পর্কে নবসাক্ষররা কতটুকু বোঝেন। তারা কি এই বিষয়ে আগ্রহশীল। যে উদ্দেশ্যে বইটি লেখা তা কি প্রকাশ হয়েছে। লেখা কি আকর্ষণীয় ও পাঠযোগ্য হয়েছে।

নবসাক্ষরদের পাঠরুচি ও প্রয়োজন সম্পর্কে গবেষণা করে দেখা গেছে যে তারা ধর্ম-পৌরাণিকী-জীবনী-গল্প-পালাপার্বণের গান ও চাষবাস সম্পর্কে বেশী আগ্রহশীল।

আমাদের দেশে নবসাক্ষরসাহিত্য প্রণয়ন ও উৎপাদনের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে সাহিত্য কর্মশালা প্রবর্তিত হয়েছে। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয় প্রতিবছর শ্রেষ্ঠ নবসাক্ষরসাহিত্যকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করছেন। ভারতের মুখ্য ১৪ টি ভাষাতেই এখন প্রচুর পরিমাণে নবসাক্ষরসাহিত্য প্রকাশিত হচ্ছে।

টেলিভিসান সঞ্চার ব্যবস্থার উন্নয়ন

নয়াদিল্লীর কেন্দ্রস্থলে বহু অট্টালিকা ও সরকারী ভবন ইত্যাদির মাথা ছাপিয়ে দাড়িয়েছে এক সদ্য নির্মিত টাওয়ার বা মিনার। গাঢ় কমলা আর সাদা রঙে রঙা এই টাওয়ারটি ভারতীয় টেলিভিসান সঞ্চার ব্যবস্থা সম্প্রসারণে এক নবীনতম সংযোজন। সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় কারিগরি দক্ষতায় গড়া এই উচ্চ টাওয়ারটি বহুদূর থেকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

ভারতে টেলিভিসান সঞ্চারের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে দিল্লীতে। দিল্লীর আকাশবাণী ভবনের সংলগ্ন টেলিভিসান সঞ্চার ক্ষমতার ব্যাস ছিল ৪০ কিলোমিটার। সাধারণ মানের এই টেলিভিশান সঞ্চারে যান্ত্রিক গোলযোগ ছাড়াও ছবি যথেষ্ট পরিষ্কার পাওয়ার সম্ভব ছিল না। এইজন্য বর্তমান টেলিভিশান টাওয়ারটি নির্মাণের কথা ভাবা হয়। এক্ষেত্রে কামানি ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন নামে একটি প্রসিদ্ধ বেসরকারী কোম্পানীকে টেলিভিশান টাওয়ারটি তৈরীর ভার দেওয়া হয়। তারা দক্ষতার সাথে সময়মত কাজটি সমাপ্ত করে।

একশ মিটার দীর্ঘ (প্রসঙ্গত, এটি দিল্লীর কুতুব মিনারকেও উচ্চতায় হার মানিয়েছে, কুতুব ২৩৪ ফিট দীর্ঘ) এই টেলিভিশান টাওয়ার স্থাপনে টেলিভিশানের ছবি এখন দিল্লীর আশে পাশে ৬০ কিলোমিটার ব্যাসের এলাকা থেকে পরিষ্কার দেখা যাবে। উন্নত যন্ত্রপাতি যুক্ত বলে এতে টেলিভিশানে যান্ত্রিক গোলযোগও কমবে এবং আশা করা যায় এর ফলে জন্তু টেলিভিশান শিল্পের প্রসার ঘটবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে দিল্লীতে প্রায় ২০,০০০ টেলিভিশান সেট রয়েছে।

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প

মোহনপুর বাঁধ

ক্ষেত্র আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ। এ দেশের উন্নয়ন মানেই মূলতঃ কৃষি উন্নয়ন। যে বছর বর্ষা ভাল হোল না সে বছর ফসলও ভাল হ'য়না। অমনি বন্ধ হয়ে গেল বার মাসের তের পার্বণ। গ্রামের চাষি শুকিয়ে গেল হাহাকার বেড়ে গেল। এ জন্যই আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পে কৃষির জন্য জল সেচ একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কয়েকটি পাঁচশালা পরিকল্পনার পরে পরিকল্পনা প্রণেতারা বুঝলেন বড় বড় জলসেচ প্রকল্পের চেয়ে ছোটও ও মাঝারি সেচ প্রকল্পের গুরুত্ব ও কার্যকারীতা বেশী। এগুলির রূপায়ণ ও পরিচালনাও সহজ। সুরু হ'ল তাই "লঘু সিঁচাই"—এর কাজ। হাজা মজা পুকুর বিলের সংস্কার সুরু হ'ল, নতুন নতুন পুকুর কাটা হ'ল।

পশ্চিম বঙ্গেও এমন কয়েকটি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প কার্যকরী হ'ল। এখনও শতাধিক প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তরে রুক্ষ ধূসর পুরুলিয়ায় এমন বিবেচনাধীন কয়েকটি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রয়েছে। মোহনপুর খয়রাবাঁধ প্রকল্প এমনই একটি সম্ভাবনাময় বিবেচনাধীন সেচ প্রকল্প। সম্প্রতি শোনা গেছে বড় বড় জলাধার না করে যেথায় সেথায় ছোটখাট জলাধার করা হবে। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতেই মোহনপুর বাঁধের বিষয় আলোচনা করা দরকার। যদিও বিষয়টির প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আগেই আকর্ষণ করা হয়েছে।

আসানসোল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেল পথের চতুর্থ ষ্টেশন মধুকুণ্ডা, দামোদরের ঠিক পশ্চিম পারেই। পাশ দিয়ে চলে গেছে দিশের গড়—বাঁকুড়া পাকা সড়ক। এ সড়ক ধরে বাঁকুড়ার দিকে মাইল তিনেক এগুলেই কলাকুড়ি—ভিলুড়ি পাকা সড়কের পশ্চিম দিকে মোহনপুর গ্রাম—থানা সাঁতুড়ি জিলা পুরুলিয়া। ধূলি ধূসর রুক্ষ প্রান্তর। বর্ষায় কিছু কৃষকারা ফসল দিয়ে চরম আনন্দে যেন বোধ পোয়াচ্ছে। একটু বারিকণা বর্ষণ হলেই যেন ফসল সম্ভবা হয়ে উঠতে পারে। জল তো কাছেই আছে। না দামোদরের কথা বলছিনা।

সন্তোষ দত্ত

দামোদর প্রকল্পের কথাও নয়। দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত হয়েও দামোদরের কৃপাকণা থেকে বঞ্চিত এ মোহনপুর। কিন্তু প্রকৃতির করুণা থেকে বঞ্চিত হয়নি আদৌ। ঐ দেখুন পঁচিশ একর এলাকা জুড়ে রয়েছে স্বাভাবিক জলাধার, অদূরে দক্ষিণ দিকে রামচন্দ্রপুর পাহাড়। সেখান থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে আসে মোহনপুরের দিকে। একটি নদী খাতের মত এ পথ। প্রথমে একর দশেক জায়গা জুড়ে একটি ছোট জলাধারে দাঁড়ায় এ জল। তারপরে সে জল উপচে পড়ে বড় জলাধারে—স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে বড় বাঁধ। সরকার এর নাম দিয়েছেন মোহনপুর বড়বাঁধ প্রকল্প।

এ বাঁধ স্থানীয় জমিদারের এলাকাভুক্ত ছিল। জমিদারী দখল হওয়ার প্রাক্কালে এ বাঁধটাকে বেনামী করে রাখা হয়েছে বহু নামে। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে এমন বিশাল বাঁধটার গভীরতা কমে এসেছে মাটি জমে জমে। তবুও এর কালো জল ক্ষুব্ধ চাষীদের হতাশা বাড়িয়ে দেয়। এ বাঁধে বিনাব্যয়ে যতটা জল আছে তা পেলে আশেপাশের জমিতে রবিশস্য ফলতো। বাঁধটির অবস্থান এমন যে এখানে জল ধরে রেখে লক গেট দিয়েই জল সরবরাহ করা যাবে পাম্প ছাড়া। সম্প্রতি এ বাঁধের জরীপ করা হয়েছে। পরে এর সংস্কার সুরু হবে। তারপরে তৃষ্ণা মিটবে এখানকার জমির। মোহনপুর বড়বাঁধ প্রকল্প পুরুলিয়ার এই গ্রামাঞ্চলে নিয়ে আসবে নতুন জীবন।

ক্ষুদ্র সঞ্চয় অভিযানে পোষ্ট মাষ্টাররাও মদত দেবেন

পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প আরও জোরদার করে তোলার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ৮০,০০০ ব্রাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টার নিযুক্ত করা হবে। অতঃপর তাঁদের উদ্যোগে পোষ্ট অফিসে তিন ও পাঁচ বছরের নির্দ্দিষ্টকালীন জমা বৃদ্ধি পেলে, তাদের এক শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হবে। এছাড়া, পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে বাড়তি নীট জমা হলেও তাঁরা উৎসাহমূলক কমিশন পাবেন। ১৯৭১-৭২ সালের বাড়তি সঞ্চয় দেখে এসব উৎসাহ ব্যঞ্জক কমিশন বিতরণ করা হবে। ডিভিসন সারকেল বা সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা সবচাইতে বেশী জমা সংগঠন করতে পারবেন তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। ডিভিসন সারকেল ও সর্বভারতীয় পর্যায়ে যিনি সবচাইতে বেশী সঞ্চয় দেখাবেন তাঁদের যথাক্রমে ১০০, ২০০, ৫০০ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে এবং সারকেল ও সর্বভারতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় সংগঠক দলকে পালাক্রমে শিল্ড প্রদান করা হবে।

সংবাদ পরিক্রমা

সুভাষ বসু

নদীয়া

নদীয়া সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের সহায়তায় সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে ১০ জন লাইসেন্সধারী ইঞ্জিনীয়ারদের একটি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। সমিতিটির নাম কৃষি শিল্প উন্নয়ন সমবায় সমিতি। এই ধরণের সমিতি নদীয়া জেলায় এই প্রথম।

সমিতির সদস্যরা প্রত্যেকে ২০০ টাকা করে শেয়ার কিনে প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ করেছেন। সরকার বা স্থানীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক জেলাতে যে সব অগভীর নলকূপ বসাবেন অথবা তাঁদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে যে সব চাষী তাঁদের জমিতে জলসেচের জন্যে পাম্পসেট বসাবেন, সেই সব পাম্পসেট এবং নলকূপগুলির দেখাশুনা সংস্কার ও মেরামতির কাজ এই সমিতি করবেন। ক্রমে কৃষি যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশও এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করবেন বলে আশা করা যায়। এই সব কাজ থেকে ঐ ১০ জন ইঞ্জিনীয়ারদের প্রত্যেকেই মাসিক ২০০ টাকা করে রোজগার করতে পারবেন।

এ ছাড়াও কৃষ্ণনগরে সরকারি পরিচালনায় বাস ও লরির বডি তৈরি করার জন্যে সম্প্রতি একটি বেসরকারি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়েছেন বলে প্রকাশ।

* * *

ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া নদীয়া জেলায় "লীড্" ব্যাঙ্ক স্থাপন করার পর থেকে গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্ক মনোভাব গড়ে তুলতে এবং জেলার সার্বিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের গুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে সারা জেলায় একটি নিবিড় প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে। এতে জনসাধারণের কাছ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই থেকে সুরু করে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক একমাত্র নদীয়া জেলাতেই প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা লগ্নী করেছেন। এর মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ২০ লক্ষ টাকা, ক্ষুদ্র শিল্পে দশলক্ষ টাকা এবং অন্যান্য কারবারে বাকি টাকাটা লগ্নী করা হয়েছে। এক হাজারেরও বেশী লোক এতে উপকৃত হয়েছেন বলে প্রকাশ।

পুরুলিয়া

চতুর্থ যোজনাকালে পুরুলিয়া জেলায় ছোট ছোট চাষীদের উন্নতিকল্পে ক্ষুদ্রচাষী ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের রূপায়ণের তিন কোটি চাপান্ন লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জেলার আশিটি ব্লক এবং আড়াই একর বা তার কম জমি আছে এমন ২৫ হাজার চাষীকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

বরাদ্দ টাকার এক তৃতীয়াংশ ঐ চাষীদের ভরতুকী বাবদ দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রকল্পভুক্ত অঞ্চলে পাঁচ হাজার চাষীকে সেচের কাজে কূপ খননের জন্যে ঋণ ও ভরতুকী দেওয়া হচ্ছে এবং বাকি ২০ হাজার চাষীকে ফল ও সব্জী চাষের জন্যে জলসেচের ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যও করা হচ্ছে। এছাড়া, ১৩০০ পরিবারকে দুগ্ধ উৎপাদন, পশু এবং হাঁস-মুরগী পালনের জন্যে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও ছয় হাজার পরিবারকে ফল ও সব্জী উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেবারও ব্যবস্থা করা হবে। গ্রামীন কারিগরদের জন্যেও চতুর্থ যোজনাকালে পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় দশহাজার একর জমি সংরক্ষণের জন্যে ২৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

সারা জেলায় জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে জলাশয়গুলির সংস্কারের কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় যে চতুর্থ পরিকল্পনা কালে বর্তমানে ৫০ হাজার একর জমির জায়গায় ১২২ হাজার একর জমি ছোট ছোট সেচ প্রকল্পগুলির আওতায় আনা হবে। এছাড়া কৃষি পণ্য মজুত করার জন্যে গুদাম এবং বিপনন ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি করা হচ্ছে। এই ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়ণের জন্যে ১৩ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি কৃষি শ্রমিক উন্নয়ন এজেন্সী গঠন করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, পুরুলিয়ার ঊষর পতিত জমিতে কৃষিকাজ প্রসারের জন্যে রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী জেলার দুটি গ্রামে তিন একরের মত জমিতে দুটি পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি ফল ও সব্জীর নিবিড় চাষ অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে বলে প্রকাশ। ঐ গ্রামগুলির চাষীদের মধ্যে ফল ও সব্জীর অধিক ফলনশীল বীজ, সার এবং সেচের জন্যে পরিমিত জল পাম্পের সাহায্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

REGD. NO. D-238

উন্নয়ন বার্তা

★ দূর দূরান্তের পল্লী অঞ্চলে, যেখানে ব্যাঙ্কের কাজ কারবার আজও শুরু হয়নি, সেসব এলাকার অধিবাসীদের ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধে দেবার কাজে যেসব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তাদের মধ্যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুর জেলার "লিড্ ব্যাঙ্ক" প্রকল্পটির অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কে অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিভাগ গত ফেব্রুয়ারী মাসে তাদের পর্যবেক্ষণ কাজ শেষ করে পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

★ সমবায় ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকাগুলিতে সমবায়ের কাজকারবার আরও জোরদার করে তোলবার জন্য জাতীয় সমবায় উন্নয়ন করপোরেশন ঐসব অঞ্চলে এক সমবেত অভিযানে অগ্রসর হয়েছেন। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও রাজস্থানে সমবায়ের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করে তোলবার জন্য ও উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করবার জন্য সাহায্যাদি আরও সুলভ করা হবে।

★ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধিনস্থ ভারত ইলেকট্রিক্যালস্ লিমিটেড (রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান) টেলিভিসান স্টুডিওর জন্য দরকারী যন্ত্রপাতি তৈরী করবার জন্য পশ্চিম জার্মেনীর এক ফার্মের সাথে এবং টেলিভিসান সম্প্রচারের উন্নত যন্ত্রপাতি নির্মাণে এক জাপানী ফার্মের সহযোগিতায় এদেশে কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। রাডার ও সেজাতীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য এবছর গাজিয়াবাদে একটি কারখানা খোলা হচ্ছে।

গত দুবছরে 'বেল' এর রপ্তানি বেড়েছে দশ গুণেরও বেশী। ১৯৭০-৭১ সালে 'বেল' রপ্তানি করে ৫১ লক্ষ টাকার ইলেকট্রনিকের যন্ত্রপাতি; ১৯৬৮-৬৯ সালে এই রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ৫ লক্ষ।

★ ভারতের সমুদ্রগামী মালবাহী জাহাজে ১,১৯,১৭২ জি আর টি যোগ হওয়াতে ভারতীয় জাহাজে মাল বওয়ার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাড়িয়েছে ২,৪১৫,১৫ জি আর. টি। চতুর্থ পরিকল্পনায় ৪০ লক্ষ জি. আর. টি লক্ষ্যে পৌঁছনোর সীমা নির্দ্ধারিত করা হয়েছে।

★ কানপুরের জাতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা ল্যাবোরেটারি সম্প্রতি পেট্রোলিয়াম জেল শোষণ করে ৯০ শতাংশ কেরোসিন বিশিষ্ট স্পঞ্জের আকার বিশিষ্ট এক জাতীয় "রুটি" তৈরী করতে সমর্থ হয়েছে। বিশেষ গুণসম্পন্ন এই স্পঞ্জ কেরোসিনে কেরোসিনের সমস্ত গুণ অবিকৃত থাকবে। স্পঞ্জ থেকে তেল নিংড়ে এনে একে কঠিন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা চলবে। এই কঠিন জ্বালানি সীমান্তের সুউচ্চ ঘাঁটিতে পৌঁছে দেওয়াও হবে সহজ। এ্যারোপ্লেন থেকে বস্তাবন্দি করে প্যারাস্যুট দিয়ে নামিয়ে দেওয়া যাবে।

ধনধান্যে

পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে, তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য। এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যথার্থ রূপ তুলে ধরা 'ধনধান্যে'র অন্যতম উদ্দেশ্য।

নিয়মাবলী

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়।

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাদের নিজস্ব।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা এবং কোনোও রচনার প্রাপ্তি স্বীকৃতি জানানো সম্ভব নয়।

নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ে, এই ঠিকানায় পাঠাবেন—

"যোজনা"
যোজনা ভবন
পার্লামেন্ট স্ট্রীট,
নিউ দিল্লী—১

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ-
বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশনস্ ডিভিশন,
পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১,
এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ডিরেক্টর, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সোসাইটি লি:—করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ধন ধান্যে

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

তৃতীয় বর্ষ　　৭ম সংখ্যা

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ : ১৪ই ভাদ্র ১৮৯৩

Vol. III : No : 7 : Sept. 5, 1971

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
সমর ঘোষ

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
সুভাষ বসু

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (শিলং)
ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

সংবাদদাতা (ত্রিবান্দ্রাম)
রসকটি কৃষ্ণ পিল্লে

সংবাদদাতা (বোম্বাই)
অবিনাশ গোডবোলে

ফোটো অফিসার
টি.এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট
বলরাম মণ্ডল

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ ৩৮৩৪৮১/৪০২

টেলিগ্রামের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

শিল্প-শ্রমিক সম্বন্ধ সুষ্ঠু রাখতে হলে দরকার—সকলের সহযোগ, উৎপাদন নিষ্ঠা এবং কাজে আনন্দ খুঁজে পাওয়া। এই তিনটি লক্ষ্যে অবিচল থাকলে সামগ্রিক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য।

—কীথ ডেভিস

[illegible]

পৃষ্ঠা

দেখে ঋণদান এবং এই ঋণ যাতে যথাযথ ভাবে উপযোগ করা হয় তা নিয়ন্ত্রণ করা। মোট কৃষকের ৭৫ শতাংশ হোল ছোট কৃষক। ব্যাঙ্কগুলি কি এঁদের কাছে পৌঁছতে পেরেছে? যাঁদের অন্তত: ৫ হেক্টেয়ার জমি আছে তাঁদের কাছেও কি ব্যাঙ্কগুলি পৌছতে পেরেছে?

এখনও পর্যন্ত কৃষকগণ যে পরিমাণ ঋণ পান তার চার পঞ্চমাংশ আসে মহাজনদের কাছ থেকে, যাঁরা সুদ নেন চক্রবৃদ্ধিতে। পল্লী অঞ্চলে যে পরিমাণ ঋণ প্রয়োজন তার এক পঞ্চমাংশ আসে প্রতিষ্ঠানগত ঋণদান ব্যবস্থা থেকে। যেমন সমবায় প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বে-সরকারী ব্যাঙ্ক এবং জমি বন্ধকী ও উন্নয়নমূলক ব্যাঙ্ক থেকে। তাহলে লাভবান হলেন কারা? প্রথম যে কৃষক ব্যবসাদারে পরিণত হয়েছেন এবং যে ব্যবসাদার কৃষকে পরিণত হয়েছেন।

এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশ গেছে বাগানী কোম্পানী, বৃহৎ যন্ত্রচালিত খামার এবং ধনী জমিদারদের হাতে। মাঝারি ধরণের কৃষক, যাঁদের জমির পরিমাণ ৫ থেকে ১০ হেক্টেয়ারের মত, তাঁরা অবশ্য কিছুটা উপকৃত হয়েছেন, কিন্তু আজও ছোট কৃষককে যেতে হয় গাঁয়ের মহাজনের কাছে।

ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণদানের যে লক্ষ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থির করে দিয়েছেন সেই ব্যবস্থার মধ্যেই প্রধান ত্রুটি রয়ে গেছে। যে ম্যানেজারকে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ কোরতে হবে তিনি কয়েকজন বিত্তশালী কৃষককে ডেকে পাঠান, তাঁদের ঋণ দেন এবং তাঁর লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ায় সন্তোষ বোধ করেন। কোন্ কৃষক ঋণ পরিশোধ কোরতে পারবেন তা দেখেই ম্যানেজার খুশি। ফলে অধিকাংশ ছোট কৃষক স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়ে যান। ঋণদানের সময় একজন কৃষকের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা না দেখে তাঁর প্রকল্প থেকে কি পরিমাণ ফলন পাওয়া যাবে সেটা দেখাই সম্ভবত: যুক্তি যুক্ত। ভূমি সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় জমির পরিমাণ ক্রমশ: হ্রাস পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট কৃষকদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাও হ্রাস পাবে। সুতরাং এমন একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা দরকার যাতে ছোট ছোট কৃষকগণ উপকৃত হবেন অথচ বিনিয়োজিত অর্থও ফেরৎ পাওয়া যাবে। কোন প্রকল্প ফলপ্রসু হবে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্যে ব্যাংকগুলিকে খামার সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ নিয়োগ কোরতে হবে। এইসব বিশেষজ্ঞ প্রকল্পগুলির গুণাগুণ বিচার করে দেখবেন এবং কৃষকদের কি পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন তাও স্থির করে দেবেন। তাঁদের কৃষি পদ্ধতির উন্নয়নের জন্যেও বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শ দেবেন। কৃষকদের অসুবিধাগুলি যেমন বিদ্যুৎ সরবরাহ, বীজ ও সার সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য করাও ব্যাঙ্কের কর্তব্য। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির আরও দেখা দরকার যে সুদের হার যেন কম হয়।

কৃষি ব্যবস্থার মত অন্যান্য ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। যেমন ক্ষুদ্রশিল্প, পরিবহন ব্যবসায় নিযুক্ত খুচরা ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য ছোট খাট ব্যবসায়ী। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের আগে পেশাদার ও স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সাহায্য বলে প্রায় কিছুই পেতেন না। সারা দেশে মাত্র একটি ব্যাংক এ ধরণের সুবিধা দিত; তাও এক নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে। ১৯৬৯ সালের জুন মাসের শেষে এই ব্যাঙ্কটির কাছে এ ধরণের একাউন্ট্ ছিল মাত্র ৪২১টি এবং যে পরিমাণ টাকা বাকী ছিল তার অঙ্ক হোল ১১ লক্ষ। রাষ্ট্রীয়করণের পর প্রথম ১৮ মাসে এই ধরণের একাউন্টের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৮৪ গুণ এবং বাকী অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২১ গুণ।

বিভিন্ন শ্রেণীর স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্যে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিশেষ ঋণদান পরিকল্পনাগুলি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি কমিটি গঠন করে। এঁদের ঋণদানের পদ্ধতি, শর্ত, সংগঠন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে কমিটি মোটামুটি ভাবে এক ব্যবস্থাপনার সুপারিশ করে। কমিটি আরও প্রস্তাব করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনের হিসেব নিয়ে ঋণদান ব্যবস্থা যেন নমনীয় করা হয়। সিকিউরিটির ওপর জোর না দিয়ে কার্যকারিতার ওপরই যেন জোর দেওয়া হয়। স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের কারিগরী সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে কমিটি সুপারিশ করে যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেন বহুমুখী সার্ভিস স্থাপন করা হয়। ব্যাঙ্কগুলিকে আরও নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাদের কার্যের এলাকার মধ্যে আরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে এ ধরণের প্রকল্পের জন্যে যেন বিশেষ ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দুবছরের মধ্যে এ ধরণের ব্যবস্থাদি নিশ্চয়ই এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দু'বছর পর

১৯৭১ সালের মে মাস পর্যন্ত "সিডিউল্ড" বাণিজ্য ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ৬০০০ কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করে। গত বছর এই আমানত ছিল ৯১৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬৯-৭০ তা সালে ছিল ৬৬০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ শতকরা হারে বৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৭ থেকে ১৭.৮ ভাগ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে (অর্থাৎ স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সাতটি সহযোগী শাখা এবং ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক) এই সময়ে আমানত ৪৩২৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৫,১০১ কোটি ১০ লক্ষ টাকায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৯৬৯-৭০ এর ৫২টি সপ্তাহে মোট আমানত ৫৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৭৭৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, যা শতাংশ হারে বাড়ে ১৫.৭ ভাগ থেকে ১৭.৯ ভাগ।

১৯৭১ সালের ২৮শে মে মাস পর্যন্ত ১৪টি ভারতীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর আমানত ছিল ৩,৪০৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা—রাষ্ট্রায়ত্তের পূর্বে তা ছিল ২,৬০৫ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা।

ছোট খাট ঋণ

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দ্বিতীয় বছরের প্রথম নয় মাসের হিসাবে দেখা যাচ্ছে (১৯৭০ এর জুলাই থেকে—১৯৭১ এর মার্চ) অল্প বিত্তের ঋণ গ্রহীতারা পূর্বের চাইতে বেশী ঋণ পেয়েছেন। যেসব খাতে ঋণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে—

কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, পরিবহন চালকদের জন্য ঋণ, খুচরো ব্যবসায়ী, স্ব-নিযুক্ত কর্মী ও শিক্ষা খাতে। এইসব বিভিন্ন খাতে ১৯৬৯ এর জুন মাস থেকে ১৯৭১ এর মার্চ মাস পর্যন্ত ঋণ ২.৮ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১১.৭ লক্ষ টাকায়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে উপরোক্ত খাতে ঋণ দানের শতকরা বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২২.৮ ভাগ। ১৯৬৯ এর জুন মাসে তা ছিল ১৪.৫ শতাংশ।

কৃষি ঋণ

কৃষকদের সরাসরি ঋণ দেওয়ার ব্যাপারেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। বছর বছর আরও কৃষক রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে কৃষি ঋণ পাবার ব্যাপারে ভীড় করছে; যথা ১৯৬৯ এর জুন মাস থেকে এদের সংখ্যা ১,৭১,৮৮০ থেকে বেড়ে ১৯৭১ এর মার্চে দাঁড়িয়েছে ৭,৯৫,৭৪০। কৃষি ঋণ তহবিলও বছর বছর স্ফীতোদর হয়ে চলেছে। ১৯৭১ এর মার্চে তা দাঁড়িয়েছে ১৭৪.৮ কোটি টাকায়। গড় পড়তায় একজন কৃষক ঋণ পায় ২৫০০ টাকা। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল, পাঁচ একরের নীচে জোত জমি সম্পন্ন কৃষকরা 'সরাসরি কৃষি ঋণ' প্রকল্পের তালিকায় অর্দ্ধেক জায়গা অধিকার করে রয়েছে।

শাখা সম্প্রসারণ

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব করবার প্রথম বছরে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকায় শাখা সম্প্রসারণের যে বিপুল উদ্যম দেখা গিয়েছিল, দ্বিতীয় বছরেও সেই উৎসাহ ও উদ্যম অব্যাহত আছে। হিসেব করলে দেখা যাবে ১৯৬৯ এর ১৯শে জুন থেকে ১৯৭১ ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত ৩,৪১৯টি শাখা খোলা হয়েছে। আর একটু খতিয়ে দেখলে জানা যাচ্ছে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের পরের দু'বছরে যেখানে শাখা সম্প্রসারণের কাজ হয়েছে গড়ে ১৯০০টি, সেক্ষেত্রে জাতীয়করণের আগের নয় বছরে শাখা সম্প্রসারণের কাজ হয়েছে গড়ে মাত্র ৩৬২টি করে। উপরোক্ত ৩,৪১৯টি নতুন শাখার মধ্যে ২,৯৩৪টি শাখা উদ্বোধন করেছে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি। অধিকন্তু ৭০ শতাংশ ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে এমন সব পল্লী অঞ্চলে যেখানে ব্যাঙ্কের কাজকারবার আগে কখনও চালু ছিল না।

লীড্ ব্যাঙ্ক প্রকল্প

এবছরের হিসেবের খতিয়ানে জানা যাচ্ছে লীড্ ব্যাঙ্ক প্রকল্পটির সমীক্ষার কাজে প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। যেসব ব্যাঙ্ককে লীড্ ব্যাঙ্ক প্রকল্পের অন্তর্গত জেলা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল তারা ইতিমধ্যে ১২৫টি সমীক্ষা-প্রতিবেদন পেশ করেছে। ১৯৭১ সালের শেষাশেষি আরও ৭৫টি প্রতিবেদন আশা করা হচ্ছে। এইসব প্রতিবেদন অনুসারে কিছু কিছু কাজ করাও আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে লীড্ ব্যাঙ্কগুলির সমীক্ষায় যেসব জায়গা উন্নয়নক্ষম এবং যেসব অঞ্চলে ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধা আগে পাওয়া যায়নি কিন্তু বর্তমানের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে থাকা বাঞ্ছনীয় বলে আলাদা করে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, ১৯৭১ সালে বিশেষ করে সে সব অঞ্চলেই ব্যাঙ্ক সম্প্রসারণের কাজ আরও জোরদার করে তোলবার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মাদ্রাজ, কলকাতা, পাটনা, ভূপাল এবং নয়া দিল্লীতে কতকগুলি সভাও আহ্বান করা হয়েছিল। এসব সভায় স্থির করা হয়, ১৯৭১ এবং ১৯৭২ এর কয়েক মাসের মধ্যেই ১,৩০০টি নতুন শাখা খোলা হবে এবং এর মধ্যে ১,২০০টি খোলা হবে এমন সব অঞ্চলে যেখানে আজও ব্যাঙ্কের কাজ কারবার আরম্ভ হয়নি।

রাস্তাঘাট সংস্কারে ৫০ লক্ষ টাকা

কলিকাতা পৌর উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্গত হলদিয়া জেলার ১০টি পৌর অঞ্চলে রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই কাজে ১৯৭০-৭১ সালের জন্য কলিকাতা পৌর উন্নয়ন প্রকল্প ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। এ বছরের শেষাশেষি কাজটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ভারতের পশমজাত জিনিসপত্র রপ্তানির সর্বকালীন রেকর্ড

১৯৭১ সালের আর্থিক বছরের শেষ অবধি ভারতীয় পশম ও পশম জাত জিনিস পত্রের রপ্তানি সর্বকালীন রেকর্ড প্রায় ৩০ কোটি টাকার কোঠায় পৌঁছায়। তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালের চেয়ে এই রপ্তানি ৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা বেশী। শতকরা হিসেবে রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ১২ ৫৪ ভাগ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এবারের রপ্তানি গত বছরের এ জাতীয় রপ্তানির চাইতে ৫০ শতাংশেরও বেশী।

এখন দেখা যাক কোন কোন ক্ষেত্রের জন্য এই সাফল্য। গত কয়েক বছর যাবৎ যে সব নতুন পশম শিল্প দ্রুত উন্নতি করেছে, রপ্তানি বৃদ্ধি অভিযানে তাদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। যথা—পশমী, আধা পশমী বস্ত্র, তা দিয়ে তৈরী পোষাক পরিচ্ছদ এবং পশ্মী, ও আধা পশ্মী হোসিয়ারী সামগ্রী। প্রকৃতপক্ষে এই সব ক্ষেত্রের বিশেষ করে হোসিয়ারী দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানীর ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব সাফল্য হয়েছে তার ফলে রপ্তানির ক্ষেত্রে কম বেশী-যে মন্দা দেখা দিয়েছিল, তা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

সুতরাং, পশমজাত জিনিসপত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে হোসিয়ারীর এখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ১৯৬৯-৭০ সালের সাময়িক বিপর্যয় দূর করতে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তা অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হয়েছে। অথচ এই শিল্পকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে—দীর্ঘ দিনের উৎপাদন অভিজ্ঞতার অভাব, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সীমাবদ্ধতায় এক্তিয়ারভুক্ত থাকা, প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের ব্যাপারে পুরোপুরি আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা, বিশ্বের সর্বাধুনিক বাজারগুলিতে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়া এবং আভ্যন্তরীণ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাধীনে কাজ করা, প্রভৃতি। এসব বিবেচনা ক'রে দেখলে এই শিল্পের কৃতিত্ব প্রকৃতই উল্লেখযোগ্য।

তালিকায় এর পরেই স্থান পশ্মী বা পশম মিশ্রিত বা আধা পশমী বস্ত্র শিল্পের। এই শিল্পে প্রতিযোগিতা সব চেয়ে বেশী। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পোষাক পরিচ্ছদের রপ্তানি হ্রাস পেলেও, পশম পণ্যে সামগ্রিক ভাবে রপ্তানির ঊর্ধমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে।

এবছর পশম ও পশমজাত জিনিস পত্র রপ্তানির পরিসংখ্যান নীচে দেখানো হোল :

চিরাচরিত পণ্য তালিক বহির্ভূত সামগ্রী

পশমী বস্ত্র : ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় এ বছর ৮১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকার বা ৪০.১৮ শতাংশ বেশী পশম কাপড় রপ্তানি হয়েছে। যে সব দেশে রপ্তানির লক্ষণীয় বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলি হং-কং (২৪ ২০ লক্ষ), সিঙ্গাপুর ৩৮ ২৯ লক্ষ, জাম্বিয়া ১২.৩৫ লক্ষ এবং সুইডেন ২.২১ লক্ষ টাকার; বেলজিয়াম ও হাঙ্গেরী ভারতীয় পশমী বস্ত্রের নতুন ক্রেতা রূপে দেখা দিয়েছে।

এইসব স্থানে উল্লেখযোগ্য ভাবে রপ্তানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে দেশগুলির বাজারে বিক্রয় কমে গিয়েছে তার মধ্যে আছে ক্যানাডা ৪ ৯৯ লক্ষ, চেকোস্লোভাকিয়া

(লক্ষ টাকার হিসেবে)

	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১
কাঁচা পশম	৪১১ ৩০	৩৭৪'৬৭
নিকৃষ্ট পশম, ছাঁট কাট	০'৬১	১ ০৬
এবং পরিত্যাক্ত অংশ উৎকৃষ্ট পশম	৫'৯২	৮'৬৭
বোনার পশম	০'০৭	— — —
উর্স্টেড এবং আধা পশমী বস্ত্র	২০১ ৩৫	২৮৫'০৬
তৈরীপশমী পোষাক	২৬৮ ০০	২২১'০০
পশমী হোসিয়ারী	৫১৭'৫১	১০৫০'৪১
পশমী কম্বল	৩৮'৬৯	৫১'১০
" শাল	৪৭'২৭	২৬'৯৭
কার্পেট, ড্রাগেট এবং নামদা	১১১২'৮৮	৯৮৯'১১
মোট—(কোটি টাকার অঙ্কে)	২৬'৪৮	২৯'৮০

১৪.৫৪ লক্ষ, ডেনমার্ক ৩.৩৪ লক্ষ, বৃটেন ১০.৪৫ লক্ষ, দক্ষিণ ইয়েমেন সাধারণতন্ত্র ৭.৪৫ লক্ষ, এবং তাঞ্জানিয়া ১৬.২১ লক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গরম কাপড়ের রপ্তানি মোটামুটি এক রকম—অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার মতই রয়েছে।

তৈরী পোষাকের রপ্তানি ৪০ লক্ষ টাকার মত কমে গেলেও ১৯৬৮-৯ সালে পৌঁছন ২ কোটি টাকার মাত্রা এখনও বজায় আছে। অন্যান্য স্থানে রপ্তানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও সোভিয়েট ইউনিয়নে রপ্তানি প্রায় পুরোপুরি সে ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখছে।

হোসিয়ারী

১৯৭০-৭১ সালে হোসিয়ারী দ্রব্য রপ্তানি করে মোট আয় হয়েছে ১০ কোটি ৫ লক্ষ টাকা যা এক রেকর্ড বলা চলে। তার আগের বছর এই খাতে আয় হয় ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। তা হলে দেখা যাচ্ছে এক বছরে রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে।

আমাদের রপ্তানির প্রধান স্থান সোভিয়েট ইউনিয়ন। সেখানে রপ্তানি তিনগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই কোটি ৬০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে এখন রপ্তানির পরিমাণ সেখানে ৯ কোটি টাকারও বেশী। এর তুলনায় কয়েকটি দেশে রপ্তানি কিছু কম হয়েছে বই-কি। এই ব্যবধান নজরে পড়ে আমাদের অন্য প্রধান ক্রেতা দেশগুলির মধ্যে,চেকোস্লোভাকিয়ার—১১০.৮৯, বাহারিণ ৫১ লক্ষ, হংকং ১৩.৭৩ লক্ষ, দক্ষিণ ইয়েমেন সাধারণতন্ত্র ১১ ৪১ লক্ষ, জাম্বিয়ার ক্ষেত্রে অবস্থা আদৌ সুবিধাজনক নয়। মালয়েশিয়ায় সামান্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ১.৬০ লক্ষ টাকা।

চিরাচরিত ও অন্যান্য পণ্য

কার্পেট, ড্রাগেট এবং মাদুর—১৯৬৯-৭০ সালে কার্পেট রপ্তানি ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার অঙ্কে পৌঁছায়, কিন্তু এ বছর তার পরিমাণ ১৪৩.৭৭ লক্ষ টাকা বা ১৪.৬৯ শতাংশের মত হ্রাস পেয়েছে। প্রধান প্রধান আমদানীকারী যেসব দেশে বড় রকমের রপ্তানি ঘাটতি দেখা গেছে, তার মধ্যে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০৮.০৩ লক্ষ, ক্যানাডা ৮৬.০৮ লক্ষ, বৃটেন ১৩.৬২ লক্ষ, সুইডেন ৪ ৬২ লক্ষ, এবং ডেনমার্ক ৩.১৩ লক্ষ। এর বিপরীত হিসেবে অন্য কয়েকটি বড় দেশে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে, যেমন পশ্চিম জার্মানী ৫৮'৩১ লক্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ৯.৭৪ লক্ষ, বেলজিয়াম ৬ ৯১ লক্ষ, নেদারল্যাণ্ড ১২.১০ লক্ষ এবং সুইটজারল্যাণ্ড ৩.১৪ লক্ষ টাকা।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে কলকাতা বন্দরের কাজ কর্ম বন্ধ থাকায় জাহাজে মাল বোঝাই কম হয়েছে। এই অবস্থার ফলে পশমী কার্পেট রপ্তানিতে ঘাটতি দেখা দেয়।

কাঁচা পশম

১৯৭০ সালে কাঁচা পশমের রপ্তানি ৩৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা অথবা ৯.৩৫ শতাংশ কম হয়েছে। গালিচা বোনার পশমের প্রধান আন্তর্জাতিক বাজারগুলিতে সাধারণ ভাবে যে মন্দা দেখা দেয়, তার দরুণই অবস্থা এ-রকম দাঁড়ায়।

প্রধান প্রধান যে সব দেশের বাজারে বিশেষভাবে এই ক্ষতি চোখে পড়ছে সেগুলি হল যথাক্রমে, বেলজিয়াম ৭.৯৭ লক্ষ, ফ্রান্স ৯.০৮ এবং বৃটেন ৭২.৪১ লক্ষ টাকা। তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রচুর পরিমানে ভারতীয় কাঁচা পশম আমদানি করেছে। পর্যালোচনাকালীন হিসেবে প্রকাশ ওই সময়ের মধ্যে ২৯৭.৫৮ লক্ষ টাকার বেশী পশম সে দেশে রপ্তানি করা হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে এই রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৫৮.৯২ লক্ষ টাকা।

এ দুটি জিনিসের ক্ষেত্রেও চলতি আর্থিক বছরে আগের বছরের তুলনায় রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। [illegible] দিক পরিমাণ যোগ যথাক্রমে ১৭.৩৬ লক্ষ এবং ২০.৩০ লক্ষ টাকা।

এগিয়ে চলেছে ইউনিট ট্রাস্ট

সাত বছরের কর্মমুখর জীবনে ইউনিট ট্রাস্ট জাতীয় সঞ্চয় সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য নজীর রেখেছে। এই সাত বছরে ইউনিট হোল্ডারদের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিনগুণ ১,৩১,৫৭৪ থেকে ৩,০০,০০০ এবং সঞ্চয় বেড়েছে পাঁচগুণ—১৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা থেকে ৯২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকায়।

সঞ্চয় অভিযানকে আরো জোরদার করে তোলবার জন্য বছর বছর লভ্যাংশ বিতরণের হার বাড়ানো হয়েছে। এবারের লভ্যাংশ বিতরণের সংবাদ ৮ শতাংশ। এ পর্যন্ত বিতরণের হারে এটিই সবচেয়ে বেশী।

গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ

এ বছরের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত দেশের ১.০৫ লক্ষ গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা গেছে। আসছে বছরের মার্চমাসের মধ্যে আরও ১৮ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করা যায়। এ বছরের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ পাম্পসেট অথবা নলকূপ বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে আরও ৩.৬৪ লক্ষ পাম্পসেট অথবা নলকূপ বৈদ্যুতিকরণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কয়েকটি প্রদেশে ১৯৭০ এর মার্চ পর্যন্ত বৈদ্যুতিকরণের খতিয়ান নিচে দেওয়া হোল:

প্রদেশ	বিদ্যুৎপ্রাপ্ত গ্রাম	পাম্প/টিউবওয়েল সেট বৈদ্যুতিকরণ
মহারাষ্ট্র	১২,১৪৫	২,১১,৬৭৯
তামিল নাড়	১১,২৪৬	৫,৩০,০০২
হরিয়াণা	৬,৬৬৯	৮৬,৪২৬
পশ্চিমবঙ্গ	২,৯৬৬	১,৫৬১

ঘর থেকে দূরে—আর এক ঘর

মানা শরণার্থী শিবির

সুভাষ বসু

কোলকাতা থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরে মধ্য প্রদেশের এক গ্রাম মানা। সম্প্রতি পূর্ববাংলা থেকে ছিন্নমূল ৮৫.২০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে মানা আবার জনমনের পাদ প্রদীপে এসেছে। অবশ্য এরা আশ্রয় নিয়েছে অস্থায়ী ভাবে। স্বদেশে ফিরে যাবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলেই এরা ফিরে যাবে তাদের স্বগৃহে।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রক মানায় যে সব শিবির স্থাপন করেছেন পশ্চিম বঙ্গের বারাসত, বসিরহাট, হাসনাবাদ এবং বনগাঁর ত্রাণ শিবির ও অভ্যর্থনা কেন্দ্রগুলি থেকে শরণার্থীদের সেখানে পাঠানো হয়। পাঠানো হয় বিমান এবং ট্রেনযোগে। পূর্ববাংলা থেকে আগত বাস্তুত্যাগীদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপক সুবন্দোবস্ত মানায় রয়েছে।

১৯৬৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী মানায় এই শরণার্থী শিবিরগুলি স্থাপিত হয়। এগুলি ট্রানসিট্ সেন্টার বা অস্থায়ী কেন্দ্ররূপে বেশী পরিচিত। পূর্বপাকিস্তান থেকে তখন বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মতো উদ্বাস্তু আগমনে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সরকার তার মোকাবিলায় যে সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এটি তারই একটি। এবং তখন থেকে মানা প্রশংসনীয় ভাবে সংখ্যাহীন বাস্তুহারাকে আশ্রয় দিয়ে আসছে। আর এর মধ্যে দিয়ে মানা নিজেও রূপান্তরিত হয়ে গেছে, আত্মপ্রকাশ করেছে নতুন রূপে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের সৈন্যদের কতকগুলি পরিত্যক্ত ছাউনী কয়েকটা ব্যারাক, ছোটখাটো একটা সামরিক বিমান অবতরণ ক্ষেত্র এবং কৃষি নির্ভর ৫০টি কৃষিজীবি পরিবার— ১৯৫৮ সালের আগে, রায়পুরের ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত মানার এই ছিল গোড়ার ইতিহাস। ১৯৫৮ সালের পর যখন দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের কাজ সুরু হল, তখন যুদ্ধকালীন এইসব পরিত্যক্ত ছাউনী এবং ব্যারাকগুলোকে বাস্তুত্যাগীদের অভ্যর্থনা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পশ্চিম বাংলার ত্রাণ শিবিরে অবস্থানরত উদ্বাস্তুদের একটা সুবিন্যস্ত সূচী অনুযায়ী দণ্ডকারণ্যে নিয়ে আসা হয় স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য।

১৯৬৪ সালের প্রথমদিকে হঠাৎ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু—আগমন সুরু হোল। এত ব্যাপক সে আগমন যে কর্তৃপক্ষকে মানায় এবং তার আশেপাশে চারটি বড় শিবির স্থাপন করতে হোল। আশ্রয় পেল লাখখানেক লোক। কিন্তু এই সংখ্যা উদ্বাস্তু প্রয়োজনের তুলনায় দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের সব কল্যাণমূলক ব্যবস্থাই অপ্রতুল মনে হোল। বিশেষ করে পানীয় জল ও সুচিকিৎসার অভাব প্রকটভাবে দেখা দিল।

১৯৬৪ সালের শেষাশেষি মানায় উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত কিছুটা স্তিমিত হলো। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরও ট্রানসিট্ কেন্দ্রগুলির দায়িত্বভার গ্রহণে এগিয়ে এলো। মানার জন্য আরো অর্থের সংস্থান হোল, সংগে সংগে অবস্থার উন্নতিও দেখা দিল। ১৯৬৮ সালের শেষাশেষি ৩৫৮ একর জায়গা জুড়ে মানা শিবির দেখতে দেখতে একটা সুন্দর পরিকল্পিত কলোনীতে পরিণত হোল। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী দেখে বলার উপায় রইলোনা এগুলি উদ্বাস্তু শিবির।

এরপর, ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আবার উদ্বাস্তু আসা সুরু হোল।

মানায় কারিগরি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বহু উৎসাহী শরণার্থীকে কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়। ছবিতে একজন কর্মীকে মেশিনে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে

একই ভাবে অবশ্য এবারে কর্তৃপক্ষকে ততটা সংকটে পড়তে হোল না। কেন্দ্রীতে ৫০০ পরিবারকে আশ্রয় দেবার জন্য খোলা হোল একটা নতুন শিবির। সম্প্রতি শিবিরটিকে ১২ হাজার শরণার্থী থাকার উপোযোগী করে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এ ছাড়া মানার কাছে মানাবাস্তায় আর একটি শিবির খোলা হোল। এতে থাকার ব্যবস্থা হোল ২৩ হাজার শরণার্থীর এবং মানা, কুরুদ এবং গাওয়াগাঁর শিবিরগুলিকেও যথেষ্ট সম্প্রসারিত করা হোল। সব শিবিরে প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার লোকের আশ্রয় দানের ব্যবস্থা হোল। তবে কিছু দিন থাকার পর বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে পুনর্বাসনের জন্য অন্যান্য ১১টা রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। মানাকে কেন্দ্র করে যে পাঁচটি শিবির গড়ে উঠেছে। তার দেখাশুনার দায়িত্ব রয়েছে ১৯০০ অফিসার এবং কর্মীদের উপর। এঁদের বেশীর ভাগই [illegible] বাস্তুহারা।

পানীয় জলের অভাব, এখানকার একটা দীর্ঘকালীন সমস্যা। যদিও এই সমস্যা দূর করার জন্য নানারকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেমন, কলোনীতে ১৫০টি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে এবং শিবির কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন নলকূপ বসানোর কাজ হাতে নিয়েছেন। মানার শরণার্থীদের চিকিৎসা করা হয় বিনামূল্যে। এর জন্য ২৮ জন ডাক্তার এবং ২৫০ জন নার্স ও কর্মী রয়েছেন। একাধিক ডিস্পেনসারী ছাড়াও এইসব কলোনীতে চারটি হাসপাতাল রয়েছে। মোট শয্যা সংখ্যা ২২৫। নবাগত শরণার্থীদের ১০০ শয্যা—বিশিষ্ট আর একটি অস্থায়ী হাসপাতালও স্থাপন করা হয়েছে। আর রয়েছে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক একটি সুসজ্জিত মেডিক্যাল শাখা। কলোনীতে কখনও মহামারী দেখা দিতে পারেনি। বাসিন্দাদের গড় স্বাস্থ্য ভাল। এখানকার মৃত্যু হার জাতীয় মৃত্যুহারের তুলনায় অনেক

মানা শিবিরের অন্য একটি কর্মচঞ্চল শাখায় পুনর্বাসিত মহিলারা সেলাই কাজে ব্যস্ত। এই শাখায় নিযুক্ত ১৩০ জন কর্মীকে দৈনিক পাঁচ টাকা বেতন দেওয়া হয়

কম। ঘাটতির হার ৫.৯ ভাগ। পরিবার পরিকল্পনার সৌজন্যে জন্মহারও কম— হাজারে মাত্র ১২.৪৯ জন। এখানকার অন্যতম সমস্যা হোল বেকার সমস্যা। ২১ হাজারের মত পুরোনো উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে ১১৫৪ জনই হচ্ছেন অকৃষিজীবি—যেমন, শিক্ষক ব্যবসায়ী ইত্যাদি। অপর ২৪৩০টি পরিবার হোল সরকারের চিরস্থায়ী বোঝা। কারণ এই সব পরিবারে রোজগারের উপযুক্ত কেউই নেই—সকলেই নাবালক। বাদবাকী ১৭,৩০০টি পরিবার কৃষিজীবি; কাজেই এদের পাকাপাকি পুনর্বাসনের জন্য জমির প্রয়োজন। অথচ উপযুক্ত জমি পাওয়া মুশকিল। কাজেই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের শিল্পে নিয়োগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

একটা মোটামুটি হিসেব অনুযায়ী সরকার গত তিন বছরে এই অস্থায়ী কেন্দ্রগুলির জন্য ব্যয় করেছেন ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ডোল, রাশন, চিকিৎসা এবং অন্যান্য ব্যয় মিলিয়ে মাথাপিছু বছরে খরচ হচ্ছে ৩৬০ টাকার মতো। কাজেই এদের কাজে লাগানোর একটা নিরন্তর চেষ্টা চলেছে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষক, গ্রামসেবক কেরাণী এবং অন্যান্য পদে কাজ দেওয়া হয়েছে।

পর্যায়ক্রমে অনেক অকৃষিজীবি শ্রমিক হিসেবে কাজ পায় এবং ২০০০ জনকে কর্ম বিনিয়োগ সংস্থার মাধ্যমে হিন্দুস্তান ইস্পাত কারখানা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন, হেভী ইলেকট্রিক্যালস্, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ প্রভৃতিতে চাকরী দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও ১৫৭০ জন এখনও চাকরী পায়নি। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষও বিভিন্ন কর্মমুখী পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছেন যেমন, হোসিয়ারী, জুতো তৈরী, বই বাঁধানোর কাজ ইত্যাদি।

সরকারী সাহায্যে মানার পুরোনো উদ্বাস্তুরা প্রায় ৪০০ মত দোকানপাট খুলে বেশ জমজমাট একটা বাজার তৈরী করেছেন। প্রতিদিন কম করেও কয়েক হাজার টাকার বেচাকেনা হয়। ভাবতে অবাক লাগে কয়েকবছর আগে কপর্দক শূন্য হয়ে শুধুমাত্র উপরে খোলা আকাশ এবং নীচে মাটি আশ্রয় করে এঁরা ভারতে চলে এসে-

বৃদ্ধ বিনোদ বিহারী কীর্ত্তনিয়া বসে খেতে চান না। তাই তাকে দেওয়া হয়েছে হাল্কা ধরণের কাজ। তিনি বাদাম বেচেন মোড়া ইত্যাদি আর তার তদারক করে তার নাতি

ছিলেন। এর সাক্ষী সতীশ মণ্ডল নিজে। একদিন উদ্বাস্তু হয়ে এসে আজ তিনি সব থেকে অবস্থাপন্ন। শ্রীমণ্ডলের সখেদ উক্তি, "আমাদের ভাগ্য পরিবর্তনে, ভারতে এসে যা সাহায্য পেয়েছি, পাকিস্তানে তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতামনা। শিবিরের আরো ২০ জনের মত সতীশ বাবুও কোলকাতা, মৌরজেলা, চাটাপরে মাছ চালানের জমজমাট ব্যবসা শুরু করেছেন। পরিমল গোস্বামী কয়লা ও খনিজের কাজের এজেন্সী নিয়ে ১২ জন উদ্বাস্তুকে কাজ দিয়েছে। এ ছাড়া তিনি বাজারে কমার্শিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বা বাণিজ্যিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। এতে ৯০ জন ছেলেমেয়ে বাণিজ্য সংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

মানায় একটি শিল্প কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রে ছুতোরের কাজ, তাঁত বোনা, দর্জির কাজ, বাঁশের কাজ, এবং করাত কলের কাজে ৬৩০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এই শিল্পকেন্দ্রটি চালু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩০ লক্ষ টাকার জিনিষপত্র উৎপন্ন হয়েছে, যা থেকে নীট লাভ হয়েছে ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। মজুরী অথবা নিপুণতা অনুযায়ী প্রতিটি কর্মীর গড় আয় মাসিক ৭৫ টাকা থেকে ১৩৫ টাকা।

কার্পেন্টারি শাখার কর্মব্যস্ত পুনর্বাসিতদের চোখে নতুন দিনের আশা

মানায় ২ বছর আগে বয়স্ক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ৫০ জনের মত উদ্বাস্তু মহিলাকে অষ্টম মান পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে সীবন এবং হস্তশিল্পের কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ৫৮।

একই ভাবে অষ্টম মান পর্যন্ত শিক্ষা-প্রাপ্ত কম বয়েসী মেয়েদের সাহায্যকারী নার্সিং তথা ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২ বছর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এটি চালু হয় ১৯৬৭ সালে। এ পর্যন্ত ৪০ জন মেয়ে পাশ করেছে এবং ৪৩ জন বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণ করছে। প্রশি-ক্ষণ গ্রহণ কালে প্রত্যেক শিক্ষানবিশের জন্য শুধু বৃত্তি হিসাবে সরকার ২১০০ টাকা ব্যয় করেন।

উদ্বাস্তু যুবকদের বৃত্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৬৫ সালে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মানায় কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রের ২৪টি কারিগরী শাখায় ৫৭০ জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করতে পারে। সংলগ্ন হোস্টেলে ৫০০ জন ছাত্রের থাকার ব্যব-স্থাও রয়েছে। উত্তীর্ণ ছাত্রদের জাতীয় ট্রেড সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বর্মা ও সিংহল প্রত্যাগত ৩৭৮ জন ছাত্রসহ এ পর্যন্ত ২২৮০ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই চাকরীও পেয়েছে। বর্তমানে এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৩৭ জন। এদের মধ্যে তিনজন শরণার্থীও রয়েছে। বিভিন্ন ট্রেডে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী ছাত্রদের উচ্চ-প্রশিক্ষণ লাভের জন্য অন্যান্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

দুই বছরের এই কোর্সে সরকারকে প্রতিটি শিক্ষানবিশের জন্য ১০,০০০, টাকা ব্যয় করতে হয়। পরীক্ষার পাশের হার শতকরা ৯৫।

এই কেন্দ্রের দুটি শাখা। একটি হোম শিল্প-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অপরটি মোটর গাড়ী চালনা শিক্ষণ কেন্দ্র। প্রথমটিতে যেসব

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ছেড়ে আসা জীবনের যাতনা

সবার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক

ছোটখাট ব্যবসায়

কিছুদিন আগেও শ্রী অনিলের রোজের পেশা ছিল দোকান দোকান ঘুরে পাখা, সেলাই কল বিক্রী। কিন্তু মনের গোপনে তার বহুদিনের আশা, তিনি জলসেচের পাম্প তৈরীর একটা ছোট খাট কারখানা খুলবেন। তাই বড় আশা নিয়ে তিনি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বারাসত শাখায় গিয়ে তার পরিকল্পনার কথা খুলে বললেন। অবশ্য ব্যাঙ্ক তার প্রকল্পের উদ্দেশ্য জেনেও তাকে সোজাসুজি একটা পাম্প বানাবার কারখানা তৈরী করবার পরামর্শ না দিয়ে পাম্প ও কৃষি যন্ত্র মেরামতির একটা একটা ছোট দোকান খুলতে উৎসাহ দেয়। ব্যাঙ্কের পরামর্শ ও ২০ ০০০ টাকা ঋণ সম্বল করে ড্রিল, লেদ ও ছোটখাট সরঞ্জাম ক্রয় করে শ্রী ঘোষ তার দোকান উদ্বোধন করেন।

আজ শ্রীঘোষের হাতে কাজ কর্মের কোন অভাব নেই, নেই টাকা পয়সারও। তার দোকানে খাটছে পাঁচ জন কর্মী এবং অদূর ভবিষ্যতে তার কারবার সম্প্রসারণের কথা ভাবছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে ধন্যবাদ তারা, একজন উদ্যোগী পুরুষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ঐ অঞ্চলের লোকের মনে অনেক আশার সঞ্চার করেছেন।

পরিবহনে

পিতার মৃত্যুর পর শ্রীসমীর কান্তি মজুমদার ছয়জন পোষ্যের ভারে অগাধ জলে পড়েন। বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতক হওয়া সত্বেও চাকরির জন্য তাকে অনেক জায়গাতেই নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। অতঃপর তিনি অফিসে বসে টেবিল চেয়ারে কাজ করার চাইতে পরিবহন ব্যবসায় নেমে হাতে কলমে কাজ করতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু হাতে ছিল কর্মরত পিতার শেষ সম্বল মাত্র ৫০০০ টাকা ও নিজেদের একটি বাড়ী।

শ্রীমজুমদারের দৃঢ় মনোবল ও উদ্যমের আস্থা রেখে সরকারভিত্ত ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া তাকে ট্রাক কেনার সম্পূর্ণ মূল্য, ৫২,০০০ টাকা, ঋণ দেন। গত বছরের জানুয়ারী মাসে শ্রী মজুমদার ট্রাক কেনেন। এই ট্রাক এখন কলিয়ারি অঞ্চল, উত্তর বঙ্গ এবং আসামে মাল নিয়ে আসা যাওয়া করছে।

শ্রী মজুমদারের পরিবহন ব্যবসায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে এবং অনিরুদ্ধ এই কাজে মাসে মাসে তার আয় দাড়িয়েছে ২০০০ টাকা।

দর্জির কাজে

পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারা শ্রী বীরেন্দ্র নাথ হালদার কাজ করতেন বিরাটির এক দর্জির দোকানে। মাসাস্তে ১৫০ টাকায় আয়ে তার একূল দেখতে ওকূল ভাসে অবস্থা। তবে নিজের একটা ছোটখাট দোকান খুলে জামাকাপড় তৈরী করে পাইকারী বাজারে বিক্রী করতে পারবেন, এমন একটা শখ ছিল তার বহুদিনের।

অতঃপর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের অর্থানুকূল্যে শ্রীহালদার সেলাইকল ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য পান ৫,০০০ টাকা আর কাপড় ক্রয় বাবদ ঋণ পান আরও ২০,০০ টাকা।

শ্রী হালদারের আজকাল দু'হাত কাজে জোড়া। তিনি আজকাল শুধু পাইকারি বাজারের অর্ডার বুক করার কাজেই ব্যস্ত। সেলাই ফোঁড়াই ইত্যাদি যাবতীয় কাজে সহায়তা করছেন তার গৃহিণী এবং প্রতিবেশী কয়েকজন মহিলা। পাড়ার মহিলাদেরও অবসর সময়ে হাতের কাজে দু' পয়সা আয়ের পথ হয়েছে পাকা।

শরণার্থী ত্রাণে চিকিৎসা ব্যবস্থা

দুর্গত ও মুমূর্ষ শরণার্থীদের ত্রাণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যা কিছু ডাক্তারি সুবিধা সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা প্রশংসনীয় বলতে হয়। যেখানে সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে একজন ডাক্তার ৫,০০০ জনসাধারণের চিকিৎসার সুযোগ পান, সে অনুপাতে ৬,০০০ জন শরণার্থী পাচ্ছেন একজন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার সুযোগ। সাধারণ অসুখ বিসুখের চিকিৎসা জানেন এমন ডাক্তার ২৫০০ জন শরণার্থীর স্বাস্থ্য রক্ষার ভার নিয়েছেন।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে প্রায় সাড়ে পাঁচশ অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং প্রায় চৌদ্দ'শ সাধারণ ডাক্তার সেবার কাজ করে চলেছেন। শরণার্থীদের ভেতর থেকেই সওয়া দু'শ ডাক্তার এবং প্রায় সওয়া চার'শ সাধারণ ডাক্তার সেবার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তর, রেল দপ্তর ও কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক্তাররা শরণার্থী সেবার কাজে নিযুক্ত আছেন।

পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর রাজস্থান সরকারের কাছ থেকে পাওয়া ৪০০ শয্যার একটি চলমান হাসপাতালে শরণার্থীদের চিকিৎসার সব রকম সুযোগ সুবিধে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিম দিনাজপুরের অন্য হাসপাতালে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডাক্তাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ত্রাণ কাজে এগিয়ে এসেছেন। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে এসেছেন ৪ জন অভিজ্ঞ ডাক্তার ও ২১ জন সাধারণ ডাক্তার, হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড, রাঁচীর ন্যাশানাল কোল ডেভেলোপমেণ্ট কর্পোরেশন, বিহার ও উড়িষ্যার ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ। কেন্দ্রীয় সরকার আরও পঞ্চাশ জন ডাক্তারের একটি ব্যাচ পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়েছেন।

মানা শরণার্থী শিবির

১০ পৃষ্ঠার পর

বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তারমধ্যে সব-থেকে জনপ্রিয় হোল ট্রাক্টর, রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কণ্ডিশানিং ট্রেনিং। গত-বছর থেকে রেডিও এবং টেলিভিশান সংক্রান্ত দু'বছরের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

মোটর ড্রাইভিং ক্ষেত্রে ১৫ মাসের একটি কোর্সে মোটরগাড়ী চালনা এবং মোটর গাড়ী সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমন—অটো ইলেক্ট্রিক্স, টায়ার মেরামত, সার্ভিসিং ইত্যাদি।

বর্তমানে, মানার ৫টির মধ্যে ৪টি কলোনীতে পুনর্বাসন উদ্বাস্তু পরিবারের ৩১৮৫ জন মেয়ে এবং ৮৭৪০ জন ছেলে—১৫টি প্রাথমিক, ১টি মাধ্যমিক এবং একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশুনা করছে। মোটামুটি ভাবে প্রতি ৪০ জন ছাত্র ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একটি সুন্দর পাঠাগারও আছে।

স্কুলগুলিতে ত্রিভাষা সূত্র অনুসরণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে হিন্দী। অবশ্য বাংলা ও ইংরেজীকে আবশ্যিক ভাষারূপে গণ্য করা হয়। মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। সরকার প্রতি বছরে বই এবং অন্যান্য শিক্ষা বাবদ ব্যয় করেন, প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাপিছু ১১, টাকা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫১ টাকা। পরবর্তী শিক্ষার জন্য ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ২টি বড় হোষ্টেল রয়েছে—একটি ছেলেদের এবং একটি মেয়েদের। খেলা ধুলা প্রভৃতির জন্যও চমৎকার বন্দোবস্ত রয়েছে।

ছাত্রেরা প্রতিবছর মানার শিক্ষামূলক মেলার আয়োজন করে। এর থেকে যে টাকা সংগৃহীত হয় তা স্কুলের তহবিলে জমা করা হয়।

এইসব সুযোগ সুবিধা, যা পুরোনো উদ্বাস্তুরা ভোগ করছেন এবং তাঁদের চেষ্টা ও উদ্যম যে ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে—তা থেকে ১৯৭০ সালের নবাগত উদ্বাস্তুরা প্রেরণা পাবে। ১৯৬৪ সালে ঢাকা থেকে আগত বৃদ্ধ রায় মোহন দাস বলেন, "এহানে ভালো থাইক্যা পইর‍্যা আছি দেইখ্যা ওয়াগোর মনেও ভবিষ্যতের আশা জাগুসে। যখনই ওরা আশা নিরাশার দোলে, তখনি আমরা ওয়াগোরে উপদেশ দেই, উৎসাহ দেই।"

১৯৭০ সালেও এই আগমন শেষ হয়নি। ২৫শে মার্চ পূর্ববাংলায় পাকিস্তানি সামরিক অভিযানের ফলে লক্ষ লক্ষ স্ত্রী পুরুষ বাড়ী ঘর ত্যাগ করে আশ্রয়ের সন্ধানে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ৬৫ লক্ষ ইতিমধ্যেই চলে এসেছে, আর কত আসবে কে জানে। এরমধ্যে ৪৩ লক্ষ শরণার্থীকে পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ের শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। শরণার্থীদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চেষ্টা চলেছে। শিবির কর্তৃপক্ষ অষ্টপ্রহর চেষ্টার ত্রুটি করছেন না।

এইসব অস্থায়ী শিবিরের জন্য সরকারের ব্যয় প্রতি বছর অন্ততঃ পক্ষে আড়াই কোটি টাকা। যদিও স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতিতে এর একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। এইসব শিবির, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে ভোগ্য পণ্যের একটা সম্প্রসারণশালী ভালো বাজারে পরিণত হচ্ছে।

এই সব বাস্তুহারা পরিবার মধ্য প্রদেশের মানায় এসে পেয়েছে আশ্রয়, পেয়েছে শান্তি, পেয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির আলিঙ্গন।

হিন্দুস্তান জাহাজ তৈরীর কারখানা

এবছর হিন্দুস্তান জাহাজ তৈরীর কারখানায়, তিনটি মালবাহী জাহাজ যার ওজন হবে ৪০,৫০০ টন, প্রশিক্ষণ জাহাজ 'ভ্রাতৃভিদের' পরিবর্তে একটি নতুন প্রশিক্ষণ জাহাজ এবং একটি ড্রাই ইস্পাত ভেজার তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হবার কথা। এগুলির জন্যে মোট ব্যয় হবে আনুমানিক ১৪ কোটি টাকা।

১৯৭০-৭১ সালে এই কোম্পানীর বিশাখাপত্তনম কারখানায় ১২,৭০০ টনী দুটি মালবাহী জাহাজ তৈরী হয়। ঐ একই টনের আর একটি মালবাহী জাহাজ তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ প্রায়। ১৯৭০-৭১ সালে জাহাজ তৈরী ও মেরামত, মূলধনী এবং বিভাগীয় অন্যান্য কাজ বাবদ কারখানার মোট উৎপাদনী মূল্য ছিল ৯ ১৮ কোটি টাকা। এর আগের বছরে ঐ পরিমাণ ছিল ৬ ৯৯ কোটি টাকা।

ভরতপুর স্যাংচুয়ারি

রাজস্থানের ভরতপুরে অবস্থিত বন্য পক্ষীশালায় একটি ৩৬ কামরাযুক্ত রেস্ট্ হাউস বা বিশ্রামাবাস নির্মাণ করা হবে। এর জন্যে ব্যয় হবে ১২ লক্ষ টাকা। আসামের কাজিরাঙ্গা, গুজরাটের গির, মধ্য প্রদেশের কানহা এবং উত্তর প্রদেশের করবেট পার্কেও অনুরূপ রেস্ট হাউসের ব্যবস্থা করা হবে। এইসব স্থানে দর্শকগণ যাতে ভালভাবে বন্য জীবজন্তু দেখতে পান তার জন্যে ১২টি মিনি বাস সংগ্রহ করা হচ্চে।

দর্শকগণের সুবিধার্থে বিভিন্ন রাজ্যের বিভাগ গাইডদের প্রশিক্ষণের জন্যে একটি পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা ও করা হয়েছে।

তালচের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র

অশোক মুখোপাধ্যায়

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলেই শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করে। উড়িষ্যার তালচের তাপ—বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি এই রাজ্যের জন জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করবে।

উত্তর উড়িষ্যার তালচের কয়লাখনির নিকট অবস্থিত তালচের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ২৫০০ লক্ষ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। এই রাজ্যের অন্যান্য জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পের সহযোগিতায় এখান থেকে ঘরে ঘরে ও কারখানাগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। পার্শ্ববর্তী তালপুর রোড, কেন্দ্রপাড়া পারাদ্বীপ ও ভদ্রকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে। বর্তমানে এই স্থানগুলিতে নিচু ভোল্টেজের স্বল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ পরিবেশন করা হয়। তালচের বিদ্যুৎ হীরাকুদ ও মাচীকেন্দা জল বিদ্যুতের ক্ষীণ ভাণ্ডারেও শক্তি সঞ্চার করবে।

তালচের কেন্দ্র থেকে সব থেকে বেশী সুবিধা লাভ করছে এন সি. ডি. সি অর্থাৎ ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। এই সংস্থাটির কাজ হল তালচের কয়লাখনিকে বিভিন্ন কয়লা আশ্রিত শিল্প সমূহের প্রয়োজনে লাগানো। ২,১৯০ বর্গমাইল ব্যাপী কয়লা ক্ষেত্রের কিছু অংশ এন. সি ডি সি আবিষ্কার করেছে; সমগ্র কয়লা ভাণ্ডারের পরিমাণ হবে প্রায় ৩ লক্ষ টন। আগামী বহু বৎসরের জন্য এই পরিমাণ কয়লা—এখানের আশ্রিত শিল্পগুলির পক্ষে যথেষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যুৎ শক্তির প্রাচুর্যের ফলে নতুন শিল্পও গড়ে উঠেছে। তালচের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছাই তালপুর রোডের উপর ফেরোক্রোম ধাতুর কারখানাটি সম্প্রতি উড়িষ্যা মাইনিং ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কর্তৃক তৈরী হয়ে উঠেছে। এখান থেকে বছরে ১০,০০০ টন ধাতব ক্রোম প্রস্তুত হচ্ছে। প্রথম বছরের উৎপাদনেই এই প্রকল্পে ৯০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের উন্নতি উড়িষ্যার নতুন। ১৯৪৫ সালে প্রায় ৩০০ কিলোওয়াট দিয়ে শুরু হয়েছিল, হীরাকুদ বাঁধ প্রকল্প ও তালচের তাপ—বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পর উড়িষ্যার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫৫৪ মেগাওয়াট দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়নের যুক্তরাষ্ট্রীয় এজেন্সী (USAID) তালচের বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য মোট ২১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাহায্য দিয়েছে। হীরাকুঁদ বাঁধ প্রকল্পটি তৈরী হয়েছে শান্তির জন্যে খাদ্য পরিকল্পনা (পি এল ৪৮০) থেকে ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার ঋণের সাহায্যে। ২৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে সক্ষম এই প্রকল্পের সাহায্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ কার্যের সুবিধা হবে।

হীরাকুঁদে একটি অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, ব্রজ রাজনগরে একটি কাগজ কল, রাজগাঙ্গপুরে একটি সিমেন্ট কারখানা এবং জোড়ায় একটি ফেরো-ম্যাঙ্গানীজ কারখানা ব্যক্তিগত মালিকানায় গড়ে উঠেছে। এছাড়া, উড়িষ্যার সবচেয়ে বড় ইস্পাত কারখানার উপজাত সামগ্রী থেকে নানা রকমের সার প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। কস্টিক সোডা কারখানা থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ক্লোরিন বীজাণু নাশক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে। উড়িষ্যার বনজ সম্পদের জন্য কার্ডবোর্ড প্রস্তুতের সম্ভাবনাও আছে।

এইসব ছোট বড় শিল্পের সমাহার ও প্রচুর পরিমাণ খনিজ সম্পদের জন্য উড়িষ্যা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে। রাজ্যের বৈদ্যুতিক শক্তির উন্নতি এ ব্যাপারে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

কোলকাতায় জল সরবরাহের নতুন প্রকল্প

কলকাতা পৌর উন্নয়ন সংস্থা শহর ও শহরাঞ্চলের মিউনিসিপ্যাল এবং মিউনিসিপ্যাল এলাকা বহির্ভূত অঞ্চলে জল সরবরাহের জন্যে ৯টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর জন্যে মোট ব্যয় হবে এক কোটি টাকার ওপর। ১৯৭২-৭৩ সালে প্রকল্পগুলির কাজ সমাপ্ত হবার কথা।

এর মধ্যে ৬টি প্রকল্পের দ্বারা নিবরা, জোমা, বাঁকড়া, উনসানি, মানিকপুর ও সাঁত্রাগাছি এলাকার প্রায় ১.৭ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হবেন এবং মাথা পিছু ৯০ লিটার পানীয় জল পাওয়া যাবে। অবশিষ্ট তিনটি প্রকল্পের দ্বারা বালি, কোন্নগর এবং চম্পাদানী মিউনিসিপ্যাল এলাকায় জল সরবরাহ আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কলকাতা পৌর উন্নয়ন সংস্থা শহরের অ-মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মাথা পিছু অন্ততঃ ৯০ লিটার পানীয় জল সরবরাহের জন্যে ৬০০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৭১-৭২ সালের জন্যেই কেবল ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন।

যেসব মিউনিসিপ্যাল এলাকায় জল সরবরাহ ব্যবস্থা ৬/৭ বছর আগে নতুন করে শুরু করা হয় অথবা পুরাতন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয় সেইসব এলাকায় ইতিমধ্যে যে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে তা মেটাবার জন্যে উন্নয়ন সংস্থা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। ১৯৭১-৭২ সালে এই সব প্রকল্পের জন্যে ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পর্যটন—একটি শিল্প

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত দশকে সারা পৃথিবীতে পর্যটনের গুরুত্ব অসাধারণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যটনকে এখন পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প বললেও অত্যুক্তি হয়না। এই শিল্প আমাদের বহু বাঞ্ছিত বৈদেশিক মুদ্রাও এনে দেয়। ১৯৭০ সালে আমাদের দেশে প্রায় ২,৮১,০০০ ভ্রমণকারী এসেছিলেন এবং এর দরুণ আমাদের উপার্জন হয়েছিল ৩৭ কোটি টাকা। কিন্তু এ সত্ত্বেও সারা বিশ্বের পর্যটন শিল্পে আমাদের অংশ খুবই নগণ্য। যুগোশ্লাভিয়ার মত ছোট দেশ যার লোকসংখ্যা মাত্র ৩ কোটি, সেখানেও প্রতি বছর প্রায় ২ কোটি ভ্রমণকারী যাতায়াত করে থাকেন। গত বৎসর যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাতে দেখা যায় যে, প্রতি হাজার জন বিশ্বপর্যটকের মধ্যে মাত্র একজন ভারতে পদার্পণ করেছেন। সীমাহীন তরঙ্গ বেষ্টিত এবং অসংখ্য গিরিপর্বত নদী বন সমন্বিত বিশাল ও বৈচিত্রময় ভারতের কাছে এই চিত্র নিশ্চয়ই সুখপ্রদ নয়। অথচ ভারতের দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও ভাস্কর্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বিদেশীয় পর্যটকের কাছে এক বিরাট বিস্ময়। এই আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হলে পর্যটন শিল্পকে যথোচিত মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এজন্য এই মুহূর্তে আমাদের উচিত যোগাযোগ ও পরিবহনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং যথেষ্ট আধুনিক কেতার হোটেল নির্মাণ করা।

ভারতে প্রায় ৩৬,০০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ এবং প্রায় ২৫,০০০ মাইল বিস্তৃত আকাশ পরিবহন ব্যবস্থা আছে। গত দশ বছরে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থারও বিপুল উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটেছে। দেশের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানেই আকাশ, রেল ও সড়ক পথে যাতায়াত করা যায়। বিদেশী পর্যটকদের সুবিধার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেল কোচ এবং বাসেরও ব্যবস্থা আছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত ১৬৩টি হোটেলে প্রায় ৯১০০টি ঘর আছে যেখানে বিদেশী ভ্রমণকারীদের থাকার আধুনিক ব্যবস্থা আছে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৭৩ সালের মধ্যে ভারতে ভ্রমণকারীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় চার লক্ষে। এই বিপুল সংখ্যক ভ্রমণকারীর থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হলে আরও অন্ততঃ ১০,০০০ হোটেল ঘরের প্রয়োজন হবে। ভারত সরকার ঘোষণা করেছেন ১৯৭২ সালের মধ্যে আরও অন্ততঃ ৯০০০ নতুন হোটেল ঘরের নির্মাণে তাঁরা উদ্যোগী হবেন। ইতি মধ্যেই এয়ার ইণ্ডিয়া বোম্বাইয়ে দুটি হোটেল নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে। এছাড়া হোটেল নির্মাণে উৎসাহ দেবার জন্য ঋণ দেবারও ব্যবস্থা হয়েছে। বাঙ্গালোরে নবনির্মিত অশোকা হোটেলের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি ঠিকই বলেছেন যে, ৭০ দশকে ভারতীয় পর্যটন শিল্পের প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন থাকার স্থান সংকুলান তা সে হোটেলেই হোক বা রেল, বাস বা প্লেনেই হোক।

ভারতে দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির মধ্যে পুরাকীর্তি এবং প্রাচীন কীর্তিগুলি রক্ষণাবেক্ষনের ভার ভারতের পুরাতত্ত্ব সমীক্ষা সংস্থার উপর ন্যস্ত। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এদেশের সুবিস্তৃত বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী। বহু বিচিত্র জীবজন্তুর লীলাভূমি ভারতীয় বনগুলি যুগ যুগ ধরে মানুষকে প্রলুব্ধ করে এসেছে। স্বাভাবিক পরিবেশে হিংস্র জীব জন্তুর জীবন যাত্রা পর্যবেক্ষণ করা ভ্রমণকারীদের কাছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। পর্যটকদের সুবিধার জন্য উপরোক্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে শিক্ষিত ও বিদেশী ভাষায় পারদর্শী গাইডের ব্যবস্থা আছে।

ভ্রমণকারীদের সুযোগ সুবিধার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে পর্যটন শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার পর্যটন উন্নয়ন সংস্থা গঠন করেছেন। এই সংস্থার কর্মোদ্যোগের মধ্যে রয়েছে হোটেল নির্মাণ, পরিবহনের সুব্যবস্থা, নিঃশুল্ক দোকানের সুবিধা এবং নানাবিধ আমোদ প্রমোদের আয়োজন। এই সংস্থা পর্যটন দপ্তর, এয়ার ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স এবং অন্যান্য কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যস্ত। এছাড়া ভারতের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরগুলির উন্নতি সাধনের জন্য ইণ্ডিয়ান এয়ারপোর্ট অথরিটি নামে একটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাবও মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করেছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরগুলি, অর্থাৎ কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ, পর্যটন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়নের ব্যাপারে ক্রমশই বেশী গুরুত্ব লাভ করেছে। আগামী বৎসরগুলিতে আমাদের দেশে পর্যটকদের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পাবে এবং সেজন্য জেট চালিত বিরাট আকারের এবং উন্নত ধরনের বিমান পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সম্বন্ধে যাবতীয় দায়িত্ব এই নতুন সংস্থার উপর ন্যস্ত হবে। সম্প্রতি এয়ার ইণ্ডিয়া দুটি জাম্বো জেট বিমান ক্রয় করেছেন। একটি বোম্বাই থেকে বিদেশের পথে পাড়ি দিচ্ছে।

সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্পে এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করছে। সম্প্রতি নির্মিত তেহেরান থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ৪,২৫০ মাইল দীর্ঘ 'এশিয়ান হাইওয়ে' ভারতের উপর দিয়ে চলে

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

সংবাদ পরিক্রমা

প্রতিবেদক

দার্জিলিং

সম্প্রতি দার্জিলিং জেলায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের দার্জিলিং শাখার উদ্বোধন হয়। বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার উত্তরাঞ্চলের কৃষিজীবিদের কৃষি সংক্রান্ত ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের জন্যে ১৯৫৮ সালে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি স্থাপিত হয়েছিল। গত বছর এই ব্যাংক দুই লক্ষ টাকা সরকারি সাহায্য পায়, এ বছর ৪ ৬ লক্ষ টাকা পাবার আশা আছে। রিজার্ভ ব্যাংকও এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শেয়ারীকৃত মূলধনে অংশ গ্রহণ করে ব্যাংকটিকে আর্থিক সাহায্য দানের কথা বিবেচনা করে দেখছে।

এই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী কৃষি-ঋণ বাবদ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা লগ্নী করার জন্যে সম্প্রতি একটি উৎপাদন মূলক কর্মসূচী রচনা করেছে। এর মধ্যে ৪লক্ষ ২৭ হাজার টাকা সম্বন্ধীকৃত বিভিন্ন সমবায় সমিতির মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়েছে এবং আরও আড়াই লক্ষ টাকা মধ্য মেয়াদী (Medium term) কৃষি ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, স্থানীয় কৃষকদের সার সরবরাহের জন্যও এই ব্যাংক কৃষি-বিপণন সমিতিগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। দার্জিলিং জেলার ২৫ জন পাহাড়ী যুবক এই ব্যাংকে বিভিন্ন পদে চাকুরী পেয়েছেন।

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়িতে একটি অবৈতনিক পাঠকেন্দ্র খোলার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশন সম্প্রতি পাঁচ বছরের জন্যে বছরে ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া পাঠ কেন্দ্রটির প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র কেনার জন্যে বছরে ১০ হাজার টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছে।

* * *

কোন কারণে জলঢাকা জলবিদ্যুত কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেলে উত্তর বঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে কতকগুলি বিকল্প বিদ্যুত সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করছেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী নয়টি অতিরিক্ত ডিজেল সেট কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ী ও চ্যাংড়াবান্ধা এবং জলপাইগুড়ি জেলার মাল ও বীরপাড়ায় বসানো হচ্ছে। এই সেটগুলি একত্রে মোট ১১৭৫ কিলোওয়াট বিদ্যুত উৎপাদনে সক্ষম। এছাড়া, ৪৪০ কিলোওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন করতে পারে এমন দুটি সেট কলকাতা থেকে এনে কোচবিহারে বসানো হচ্ছে এবং ২৭৫ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন একটি সেট আসাম থেকে আনিয়ে জলপাইগুড়ি বিদ্যুত কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন সক্ষম এমন পাঁচটি সেট গুজরাট থেকে এনে শিলিগুড়িতে বসানো হবে।

এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ সম্প্রতি জলপাইগুড়ি ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানিটির কার্যভার নিজেদের হাতে নিয়েছেন। জলপাইগুড়ি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে ১৯৩৩ সালে এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। ইদানীং এই প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুত সরবরাহ অসন্তোষজনক হওয়ায় রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

পশ্চিম দিনাজপুর

গত রবিখন্দে পশ্চিম দিনাজপুরে গমের চাষ খুবই সন্তোষজনক হয়। প্রায় ৪৮ হাজার একরে উচ্চফলনশীল গম চাষ হয়েছিল। রায়গঞ্জ ব্লকের শ্রীউমাশংকর আগরওয়ালা একরে প্রায় ৭৪ মণ "সরবতী সোনারা" জাতের গম ফলিয়ে সারা পশ্চিম বাংলায় গত রবিখন্দে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

এ বছর পশ্চিম দিনাজপুরে স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার শাখাগুলি প্রায় তিন লক্ষ টাকার কৃষিঋণ স্থানীয় কৃষিজীবিদের দিয়েছে বলে জানা গেছে।

পুরুলিয়া

সাম্প্রতিক আদম সুমারীতে পুরুলিয়া জেলার লোকসংখ্যা ১৬,০২,৫৭৭ জন বলে প্রকাশ অর্থাৎ ১৯৬১ সালের লোকগণনায় এই জেলায় যা জনসংখ্যা ছিল, তার থেকে প্রায় তিন লক্ষ বেশী। গত দশ বছরে পুরুলিয়ার জেলায় লোকসংখ্যা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই সংখ্যার শতকরা ২১ জনই শিক্ষিত। সংখ্যায় এঁরা হলেন, ৩,৬২,৫৭৩ জন। গত দশ বছরে এই জেলায় শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে ৪ শতাংশের মত।

পুরুলিয়ার মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যার চেয়ে নারীর সংখ্যা তিন লক্ষ কম। পুরুলিয়া শহরের লোকসংখ্যা গত দশ বছরে বেড়েছে আট হাজারেরও বেশী। ঝালদা ও রঘুনাথপুর শহরেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ১৯৭১ এর আদম সুমারে রঘুনাথপুর শহরের লোকসংখ্যা ১১ হাজার হওয়ায় এটি একটি মিউনিসিপ্যাল শহরের মর্যাদা পেয়েছে।

* * *

পুরুলিয়ার মত অনুন্নত অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্থাপন, উন্নতি ও প্রসারের

জন্যে সহজ শর্তে আর্থিক সাহায্য দেবার একটি সুস্পষ্ট সরকারি নীতি গৃহীত হবার পর, কিছু লোক এই সহজ সাহায্যের সুবিধা নিয়ে পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হয়েছেন।

হাসপাতালের সাজ সরঞ্জাম, ষ্টেনলেস্ ইস্পাতের বাসন পত্র ইত্যাদি তৈরির জন্য পুরুলিয়া শহরে প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কারখানা স্থাপনের জন্যে সরকারি অনুমতি পাওয়া গেছে। এই কাজে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানির জন্যেও লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। কারখানাটি শীঘ্রই চালু হবে। তাছাড়া, "হাই টেনশন্" নাট বল্টু তৈরি করার জন্যে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আর একটি কারখানা স্থাপনের কথাও সরকারের বিবেচনাধীন।

আরও কয়েকটি কারখানা এখানে স্থাপন করার প্রস্তাব আছে। এইগুলির মধ্যে ফল সংরক্ষণ কারখানা, রোলিং মিল, বিদ্যুৎ চালিত তাঁত ছাড়াও বৈদ্যুতিক বাল্ব, হাড়ের সার, রবারের পাইপ ও নল, চীনামাটির জিনিষ পত্রাদি তৈরি করার জন্যে বিভিন্ন ধরণের কারখানা স্থাপন করার কথাও সরকার বিবেচনা করে দেখছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে পুরুলিয়ার কারিগরদের তসর, লাক্ষা, ইট, টালি তৈরি করার জন্যে ২১ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছেন।

শুধু শিল্পক্ষেত্রেই নয়, কৃষির উন্নতির জন্যেও সরকার যথেষ্ট আগ্রহী। পুরুলিয়া জেলায় প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি সেচ প্রকল্প রূপায়িত হতে চলেছে। প্রকল্প দুটি শেষ হলে এই জেলায় ৫২০০ একরের মত আবাদী জমিতে জলসেচ সম্ভব হবে। এ দুটির একটি হল, জয়দা থানার অন্তর্গত রুপাই সেচ প্রকল্প। এটিতে খরচ পড়বে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। অপরটি কাশিপুর থানার অন্তর্গত মাজরা প্রকল্প। এতে ব্যয় হবে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা।

মেদিনীপুর

পশ্চিম বঙ্গের খরা পীড়িত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এর মধ্যে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় কয়েকটি ছোট ছোট সেচ প্রকল্পের জন্যে ১৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। তাছাড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার সন্নিহিত খরা পীড়িত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্যে একটি "মাষ্টার প্ল্যানও" রচনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত রবি মরশুমে মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ২৫ হাজার একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল গমের চাষ হয়। একর প্রতি গমের ফলন হয়েছিল ৪০ থেকে ৪৫ মণ। জেলার কৃষি দপ্তর অবশ্য স্থানে স্থানে ৫২ মণ পর্যন্ত গম ফলিয়েছেন। এর আগে এই জেলায় গমের এত প্রচুর ফলন হয়নি। এ সাফল্যে জেলার কৃষককুল উৎসাহিত।

উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের চাষ হয়েছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার একরে। ফলন হয়েছিল বেশ। তবে জেলার কৃষিজীবিরা ধান চাষের চেয়ে গম চাষে বেশী আগ্রহী, কারণ গম চাষে সেচের প্রয়োজনীয়তা অনেক কম।

মেদিনীপুর জেলার কৃষি দপ্তর একটি নতুন ধরণের আলু বীজ বার করেছেন। নাম দিয়েছেন "কুফরি চন্দ্রমুখী।" বর্মি আলুর চেয়ে এই ধরণের আলু কোন অংশে খারাপ তো নয়ই বরং ভাল। বৈদেশিক মুদ্রাজনিত অসুবিধা থাকায় বর্মি আলুর যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও, বর্মা থেকে এ বীজ আমদানি করা যাচ্ছে না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে "চন্দ্রমুখীর" ফলন আশাপ্রদ।

পর্যটন—একটি শিল্প

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

গিয়েছে। এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিদেশ ভ্রমণকারীরা যাঁরা আর্থিক কারণে সড়কপথে আসা পছন্দ করেন, তাঁরা ভারত ভ্রমণে উৎসাহ পাবেন। জাতীয় সড়ক ও অন্যান্য রাজ্য সড়ক ও পথগুলির পাশে হোটেল, ডাকবাংলো, পেট্রোল, গাড়ী মেরামত প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকরী করবার জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পর্যটকদের আরও বেশী সংখ্যায় ভারত পরিভ্রমণে উৎসাহ দেবার জন্য 'এয়ার ইণ্ডিয়া' বিমান চার্টার করবার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। এয়ার ইণ্ডিয়ার সহযোগী হিসাবে একটি চার্টার্ড কোম্পানী এ উদ্দেশ্যে চালু করা হবে।

পর্যটকদের আসা যাওয়ার ফলে শুধু যে বৈদেশিক মুদ্রাই অর্জিত হয় তা নয়, এর দ্বারা বিশ্বজনীন চিন্তাধারারও প্রসার লাভ ঘটে। এ ছাড়া আন্তর্দেশীয় পর্যটন যত বেশী প্রসার লাভ করবে, ততই তা জাতীয় সংহতির সহায়ক হয়ে উঠবে।

পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে আমরা কি কিছু রপ্তানী করে থাকি? এ প্রশ্নের উত্তর, হ্যাঁ। ভারত পরিদর্শনে এসে বিদেশী ভ্রমণকারীরা ভারতীয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা, ভাস্কর্য পুরাকীর্তি, নৃত্য, গীত, উৎসব প্রভৃতির যে আনন্দময় স্মৃতি চিত্র তাঁদের হৃদয়ের মণিকোঠায় বহন করে নিয়ে যান এবং যার সৌরভ বিদেশে বিকিরণ করেন, এক হিসাবে সেটাইত ভারতের শ্রেষ্ঠ রপ্তানি সম্ভার।

আসাম ও মেঘালয়ের অর্থনীতির ওপর শরণার্থী আগমনের প্রতিক্রিয়া

পূর্ববাংলার ঘটনাবলী লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভিটে মাটি, ঘর বাড়ী ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। দলে দলে, কাতারে কাতারে শরণার্থী চলে আসে পূর্ববাংলার সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় এলাকাগুলিতে। এদের বিরাট একটা অংশ আশ্রয় নেয় পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরায়। আসাম ও মেঘালয়ে আগত শরণার্থীদের সংখ্যাও অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। এখনও পর্যন্ত প্রধান বোঝা বহন করতে হচ্ছে আসাম ও মেঘালয়ের সীমান্ত জেলাগুলিকে। মেঘালয়ের গারো পার্বত্য অঞ্চল এবং আসামের কাছাড়ে সর্বাধিক সংখ্যক শরণার্থীর সমাগম হয়েছে। মেঘালয়ের সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড় এলাকা এবং আসামের গোয়ালপাড়া অনুরূপ সাংঘাতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

এপ্রিলের প্রথমে এই শরণার্থী সমাগম আরম্ভ হয়। মে মাস নাগাদ এই সংখ্যা এক লাখ ৩১ হাজার ৮০৩-এ পৌঁছয়। জুন মাসে সে সংখ্যা দ্বিগুণ হয় এবং ২রা জুলাই পর্যন্ত ৪ ৯৮ ৪৪০ জন সীমান্ত পার হয়ে আসাম ও মেঘালয়ে প্রবেশ করে। ১৭ ই জুলাই বিভিন্ন জেলায় শরণার্থীদের সংখ্যা পর পৃষ্ঠায় দেখান হোল।

আসাম ও মেঘালয় সরকার স্বভাবতঃই এরকম বিরাট এক সমস্যার মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। একসঙ্গে এত শরণার্থীর আশু ত্রাণের ব্যবস্থা করাটা মোটেই সহজ কাজ নয়। তা সত্ত্বেও আসাম ও মেঘালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রশংসার পাত্র। নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী

তাঁরা সব কিছু করেছেন। ক্ষুধার্ত কাতর, শান্ত ও দুর্বলদের আহার এবং সেবার ব্যবস্থা, আশ্রয়ের সংস্থান,—দুর্বল মাতা ও রুগ্ন শিশুদের দেখাশোনা, এসবের জন্য প্রয়োজন সহানুভূতির মনোভাব চিন্তা শক্তি কৌশল এবং যথাশীঘ্র কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা। অবস্থার মোকাবিলা করতে সরকারী ব্যবস্থাপনাকে পুরোপুরি এই কাজে লাগানো হয় -যার ফলে সরকারী ভবনগুলিতে শরণার্থীদের স্থান দেওয়া সম্ভব হয়।

দেশ বিভাগের পর থেকেই আসাম অনবরত পূর্ববাংলার ছিন্নমূল লোকেদের আগমন জনিত সমস্যার সম্মুখীন। নিজের সমস্যা সকল এবং নিজস্ব সমস্যা থাকা সত্বেও আসাম এবার ১০ লক্ষ বেশী শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছে। রাজ্য সরকারের সহায়তায় প্রায় আট লক্ষ শরণার্থীকে ইতিমধ্যেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ লক্ষের বেশী শরণার্থীকে শিবির বা অন্যত্র আশ্রয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম যে প্রতিক্রিয়া নজরে পড়ে তা হল আসাম ও মেঘালয়ে বিশেষ করে, সীমান্ত জেলাগুলিতে প্রায় সব জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি। এমনিতেই গ্রীষ্মের মাসগুলিতে আসামে মূল্য সূচী অনিশ্চিত হওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়, তার ওপর এত লোকের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করার মত এই অপ্রত্যাশিত দায়িত্বের বোঝা এসে পড়ায়, সে সমস্যা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। অসাধু এবং অবিবেক ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে জিনিস পত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ নুনের কথা উল্লেখ করা যায়। আসামের উত্তরাংশের কয়েকটি স্থানে নুনের দাম অস্বাভাবিক রকমের বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিবছর আসাম ভয়ঙ্কর বন্যার সম্মুখীন হয়। এবছর ইতিমধ্যেই রাজ্যে প্রথম দফার বন্যা হয়ে গেছে—যার ফলে লখিমপুর জেলার বিরাট এলাকা প্লাবিত হয়েছে এবং ফসল ও সম্পত্তির ক্ষতি

শত দুঃখ কষ্টে দেশ ছেড়ে এলেও পড়াশুনা থেমে নেই। করিমগঞ্জের শরণার্থী ক্যাম্পে একটি অস্থায়ী বিদ্যালয়

হয়েছে প্রচুর। একদিকে উত্তর পূর্ব পাহাড় অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে অথচ অন্যদিকে দক্ষিণ আসামের কামরূপ এবং দারাং জেলার ব্যাপক এলাকা জুড়ে চলেছে প্রচণ্ড খরা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের ত্রাণের জন্যই শুধু প্রতি বছর খরচ হয় ২কোটি টাকার বেশী। অপরদিকে খরা কবলিত অঞ্চলের জনগণের সাহায্য বাবদের ফলে রাজ্যের অর্থনীতির ওপর দারুণ চাপ পড়ছে। খরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্যা খরা এবং শরণার্থী সমস্যার মোকাবিলা করতে খুবই মুস্কিল হবে।

এদিকে কাতারে কাতারে শরণার্থীর আগমনের জন্য সস্তায় মজুর পাওয়া সম্ভব হচ্ছে যার ফলে স্থানীয় শ্রমিকদের মজুরীর কাঠামোর ওপর আবার প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে।

মেঘালয়ের অর্থনীতি

মেঘালয় এক শিশু রাজ্য। জনসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। রাজ্যের দুটি জেলা গারো পাহাড় এবং সংযুক্ত খাসি জয়ন্তীয়া পাহাড় অঞ্চলে তিন লক্ষ মত শরণার্থী এসে আশ্রয় নেওয়ায় মেঘালয়ের অবস্থা এখন

জেলা	শিবিরেরসংখ্যা	শিবিরবাসী	শিবিরের বাইরে মোট শরণার্থীর সংখ্যা
গারো পাহাড়	৬	১৭৯,৫২৩	২০৩,০৬৭
কাছাড়	১১১	৮১,০৫২	১১৬,৪৪০
সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড়	১১	৮১,১২৪	৯৪,৯০০
গোয়ালপাড়া	১০	৪৪,১৮০	৬৯,৪১১
মিজো পাহাড়	৭	২০,১৭০	২০ ১৭০
নওগাঁও	১	১,৯৪৪	২০,৮৬৯
অন্যান্য জেলা	০	২,৮৮৪	৬,৮ ৪

মোট আগত—৫,৩৩,৪১৭।
শিবিরবাসীদের
মোট সংখ্যা—৪,১২,৮৮৮।

নদীয়ার পাট

মোহিত রায়

পাট চাষে নদীয়া জেলার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ্য। শুধু যে ভাল জাতের পাটই এ জেলায় উৎপন্ন হয় তাই নয়, বেশি পরিমাণও উৎপন্ন হয়। পাট হল তাই নদীয়ার কৃষকদের প্রধান ক্যাশ ক্রপ। জেলায় মোট ১লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমিতে পাট চাষ হয়। পাট চাষের জন্য চাষীরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পান। সেচের জন্য নদীয়ায় ৪৬০৩টি অগভীর নলকূপ, ৪৫৭টি গভীর নলকূপ ও ২৯টি নদীসেচ প্রকল্প আছে। ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে নদীয়ায় নিবিড় পাট চাষের প্যাকেজ প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। এই নিবিড় পাট চাষ শুরু হয়েছিল মাত্র দু'হাজার একর জমিতে এখন নদীয়ার ৮টি ব্লক এলাকার ২৬ হাজার একর জমিতে নিবিড় পাট চাষ হচ্ছে। নিবিড় পাট চাষে চাষীদের উৎসাহ বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন।

নদীয়ায় কোন পাটকল নেই তাই সমস্ত পাট জেলার বাইরে চলে যায়। কিন্তু পাটকাঠি জ্বালানী আর পানের বরোজ ঘেরা ছাড়া অন্য কোনও কাজে আসে না। পাটকাঠি দিয়ে কাগজের বোর্ড তৈরি হতে পারে। সে কারণে ভারত সরকার নদীয়ায় কাগজের বোর্ড তৈরির কারখানা স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

শরণার্থীর চাপ

[illegible] পূর্ব বাংলার সঙ্গে গারো পাহাড়ের [illegible] কলোনি [illegible] এই জেলার জনসংখ্যা আগে ছিল ৪ লক্ষ। শরণার্থীদের আগমনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষে। এই জেলাটিকে এখন তেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে বাইরের উপর নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। এখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও চাপ পড়ছে বেশী। যোগাযোগের অসুবিধা এবং শিবির স্থাপন ও অস্থায়ী আশ্রয় নির্মাণের জন্য যথেষ্ট সমতলভূমির অভাব থাকায় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সামনে সমস্যাটি অত্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, বাসস্থান স্তূপীকৃত মাল মশলা, খাদ্য সরবরাহ এবং পানীয় জলের অভাবও আছেই।

ওদিকে সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তীয়া পার্বত্য জেলাতেও অর্থনৈতিক অবস্থা আগেই তেমন সন্তোষজনক ছিল না। এখন তাকে ১ লক্ষ শরণার্থী অর্থাৎ এই [illegible] একটি সুখা [illegible] শরণার্থীর বাড়তি বোঝা বহন করতে হচ্ছে। [illegible] ডাউকি [illegible] জায়গাতেও যেখানে [illegible] হাজারের মত বিপুল [illegible] এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারপরই শিলং এবং চেরাপুঞ্জি তেও একই অবস্থা। অত্যাবশ্যক দ্রব্য সামগ্রীর অসম্ভব [illegible] মূল্যবৃদ্ধি এবং ও যোগাযোগের অসুবিধা থাকায় এই সব [illegible] সরবরাহ পৌঁছে দেওয়ার কাজ দুরূহ হয়ে পড়ছে।

গারো পাহাড়ের মহেশখোলা নামক স্থানটিতে মাত্র তিন হাজার লোকের বাস। কিন্তু আশ্রয় দিতে হয়েছে ৩৪ হাজারকে। জনসংখ্যা হঠাৎ এভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় শুধু যে মূল্যসূচী ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে তাই নয় স্থানীয় লোকেদের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

আশ্রয় শিবিরগুলি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে আসাম ও মেঘালয় সরকার দুই কোটির বেশী টাকা ব্যয় করেছেন। শিবির সংগঠন এবং পরিচালনার কাজে [illegible] অফিসারদের নিযুক্ত করা ছাড়াও [illegible] সরকারের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করেছেন। ত্রাণ এবং পুনর্বাসন বিভাগে নতুন কর্মচারী নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আসাম সরকার অতিরিক্ত একটি পুলিশ ব্যাটেলিয়ন গঠনের প্রস্তাব পেশ করেছেন যা কার্যকর হলে সরকারের বার্ষিক খরচ হবে ৪৬ লক্ষ টাকা।

মুর্শিদাবাদের বিস্তৃত পাট ক্ষেতে ইউরিয়া স্প্রে

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় এইবার সর্বপ্রথম পাট ক্ষেতে ইউরিয়া স্প্রে করা হোল। পশ্চিমবঙ্গের যেকটি জেলায় পাট চাষ হয় তাদের মধ্যে মুর্শিদাবাদ অন্যতম। পাট চাষে উন্নততর প্রথা চালু করবার জন্য ঐ জেলার ১০০০০ হেক্টার জমি সম্প্রসারিত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

REGD NO. D-233

★ হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্‌ এর পিঞ্জোরে অবস্থিত কারখানা গত মাসের ১৫ তারিখে তাদের কারখানায় তৈরী ট্রাকটর বিক্রির জন্য বাজারে ছেড়েছে। ইতিমধ্যে কারখানাটি ২০০ ট্রাকটর নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। কারখানাটি চেকোস্লোভাক সরকারের সহযোগিতায় তৈরী।

★ গুজরাটের মেহসানা জেলার কৃষকরা তুলা উৎপাদনে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। ঐ জেলার ইন্দপুরা গ্রামের উদ্যোগী কৃষকরা অধিক ফলন-৪ নামে একরকম নতুন জাতের তুলার বীজ উৎপন্ন করেছেন যা তুলাচাষে এক বৈপ্লবিক উৎপাদনের সূচনা করবে।

'অধিক ফলন-৪' বীজের বিশেষত্বগুলি হোল—এই বীজে উৎপাদন অন্যান্য বীজের উৎপাদনের চাইতে দুই তিন গুণ বেশী তুলা পাকতে সময় নয় কম উৎকর্ষে আর দানি করা বিপরীত এলার মত সুলভ

★ রাশিয়ার স্যুডোইমপোর্ট ও ভারতের শিপিং কর্পোরেশনের এক চুক্তি অনুযায়ী ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ান থেকে চারটি মালবাহী জাহাজ কিনবে। এগুলির দাম পড়বে ১৮ কোটি টাকা।

আধুনিক সাজ সরঞ্জাম যুক্ত এই জাহাজের গতি হবে ঘণ্টায় ১৭.৫ নট। জাহাজের খোল থেকে সহজে মাল বের করা বা পোরার জন্য জাহাজের উপরেই একটি ক্রেনের ব্যবস্থা করা আছে। এর ফলে ভারী মালপত্র যেমন ইস্পাত ও লৌহ ভারী মেশিন যন্ত্রপাতি এবং ঐ জাতীয় জিনিষপত্র ওঠা নামা করানোর খুব সুবিধে হবে। সাধারণ জাহাজের চাইতে অন্যান্য মালপত্র তোলা নাবানোর কাজও এ জাহাজে হবে দ্রুততর।

★ স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের আয়ত্তাধীন ও অগ্রগামী প্রোজেক্টস এণ্ড ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া তাইওয়ানের জন্য ১১৩টি রেলবগি রপ্তানীর একটি অর্ডার হস্তগত করেছে। চার কোটি মূল্যের সর্বাধুনিক সাজ সরঞ্জাম যুক্ত এই বগনী পণ্য তৈরী হচ্ছে ভারতের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে। তাইওয়ান রেলের দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষা নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই রেলের বগিগুলি ভারতীয় রেলের ওয়াগান নির্মাণকারী ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মীদের কাজের উৎকর্ষতার পরিচায়ক।

ধনধান্যে

পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে, তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য। এই পটভূমিকায় পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যথাযথ রূপ তুলে ধরা 'ধনধান্যে'র অন্যতম উদ্দেশ্য।

নিয়মাবলী

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়।

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা এবং কোনোও রচনার প্রাপ্তি স্বীকৃতি জানানো সম্ভব নয়।

নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ে, এই ঠিকানায় পাঠাবেন—

যোজনা
যোজনা ভবন
পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট
নিউ দিল্লী—১

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ-
বিজনেস ম্যানেজার পাব্লিকেশন্স্‌ ডিভিশন,
পাতিয়ালা হাউস নূতন দিল্লী ১,
এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ডিরেক্টর পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধন ধান্যে

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

তৃতীয় বর্ষ ৭ম সংখ্যা

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ : ১৪ই ভাদ্র ১৮৯৩

Vol III : No · 7 · Sept 5, 1971

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
সমর ঘোষ

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
সুভাষ বসু

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (দিল্লী)
ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

সংবাদদাতা (হায়দ্রাবাদ)
বেংকটি কৃষ্ণ পিল্লে

সংবাদদাতা (বোম্বাই)
অবিনাশ গোডবোলে

ফোটো অফিসার
টি. এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট
বলরাম মণ্ডল

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন পার্লামেন্ট স্ট্রীট নিউ দিল্লী ১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫ ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ ৩৮৫৪৮১/৪০২

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

শিল্প-শ্রমিক সম্বন্ধ সুষ্ঠু রাখতে হলে দরকার—সকলের সহযোগ, উৎপাদন নিষ্ঠা এবং কাজে আনন্দ খুঁজে পাওয়া। এই তিনটি লক্ষ্যে অবিচল থাকলে সামগ্রিক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য।

—কীথ ডেভিস

এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রথম দু'বছর

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলাফল দু উপায়ে দেখা যায়। একটি হোল পুঁজিবাদীদের মাপকাঠি লভ্যাংশ কি দাঁড়ালো। জাতীয়করণের পর ব্যাঙ্কগুলি কি আগের মতই লভ্যাংশ দিচ্ছে না আরও কিছু বেশী দিচ্ছে। অপর মাপকাঠিটি হোল—জাতীয়করণের ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ ঋণদান ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কতটা পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছে।

ভারতের পরিস্থিতি এক অদ্ভুত ধরণের। এই পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্কগুলি কি সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছে? যেসব এলাকায় আগে ব্যাঙ্ক ছিল না সেই সব এলাকাতে কি এখন ব্যাঙ্কিং কাজ চলেছে? সুপরিকল্পিত উন্নয়নের জন্যে ব্যাঙ্কগুলি কি এখন পল্লী অঞ্চলে সক্রিয় অভিযান শুরু করেছে? ব্যাঙ্কগুলি কি ক্ষুদ্র চাষীদের নানান কৃষি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে সহজ কিস্তিতে ঋণ দিচ্ছে? জাতীয়করণের ফলে কৃষকগণ কি অন্ততঃ আংশিকভাবে মহাজনদের কবলমুক্ত হতে পেরেছেন? সংক্ষেপে বলা যায় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষে এগুলি অন্যতম সামাজিক লক্ষ্য ছিল। আংশিকভাবেও যদি এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই এর পর লভ্যাংশেও যদি ঘাটতি থাকে তাতে কোন ক্ষতি নেই। এক কথায় বলা যায় সামাজিক লক্ষ্যগুলির ওপর ব্যাঙ্কের লভ্যাংশকে স্থান দেওয়া যায় না।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সময় তিনটি লক্ষ্য স্থির করা হয়। প্রথম পল্লী অঞ্চলে যে সব জায়গায় ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধে নেই সেখানে সত্বর এই সব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় সংগঠিত সঞ্চয়ের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং তৃতীয়, সমাজের সেই সব সম্প্রদায় যাঁরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁদের ন্যায্য অংশ পাননি এবং যাঁরা প্রতিষ্ঠানগত আর্থিক সুযোগ সুবিধা অতি সামান্য পেয়েছেন, তাঁদের আশা আকাঙ্খা চরিতার্থ করা। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মুখ্য উদ্দেশ্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি করা নয়। সম্ভবতঃ আশা করা গিয়েছিল যে লভ্যাংশ কমই হবে। বস্তুতঃ প্রাক্তন মালিকদের ক্ষতি-পূরণ হিসেবে যে বণ্ড দেওয়া হয়েছে তার সুদের হারের চেয়ে লভ্যাংশ এখন কমই। লাভ কম হবার আংশিক কারণ হোল, গত এক বছর ধরে গড়ে প্রতি মাসে ১৫০টি করে শাখা অফিস খোলা হচ্চে পল্লী অঞ্চলে, যেখানে আগে কোন ব্যাঙ্ক ছিল না। এর জন্যে অতিরিক্ত খরচও হচ্চে।

নতুন নতুন শাখা অফিস খোলা ছাড়াও, আমানতের পরিমাণও অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয়করণের পর এটিও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৬৯ সালের মে মাসে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ ছিল ৩,৭৩৮.৬ কোটি টাকা, ১৯৭০ সালের মে মাসে এই অংক দাঁড়ায় ৪,৩২৭.২ কোটি টাকা এবং ১৯৭১ সালের মে মাসে এই পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫,১০৭ কোটি টাকায়। অর্থাৎ গত দুবছরে বার্ষিক বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৫.৭ এবং ১৭.৯ শতাংশ।

বহু সংখ্যক নতুন নতুন শাখা অফিস খোলাই হয়তো আংশিকভাবে এই আমানত বৃদ্ধির কারণ। এবং এখানে উল্লেখ্য যে সওদাগরী ব্যাঙ্কগুলি জাতীয়করণের পর পল্লী অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছে প্রায় ৭০ কোটি টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেয় যে শহর অঞ্চলে যদি একটি নতুন শাখা খোলা হয়, তাহলে, পল্লী অঞ্চলে অথবা যেখানে কোন ব্যাঙ্ক নেই সেই রকম জায়গায় অন্ততঃ দুটি শাখা অফিস খুলতে হবে। জাতীয়করণের পর ব্যাঙ্কগুলি গড়ে প্রতিদিন পাঁচটি করে শাখা অফিস খুলছে। যে ৩,০০০টি শাখা অফিস খোলা হয়েছে তার দুই তৃতীয়াংশ খোলা হয় পল্লী অথবা আধা-শহরাঞ্চলে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পূর্বে শাখা অফিসের সংখ্যা ছিল ৮,২৬২টি আর আজ সে জায়গায় শাখা অফিসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১,৬০০। নতুন শাখাগুলির ৪০ শতাংশ খোলা হয়েছে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্যগুলিতে, যেমন উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা পশ্চিম বাংলা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোল—কৃষি এবং এ বাবৎ অবহেলিত ক্ষেত্রে ঋণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি। ১৯৬৯ সালের জুন মাসে এইসব ক্ষেত্রের ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৮২ হাজার ১৯৭০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯ লক্ষ ২৮ হাজারে এবং ১৯৭১ সালের জুন মাসে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১ লক্ষ ৭০ হাজারে।

১৯৫৯ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত ভাবে পল্লী অঞ্চলে ঋণদান ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করেন,—'ভারতীয় পরিস্থিতিতে পল্লী অঞ্চলে ঋণদান ব্যবস্থার অর্থ হোল অসংখ্য ছোট ছোট কৃষকের কাছে পৌঁছন, তাঁরা যে সব জিনিষ বন্ধক দিতে পারেন তা জমা

রেখে ঋণদান এবং এই ঋণ যাতে যথাযথ ভাবে উপযোগ করা হয় তা নিরূপণ করা। মোট কৃষকের ৭৫ শতাংশ হোল ছোট কৃষক। ব্যাঙ্কগুলি কি এঁদের কাছে পৌঁছতে পেরেছে? যাঁদের অন্তত: ৫ হেক্টেয়ার জমি আছে তাঁদের কাছেও কি ব্যাঙ্কগুলি পৌছতে পেরেছে?

এখনও পর্যন্ত কৃষকগণ যে পরিমাণ ঋণ পান তার চার পঞ্চমাংশ আসে মহাজনদের কাছ থেকে, যাঁরা সুদ নেন যথেচ্ছ। পল্লী অঞ্চলে যে পরিমাণ ঋণ প্রয়োজন তার এক পঞ্চমাংশ আসে প্রতিষ্ঠানগত ঋণদান ব্যবস্থা থেকে। যেমন সমবায় প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বে-সরকারী ব্যাঙ্ক এবং জমি বন্ধকী ও উন্নয়নমূলক ব্যাঙ্ক থেকে। তাহলে লাভবান হলেন কারা? প্রথম যে কৃষক ব্যবসাদারে পরিণত হয়েছেন এবং যে ব্যবসাদার কৃষকে পরিণত হয়েছেন।

এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশ গেছে আবাদী কোম্পানী, বৃহৎ যন্ত্রচালিত খামার এবং ধনী জমিদারদের হাতে। মাঝারি ধরণের কৃষক, যাঁদের জমির পরিমাণ ৫ থেকে ১০ হেক্টেয়ারের মত, তাঁরা অবিশ্যি কিছুটা উপকৃত হয়েছেন, কিন্তু আজও ছোট কৃষককে যেতে হয় গাঁয়ের মহাজনের কাছে।

ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণদানের যে লক্ষ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থির করে দিয়েছেন সেই ব্যবস্থার মধ্যেই প্রধান ত্রুটি রয়ে গেছে। যে ম্যানেজারকে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ কোরতে হবে তিনি কয়েকজন বিত্তশালী কৃষককে ডেকে পাঠান, তাঁদের ঋণ দেন এবং তাঁর লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ায় সন্তোষ বোধ করেন। কোন্ কৃষক ঋণ পরিশোধ কোরতে পারবেন তা দেখেই ম্যানেজার খুশি। ফলে অধিকাংশ ছোট কৃষক স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়ে যান। ঋণদানের সময় একজন কৃষকের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা না দেখে তাঁর প্রকল্প থেকে কি পরিমাণ ফলন পাওয়া যাবে সেটা দেখাই সম্ভবত: যুক্তিযুক্ত। ভূমি সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় জমির পরিমাণ ক্রমশ: হ্রাস পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট কৃষকদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাও হ্রাস পাবে। সুতরাং এমন একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা দরকার যাতে ছোট ছোট কৃষকগণ উপকৃত হবেন অথচ বিনিয়োজিত অর্থও ফেরৎ পাওয়া যাবে। কোন প্রকল্প ফলপ্রসূ হবে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্যে ব্যাংকগুলিকে খামার সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ নিয়োগ কোরতে হবে। এইসব বিশেষজ্ঞ প্রকল্পগুলির গুণাগুণ বিচার করে দেখবেন এবং কৃষকদের কি পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন তাও স্থির করে দেবেন। তাঁদের কৃষি পদ্ধতির উন্নয়নের জন্যেও বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শ দেবেন। কৃষকদের অসুবিধাগুলি যেমন বিদ্যুৎ সরবরাহ, বীজ ও সার সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য করাও ব্যাঙ্কের কর্তব্য। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির আরও দেখা দরকার যে সুদের হার যেন কম হয়।

কৃষি ব্যবস্থার মত অন্যান্য ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। যেমন ক্ষুদ্রশিল্প, পরিবহন ব্যবসায় নিযুক্ত খুচরা ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য ছোট খাট ব্যবসায়ী। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের আগে পেশাদার ও স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সাহায্য বলে প্রায় কিছুই পেতেন না। সারা দেশে মাত্র একটি ব্যাংক এ ধরণের সুবিধা দিত; তাও এক নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে। ১৯৬৯ সালের জুন মাসের শেষে এই ব্যাঙ্কটির কাছে এ ধরণের একাউন্ট্ ছিল মাত্র ৪২১টি এবং যে পরিমাণ টাকা বাকী ছিল তার অঙ্ক হোল ১১ লক্ষ। রাষ্ট্রীয়করণের পর প্রথম ১৮ মাসে এই ধরণের একাউন্টের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৮৪ গুণ এবং বাকী অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২৩ গুণ।

বিভিন্ন শ্রেণীর স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্যে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিশেষ ঋণদান পরিকল্পনাগুলি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি কমিটি গঠন করে। এঁদের ঋণদানের পদ্ধতি, শর্ত, সংগঠন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে কমিটি মোটামুটি ভাবে এক ব্যবস্থাপনার সুপারিশ করে। কমিটি আরও প্রস্তাব করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনের হিসেব নিয়ে ঋণদান ব্যবস্থা যেন নমনীয় করা হয়। সিকিউরিটির ওপর জোর না দিয়ে কার্যকারিতার ওপরই যেন জোর দেওয়া হয়। স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের কারিগরী সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে কমিটি সুপারিশ করে যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেন বহুমুখী সার্ভিস স্থাপন করা হয়। ব্যাঙ্কগুলিকে আরও নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাদের কার্যের এলাকার মধ্যে আরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে এ ধরণের প্রকল্পের জন্যে যেন বিশেষ ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দুবছরের মধ্যে এ ধরণের ব্যবস্থাদি নিশ্চয়ই এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দু'বছর পর

১৯৭১ সালের মে মাস পর্যন্ত "সিডিউল্ড" বাণিজ্য ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ৬০০০ কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করে। গত বছর এই আমানত ছিল ৯১৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬৯-৭০ সালে ছিল ৬৬০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ শতকরা হারে বৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৭ থেকে ১৭.৮ ভাগ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে (অর্থাৎ স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সাতটি সহযোগী শাখা এবং ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক) এই সময়ে আমানত ৪৩২৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৫,১০১ কোটি ১০ লক্ষ টাকায়। অথচ দেখা যাচ্ছে ১৯৬৯-৭০ এর ৫২টি সপ্তাহে নীট আমানত ৫৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৭৭৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা বা শতাংশ হারে বাড়ে ১৫.৭ ভাগ থেকে ১৭.[illegible] ভাগ।

১৯৭১ সালের ২৮শে মে মাস পর্যন্ত ১৪টি ভারতীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর আমানত ছিল ৩৪০৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা—রাষ্ট্রায়ত্তের পূর্বে তা ছিল ২,৬০০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা।

ছোট খাট ঋণ

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দ্বিতীয় বছরের প্রথম নয় মাসের হিসাবে দেখা গিয়েছে (১৯৭০ এর জুলাই থেকে—১৯৭১ এর মার্চ) সব বিভাগের ঋণ গ্রহীতারা পূর্বের চাইতে বেশী ঋণ পেয়েছেন। যেসব খাতে ঋণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে—
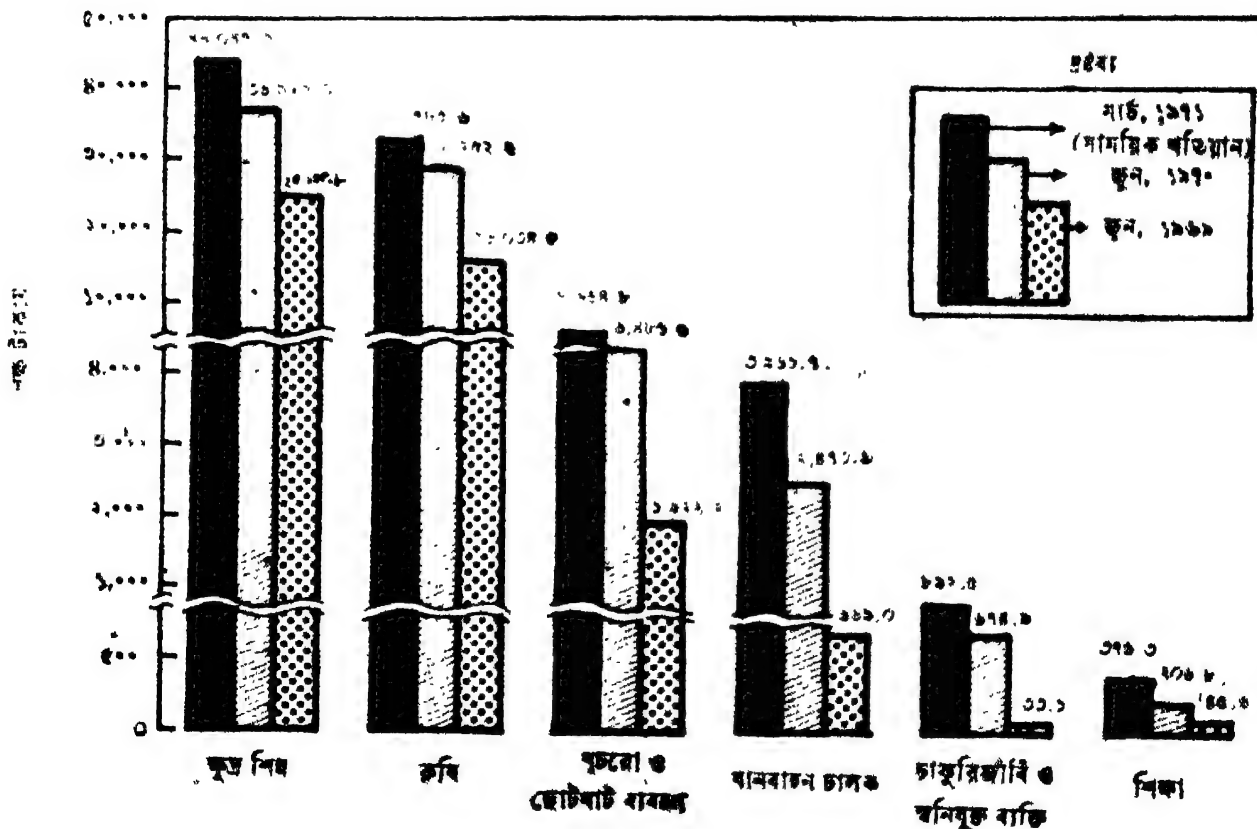
কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, পরিবহন চালকদের জন্য ঋণ, খুচরো ব্যবসায়ী, স্ব-নিযুক্ত কর্মী ও শিক্ষা খাত। এইসব বিভিন্ন খাতে ১৯৬১ এর জুন মাস থেকে ১৯৭১ এর মার্চ মাস পর্যন্ত ঋণ ২.৮ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১১.৭ লক্ষ টাকায়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে উপরোক্ত খাতে ঋণ দানের শতকরা বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২২.৮ ভাগ। ১৯৬৯ এর জুন মাসে তা ছিল ১৪.৫ শতাংশ।

কৃষি ঋণ

কৃষকদের সরাসরি ঋণ দেওয়ার ব্যাপারেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। বছর বছর আরও কৃষক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে কৃষি ঋণ পাবার ব্যাপারে ভীড় করছে; যথা ১৯৬৯ এর জুন মাস থেকে এদের সংখ্যা ১,৭১,৮৮০ থেকে বেড়ে ১৯৭১ এর মার্চে দাঁড়িয়েছে ৭,৯৫,৭৪৫। কৃষি ঋণ তহবিলও বছর বছর স্ফীততর হয়ে চলেছে। ১৯৭১ এর মার্চে তা দাঁড়িয়েছে ১৯৮.৮ কোটি টাকায়। গড় পড়তায় একজন কৃষক ঋণ পায় ২৫০০ টাকা। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল, পাঁচ একরের নীচে জোত জমি সম্পন্ন কৃষকরা 'সরাসরি কৃষি ঋণ' প্রকল্পের তালিকায় অর্দ্ধেক জায়গা অধিকার করে রয়েছে।

শাখা সম্প্রসারণ

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করবার প্রথম বছরে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকায় শাখা সম্প্রসারণের যে বিপুল উদ্যম দেখা গিয়েছিল, দ্বিতীয় বছরেও সেই উৎসাহ ও উদ্যম অব্যাহত আছে। হিসেব করলে দেখা যাবে ১৯৬৯ এর ১৯শে জুন থেকে ১৯৭১ ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ৩,৪১৯টি শাখা খোলা হয়েছে। আর একটু খতিয়ে দেখলে জানা যাচ্ছে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের পরের দু'বছরে যেখানে শাখা সম্প্রসারণের কাজ হয়েছে

গড়ে ১৯০০টি, সেক্ষেত্রে জাতীয়করণের আগের নয় বছরে শাখা সম্প্রসারণের কাজ হয়েছে গড়ে মাত্র ৩১ টি করে। উপরোক্ত ৩৪১৯টি নতুন শাখার মধ্যে ২,৯৩৪টি শাখা উদ্বোধন করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। অধিকন্তু ৭০ শতাংশ ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে এমন সব পল্লী অঞ্চলে যেখানে ব্যাঙ্কের কাজকারবার আগে কখনও চালু ছিল না।

লীড্ ব্যাঙ্ক প্রকল্প

এবছরের হিসেবের খতিয়ানে জানা যাচ্ছে লীড্ ব্যাঙ্ক প্রকল্পটির সমীক্ষার কাজে প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। যেসব ব্যাঙ্ককে লীড্ ব্যাঙ্ক প্রকল্পের অন্তর্গত জেলা নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল তারা ইতিমধ্যে ১২৫টি সমীক্ষা-প্রতিবেদন পেশ করেছে। ১৯৭১ সালের শেষাশেষি আরও ৭৫টি প্রতিবেদন জমা করা হচ্ছে। এইসব প্রতিবেদন অনুসারে কিছু কিছু কাজ কর্মও আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে লীড্ ব্যাঙ্কগুলির সমীক্ষায় যেসব জায়গা উন্নয়নক্ষম এবং যেসব অঞ্চলে ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধা আগে পাওয়া যায়নি কিন্তু বর্তমানের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে থাকা বাঞ্ছনীয় বলে আলাদা করে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে, ১৯৭১ সালে বিশেষ করে সে সব অঞ্চলেই ব্যাঙ্ক সম্প্রসারণের কাজ আরও জোরদার করে তোলবার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মাদ্রাজ, কলকাতা, পাটনা, ভূপাল এবং নয়া দিল্লীতে কতকগুলি সভাও আহ্বান করা হয়েছিল। এসব সভায় স্থির করা হয়, ১৯৭১ এবং ১৯৭২ এর কয়েক মাসের মধ্যেই ১,৩০০টি নতুন শাখা খোলা হবে এবং এর মধ্যে ১,২০০টি খোলা হবে এমন সব অঞ্চলে যেখানে আজও ব্যাঙ্কের কাজ কারবার আরম্ভ হয়নি।

রাস্তাঘাট সংস্কারে ৫০ লক্ষ টাকা

কলিকাতা পৌর উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্গত হলদিয়া জেলার ১০টি পৌর অঞ্চলে রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই কাজে ১৯৭০-৭১ সালের জন্য কলিকাতা পৌর উন্নয়ন প্রকল্প ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। এ বছরের শেষাশেষি কাজটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ভারতের পশমজাত জিনিসপত্র রপ্তানির সর্বকালীন রেকর্ড

১৯৭১ সালের আর্থিক বছরের শেষ অবধি ভারতীয় পশম ও পশম জাত জিনিস পত্রের রপ্তানি সর্বকালীন রেকর্ড প্রায় ৩০ কোটি টাকার কোঠায় পৌঁছায়। তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালের চেয়ে এই রপ্তানি ৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা বেশী। শতকরা হিসেবে রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ১২ ৫৪ ভাগ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবারের রপ্তানি গত বছরের এ জাতীয় রপ্তানির চাইতে ৫০ শতাংশেরও বেশী।

এখন দেখা যাক কোন কোন ক্ষেত্রের জন্য এই সাফল্য। গত কয়েক বছর যাবৎ যে সব নতুন পশম শিল্প দ্রুত উন্নতি করেছে, রপ্তানি বৃদ্ধি অভিযানে তাদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। যথা—পশমী আধা পশমী বস্ত্র, তা দিয়ে তৈরী পোষাক পরিচ্ছদ এবং পশমী, ও আধা পশমী হোসিয়ারী সামগ্রী। প্রকৃতপক্ষে এই সব ক্ষেত্রের বিশেষ করে হোসিয়ারী দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানীর ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব সাফল্য হয়েছে তার ফলে রপ্তানির ক্ষেত্রে কম বেশী যে মন্দা দেখা দিয়েছিল, তা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

সুতরাং, পশমজাত জিনিসপত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে হোসিয়ারীর এখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ১৯৬৯-৭০ সালের সাময়িক বিপর্যয় দূর করতে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তা অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হয়েছে। অথচ এই শিল্পকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে—দীর্ঘ দিনের উৎপাদন অভিজ্ঞতার অভাব, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সীমাবদ্ধতার প্রতিবন্ধক বাধা, প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের ব্যাপারে পুরোপুরি আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা, বিশ্বের সর্বাধুনিক বাজারগুলিতে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়া এবং আভ্যন্তরীণ বাধাজনক ব্যবস্থাধীনে কাজ করা প্রভৃতি। এসব বিবেচনা করে দেখলে এই শিল্পের কৃতিত্ব প্রকৃতই উল্লেখযোগ্য।

তালিকার এর পরেই স্থান পশমী বা পশম মিশ্রিত বা আধা পশমী বস্ত্র শিল্পের। এই শিল্পে প্রতিযোগিতা সব চেয়ে বেশী। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পোষাক পরিচ্ছদের রপ্তানি হ্রাস পেলেও পশম পণ্যে সামগ্রিক ভাবে রপ্তানির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে।

এবছর পশম ও পশমজাত জিনিস পত্র রপ্তানির পরিসংখ্যান নীচে দেখানো হোল :

চিরাচরিত পণ্য তালিক বহির্ভূত সামগ্রী

পশমী বস্ত্র : ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় এ বছর ৮১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকার বা ৪০ ১৮ শতাংশ বেশী পশম কাপড় রপ্তানি হয়েছে। যে সব দেশে রপ্তানির লক্ষণীয় বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলি হল—ইউ.কে. (২৪ ২০ লক্ষ), সিঙ্গাপুর ৩৮ ২৯ লক্ষ, জাম্বিয়া ১২ ৩৫ লক্ষ এবং সুইডেন ২ ২১ লক্ষ টাকার, বেলজিয়াম ও হাঙ্গেরী ভারতীয় পশমী বস্ত্রের নতুন ক্রেতা রূপে দেখা দিয়েছে।

এইসব স্থানে উল্লেখযোগ্য ভাবে রপ্তানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে দেশগুলির বাজারে বিক্রয় কমে গিয়েছে তার মধ্যে আছে কানাডা ৪ ৯৯ লক্ষ, চেকোশ্লোভাকিয়া

(লক্ষ টাকার হিসেবে)

	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১
কাঁচা পশম	৪১১ ৩০	৩৭৪'৬৭
নিকৃষ্ট পশম, ছাঁট কাট	০ ৬১	১ ০৬
এবং পরিত্যাক্ত অংশ উৎকৃষ্ট পশম	৫ ৯২	৮'৬৭
বোনার পশম	০ ০৭	— — —
উর্স্টেড এবং আধা পশমী বস্ত্র	২০১ ৩৫	২৮৫'০৬
তৈরীপশমী পোষাক	২৬৮ ০০	২৫৩'০০
পশমী হোসিয়ারী	৫৩৭ ৫১	১০৫০'৪১
পশমী কম্বল	৩৮'৬৯	২১ ১০
" শাল	৪৭'২৭	২৬'৯৭
কার্পেট, ড্রাগেট এবং নামদা	১১৩২'৮৮	৯৮৯'১১
মোট—(কোটি টাকার অঙ্কে)	২৬'৪৮	২৯'৮০

১৫ ৫৪ লক্ষ, ডেনমার্ক ৩ ৩৯ লক্ষ, বৃটেন ১০.৪৫ লক্ষ, দক্ষিণ ইয়েমেন সাধারণতন্ত্র ৭.৪৫ লক্ষ, এবং তাঞ্জানিয়া ১৬ ২১ লক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পশম কাপড়ের রপ্তানি মোটামুটি এক রকম—অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার মতই রয়েছে।

তৈরী পোষাকের রপ্তানি ৪৫ লক্ষ টাকার মত কমে গেলেও ১৯৬৮ র সালে পৌঁছন ২ কোটি টাকার মাত্রা এখনও বজায় আছে। অন্যান্য স্থানে রপ্তানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও সোভিয়েট ইউনিয়নে রপ্তানি প্রায় পুরোপুরি সে ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখছে।

হোসিয়ারী

১৯৭০-৭১ সালে হোসিয়ারী দ্রব্য রপ্তানি করে মোট আয় হয়েছে ১০ কোটি ৫ লক্ষ টাকা যা এক রেকর্ড বলা চলে। তার আগের বছর এই খাতে আয় হয় ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। তা হলে দেখা যাচ্ছে এক বছরে রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে।

আমাদের রপ্তানির প্রধান স্থান সোভিয়েট ইউনিয়ন। সেখানে রপ্তানি তিনগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই কোটি ৬০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে এখন রপ্তানির পরিমাণ সেখানে ৯ কোটি টাকারও বেশী। এর তুলনায় কয়েকটি দেশে রপ্তানি কিছু কম হয়েছে বই-কি। এই ক্ষেত্রের নজরে পড়ে আমাদের অন্য প্রধান ক্রেতা দেশগুলির মধ্যে, চেকোস্লোভাকিয়া—১৭০ ৮৯ বাহারিণ ৫১ লক্ষ, হংকং ১৩ ৭৩ লক্ষ দক্ষিণ ইয়েমেন সাধারণতন্ত্র ১১ ৪১ লক্ষ আমিরাত ক্ষেত্রে অবস্থা আদৌ সুবিধা জনক নয়। মালয়েশিয়ায় সামান্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ১.৬০ লক্ষ টাকা।

চিরাচরিত ও অন্যান্য পণ্য

কার্পেট, ক্লথেট এবং নামদা—১৯৬৯-৭০ সালে কার্পেট রপ্তানি ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার অঙ্কে পৌঁছায়, কিন্তু এ বছর তার পরিমাণ ১৪৩ ৭৭ লক্ষ টাকা বা ১৪ ৬৯ শতাংশের মত হ্রাস পেয়েছে। প্রধান প্রধান আমদানীকারী যেসব দেশে বড় রকমের রপ্তানি ঘাটতি দেখা গেছে, তার মধ্যে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০৮ ৩৩ লক্ষ, ক্যানাডা ৮৬ ৩৮ লক্ষ, বৃটেন ১৩ ৬২ লক্ষ, সুইডেন ৪ ১২ লক্ষ, এবং ডেনমার্ক ৩ ১৩ লক্ষ। এর বিপরীত হিসেবে অন্য কয়েকটি বড় দেশে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে যেমন পশ্চিম জার্মানী ৫৮ ৩৩ লক্ষ, অস্ট্রিয়া ৯ ৭৪ লক্ষ বেলজিয়াম ৬ ৯১ লক্ষ, নেদারল্যাণ্ড ১২ ১০ লক্ষ এবং সুইটজারল্যাণ্ড ৩ ১৪ লক্ষ টাকা।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে কলকাতা বন্দরের কাজ কর্ম বন্ধ থাকায় জাহাজে মাল বোঝাই কম হয়েছে। এই অবস্থার ফলে পশমী কার্পেট রপ্তানিতে ঘাটতি দেখা দেয়।

কাঁচা পশম

১৯৭০ সালে কাঁচা পশমের রপ্তানি ৩৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা অথবা ৯ ৩৫ শতাংশ কম হয়েছে। গালিচা বোনার পশমের প্রধান আন্তর্জাতিক বাজারগুলিতে সাধারণ ভাবে যে মন্দা দেখা দেয় তার দরুণই অবস্থা এ রকম দাঁড়ায়।

প্রধান প্রধান যে সব দেশের বাজারে বিশেষভাবে এই কমতি চোখে পড়ছে সেগুলি হল যথাক্রমে বেলজিয়াম ৭ ৯৭ লক্ষ, ফ্রান্স ৯ ০৮ এবং বৃটেন ১২ ৪১ লক্ষ টাকা। তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় কাঁচা পশম আমদানি করেছে। পর্যালোচনাকালীন হিসেবে প্রকাশ ওই সময়ের মধ্যে ২৭৭ ৫৮ লক্ষ টাকার বেশী পশম সে দেশে রপ্তানি করা হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে এই রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৫৮.৯২ লক্ষ টাকা।

এ দুটি জিনিষের ক্ষেত্রেও চলতি আর্থিক বছরে আগের বছরের তুলনায় রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। চলতি বছরে রপ্তানির পরিমাণ হোল যথাক্রমে ১৭ ৫৯ লক্ষ এবং ২০ ৩০ লক্ষ টাকা।

এগিয়ে চলেছে ইউনিট ট্রাস্ট

সাত বছরের কর্মমুখর জীবনে ইউনিট ট্রাস্ট জাতীয় সঞ্চয় সংগঠনে উল্লেখযোগ্য নজীর রেখেছে। এই সাত বছরে ইউনিট হোল্ডারদের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিনগুণ ১,৩১,৫৯৪ থেকে ৩,০০,০০০ এবং সঞ্চয় বেড়েছে পাঁচগুণ—১৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা থেকে ৯২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকায়।

সঞ্চয় অভিযানকে আরো জোরদার করে তোলবার জন্য বছর বছর লভ্যাংশ বিতরণের হার বাড়ানো হয়েছে। এবারের লভ্যাংশ বিতরণের সংখ্যা ৮ শতাংশ। এ পর্যন্ত বিতরণের হারে এটিই সবচেয়ে বেশী।

গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ

এ বছরের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত দেশের ১ ০৫ লক্ষ গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা গেছে। আসছে বছরের মার্চমাসের মধ্যে আরও ১৮ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করা যায়। এ বছরের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ পাম্পসেট অথবা নলকূপ বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে আরও ৩ ৬৪ লক্ষ পাম্পসেট অথবা নলকূপ বৈদ্যুতিকরণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কয়েকটি প্রদেশে ১৯৭০ এর মার্চ পর্যন্ত বৈদ্যুতিকরণের খতিয়ান দিয়ে দেওয়া হোল :

প্রদেশ	বিদ্যুৎপ্রাপ্ত গ্রাম	পাম্প/টিউবওয়েল সেট বৈদ্যুতিকরণ
মহারাষ্ট্র	১২,১৪০	২,১১,৬৭৯
তামিল নাড়	১১,২৪৬	৫,৩০,০০২
হরিয়ানা	৬,৬৬৯	৮৬,৪২৬
পশ্চিমবঙ্গ	২,৯৬৬	১,৫৫১

ঘর থেকে দূরে—আর এক ঘর

মানা শরণার্থী শিবির

সুভাষ বসু

কোলকাতা থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরে মধ্য প্রদেশের এক গ্রাম মানা। সম্প্রতি পূর্ববাংলা থেকে ছিন্নমূল ৮৫,২০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে মানা আবার জনমনের পাদ প্রদীপে এসেছে। অবশ্য এরা আশ্রয় নিয়েছে অস্থায়ী ভাবে। স্বদেশে ফিরে যাবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলেই এরা ফিরে যাবে তাদের স্বগৃহে।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রনয় মানায় যে সব শিবির স্থাপন করেছেন পশ্চিম বঙ্গের বারাসত, বসিরহাট, হাসনাবাদ এবং বনগাঁর ত্রাণ শিবির ও অভ্যর্থনা কেন্দ্রগুলি থেকে শরণার্থীদের সেখানে পাঠানো হয়। পাঠানো হয় বিমান এবং ট্রেনযোগে। পূর্ববাংলা থেকে আগত বাস্তুত্যাগীদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপক সুবন্দোবস্ত মানায় রয়েছে।

১৯৬৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী মানায় এই শরণার্থী শিবিরগুলি স্থাপিত হয়। এগুলি ট্রানসিট্ সেন্টার বা অস্থায়ী কেন্দ্ররূপে বেশী পরিচিত। পূবপাকিস্তান থেকে তখন বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো উদ্বাস্তু আগমনে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সরকার তার মোকাবিলায় যে সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এটি তারই একটি। এবং তখন থেকে মানা প্রশংসনীয় ভাবে সংখ্যাহীন বাস্তুহারাকে আশ্রয় দিয়ে আসছে। আর এর মধ্যে দিয়ে মানা নিজেও রূপান্তরিত হয়ে গেছে, আত্মপ্রকাশ করেছে নতুন রূপে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের সৈন্যদের কর্তৃক পরিত্যক্ত ছাউনী কয়েকটা ব্যারাক, ছোটখাটো একটা সামরিক বিমান অবতরণ ক্ষেত্র এবং বৃষ্টি নির্ভর ৫০টি কৃষিজীবি পরিবার—১৯৫৮ সালের আগে, রায়পুরের ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত মানার এই ছিল গোড়ার ইতিহাস। ১৯৫৮ সালের পর যখন দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের কাজ শুরু হল তখন যুদ্ধকালীন এইসব পরিত্যক্ত ছাউনী এবং ব্যারাকগুলিকে বাস্তুত্যাগীদের অভ্যর্থনা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পশ্চিম বাংলার ত্রাণ শিবিরে অবস্থানরত উদ্বাস্তুদের একটা সুবিন্যস্ত সূচী অনুযায়ী দণ্ডকারণ্যে নিয়ে আসা হয় স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য।

১৯৬৪ সালের প্রথমদিকে হঠাৎ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু—আগমন শুরু হোল। এত ব্যাপক সে আগমন যে কর্তৃপক্ষকে মানায় এবং তার আশেপাশে চারটি বড় শিবির স্থাপন করতে হোল। আশ্রয় পেল লাখখানেক লোক। কিন্তু এই সংখ্যা উদ্বাস্তু প্রয়োজনের তুলনায় দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের সব কল্যাণমূলক ব্যবস্থাই অপ্রতুল মনে হোল। বিশেষ করে পানীয় জল ও সুচিকিৎসার অভাব মারাত্মকভাবে দেখা দিল।

১৯৬৪ সালের শেষাশেষি মানায় উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত কিছুটা সীমিত হলো। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরও ট্রানসিট্ কেন্দ্রগুলির দায়িত্বভার গ্রহণে এগিয়ে এলো। মানার জন্য আরো অর্থের সংস্থান হোল, সংগে সংগে অবস্থার উন্নতিও দেখা দিল। ১৯৬৮ সালের শেষাশেষি ৩৫৮ একর জায়গা জুড়ে মানা শিবির দেখতে দেখতে একটা সুন্দর পরিকল্পিত কলোনীতে পরিণত হোল। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী দেখে বলার উপায় রইলোনা এগুলি উদ্বাস্তু শিবির।

এরপর, ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আবার উদ্বাস্তু আসা শুরু হোল।

মানায় কারিগরি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বহু উৎসাহী নর নারীকে কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়। ছবিতে একজন কর্মীকে মেশিনে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে

একই ভাবে অন্য এখানে কর্তৃপক্ষকে অতটা সংকটে পড়তে হোল না। কেন্দ্রীতে ৪০০ পরিবারকে আশ্রয় দেবার জন্য খোলা হোল একটা নতুন শিবির। সম্প্রতি শিবিরটিকে ১২ হাজার শরণার্থী থাকার উপোযোগী করে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এ ছাড়া মানার কাছে মানাবাস্তায় আর একটি শিবির খোলা হোল। এতে থাকার ব্যবস্থা হোল ২৩ হাজার শরণার্থীর এবং মানা, কুরুদ এবং নাওয়াগাঁর শিবিরগুলিকেও যথেষ্ট সম্প্রসারিত করা হোল। সব মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার লোকের আশ্রয় দানের ব্যবস্থা হোল। তবে কিছু দিন যাবার পর বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করে, পুনর্বাসনের জন্য অন্যান্য ১১টা রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। মানাকে কেন্দ্র করে যে পাঁচটি শিবির গড়ে উঠেছে। তার দেখাশুনার দায়িত্ব রয়েছে ১৯০০ অফিসার এবং কর্মীদের উপর। এঁদের বেশীর ভাগই হলেন বাস্তহারা।

পানীয় জলের অভাব, এখানকার একটা দীর্ঘকালীন সমস্যা। যদিও এই সমস্যা দূর করার জন্য নানারকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেমন, কলোনীতে ১৫০টি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে এবং শিবির কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন নলকূপ বসানোর কাজ হাতে নিয়েছেন। মানার শরণার্থী-দের চিকিৎসা করা হয় বিনামূল্যে। এজন্য ২৮ জন ডাক্তার এবং ২৫০ জন নার্স ও ধাত্রী রয়েছেন। একাধিক ডিস্পেনসারী ছাড়াও এইসব কলোনীতে চারটি হাসপাতাল রয়েছে। মোট শয্যা সংখ্যা ২২৫। মানাগত শরণার্থীদের ১০০ শয্যা—বিশিষ্ট আর একটি অস্থায়ী হাসপাতালও স্থাপন করা হয়েছে। আর রয়েছে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক একটি সুসজ্জিত মেডিক্যাল শাখা। কলোনীতে কখনও মহামারী দেখা দিতে পারেনি। বাসিন্দা-দের গড় স্বাস্থ্য ভাল। এখানকার মৃত্যু হার জাতীয় মৃত্যুহারের তুলনায় অনেক

মানা শিবিরের জন্য একটি কর্মচঞ্চল শাখার পুনর্বাসিত মহিলারা সেলাই কাজে ব্যস্ত। শাখায় নিযুক্ত ১৩০ জন কর্মীকে দৈনিক দেড় টাকা বেতন দেওয়া হয়

কম। হাজার প্রতি ৫.৯ জন। পরিবার পরিকল্পনার দৌলতে জন্ম হারও কম—হাজারে মাত্র ১২.৪১ জন। এখানকার অন্যতম সমস্যা হোল বেকার সমস্যা। ২১ হাজারের মত পুরোনো উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে ১১৫৫ জনই হলেন অকৃষিজীবি—যেমন, শিক্ষক ব্যবসায়ী ইত্যাদি। অপর ২৪৩০টি পরিবার হোল সরকারের চিরস্থায়ী বোঝা। কারণ এই সব পরিবারে রোজগারের উপযুক্ত কেউই নেই—সকলেই নাবালক। বাদবাকী ১৭,৩০০টি পরিবার কৃষিজীবি; কাজেই এদের পাকাপাকি পুনর্বাসনের জন্য জমির প্রয়োজন। অথচ উপযুক্ত জমি পাওয়া মুসকিল। কাজেই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের শিল্পে নিয়োগ করা ছাড়া গত্যান্তর নেই।

একটা মোটামুটি হিসেব অনুযায়ী সরকার গত তিন বছরে এই অস্থায়ী কেন্দ্রগুলির জন্য ব্যয় করেছেন ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ডোল, র‍্যাশন, চিকিৎসা এবং অন্যান্য ব্যয় মিলিয়ে মাথাপিছু বছরে খরচ হচ্ছে ৩৬০ টাকার মতো। কাজেই এদের কাজে লাগানোর একটা নিরন্তর চেষ্টা চলেছে এবং যেখানে সম্ভব সেখানেই শিক্ষক, গ্রামসেবক কেরাণী এবং অন্যান্য পদে কাজ দেওয়া হয়েছে।

বর্ষাকালে অনেক কৃষিজীবি শ্রমিক হিসেবে কাজ পায় এবং ২০০০ জনকে কর্ম বিনিয়োগ সংস্থার মাধ্যমে হিন্দুস্থান ইস্পাত কারখানা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন, হেভী ইলেকট্রিক্যালস্, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ প্রভৃতিতে চাকরী দেওয়া হয়েছে। তা সত্বেও ১৫৭০ জন এখনও চাকরী পায়নি। সঙ্গে সঙ্গে শিবির কর্তৃপক্ষও বিভিন্ন কর্মমুখী পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছেন যেমন, হোসিয়ারী, জুতো তৈরী, বই বাঁধানোর কাজ ইত্যাদি।

সরকারী সাহায্যে, মানার পুরোনো উদ্বাস্তুরা প্রায় ৪০০ মত দোকানপাট খুলে বেশ জমজমাট একটা বাজার তৈরী করেছেন। প্রতিদিন কম করেও কয়েক হাজার টাকার বেচাকেনা হয়। ভাবতে অবাক লাগে কয়েকবছর আগে কপর্দক শূণ্য হয়ে শুধুমাত্র উপরে খোলা আকাশ এবং নীচে মাটি আশ্রয় করে এঁরা ভারতে চলে এসে-

বৃদ্ধ বিনোদ বিহারী কীর্ত্তনিয়ার বসে খেতে চান না। তাই তাকে দেওয়া হয়েছে হাতা ধরণের কাজ। তিনি বাজার থেকে যোগা ইত্যাদি আর তার তদারক করে তার সাক্ষী ছিলেন। এর সাক্ষী সতীশ মণ্ডল নিজে। একদিন উদ্বাস্তু হয়ে এসে আজ তিনি সব থেকে অবস্থাপন্ন। শ্রীমণ্ডলের গর্বিত উক্তি, "আমাদের ভাগ্য পরিবর্তনে, ভারতে এসে যা সাহায্য পেয়েছি, পাকিস্তানে তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতামনা। শিবিরের আরো ২০ জনের মত সতীশ বাবুও কোলকাতা, খেয়াকলা, টাটানগরে মাছ চালানের জমজমাট ব্যবসা শুরু করেছেন। পবিত্র গোস্বামী কয়লা ও খবরের কাগজের এজেন্সী নিয়ে ১২ জন উদ্বাস্তুকে কাজ দিয়েছে। এ ছাড়া তিনি মানাতে কমারশিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বা বাণিজ্যিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। এতে ৯০ জন ছেলেমেয়ে বাণিজ্য সংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

মানার একটি শিল্প কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রে ছুঁতোরের কাজ, তাঁত বোনা, দর্জির কাজ, বাঁশের কাজ, এবং কামার কলের কাজে ৬৩০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এই শিল্প-কেন্দ্রটি চালু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩০ লক্ষ টাকার জিনিষপত্র উৎপন্ন হয়েছে, যা থেকে নীট লাভ হয়েছে ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। মজুরী অথবা পিসরেট অনুযায়ী প্রতিটি কর্মীর গড় আয় মাসিক ৭৫ টাকা থেকে ১৩৫ টাকা।

কার্পেন্টারি শাখায় কর্ম ব্যস্ত পুর্নবাসিতদের চোখে নতুন দিনের আশা

মানায় ২ বছর আগে বয়স্ক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ৫০ জনের মত উদ্বাস্তু মহিলাকে অষ্টম মান পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে সীবন এবং হস্তশিল্পের কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ৫৮।

একই ভাবে অষ্টম মান পর্যন্ত শিক্ষা-প্রাপ্ত কম বয়েসী মেয়েদের সাহায্যকারী নার্সিং তথা ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২ বছর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এটি চালু হয় ১৯৬৭ সালে। এ পর্যন্ত ৪০ জন মেয়ে পাশ করেছে এবং ৪৩ জন বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণ করছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ কালে প্রত্যেক শিক্ষানবিশের জন্য শুধু বৃত্তি হিসাবে সরকার ২১০০ টাকা ব্যয় করেন।

উদ্বাস্তু যুবকদের বৃত্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৬৫ সালে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মানায় কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রের ২৪টি কারিগরী শাখায় ৫৭০ জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করতে পারে। সংলগ্ন হোস্টেলে ৫০০ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। উত্তীর্ণ ছাত্রদের জাতীয় ট্রেড সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বর্মা ও সিংহল প্রত্যাগত ৩৭৮ জন ছাত্রসহ এ পর্যন্ত ২২৮০ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই চাকরীও পেয়েছে। বর্তমানে এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৬৭ জন। এদের মধ্যে তিব্বতী শরণার্থীও রয়েছে। বিভিন্ন ট্রেডে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী ছাত্রদের উচ্চ-প্রশিক্ষণ লাভের জন্য অন্যান্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

দুই বছরের এই কোর্সে সরকারকে প্রতিটি শিক্ষানবিশের জন্য ১০,০০০, টাকা ব্যয় করতে হয়। পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা ৯৫।

এই কেন্দ্রের দুটি শাখা। একটি মৌল শিল্প-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অপরটি মোটর গাড়ী চালনা শিক্ষণ কেন্দ্র। প্রথমটিতে যেসব

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ছেড়ে আসা জীবনের যাতনা

সবার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক

ছোটখাট ব্যবসায়

কিছুদিন আগেও শ্রী অমিয়ের ঘোষের পেশা ছিল দোকান দোকান ঘুরে পাখা, সেলাই কল বিক্রী। কিন্তু মনের গোপনে তার বহুদিনের আশা, তিনি জলসেচের পাম্প তৈরীর একটা ছোট খাট কারখানা খুলবেন। তাই বড় আশা নিয়ে তিনি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বারাসত শাখায় গিয়ে তার পরিকল্পনার কথা খুলে বললেন। অবশ্য ব্যাঙ্ক তার প্রকল্পের উদ্দেশ্য জেনেও তাকে সোজাসুজি একটা পাম্প বানাবার কারখানা তৈরী করবার পরামর্শ না দিয়ে পাম্প ও কৃষি যন্ত্র মেরামতির একটা একটা ছোট দোকান খুলতে উৎসাহ দেয়। ব্যাঙ্কের পরামর্শ ও ২০,০০০ টাকা ঋণ সম্বল করে ড্রিল, লেদ ও ছোটখাট সরঞ্জাম ক্রয় করে শ্রী ঘোষ তার দোকান উদ্বোধন করেন।

আজ শ্রীঘোষের হাতে কাজ কর্মের কোন অভাব নেই, নেই টাকা পয়সারও। তার দোকানে খাটছে পাঁচ জন কর্মী এবং অদূর ভবিষ্যতে তার কারবার সম্প্রসারণের কথা ভাবছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে ধন্যবাদ তারা, একজন উদ্যোগী পুরুষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ঐ অঞ্চলের লোকের মনে অনেক আশার সঞ্চার করেছেন।

পরিবহনে

পিতার মৃত্যুর পর শ্রীনবীন কান্তি মজুমদার ছয়জন পোষ্যের ভারে অগাধ জলে পড়েন। বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতক হওয়া সত্বেও চাকরির জন্য তাকে অনেক দরজাতেই নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। অতঃপর তিনি অফিসে বসে টেবিল চেয়ারে কাজ করার চাইতে পরিবহন ব্যবসায় নেমে হাতে কলমে কাজ করতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু হাতে ছিল সর্বগত পিতার শেষ সম্বল মাত্র ৫০০০ টাকা ও নিজেদের একটি বাড়ী।

শ্রীমজুমদারের দৃঢ় মনোবল ও উদ্যমে আস্থা রেখে দমদমস্থিত ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া তাকে ট্রাক কেনার সম্পূর্ণ মূল্য, ৫২,০০০ টাকা, ঋণ দেন। গত বছরের জানুয়ারী মাসে শ্রী মজুমদার ট্রাক কেনেন। এই ট্রাক এখন কলিয়ারি অঞ্চল, উত্তর বঙ্গ এবং আসামে মাল নিয়ে আসা যাওয়া করছে।

শ্রী মজুমদারের পরিবহন ব্যবসায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে এবং স্বনিযুক্ত এই কাজে মাসে মাসে তার আয় দাঁড়িয়েছে ২০০০ টাকা।

দর্জির কাজে

পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ হালদার কাজ করতেন বিরাটির এক দর্জির দোকানে। মাসিক ১৫০ টাকার আয়ে তার একূল দেখতে ওকূল ভাসে অবস্থা। তবে নিজের একটা ছোটখাট দোকান খুলে জামাকাপড় তৈরী করে পাইকারী বাজারে বিক্রী করতে পারবেন, এমন একটি শখ ছিল তার বহুদিনের।

অতঃপর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের আর্থানুকূল্যে শ্রীহালদার সেলাইকল ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য পান ৫,০০০ টাকা আর কাপড় ক্রয় বাবদ ঋণ পান আরও ২০,০০ টাকা।

শ্রী হালদারের আজকাল দু'হাত কাজে জোড়া। তিনি আজকাল শুধু পাইকারি বাজারের অর্ডার বুক করার কাজেই ব্যস্ত। সেলাই ফোড়াই ইত্যাদি যাবতীয় কাজে সহায়তা করছেন তার গৃহিনী এবং পাড়াপ্রতিবেশী কয়েকজন মহিলা। পাড়ার মহিলাদেরও অবসর সময়ে হাতের কাজে দু' পয়সা আয়ের পথ হয়েছে পাকা।

শরণার্থী ত্রাণে চিকিৎসা ব্যবস্থা

দুর্গত ও মুমূর্ষু শরণার্থীদের ত্রাণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যা কিছু ডাক্তারি সুবিধা সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা প্রশংসনীয় বলতে হয়। যেখানে সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে একজন ডাক্তার ৫,০০০ জনসাধারণের চিকিৎসার সুযোগ পান, সে অনুপাতে ৬,০০০ জন শরণার্থী পাচ্ছেন একজন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার সুযোগ। সাধারণ অসুখ বিসুখের চিকিৎসা জানেন এমন ডাক্তার ২৫০০ জন শরণার্থীর স্বাস্থ্য রক্ষার ভার নিয়েছেন।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে প্রায় সাড়ে পাঁচশ অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং প্রায় চৌদ্দ'শ সাধারণ ডাক্তার সেবার কাজ করে চলেছেন। শরণার্থীদের ভেতর থেকেই সওয়া দু'শ ডাক্তার এবং প্রায় সওয়া চার'শ সাধারণ ডাক্তার সেবার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তর, রেল দপ্তর ও কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক্তাররা শরণার্থী সেবার কাজে নিযুক্ত আছেন।

পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুরে রাজস্থান সরকারের কাছ থেকে পাওয়া ৪০০ শয্যার একটি চলমান হাসপাতালে শরণার্থীদের চিকিৎসার সব রকম সুযোগ সুবিধে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিম দিনাজপুরের অন্য হাসপাতালে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডাক্তাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ত্রাণ কাজে এগিয়ে এসেছেন। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে এসেছেন ৪ জন অভিজ্ঞ ডাক্তার ও ২১ জন সাধারণ ডাক্তার, হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড, রাঁচীর ন্যাশানাল কোল ডেভেলোপমেন্ট করপোরেশন, বিহার ও উড়িষ্যার ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ। কেন্দ্রীয় সরকার আরও পঞ্চাশ জন ডাক্তারের একটি ব্যাচ পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়েছেন।

মানা শরণার্থী শিবির

১০ পৃষ্ঠার পর

বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তারমধ্যে সব-থেকে জনপ্রিয় হোল ট্রাক্টর, রেফ্রিজা-রেশন এবং এয়ার কণ্ডিশানিং ট্রেনিং। গত-বছর থেকে রেডিও এবং টেলিভিশান সংক্রান্ত দু'বছরের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

মোটর ড্রাইভিং ক্ষেত্রে ১৫ মাসের একটি কোর্সে মোটরগাড়ী চালনা এবং মোটর গাড়ী সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমন—অটো ইলেক্ট্রিক্স, টায়ার মেরামত, সার্ভিসিং ইত্যাদি।

বর্তমানে, মানার ৫টির মধ্যে ৪টি কলোনীতে পুরানো উদ্বাস্তু পরিবারের ৩১৮৫ জন মেয়ে এবং ৮৭৪০ জন ছেলে—১৩টি প্রাথমিক, ১টি মাধ্যমিক, এবং একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশুনা করছে। মোটামুটি ভাবে, প্রতি ৪০ জন ছাত্র ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একটি সুন্দর পাঠাগারও আছে।

স্কুলগুলিতে ত্রিভাষা সূত্র অনুসরণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে হিন্দী। অবশ্য বাংলা ও ইংরেজীকে আবশ্যিক ভাষারূপে গণ্য করা হয়। মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। সরকার প্রতি বছরে বই এবং অন্যান্য শিক্ষা বাবদ ব্যয় করেন, প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাপিছু ১১, টাকা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫১ টাকা। পরবর্তী শিক্ষার জন্য ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ২টি বড় হোষ্টেল রয়েছে—একটি ছেলেদের এবং একটি মেয়েদের। খেলাধুলা প্রভৃতির জন্যও চমৎকার বন্দোবস্ত রয়েছে।

ছাত্রেরা প্রতিবছর মানার শিক্ষামূলক মেলার আয়োজন করে। এর থেকে যে টাকা সংগৃহীত হয় তা দুঃস্থ তহবিলে দান করা হয়।

এইসব সুযোগ সুবিধা, যা পুরোনো উদ্বাস্তুরা ভোগ করছেন এবং তাঁদের চেষ্টা ও উদ্যম যে ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে—তা থেকে ১৯৭০ সালের নবাগত উদ্বাস্তুরা প্রেরণা পাবে। ১৯৬৪ সালে ঢাকা থেকে আগত বৃদ্ধ রায় মোহন দাস বললেন, "এহানে ভালো থাইয়া পইর্যা আছি দেইখা ওয়াগোর মনেও ভবিষ্যতের আশা জাগুবে। যখনই ওরা আশা নিরাশায় দোলে, তহনি আমরা ওয়াগোরে উপদেশ দেই, উৎসাহ দেই।"

১৯৭০ সালেও এই আগমন শেষ হয়নি। ২৫শে মার্চ পূর্ববাংলায় পাকিস্তানি সামরিক অভিযানের ফলে লক্ষ লক্ষ স্ত্রী পুরুষ বাড়ী ঘর ত্যাগ করে আশ্রয়ের সন্ধানে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ৬৫ লক্ষ ইতিমধ্যেই চলে এসেছে, আর কত আসবে কে জানে। এরমধ্যে ৪৩ লক্ষ শরণার্থীকে পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ের শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। শরণার্থীদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চেষ্টা চলেছে। শিবির কর্তৃপক্ষ অষ্টপ্রহর চেষ্টার ত্রুটি করছেন না।

এইসব অস্থায়ী শিবিরের জন্য সরকারের ব্যয় প্রতি বছর অন্ততঃ পক্ষে আড়াই কোটি টাকা। যদিও স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতিতে এর একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। এইসব শিবির, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে ভোগ্য পণ্যের একটা সম্প্রসারণশালী ভালো বাজারে পরিণত হচ্ছে।

এই সব বাস্তুহারা পরিবার মধ্য প্রদেশের মানায় এসে পেয়েছে আশ্রয়, পেয়েছে শান্তি, পেয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির আলিঙ্গন।

হিন্দুস্তান জাহাজ তৈরীর

এবছর হিন্দুস্তান জাহাজ তৈরীর কারখানায়, তিনটি মালবাহী জাহাজ যার ওজন হবে ৪০,২০০ টন, প্রশিক্ষণ জাহাজ 'ডাফুরিণের' পরিবর্তে একটি নতুন প্রশিক্ষণ জাহাজ এবং একটি প্রায় ভাসমান ডেক্রার তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হবার কথা। এগুলির জন্যে মোট ব্যয় হবে আনুমানিক ১৪ কোটি টাকা।

১৯৭০-৭১ সালে এই কোম্পানীর বিশাখাপত্তনম কারখানায় ১২,৭০০ টনী দুটি মালবাহী জাহাজ তৈরী হয়। ঐ একই টনের আর একটি মালবাহী জাহাজ তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ প্রায়। ১৯৭০-৭১ সালে জাহাজ তৈরী ও মেরামত, মূলধনী এবং বিভাগীয় অন্যান্য কাজ বাবদ কারখানার মোট উৎপাদনী মূল্য ছিল ৯.১৮ কোটি টাকা। এর আগের বছরে ঐ পরিমাণ ছিল ৬ ৯৯ কোটি টাকা।

ভরতপুর স্যংচুয়ারি

রাজস্থানের ভরতপুরে অবস্থিত বনাঞ্চলে একটি ৩৬ কামরাযুক্ত রেস্ট্ হাউস বা বিশ্রামাবাস নির্মাণ করা হবে। এর জন্যে ব্যয় হবে ১২ লক্ষ টাকা। আসামের কাজিরাঙ্গা, গুজরাটের গির, মধ্য প্রদেশের কন্হা এবং উত্তর প্রদেশের করবেট পার্কেও অনুরূপ রেস্ট হাউসের ব্যবস্থা করা হবে। এইসব স্থানে দর্শকগণ যাতে ভালভাবে বন্য জীবজন্তু দেখতে পান তার জন্যে ১২টি মিনি বাস সংগ্রহ করা হচ্চে।

দর্শকগণের সুবিধার্থে বিভিন্ন রাজ্যের বিভাগ গাইডদের প্রশিক্ষণের জন্যে একটি পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা ও করা হয়েছে।

তালচের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র

অশোক মুখোপাধ্যায়

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলেই শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করে। উড়িষ্যার তালচের তাপ—বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি এই রাজ্যের জন জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করবে।

উত্তর উড়িষ্যার তালচের কয়লাখনির নিকট অবস্থিত তালচের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ২৫০০ লক্ষ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। এই রাজ্যের অন্যান্য জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পের সহযোগিতায় এখান থেকে ঘরে ঘরে ও কারখানাগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। পার্শ্ববর্তী জাজপুর রোড, কেন্দ্রপাড়া, পারাদীপ ও ভদ্রকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে। বর্তমানে এই স্থানগুলিতে নিচু ভোল্টেজের স্বল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ পরিবেশন করা হয়। তালচের বিদ্যুৎ হীরাকুদ ও বালীমেলা জল বিদ্যুতের ক্ষীণ ভাণ্ডারস্থ শক্তি সঞ্চার করবে।

তালচের কেন্দ্র থেকে সব থেকে বেশী সুবিধা লাভ করছে এন সি. ডি. সি অর্থাৎ ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। এই সংস্থাটির কাজ হল তালচের কয়লাখনিকে বিভিন্ন কয়লা আশ্রিত শিল্প সমূহের প্রয়োজনে লাগানো। ২, ১ ৯০ বর্গমাইল ব্যাপী কয়লা ক্ষেত্রের কিছু অংশ এন. সি ডি. সি আবিষ্কার করেছে; সমগ্র কয়লা ভাণ্ডারের পরিমাণ হবে প্রায় ৩ লক্ষ টন। আগামী বহু বৎসরের জন্য এই পরিমাণ কয়লা—এখনকার আশ্রিত শিল্পগুলির পক্ষে যথেষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যুৎ শক্তির প্রাচুর্যের ফলে নতুন শিল্পও গড়ে উঠেছে। তালচের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্যই জাজপুর রোডের উপর ফেরোক্রোম ধাতুর কারখানাটি সম্প্রতি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কর্তৃক তৈরী হয়ে উঠেছে। এখান থেকে বছরে ১০,০০০ টন খাদযুক্ত ক্রোম প্রস্তুত হচ্ছে। প্রথম বছরের উৎপাদনেই এই প্রকল্পে ৯০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে উন্নতি উড়িষ্যার নতুন। ১৯৪৫ সালে প্রায় ৩০০ কিলোওয়াট দিয়ে শুরু হয়েছিল, হীরাকুদ বাঁধ প্রকল্প ও তালচের তাপ—বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পর উড়িষ্যার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫৫৪ মেগাওয়াট দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়নের যুক্তরাষ্ট্রীয় এজেন্সী (USAID) তালচের বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য মোট ২১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাহায্য দিয়েছে। হীরাকুদ বাঁধ প্রকল্পটি তৈরী হয়েছে শান্তির জন্যে খাদ্য পরিকল্পনা (পি এল ৪৮০) থেকে ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার ঋণের সাহায্যে। ২৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে সক্ষম এই প্রকল্পের সাহায্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ কার্যের সুবিধা হবে।

হীরাকুদে একটি অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, বৃজরাজনগরে একটি কাগজ কল, রাজগাঙ্গপুরে একটি সিমেন্ট কারখানা এবং যোড়ায় একটি ফেরো-ম্যাঙ্গানীজ কারখানা ব্যক্তিগত মালিকানায় গড়ে উঠেছে। এছাড়া, উড়িষ্যার সবচেয়ে বড় ইস্পাত কারখানার উপজাত সামগ্রী থেকে নানা রকমের সার প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। কষ্টিক সোডা কারখানা থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ক্লোরিন বীজাণু নাশক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে। উড়িষ্যার বনজ সম্পদের জন্য কার্ডবোর্ড প্রস্তুতের সম্ভাবনাও আছে।

এইসব ছোট বড় শিল্পের সমাহার ও প্রচুর পরিমাণ খনিজ সম্পদের জন্য উড়িষ্যা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে। রাজ্যের বৈদ্যুতিক শক্তির উন্নতিই এ ব্যাপারে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

ধনধান্যে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পৃষ্ঠা ১৩

কোলকাতায় জল সরবরাহের নতুন প্রকল্প

কলকাতা পৌর উন্নয়ন সংস্থা শহর ও শহরাঞ্চলের মিউনিসিপ্যাল এবং মিউনিসিপ্যাল এলাকা বহির্ভূত অঞ্চলে জল সরবরাহের জন্যে ৯টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর জন্যে মোট ব্যয় হবে এক কোটি টাকার ওপর। ১৯৭২-৭৩ সালে প্রকল্পগুলির কাজ সমাপ্ত হবার কথা।

এর মধ্যে ৬টি প্রকল্পের দ্বারা পিকলা, কোনা, বাঁকড়া, উলুবাড়ি, মানিকপুর ও সাঁতরা এলাকার প্রায় ১.৭ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হবেন এবং মাথা পিছু ৯০ লিটার পানীয় জল পাওয়া যাবে। অবশিষ্ট তিনটি প্রকল্পের দ্বারা বালি, কোন্নগর এবং চাঁপদানী মিউনিসিপ্যাল এলাকায় জল সরবরাহ আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কলকাতা পৌর উন্নয়ন সংস্থা শহরের অ-মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মাথা পিছু অন্ততঃ ৯০ লিটার পানীয় জল সরবরাহের জন্যে ৬০০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করেছেন ১৯৭১-৭২ সালের জন্যেই কেবল ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন।

যেসব মিউনিসিপ্যাল এলাকায় জল সরবরাহ ব্যবস্থা ৬/৭ বছর আগে নতুন করে শুরু করা হয় অথবা পুরাতন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয় সেইসব এলাকার ইতিমধ্যে যে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে তা মেটাবার জন্যে উন্নয়ন সংস্থা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। ১৯৭১-৭২ সালে এই সব প্রকল্পের জন্যে ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পর্যটন—একটি শিল্প

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত দশকে সারা পৃথিবীতে পর্যটনের গুরুত্ব অসাধারণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যটনকে এখন পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প বললেও অত্যুক্তি হয়না। এই শিল্প আমাদের বহু বাঞ্ছিত বৈদেশিক মুদ্রাও এনে দেয়। ১৯৭০ সালে আমাদের দেশে প্রায় ২,৮১,০০০ ভ্রমণকারী এসেছিলেন এবং এর দরুণ আমাদের উপার্জন হয়েছিল ৩৭ কোটি টাকা। কিন্তু এ সত্বেও সারা বিশ্বের পর্যটন শিল্পে আমাদের অংশ খুবই নগণ্য। যুগোশ্লাভিয়ার মত ছোট্ট দেশ যার লোকসংখ্যা মাত্র ৩ কোটি, সেখানেও প্রতি বছর প্রায় ২ কোটি ভ্রমণকারী যাতায়াত করে থাকেন। গত বৎসর যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাতে দেখা যায় যে, প্রতি হাজার জন বিশ্বপর্যটকের মধ্যে মাত্র একজন ভারতে পদার্পণ করেছেন। সীমাহীন জলধি বেষ্টিত এবং অসংখ্য গিরিপর্বত নদী বন সমন্বিত বিশাল ও বৈচিত্র্যময় ভারতের কাছে এই চিত্র নিশ্চয়ই সুখপ্রদ নয়। অথচ ভারতের দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও ভাস্কর্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বিদেশীয় পর্যটকের কাছে এক বিরাট বিস্ময়। এই আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হলে পর্যটন শিল্পকে যথোচিত মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এজন্য এই মুহূর্তে আমাদের উচিত যোগাযোগ ও পরিবহনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং যথেষ্ট আধুনিক কেতার হোটেল নির্মাণ করা।

ভারতে প্রায় ৩৬,০০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ এবং প্রায় ২৫,০০০ মাইল বিস্তৃত আকাশ পরিবহন ব্যবস্থা আছে। গত দশ বছরে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থারও বিপুল উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটেছে। দেশের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানেই আকাশ, রেল ও সড়ক পথে যাতায়াত করা যায়। বিদেশী পর্যটকদের সুবিধার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেল কোচ এবং বাসেরও ব্যবস্থা আছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত ১৬৩টি হোটেলে প্রায় ৯৭০০টি ঘর আছে যেখানে বিদেশী ভ্রমণকারীদের থাকার আধুনিক ব্যবস্থা আছে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৭৩ সালের মধ্যে ভারতে ভ্রমণকারীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় চার লক্ষে। এই বিপুল সংখ্যক ভ্রমণকারীর থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হলে আরও অন্ততঃ ১০,০০০ হোটেল ঘরের প্রয়োজন হবে। ভারত সরকার ঘোষণা করেছেন ১৯৭২ সালের মধ্যে আরও অন্ততঃ ৯০০০ নতুন হোটেল ঘরের নির্মাণে তাঁরা উদ্যোগী হবেন। ইতি মধ্যেই এয়ার ইণ্ডিয়া বোম্বাইয়ে দুটি হোটেল নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে। এছাড়া হোটেল নির্মাণে উৎসাহ দেবার জন্য ঋণ দেবারও ব্যবস্থা হয়েছে। বাঙ্গালোরে নবনির্মিত অশোকা হোটেলের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি ঠিকই বলেছেন যে, ৭০ দশকে ভারতীয় পর্যটন শিল্পের প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন হোল স্থান সংকুলান তা সে হোটেলেই হোক বা রেল, বাস বা প্লেনেই হোক।

ভারতে দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির মধ্যে পুরাকীর্তি এবং প্রাচীন কীর্তিগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভারতের পুরাতত্ব সমীক্ষা সংস্থার উপর ন্যস্ত। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এদেশের সুবিস্তৃত বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী। বহু বিচিত্র জীবজন্তুর লীলাভূমি ভারতীয় বনগুলি যুগ যুগ ধরে মানুষকে প্রলুব্ধ করে এসেছে। স্বাভাবিক পরিবেশে হিংস্র জীব জন্তুর জীবন যাত্রা পর্যবেক্ষণ করা ভ্রমণকারীদের কাছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। পর্যটকদের সুবিধার জন্য উপরোক্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে শিক্ষিত ও বিদেশী ভাষায় পারদর্শী গাইডের ব্যবস্থা আছে।

ভ্রমণকারীদের সুযোগ সুবিধার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে পর্যটন শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার পর্যটন উন্নয়ন সংস্থা গঠন করেছেন। এই সংস্থার কর্মোদ্যোগের মধ্যে রয়েছে হোটেল নির্মাণ, পরিবহনের সুব্যবস্থা, নিঃশুল্ক দোকানের সুবিধা এবং নানাবিধ আমোদ প্রমোদের আয়োজন। এই সংস্থা পর্যটন দপ্তর, এয়ার ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স এবং অন্যান্য কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যস্ত। এছাড়া ভারতের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরগুলির উন্নতি সাধনের জন্য ইণ্ডিয়ান এয়োরপোর্ট অথরিটি নামে একটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাবও মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করেছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরগুলি, অর্থাৎ কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ, পর্যটন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়নের ব্যাপারে ক্রমশই বেশী গুরুত্ব লাভ করেছে। আগামী বৎসরগুলিতে আমাদের দেশে পর্যটকদের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পাবে এবং সেজন্য জেট চালিত বিরাট আকারের এবং উন্নত ধরনের বিমান পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সম্বন্ধে যাবতীয় দায়িত্ব এই নতুন সংস্থার উপর ন্যস্ত হবে। সম্প্রতি এয়ার ইণ্ডিয়া দুইটি জাম্বো জেট বিমান ক্রয় করেছেন। একটি বোম্বাই থেকে বিদেশের পথে পাড়ি দিচ্ছে।

সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্পে এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করছে। সম্প্রতি নির্মিত তেহেরান থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ৪,২৫০ মাইল দীর্ঘ 'এশিয়ান হাইওয়ে' ভারতের উপর দিয়ে চলে

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

সংবাদ পরিক্রমা

প্রতিবেদক

দার্জিলিং

সম্প্রতি দার্জিলিং জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের দার্জিলিং শাখার উদ্বোধন হয়। বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার উত্তরাঞ্চলের কৃষিজীবিদের কৃষি সংক্রান্ত ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের জন্যে ১৯৫৮ সালে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি স্থাপিত হয়েছিল। গত বছর এই ব্যাংক দুই লক্ষ টাকা সরকারি সাহায্য পায়; এ বছর ৪ ৬ লক্ষ টাকা পাবার আশা আছে। বিভিন্ন ব্যাংকও এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শেয়ারীকৃত মূলধনে অংশ গ্রহণ করে ব্যাংকটিকে আর্থিক সাহায্য দানের কথা বিবেচনা করে দেখছে।

এই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী কৃষি-ঋণ বাবদ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা লগ্নী করার জন্যে সম্প্রতি একটি উৎপাদন মূলক কর্মসূচী রচনা করেছে। এর মধ্যে ৪লক্ষ ২৭ হাজার টাকা শর্তাধীকৃত বিভিন্ন সমবায় সমিতির মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়েছে এবং আরও আড়াই লক্ষ টাকা মধ্য মেয়াদী (Medium term) কৃষি ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, স্থানীয় কৃষকদের সার সরবরাহের জন্যও এই ব্যাংক কৃষি-বিপনন সমিতিগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। দার্জিলিং জেলার ৮৫ জন পাহাড়ী যুবক এই ব্যাংকে বিভিন্ন পদে চাকুরী পেয়েছেন।

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়িতে একটি অবৈতনিক পাঠকেন্দ্র খোলার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সম্প্রতি পাঁচ বছরের জন্যে বছরে ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া পাঠ কেন্দ্রটির প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র কেনার জন্যে বছরে ১০ হাজার টাকা ও মঞ্জুর করা হয়েছে।

* * *

কোন কারণে জলঢাকা জলবিদ্যুত কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেলে উত্তর বঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে কতকগুলি বিকল্প বিদ্যুত সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করছেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী নয়টি অতিরিক্ত ডিজেল সেট কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ী ও চ্যাংড়াবান্ধা এবং জলপাইগুড়ি জেলার মাল ও বীরপাড়ায় বসানো হচ্ছে। এই সেটগুলি একত্রে মোট ১১৭৫ কিলোওয়াট বিদ্যুত উৎপাদনে সক্ষম। এছাড়া, ৪৪০ কিলোওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন করতে পারে এমন দুটি সেট কলকাতা থেকে এনে কোচবিহারে বসানো হচ্ছে এবং ২৭৫ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন একটি সেট আসাম থেকে আনিয়ে জলপাইগুড়ি বিদ্যুত কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন সক্ষম এমন পাঁচটি সেট গুজরাট থেকে এনে শিলিগুড়িতে বসানো হবে।

এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ সম্প্রতি জলপাইগুড়ি ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানিটির কার্যভার নিজেদের হাতে নিয়েছেন। জলপাইগুড়ি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে ১৯৩৩ সালে এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। ইদানীং এই প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুত সরবরাহ অসন্তোষজনক হওয়ায় রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

পশ্চিম দিনাজপুর

গত রবিশস্যের মরশুমে পশ্চিম দিনাজপুরে গমের চাষ খুবই সন্তোষজনক হয়। প্রায় ৪৮ হাজার একরে উচ্চফলনশীল গম চাষ করেছিল। বারঘরা মুরের দুটি আঁশ আগরওয়ালা একরে প্রায় ৭৪ মণ "সরবতী সোনারা" জাতের গম ফলিয়ে সারা পশ্চিম বাংলার গত রবিমরশুমে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

এ বছর পশ্চিম দিনাজপুরে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার শাখাগুলি প্রায় তিন লক্ষ টাকার কৃষিঋণ স্থানীয় কৃষিজীবিদের দিয়েছে বলে জানা গেছে।

পুরুলিয়া

সাম্প্রতিক আদম সুমারীতে পুরুলিয়া জেলার লোকসংখ্যা ১৬,০২,৫৭৭ জন বলে প্রকাশ অর্থাৎ ১৯৬১ সালের লোকগণনায় এই জেলায় যা জনসংখ্যা ছিল, তার থেকে প্রায় তিন লক্ষ বেশী। গত দশ বছরে পুরুলিয়ার জেলার লোকসংখ্যা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই সংখ্যার শতকরা ২১ জনই শিক্ষিত। সংখ্যার এঁরা হলেন, ৩,৩৮,৫৭৩ জন। গত দশ বছরে এই জেলায় শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে ৪ শতাংশের মত।

পুরুলিয়ার মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যার চেয়ে নারীর সংখ্যা তিন লক্ষ কম। পুরুলিয়া শহরের লোকসংখ্যা গত দশ বছরে বেড়েছে আট হাজারেরও বেশী। ঝালদা ও রঘুনাথপুর শহরেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ১৯৭১ এর আদম সুমারে বলরামপুর শহরের লোকসংখ্যা ১৩ হাজার হওয়ায় এটি একটি মিউনিসিপাল শহরের মর্যাদা পেয়েছে।

* * *

পুরুলিয়ার মত অনুন্নত অঞ্চলে কুটির-শিল্প স্থাপন, উন্নতি ও প্রসারের

জন্যে সহজ শর্তে আর্থিক সাহায্য দেবার একটি সুস্পষ্ট সরকারি নীতি গৃহীত হবার পর, কিছু লোক এই সহজ সাহায্যের সুবিধা নিয়ে পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হয়েছেন।

হাসপাতালের সাজ সরঞ্জাম, স্টেনলেস্ ইস্পাতের বাসন পত্র ইত্যাদি তৈরির জন্য পুরুলিয়া শহরে প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কারখানা স্থাপনের জন্যে সরকারি অনুমতি পাওয়া গেছে। এই কাজে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানির জন্যেও লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। কারখানাটি শীঘ্রই চালু হবে। তাছাড়া, "হাই টেন্‌শন্" নাট বল্টু তৈরি করার জন্যে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আর একটি কারখানা স্থাপনের কথাও সরকারের বিবেচনাধীন।

আরও কয়েকটি কারখানা এখানে স্থাপন করার প্রস্তাব আছে। এইগুলির মধ্যে ফল সংরক্ষণ কারখানা, রোলিং মিল, বিদ্যুৎ চালিত তাঁত ছাড়াও বৈদ্যুতিক বাল্‌, হাড়ের সার, রবারের পাইপ ও নল, চীনামাটির জিনিষ পত্রাদি তৈরি করার জন্যে বিভিন্ন ধরণের কারখানা স্থাপন করার কথাও সরকার বিবেচনা করে দেখছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে পুরুলিয়ার কারিগরদের তসর, লাক্ষা, ইট, টালি প্রভৃতি তৈরি করার জন্যে ২১ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছেন।

শুধু শিল্পক্ষেত্রেই নয়, কৃষির উন্নতির জন্যেও সরকার যথেষ্ট আগ্রহী। পুরুলিয়া জেলায় প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি সেচ প্রকল্প রূপায়িত হতে চলেছে। প্রকল্প দুটি শেষ হলে এই জেলার ৫২৫০ একরের মত আবাদী জমিতে জলসেচ সম্ভব হবে। এ দুটির একটি হল, বলরা থানার অন্তর্গত রূপাই সেচ প্রকল্প। এটিতে খরচ পড়বে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। অপরটি কাশিপুর থানার অন্তর্গত মাকরা প্রকল্প। এতে ব্যয় হবে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা।

মেদিনী

পশ্চিম বঙ্গের খরা পীড়িত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এর মধ্যে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহাকুমায় কয়েকটি ছোট ছোট সেচ প্রকল্পের জন্যে ১৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। তাছাড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার সন্নিহিত খরা পীড়িত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্যে একটি "মাষ্টার প্ল্যানও" রচনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত রবি মরশুমে মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ২৫ হাজার একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল গমের চাষ হয়। একর প্রতি গমের ফলন হয়েছিল ৪৩ থেকে ৪৫ মণ। জেলার কৃষি দপ্তর অবশ্য স্থানে স্থানে ৫২ মণ পর্যন্ত গম ফলিয়েছেন। এর আগে এই জেলায় গমের এত প্রচুর ফলন হয়নি। এ সাফল্যে জেলার কৃষককুল উৎসাহিত।

উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের চাষ হয়েছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার একরে। ফলন হয়েছিল বেশ। তবে জেলার কৃষিজীবিরা ধান চাষের চেয়ে গম চাষে বেশী আগ্রহী, কারণ গম চাষে সেচের প্রয়োজনীয়তা অনেক কম।

মেদিনীপুর জেলার কৃষি দপ্তর একটি নতুন ধরণের আলু বীজ বার করেছেন। নাম দিয়েছেন "কুফরি চন্দ্রমুখী।" রবি আলুর চেয়ে এই ধরণের আলু কোন অংশে খারাপ তো নয়ই বরং ভাল। বৈদেশিক মুদ্রাজনিত অসুবিধা থাকায় রবি আলুর যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও, বর্মা থেকে এ বীজ আমদানি করা যাচ্ছে না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে "চন্দ্রমুখীর" ফলন আশাপ্রদ।

পর্যটন—একটি শিল্প

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

দিয়েছে। এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিদেশ ভ্রমণকারীরা যাঁরা আর্থিক কারণে সড়কপথে আসা পছন্দ করেন, তাঁরা ভারত ভ্রমণে উৎসাহ পাবেন। জাতীয় সড়ক ও অন্যান্য রাজ্য সড়ক ও পথগুলির পাশে হোটেল, ডাকবাংলো, পেট্রোল, গাড়ী মেরামত প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকরী করবার জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পর্যটকদের আরও বেশী সংখ্যায় ভারত পরিভ্রমণে উৎসাহ দেবার জন্য 'এয়ার ইণ্ডিয়া' বিমান চার্টার করবার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। এয়ার ইণ্ডিয়ার সহযোগী হিসাবে একটি চার্টার্ড কোম্পানী এ উদ্দেশ্যে চালু করা হবে।

পর্যটকদের আসা যাওয়ার ফলে শুধু যে বৈদেশিক মুদ্রাই অর্জিত হয় তা নয়, এর দ্বারা বিশ্বজনীন চিন্তাধারারও প্রসার লাভ ঘটে। এ ছাড়া আন্তর্দেশীয় পর্যটন যত বেশী প্রসার লাভ করবে, ততই তা জাতীয় সংহতির সহায়ক হয়ে উঠবে।

পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে আমরা কি কিছু রপ্তানী করে থাকি? এ প্রশ্নের উত্তর, হ্যাঁ। ভারত পরিদর্শনে এসে বিদেশী ভ্রমণকারীরা ভারতীয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা, ভাস্কর্য পুরাকীর্তি, নৃত্য, গীত, উৎসব প্রভৃতির যে আনন্দময় স্মৃতি চিত্র তাঁদের হৃদয়ের মনিকোঠায় বহন করে নিয়ে যান এবং যার সৌরভ বিদেশে বিকিরণ করেন, এক হিসাবে সেটাইত ভারতের শ্রেষ্ঠ রপ্তানি সম্ভার।

আসাম ও মেঘালয়ের অর্থনীতির ওপর শরণার্থী আগমনের প্রতিক্রিয়া

পূর্ব্ববাংলার ঘটনাবলী লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভিটে-বাটি, ঘর-বাড়ী ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। দলে দলে, কাতারে কাতারে শরণার্থী চলে আসে পূর্ব্ববাংলার সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় এলাকাগুলিতে। এদের বিরাট একটা অংশ আশ্রয় নেয় পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরায়। আসাম ও মেঘালয়ে আগত শরণার্থীদের সংখ্যাও অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। এখনও পর্যন্ত প্রধান বোঝা বহন করতে হচ্ছে আসাম ও মেঘালয়ের সীমান্ত জেলাগুলিকে। মেঘালয়ের গারো পার্ব্বত্য অঞ্চল এবং আসামের কাছাড়ে সর্ব্বাধিক সংখ্যক শরণার্থীর সমাগম হচ্ছে। মেঘালয়ের সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড় এলাকা এবং আসামের গোয়ালপাড়া অনুরূপ সাংঘাতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

এপ্রিলের প্রথমে এই শরণার্থী সমাগম আরম্ভ হয়। মে মাস নাগাদ এই সংখ্যা এক লাখ ৩১ হাজার ৮০১-এ পৌঁছয়। জুন মাসে সে সংখ্যা দ্বিগুণ হয় এবং ২রা জুলাই পর্যন্ত ৪,৯৮ ৪৪০ জন সীমান্ত পার হয়ে আসাম ও মেঘালয়ে প্রবেশ করে। ১৭-ই জুলাই বিভিন্ন জেলায় শরণার্থীদের সংখ্যা পর পৃষ্ঠায় দেখান হোল।

আসাম ও মেঘালয় সরকার স্বভাবতঃই এরকম বিরাট এক সমস্যার—মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। একসঙ্গে এত শরণার্থীর আশু ত্রাণের ব্যবস্থা করাটা মোটেই সহজ কাজ নয়। তা সত্ত্বেও আসাম ও মেঘালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রশংসার পাত্র। নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী

তাঁরা সব কিছু করেছেন। ক্ষুধার কাজ, পুষ্টি ও পর্যাপ্ত আহার এবং সেবার শুশ্রূষা, আশ্রয়ের সংস্থান,—দুর্বল মাতা ও রুগ্ন শিশুদের দেখাশোনা, এসবের জন্য প্রয়োজন সহানুভূতির মনোভাব, চিন্তা শক্তি, কৌশল এবং যথাশীঘ্র কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা। অবস্থার মোকাবিলা করতে সরকারী ব্যবস্থাপনাকে পুরোপুরি এই কাজে লাগানো হয়—যার ফলে সরকারী ভবনগুলিতে শরণার্থীদের স্থান দেওয়া সম্ভব হয়।

দেশ বিভাগের পর থেকেই আসাম অনবরত পূর্ববাংলার ছিন্নমূল লোকেদের আগমন জনিত সমস্যায় জর্জরিত। নিজের সহায় সম্বল এবং নিজস্ব সমস্যা থাকা সত্বেও আসাম এবার ১০ লক্ষ বেশী শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছে। রাজ্য সরকারের সহায়তায় প্রায় আট লক্ষ শরণার্থীকে ইতিমধ্যেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ লক্ষের বেশী শরণার্থীকে শিবির বা অন্যত্র আশ্রয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম যে প্রতিক্রিয়া নজরে পড়ে, তা হল আসাম ও মেঘালয়ে বিশেষ করে, সীমান্ত জেলাগুলিতে প্রায় সব জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি। এমনিতেই গ্রীষ্মের মাসগুলিতে আসামে মূল্য সূচী অনিশ্চিত হওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়, তার ওপর এত লোকের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করার মত এই অপ্রত্যাশিত দায়িত্বের বোঝা এসে পড়ায়, সে সমস্যা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। অসাধু এবং অবিবেক ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে জিনিস পত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ নুনের কথা উল্লেখ করা যায়। আসামের উত্তরাংশের কয়েকটি স্থানে নুনের দাম অস্বাভাবিক রকমের বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিবছর আসাম ভয়ঙ্কর বন্যার সম্মুখীন হয়। এবছর ইতিমধ্যেই রাজ্যে প্রথম দফায় বন্যা হয়ে গেছে—যার ফলে লখিমপুর জেলার বিরাট এলাকা প্লাবিত হয়েছে এবং ফসল ও সম্পত্তির ক্ষতি

শত দুঃখ কষ্টে দেশ ছেড়ে এসেও পড়াশুনা থেমে নেই। করিমগঞ্জের শরণার্থী ক্যাম্পে একটি অস্থায়ী বিদ্যালয়

হয়েছে প্রচুর। একদিকে উত্তর পূর্ব পাহাড় অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে, অথচ অন্যদিকে দক্ষিণ আসামের কামরূপ এবং দারাং জেলার ব্যাপক এলাকা জুড়ে চলেছে প্রচণ্ড খরা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের ত্রাণের জন্যই শুধু প্রতি বছর খরচ হয় ২কোটি টাকার বেশী। অপরদিকে খরা কবলিত অঞ্চলের দুর্গতদের সাহায্য করার ফলে রাজ্যের অর্থনীতির ওপর দারুণ চাপ পড়েছে। বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্যা খরা এবং শরণার্থী সমস্যার মোকাবিলা করতে খুবই মুস্কিল হবে।

এদিকে কাতারে কাতারে শরণার্থীর আগমনের জন্য সস্তায় মজুর পাওয়া সম্ভব হচ্ছে যার ফলে স্থানীয় শ্রমিকদের মজুরীর কাঠামোর ওপর আবার প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে।

মেঘালয়ের অর্থনীতি

মেঘালয় এক শিশু রাজ্য। জনসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। রাজ্যের দুটি জেলা গারো পাহাড় এবং সংযুক্ত খাসি জয়ন্তীয়া পাহাড় অঞ্চলে তিন লক্ষ মত শরণার্থী এসে আশ্রয় নেওয়ায় মেঘালয়ের অবস্থা এখন

জেলা	শিবিরের সংখ্যা	শিবিরবাসী	শিবিরের বাইরে মোট শরণার্থীর সংখ্যা
গারো পাহাড়	৬	১৭৯,৫২৩	২০৫,০৬৭
কাছাড়	১১১	৮১,০৬২	১১৬,৪৪০
সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড়	১১	৮১,১২৪	৯৪,৯৫০
গোয়ালপাড়া	১০	৪৪,১৮০	৬৯,৪৬১
মিজো পাহাড়	৭	২০,১৭০	২০.১৭০
নওগাঁও	১	১,৯৪৪	২০,৮৬৯
অন্যান্য জেলা	০	২,৮৮৭	৬,৮·৪

মোট আগত—৫,৩৫,৪১৭।
শিবিরবাসীদের
মোট সংখ্যা—৪,১২,৮৮৮।

নদীয়ার পাট

মোহিত রায়

পাট চাষে নদীয়া জেলার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ্য। শুধু যে ভাল জাতের পাটই এ জেলায় উৎপন্ন হয় তাই নয়, বেশি পরিমাণও উৎপন্ন হয়। পাট হল তাই নদীয়ার কৃষকদের প্রধান ক্যাশ ক্রপ। জেলার মোট ১লক্ষ ১৫ হাজার একর জমিতে পাট চাষ হয়। পাট চাষের জন্য চাষীরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পান। সেচের জন্য নদীয়ার ৪৬০৩টি অগভীর নলকূপ, ৪৫৭টি গভীর নলকূপ ও ২৯টি নদীসেচ প্রকল্প আছে। ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে নদীয়ায় নিবিড় পাট চাষের প্যাকেজ প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। এই নিবিড় পাট চাষ সুরু হয়েছিল মাত্র দু হাজার একর জমিতে, এখন নদীয়ার ৮টি ব্লক এলাকায় ২৬ হাজার একর জমিতে নিবিড় পাট চাষ হচ্ছে। নিবিড় পাট চাষে চাষীদের উৎসাহ বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন।

নদীয়ায় কোন পাটকল নেই তাই সমস্ত পাট জেলার বাইরে চলে যায়। কিন্তু পাটকাঠি জ্বালানী আর পানের বরোজ বেড়া ছাড়া অন্য কোনও কাজে আসে না। পাটকাঠি দিয়ে কাগজের বোর্ড তৈরি হতে পারে। সে কারণে ভারত সরকার নদীয়ায় কাগজের বোর্ড তৈরির কারখানা স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

শরণার্থীর চাপ

কাহিল। পূর্ব-বাংলার সঙ্গে গারো পাহাড়ের ২৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত। এই জেলার জনসংখ্যা আগে ছিল ৪ লক্ষ। শরণার্থীদের আগমনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষে। এই জেলাটিকে এমনিতেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে বাইরের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। এখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও চাপ খুব বেশী পড়েছে; যোগাযোগের অসুবিধা এবং শিবির স্থাপন ও অস্থায়ী আশ্রয় নির্মাণের মত যথেষ্ট সমতলভূমির অভাব থাকায় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সামনে সমস্যাটি অত্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, বাসস্থান তৈরীর মাল মশলা, মাল সরঞ্জাম এবং পানীয় জলের অভাবও আছেই।

ওদিকে সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তীয়া পার্বত্য জেলাতেও অর্থনৈতিক অবস্থা আগেই তেমন সন্তোষজনক ছিল না। এখন তাকে ১ লক্ষ শরণার্থী অর্থাৎ এই জেলার মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিতে হয়েছে। বালাটের মত ছোট জায়গাতেও যেখানে জনসংখ্যা মাত্র ১ হাজারের মত, বিপুল সংখ্যক শরণার্থী এসে আশ্রয় নিয়েছে। মায়রই, আমতং এবং ডিংবাই-তেও একই অবস্থা। অত্যাবশ্যক দ্রব্য সামগ্রীর মসজুর টানাটানি খুবই এবং ওখানেকারখার যোগাযোগের অসুবিধা থাকায় ওই সব স্থানে সরবরাহ পৌঁছে দেওয়ার কাজ দুরূহ হয়ে পড়ছে।

গারো পাহাড়ের বাগমারা নামক স্থানটিতে মাত্র তিন হাজার লোকের বাস। কিন্তু আশ্রয় দিতে হয়েছে ৩৪ হাজারকে। জনসংখ্যা হঠাৎ এভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় শুধু যে মূল্যসূচী ঊর্দ্ধমুখী হয়েছে তাই নয়, স্থানীয় লোকেদের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

আশ্রয় শিবিরগুলি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে আসাম ও মেঘালয় সরকার দুই কোটির বেশী টাকা ব্যয় করেছেন। শিবির সংগঠন এবং পরিচালনার কাজে নিজেদের অফিসারদের নিযুক্ত করা ছাড়াও শান্তিশৃঙ্খলা ও আইন শৃংখলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করেছেন। ত্রাণ এবং পুনর্বাসন বিভাগে নতুন কর্মচারী নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আসাম সরকার অতিরিক্ত একটি পুলিশ ব্যাটেলিয়ন গঠনের প্রস্তাব পেশ করেছেন যা কার্যকর হলে সরকারের বার্ষিক খরচ হবে ৪৬ লক্ষ টাকা।

মুর্শিদাবাদের বিস্তৃত পাট ক্ষেতে ইউরিয়া স্প্রে

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় এইবার সর্বপ্রথম পাট ক্ষেতে ইউরিয়া স্প্রে করা হোল। পশ্চিমবঙ্গের যেকটি জেলায় পাট চাষ হয় তাদের মধ্যে মুর্শিদাবাদ অন্যতম। পাট চাষে উন্নততর প্রথা চালু করবার জন্য ঐ জেলার ১০,০০০ হেক্টার জমি সম্প্রসারিত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে
ঠিকমতো লালন-পালন করতে
পারছেন কি না।

পরিবার ছোট। পোশাক-আশাক, খেলনা-পাতি, বই-পত্তর—সব কিছু ঠিকঠাক হলে তবে তো সন্তানকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আর একটি হয়—তখন? সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবধি পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয় গর্ভনিরোধক। আজই এক প্যাকেট কিনে নিন। ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে মাত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, নিরাপদে গর্ভনিরোধের সহজ উপায়
মনিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকান,
পানের দোকান ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

কৃষি সমাচার

টমেটোর চাষ

শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার গোস্বামী

আমাদের দেশে যত প্রকারের সব্জী চাষ করা হয় তন্মধ্যে টমেটোর চাষ অন্যতম। সাধারণতঃ ভাদ্র আশ্বিন মাসেই টমেটোর চাষ করা হয়। টমেটো চাষের জন্য দোঁয়াশ মাটিই ভাল। শক্ত মাটিগুলি কুপিয়ে মাটির ঢেলা গুঁড়া করে বেশ আলের মত উঁচু করে সেই উঁচু জায়গায় ১ ফুট অন্তর অন্তর টমেটোর চারা বসিয়ে দিতে হয়।

চারাগুলি বসানোর পূর্বে টমেটোর দানা বীজতলাতে ছড়িয়ে জল দিতে হয়। মাটিতে রস থাকলে বেশী জলের প্রয়োজন হয় না। বীজ ছড়ানোর ৩ ৪ দিন পরেই ছোট ছোট গাছ বের হয় এবং সেই গাছ দু সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় ৫ ৬ ইঞ্চি লম্বা হয়ে ওঠে, এখন সেই চারাগুলি বীজতলা থেকে তুলে ক্ষেতের আল করা জমিতে বসিয়ে দিতে হয়। সূর্যের তাপে যাতে চারাগুলি হেলে না পড়ে তারজন্য খড়ের খোলা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। সূর্যের আলো পড়ে গেলে খুলে দিতে হয়। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে চারাগুলি নূতন মাটিতে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং মাটি থেকে রস টেনে খাবার ক্ষমতা জন্মায়। তখন দেখা যাবে যে দুই সপ্তাহের মধ্যেই শিশুগাছগুলি বেশ স্বাস্থ্য ও সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং বাড়তে সুরু করেছে। কিন্তু গাছের বাড় কম হলে গাছের চতুর্দিকে "ইউরিয়া" ছড়িয়ে দিতে হ'বে। গাছগুলি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গাছের প্রতিটি গোড়াতে শক্ত কাঠি পুঁতে ডগাটা সেই কাঠির সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। কাঠি পুঁতে বেঁধে না দিলে গাছগুলি সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, মাটিতে শুয়ে পড়বে এবং গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে থাকবে। মাটিতে গড়িয়ে গেলে ফল ভাল হয় না।

টমেটো গাছগুলি বড় হয়ে গেলে তখন আর তত জলের প্রয়োজন হয় না। আলের ভিতরে জল ঢেলে দিলে জলটা মাটিতে বসে যায়, গাছের তলার মাটি ভিজে থাকে। গাছগুলি তখন বেশ সহজ ভাবেই মাটি থেকে রস টেনে বাড়তে থাকে। গাছ বাড়বার জন্যে যেমন, শিকড়ের সাহায্যে রসটেনে খাওয়া প্রয়োজন তেমনি গাছের উপরি ভাগটাতেও বাড়বার জন্য আলো বাতাসের প্রয়োজন। গাছগুলি স্বাভাবিক ভাবেই সেই আলো-বাতাস পেয়ে থাকে, তারজন্য চাষীর কোন আয়াসের প্রয়োজন হয় না। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে রাত্রির শেষ ভাগে শিশির পড়ে। গাছগুলি প্রতিদিন সেই শিশিরের জলে স্নান করে বেশ সবল দেহে ফলের আশায় বাড়তে থাকে।

অল্প দিনের মধ্যে টমেটো গাছের ডালে ডালে থোপা থোপা ফল ফলতে সুরু করে। চতুর্দিকে ডালেতে যখন ফল ফলতে সুরু করে তখন যদি কাঠি পোতা না থাকে তবে ফলের ভারেতে গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়বে। যদি দেখা যায় ফলগুলির বাড় কম হয়েছে তখন বুঝতে হবে যে গাছের ফলেতে পোকা ধরেছে। ফলে পোকা ধরলে গাছেতে "ফলিডল" অথবা "বাসুডিন" ছড়িয়ে দিতে হয়। এই দু'টিই বিষাক্ত কীট নাশক ঔষধ।

ভাল চাষ হলে এবং সার পড়লে এক একটি টমেটো প্রায় ওজনে ২০০/২৫০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাকা টমেটোতে কমলা লেবুর মতই খাদ্য-প্রাণ আছে। 'ক' ও 'খ' খাদ্যপ্রাণ ইহাতে পাওয়া যায়। 'গ' খাদ্য প্রাণতো কমলা লেবুর চেয়েও টমেটোতে যথেষ্ট পরিমাণ বেশী। এছাড়া খনিজ পদার্থ "পটাসিয়াম" ও "ক্যালসিয়াম" থাকে।

টমেটো খুব জনপ্রিয় খাদ্য। কাঁচা টমেটোর স্যালাড সকলেই পছন্দ করে। চপ্, কাট্‌লেট ইত্যাদি খাবারের সঙ্গে টমেটোর স্যালাড খুবই উপভোগ্য খাদ্য। পাকা টমেটোর চাটনী, সস্, কেচ-আপ ইত্যাদি পরম লোভনীয় খাদ্য। সহজ সস্তা এই লোভনীয় খাদ্যটির উপকারীতাও প্রচুর। সহজ সস্তা এবং প্রচুর ফলনের জন্যই সকল শ্রেণীর লোক কিছু কিছু এই লোভনীয় ফলটি নানাভাবে ইচ্ছামত খাবার সুযোগ করতে পারে। আঙ্গুর, বেদানা, আপেল ইত্যাদি ফল সকল শ্রেণীর লোক খাবার সুযোগ পায় না, কিন্তু 'ক' 'খ' ও 'গ' খাদ্য-প্রাণ-যুক্ত এই ফলটি সকলেই খাবার সুযোগ করতে পারে।

টমেটো শীতের দিনের সবজী। শীত কালেই ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। শীত কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার ফলনও কমতে থাকে এবং টমেটোর আকার ও ছোট হ'তে থাকে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রায় থাকেই না। তারপর বর্ষার জল পেলে গাছগুলি নষ্ট হতে থাকে। কিন্তু চাষীরা চেষ্টা করে যদি মাটি দিয়ে বাঁধন দিয়ে গাছের গোড়াতে জল জমা বন্ধ করতে পারে তাহলে আকারে ছোট হলেও বারো মাসই কিছু কিছু টমেটো পাওয়া যেতে পারে।

REGD .NO. D-233

★ হিন্দুস্থান মেশিন টুলস এর পিঞ্জোরে অবস্থিত কারখানা গত মাসের ১৫ তারিখে তাদের কারখানার তৈরী ট্রাকটর বিক্রির জন্য বাজারে ছেড়েছে। ইতিমধ্যে কারখানাটি ২০০ ট্রাক্টর নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। কারখানাটি চেকোশ্লোভাক সরকারের সহযোগীতায় তৈরী।

★ গুজরাটের মেশানা জেলার কৃষকরা তুলা উৎপাদনে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। ঐ জেলার ইন্দ্রপুরা গ্রামের উদ্যোগী কৃষকরা 'অধিক ফলন-৪ নামে একরকম নতুন জাতের তুলার বীজ উৎপন্ন করেছেন যা তুলাচাষে এক বৈপ্লবিক উৎপাদনের সূচনা করবে।

'অধিক ফলন-৪' বীজের বিশেষত্বগুলি হোল—এই বীজে উৎপাদন অন্যান্য বীজের উৎপাদনের চাইতে দুই তিন গুণ বেশী তুলা পাকতে সময় নেয় কম, উৎকর্ষে আমদানি করা মিশরীয় তুলার মত সুন্দর

★ রাশিয়ান স্যুডোইমপোর্ট ও ভারতীয় শীপিং করপোরেশনের এক চুক্তি অনুযায়ী ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ান থেকে চারটি মালবাহী জাহাজ কিনবে। এগুলির দাম পড়বে ১৮ কোটি টাকা।

আধুনিক সাজ সরঞ্জাম যুক্ত এই জাহাজের গতি হবে ঘন্টায় ১৭.৫ নট। জাহাজের খোল থেকে সহজে মাল বের করা বা পোরার জন্য জাহাজের উপরেই একটি ক্রেনের ব্যবস্থা করা আছে। এর ফলে ভারী মালপত্র যেমন, ইস্পাত ও লোহ ভারী মেশিন যন্ত্রপাতি এবং ঐ জাতীয় জিনিষ পত্র ওঠা নামা করানোর খুব সুবিধে হবে। সাধারণ জাহাজের চাইতে অন্যান্য মালপত্র তোলা নাবানোর কাজও এ জাহাজে হবে দ্রুততর।

★ স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের আয়ত্তাধীন ও অনুগামী প্রোজেক্ট এণ্ড ইকুইপমেন্ট করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া তাইওয়ানের জন্য ১১৩টি রেলবগি রপ্তানীর একটি অডার হস্তগত করেছে। চার কোটি মূল্যের সর্বাধুনিক সাজ সরঞ্জাম যুক্ত এই রপ্তানী পণ্য তৈরী হচ্ছে ভারতের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাকটারিতে। তাইওয়ান রেলের দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষা নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই রেলের বগিগুলি ভারতীয় রেলের ওয়াগান নির্মাণকারী ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মীদের কাজের উৎকর্ষতার পরিচায়ক।

ধন ধান্যে

পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সাথে সঙ্গে অর্থনৈতিক শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে, তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য। এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যথার্থ রূপ তুলে ধরা 'ধনধান্যে'র অন্যতম উদ্দেশ্য।

নিয়মাবলী

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়।

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশ কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা এবং কোনও রচনার প্রাপ্তি স্বীকার জানানো সম্ভব নয়।

নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ে এই ঠিকানায় পাঠাবেন—

যোজনা
যোজনা ভবন
পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট,
নিউ দিল্লী—১

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ-বিজনেস ম্যানেজার পাব্লিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী ১, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

**"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন**

ডিরেক্টর পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

তৃতীয় বর্ষ : ৮
১১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
২৫ পয়সা

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

তৃতীয় বর্ষ ৮ম সংখ্যা
১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ : ২৮শে ভাদ্র ১৮৯৩
Vol III : No · 8 : Sept 19, 1971

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য হলেও, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন পার্লামেন্ট স্ট্রীট নিউ দিল্লী ১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬ ৩৮৭৯১০ ৩৮৫৪৮১/৪০২

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

"শিরদার ত সরদার"। মাথা দিতে পার ত নেতা হবে। আমরা সকলে ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই, তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

খাদ্যোৎপাদনে নব দিগন্ত

১৯৭০-৭১ সালে দেশে রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পরিমাণ হোল ১০৭ ৮১ মিলিয়ন টন। সুতরাং বলা যায় ৫৫০ মিলিয়ন দেশবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করা আগের মত অত প্রকট হয়ে দেখা দেবে না। ভারতীয় কৃষির ইতিহাসে এই প্রথম শস্যোৎপাদন ১০০ মিলিয়ন টনের ওপর হোল। গমের ক্ষেত্রে চার বছরের মধ্যে উৎপাদন চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কোন মান হিসেবে এটা একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। মাত্র ২০ বছর আগে আমাদের দেশে যখন সুপরিকল্পিত-ভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ শুরু হয় তখন খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল মাত্র ৫১ মিলিয়ন টন।

এই অপূর্ব সাফল্যের কৃতিত্ব যোল ডঃ নরম্যান বোরলগের অধিনায়কত্বে বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের। ডঃ স্বামীনাথনের নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কার্যকলাপ সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং কয়েকটি উচ্চতম পুরস্কারের দ্বারাও তাঁদের সম্মানিত করা হয়। মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ফিলিপিন, তাইওয়ান ইত্যাদি সুদূর দেশগুলিতে বিভিন্ন পরিবেশ ও আবহাওয়ার মধ্যে থেকে এইসব বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মীগণ জনগণের দুঃখ দুর্দশা বহুল পরিমাণে লাঘব কোরতে সক্ষম হয়েছেন, যা এর আগে আর কখনও সম্ভব হয়নি। এরদ্বারা তাঁরা বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন যে মনুষ্য সমাজের কল্যাণে, জাতীয়তার সংকীর্ণ বেড়াজাল পেরিয়ে একত্রে চিন্তা কোরতে এবং একত্রে কাজ কোরতে বিজ্ঞানীরা সক্ষম।

ভারতীয় কৃষকগণের প্রচেষ্টাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। যদিও দেশের মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে এবং কয়েক প্রকার শস্য যেমন, গম ইত্যাদির ক্ষেত্রে 'সবুজ বিপ্লব' দেখা গেছে। যাই হোক এখন বলা যায় যে ভারত আজ তার কৃষি ব্যবস্থা অনেক ন্যায় সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোরতে পেরেছে। আর এই পদ্ধতির মধ্যে অন্তঃনিহিত রয়েছে তার সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার শক্তি। মানুষের বাঁচার প্রধান ও প্রাচীনতম হাতিয়ার ছিল লাঙল ও বলদ। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে বহু বছর ধরে এর আর কোন পরিবর্তন হয়নি। উপস্থিত এদিকে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

এ যাবৎ যে 'সবুজ বিপ্লব' দেখা গেছে তা হয়েছে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণে। ভারতে ধর্মীয় কারণে অধিকাংশ জনগণ প্রাণীজ প্রোটিন হিসাবে মাত্র একটি সামগ্রী ব্যবহার করেন—তা হোল দুধ। কিন্তু এই দুধকে আবার আরও পুষ্টিকর কোরতে গিয়ে একে পরিণত করা হয় প্রাণীজ চর্বি বা ফ্যাটে—যাকে আমরা বলি ঘি। এই রূপান্তরের ফলে প্রোটিন পুষ্টির সাংঘাতিক রকম অভাব দেখা দেয় এবং নানা রকম উপসর্গ দেখা দিতে থাকে।

কৃষি বিজ্ঞানীগণ, এ সমস্যা সমাধানের দুটি পথ দেখিয়েছেন। প্রথম উচ্চ শ্রেণীর গো-মহীষাদির সংমিশ্রণে আরও ভাল জাতের দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি কোরে দুধ উৎপাদন আরও বাড়ানো এবং দ্বিতীয় গম ও রাই-এর সংমিশ্রণে তেমন প্রোটিন বিশিষ্ট ভাল জাতের শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি। দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধনের পথে ইতিমধ্যেই খানিকটা অগ্রসর হওয়া গেছে কিন্তু নতুন শস্যের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় না। এর প্রজননের বিষয়টি এখনও গবেষণাগারে আবদ্ধ। তবে ডঃ বোরলগের কথায় বলা যায় "প্রগতির কোন বিরাম নেই, সব সময়েই আমরা প্রগতির পথে এগুতে পারি এবং এগুনো উচিৎ।"

গবেষণাগারে না হয় সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল কিন্তু আসল সমস্যা হোল সেটিকে কাজে লাগানো। ভারতের মত এত বিরাট দেশে নানা রকম সমস্যা রয়েছে এবং গবেষণালব্ধ ফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার মত সম্পদও খুঁজে বার করা দরকার। অগ্রাধিকার বশতঃ সমাধানগুলি খুঁজে বার করার জন্যে যদি আমাদের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মনিষীদের কাজে লাগাতে হয় তাহলে এটাও স্পষ্ট যে সেগুলি কার্যকরী করার জন্যেও উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ কোরতে হবে।

ভারতকে যদি ব্যাপকভাবে উন্নত ধরণের পুষ্টি সম্পন্ন খাদ্যদ্রব্য দিয়ে পুষ্টির অভাব দূর কোরতে হয়, তাহলে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্প্রসারণ সংস্থাগুলিকেও তৎপর কোরে তুলতে হবে। বহুদিন ধরে আমাদের বিজ্ঞানীগণ আমাদের শোনাচ্ছেন যে রান্নার মাধ্যম হিসেবে ঘিয়ের চেয়ে ভিটামিনযুক্ত বনস্পতি অনেক ভাল। কারণ এতে অতিরিক্ত পুষ্টিকর দ্রব্য যোগ করা হয়েছে এবং এতে কোলেস্টেরল, যা হার্ট রোগের অন্যতম কারণ, তার পরিমাণ অনেক কম। কিন্তু আমরা কি সে কথা শুনি? বরং আরও বেশী পয়সা দিয়ে সন্দেহজনক মানের প্রাণীজ ফ্যাট পছন্দ করি। বহু দিন ধরে আমরা সয়াবিনের প্রশংসা শুনে আসছি, কিন্তু বড় বড় শহর ছাড়া এটি এখনও তেমন-ভাবে বাজারে দেখা যায় না। চীনে বাদাম থেকে তৈরী পুষ্টিযুক্ত আটার বেলায়ও এ কথা বলা যায়। পুষ্টি বিশেষজ্ঞগণ বহু দিন থেকে বলে আসছেন যে ব্যাপকভাবে পুষ্টির অভাব দূর করার জন্যে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে সস্তা। ভারতের উপকূল-ভাগে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি ও টুনা মাছ পাওয়া যায়। এগুলি প্রাণীজ প্রোটিনে পূর্ণ। কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে সেগুলি শোভা পায় পাশ্চাত্য দেশগুলির ভোজ টেবিলে। আর আমরা আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে আমদানি করি জাহাজ ভর্তি ষ্টার্চ জাতীয় খাদ্য। এ অবস্থায় বিজ্ঞানীগণ আমাদের আর কি সাহায্য কোরতে পারেন।

রাষ্ট্র সঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন

বিশ্ব কৃষি উৎপাদনে দুই শতাংশ বৃদ্ধি

১৯৭০ সালে বিশ্বে কৃষি উৎপাদন দুই শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য উৎপাদনে দূর প্রাচ্যের দেশগুলি অগ্রগতি অপ্রতিহত রেখেছে এবং ঐসব অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আশঙ্কাজনকভাবে বাড়েনি। সংবাদটি পাওয়া গ্যাছে রাষ্ট্র সঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাৎসরিক প্রতিবেদনে।

খাদ্য শস্য উৎপাদনে পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ওসিয়ানিয়া এবং জাপান ১৯৬৯ এর উৎপাদনের তুলনায় কোন রকম বৃদ্ধি ঘটাতে পরেনি। আর পূর্ব ইউরোপে কৃষি উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা কমই ছিল এদের তুলনায় সোভিয়েট রাশিয়ার অবস্থা অনেক ভাল। ১৯৬৯ সালে উৎপাদনে ৪ শতাংশ অধোগতি দেখা দেওয়া সত্বেও এবছর সামগ্রিক ভাবে উৎপাদন ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

বাড়ন্ত-ফসলি গমের দেশ মেক্সিকো ঐ বছর গম উৎপাদনে বিশেষ জোর দেয়নি —তারা কারণ দেখিয়েছে উদ্বৃত্ত ফসল রপ্তানি করা যায় এমন দেশের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। এই ধরণের আমদানিকারী দেশের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ ভারতের কথাই ধরা যাক্। ভারত ১৯৬৭ সালে আমদানি করত ৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন গম। অধিক ফলনশীল গমের কল্যাণে ১৯৭০ সালে ভারতের সম্ভাব্য আমদানি কমে দাঁড়াতে পারে ২৮ লক্ষ মে. টনে।

ধান উৎপাদনে রেকর্ড

এ সত্বেও বিশ্বের মুখ্য খাদ্য শস্য গমের উৎপাদন—১৯৬৯ এর উৎপাদনের উপরে যায়নি। ১৯৬৯এ বিশ্বে গম উৎপাদন ছিল ২৮ কোটি ৬০ লক্ষ মে. টন। গম উৎপাদন আশাব্যঞ্জক না হলেও ধান উৎপাদনে নয়া রেকর্ড কায়েম করা হয়েছে। ১৯৭০ সালে ধান উৎপন্ন হয় ৩০৭ কোটি ৮২ লক্ষ মে টন।

১৯৭০ সালে নিম্ন মানের খাদ্য শস্যের এবং প্রাণীজ খাদ্যের উপর বিশেষ নজর না দেওয়ার ফলে এদের উৎপাদন পড়ে যায়। এর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপে ফলমূলাদি উৎপাদন এবং সমাপ্রায় চিনির উৎপাদন নেমে এসেছে।

কৃষিজ বাণিজ্যে অগ্রগতি

বিশ্ব কৃষিজ দ্রব্য বাণিজ্যের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী মৎস্য ও বনজ সম্পদ ছাড়া ১৯৭০ সালে রপ্তানির মূল্য দাঁড়ায় ১৩ শতাংশ। সম্পূর্ণ তথ্য গোচরে এলে খতিয়ানে দেখা যাবে ১৯৫২ সালের পর আলোচ্য বছরে কৃষি রপ্তানির অগ্রগতি এই বছরের বিশ্বের মোট বানিজ্য অগ্রগতির সঙ্গে তুলনীয়।

উন্নয়নশীল দেশে কৃষি উৎপাদন

উন্নয়নশীল দেশে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৩ ও ৪ শতাংশ। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে জনপিছু কৃষি উৎপাদন বাড়েনি বরং কমে গেছে। উপরোক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে রাষ্ট্র সঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল ডঃ এ. এইচ বোয়েরমা বলেন —"১৯৬০ এর গোটা দশকে উন্নয়নশীল দেশে জনপিছু খাদ্য উৎপাদন তো বাড়েই নি, অধিকন্তু আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে উৎপাদন মোটেই আশাব্যঞ্জক নয় অবশ্য ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এসব দেশ এটুকু সন্তুষ্টি পেতে পারে যে অন্ততঃ তাদের মাথাপিছু উৎপাদন পড়ে যায়নি। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে এটুকু যথেষ্ট নয়।"

উন্নত দেশে কৃষির অবস্থা

উন্নত দেশগুলিও কৃষি ক্ষেত্রে কোন রকম উন্নতি দেখাতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ার কৃষি উৎপাদন ৩ শতাংশ কমেছে. নিউজিল্যাণ্ড উৎপাদনের পূর্ব মাত্রায় চলছে। খাদ্যোৎপাদনে উত্তর আমেরিকা, ও ওসিয়ানিয়া এক ও দুই শতাংশ পেছিয়ে পড়েছে। জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইজরাইলে খাদ্যোৎপাদন এক শতাংশ বেশী হয়েছে।

১৯৬৯ সালে বিশ্বে মৎস্য চাষে সাময়িক ঘাটতি দেখা দেয়। সাময়িক বলা হোল, কেননা পরের বছরই উৎপাদন প্রচণ্ডভাবে বাড়ে—৬ কোটি ১০ লক্ষ মেট্রিক টন। এ পর্যন্ত মৎস্য উৎপাদনে এটি একটি রেকর্ড। বরাবরের মত দক্ষিণ আমেরিকা ৭০ সালেও তাদের অগ্রগতি অপ্রতিহত রাখতে পেরেছে। শতাংশে মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৬ ভাগ এবং মূল্যায়নে তা দাঁড়িয়েছে ৩০০ কোটি ডলার।

খাদ্যোৎপাদনে অপ্রতিহত অগ্রগতি

১৯৭০-৭১ সাল ভারতের কৃষি উত্তি-হাসে এক নব দিগন্তের সচনা করল। এইবার সর্বপ্রথম খাদ্যোৎপাদন ১০০ কোটি মেট্রিক টন সীমা অতিক্রম করেছে।

খাদ্য শস্য উৎপাদনের খতিয়ান অনুযায়ী ১৯৭০-৭১ সালে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৭.৮১ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ১৯৬৯-৭০ সালে এই উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৯.৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। গতবারের চাইতে কর্ষিত এলাকার সংসাধান বৃদ্ধি অবশ্য হয়েছে ২০ মি.হেক্টর (মোট কর্ষিত জমি ১২৩ ৯০ মি. হেক্টর), কিন্তু ৮.৪ শতাংশ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে খাদ্য শস্য উৎপাদনই প্রধানতঃ অগ্রণী।

গম উৎপাদনে নতুন রেকর্ড

কৃষি মন্ত্রকের অর্থনৈতিক এবং পরি-সংখ্যান দপ্তরের হিসেবে অনুযায়ী, এই-বার নিয়ে উপর্যুপরি চতুর্থবার গম উৎ-পাদনে পুরোন রেকর্ড ভেঙে নতুন, আবার নতুন রেকর্ড কায়েম, এই ভাঙাগড়ার পালা চলেছে। এবছর গম উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ২৩.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ধরা হয়েছিল চতুর্থ যোজ-নার শেষ ভাগ পর্যন্ত গম উৎপাদন ২৪ মিলিয়ন মে. টন দাঁড়াবে। দেখা যাচ্ছে সবুজ বিপ্লবের কল্যাণে উপরোক্ত সীমা দুই/এক বছরের মধ্যে অতিক্রম করা মোটেই অসম্ভব কাজ হবে না।

বিশেষভাবে বলতে হবে ধান উৎপাদ-নের কথা। এক্ষেত্রে কর্ষিত এলাকা প্রকৃতপক্ষে নেমে গ্যাছে ০.৭ শতাংশ ভাগ; এ সত্ত্বেও গত বারের চাইতে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৭ শতাংশ ভাগ। অপেক্ষা-কৃত কম আকর্ষণীয় খাদ্য শস্য যথা উৎপাদনেও আশাতীত সাফল্য লাভ হয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে যে উৎপাদন সীমা ধার্য করা হয়েছিল, এবছর তা অতিক্রম করেও বর্ধিত উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন।

ডাল উৎপাদন, মানতে হবে, আশানু-রূপ হয়নি। গতবছরের চাইতে এবার উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে কিছু কম হয়েছে। এবছরের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে যে কয়টি প্রদেশ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে তাদের মধ্যে রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, তামিল নাড়ু, বিহার, হরিয়াণা অন্যতম। আর যেসব প্রদেশে উৎপাদন নেমে এসেছে তার মধ্যে আছে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর। নীচে কয়েকটি খাদ্য শস্যের উৎপাদন সম্বন্ধে কিছু বলা হোল:

ধান

খাদ্য শস্যের মধ্যে ধান উৎপাদনই অগ্রাধিকার করে আছে। ১৯৭০-৭১ সালে চাল উৎপাদনের রেকর্ড যোগ ৪২.৪৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। গতবারের চাইতে এবারে উৎপাদন হয় ২.০২ মিলিয়ন মে. টন বেশী এবং শতাংশে এই বৃদ্ধির হার ৫ ভাগ। এবারের উৎপাদনের বিশেষত্ব হোল কর্ষিত এলাকার পরিমাণ নেমে যাওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়েছে। যেসব প্রদেশ উৎপাদন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে তাদের মধ্যে রয়েছে তামিল নাড়ু, বিহার, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট এবং পাঞ্জাব। এই উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে হোল হেক্টর পিছু উৎপাদনে উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি। গত বছরের তুলনায় ১৯৭০-৭১ সালে হেক্টর পিছু উৎপাদন বেড়েছে ৫.৭ শতাংশ ভাগ।

গম

গম উৎপাদনে এইবার নিয়ে উপর্যুপরি চতুর্থবার সফল্য শিখর অভিযান অব্যাহত হয়েছে। এবারের উৎপাদন যা হয়েছে তাকে সর্বকালের রেকর্ড বলে ধরা যায়।

গতবারের চাইতে ৩.১৫ মিলিয়ন মে. টন অথবা শতকরা হিসেবে ১৫.৭ শতাংশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে এবারের গম উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ২৩.২৫ মিলিয়ন মে. টন।

এবারের উন্নততর উৎপাদনের শরিক হয়েছে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট। মেক্সিকান গমের উৎপাদনেও হয়েছে অভূতপূর্ব সাফল্য—১৯৭০-৭১ এর উৎপাদন গত বছরের তুলনামূলক উৎপাদনের চাইতে ৯০ বেশি অথবা শতকরা হারে ৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য হরিয়াণা ও পাঞ্জাবে উৎপাদন লক্ষ্য সীমার চাইতে অনেক বেশী হয়েছে। অধিক কি, এ দুটি প্রদেশের মেক্সিকান গম উৎপাদন যে কোন উন্নত দেশের মেক্সিকান গম উৎপাদনের সমকক্ষ।

বাজরা

অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় খাদ্য শস্যের মধ্যে পড়ে বাজরা। এবছরে তার উৎপাদন গত বছরের তুলনায় বাড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ। এ বছরে বাজরা উৎপাদনে রাজস্থান এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গত বছরের ৮.০৮ মে. টন থেকে উৎপাদন বাড়িয়ে তোলা হয় ২৬.৭৪ লক্ষ মে. টন। এছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধিতে অন্যান্য প্রদেশ, যেমন গুজরাট, হরিয়াণা উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, মহিশূর ও তামিল নাড়ুরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

ভুট্টা

ভুট্টা উৎপাদনেও নতুন রেকর্ড কায়েম করা হয়। ১৯৭০-৭১তে ৭ ৪১ মিলিয়ন মে. টন ভুট্টা উৎপাদন গতবারের উৎপাদন ৫.৬৭ মিলিয়ন মে. টনের চাইতে প্রায় ৩০ শতাংশ বেশী। উল্লেখযোগ্য উৎপাদন হয়েছে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, বিহার, গুজরাট এবং মহীশূরে।

খরিফ ও রবি খন্দের শস্য জোয়ার উৎপাদন কিন্তু গতবারের চাইতে ১৬ শতাংশ কম হয়েছে। এবারের উৎপাদন ছিল ৮.১৯ মিলি মে. টন।

'রাগি' উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে যৎসামান্য। ১৯৭০-৭১ সালের উৎপাদন দাঁড়ায় ২.২০ মি. মে. টন—গতবার ছিল ২.১২ মে.মি. টন। অবশ্য 'রাগি' শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে এজন্য যে, গতবছরের চাইতে কর্ষিত এলাকা ৯ শতাংশ ভাগ কম হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়নি। মহিশূর, মহারাষ্ট্র, বিহার ও তামিলনাড়ু 'রাগি' উৎপাদনে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছে।

রবি খন্দের আর একটি শস্য বার্লি। সামগ্রিক শস্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে সীমান্ত স্থান নিলেও তা অপাংক্তেয় হয়ে পড়েনি। ১৯৭০-৭১ সালে দেশে বার্লি উৎপাদন দাঁড়ায় ২.৮৭ মি. মে. টন।

ডাল উৎপাদন

খাদ্য শস্যের সামগ্রিক অগ্রগতি সত্ত্বেও ডাল উৎপাদন আশানুরূপ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এবছর ছোলার ডালের উৎপাদন পড়েছে মাত্র ৩ লক্ষ মে. টন। ১৯৭০-৭১ এ মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ৫২.৫ লক্ষ মে. টন। উৎপাদন নিম্নমুখী হওয়ার দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমটি বর্তমানের বজ্রকবলের কৃপাহতে শস্যটি বঞ্চিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় কারণটি হোল, গম এবং ভুট্টার মত উচ্চ ফলনশীল বীজের মত এটি লেখক্ষ্য নয়। অবশ্য সব রকমের ডাল মিলিয়ে মিশিয়ে এবারের মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ১১.৫৮ মি. মে. টন—যা গতবারের উৎপাদনের চাইতে সামান্য কম।

এবারের খাদ্য শস্য উৎপাদনের একটি বিশেষত্ব হোল, বৃষ্টিপাত সিঞ্চিত এলাকার বর্ষা আশানুরূপ হয়নি। যেমন পাঞ্জাবে এবারে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস মাস পর্যন্ত রবি খন্দের শস্য বৃষ্টির আনুকূল্য লাভ করেনি বল্লেই চলে। এছাড়া, এপ্রিল মে মাসে শস্য পাকার মুখে অকাল বর্ষণ ও শিলা বৃষ্টির প্রাবল্যে শস্যের প্রভূত ক্ষতি হয়। অবস্থা আরো সঙ্গিন হয়ে ওঠে কেননা ঠিক এই সময়েই ভাকরা বাঁধে জল নেমে যাওয়ার দরুণ হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দেয়। এর ফলে সেচের কাজেও বাধার সৃষ্টি হয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও হরিয়াণা ও পাঞ্জাব যে উপর্যুপরি চতুর্থ বার গম উৎপাদনে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখতে পেরেছে, তা থেকেই সিদ্ধ হয় "সবুজ বিপ্লবের" কল্যাণে কৃষকরা আজ আর পূর্বের মত প্রকৃতি নির্ভর নন। ভারতের কৃষি উৎপাদনে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ইস্পাত শিল্পের সমস্যা

সম্প্রতি ইস্পাত শিল্পে নানান সমস্যা দেখা দেওয়ায়, উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে এবং উৎপাদন মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক কারখানায় উৎপাদন-ক্ষমতার তুলনায় কম উৎপাদন হচ্ছে। টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কারখানায় উৎপাদন নির্দিষ্ট ক্ষমতার তুলনায় মোটামুটি সন্তোষজনক এবং ভিলাই ইস্পাত কারখানাতেও উৎপাদন বেশ উৎসাহ ব্যঞ্জক হলেও রাষ্ট্রায়ত্ত অন্যান্য ইস্পাত উৎপাদনকারী উদ্যোগ লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে পড়েছে।

ইস্পাত শিল্পে শ্রমিক অশান্তি ছাড়াও, পরিচালন এবং প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রেও নানান রকম সমস্যা রয়েছে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির পেছনে শ্রমিকের দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মজুরী বাড়া সত্ত্বে শ্রমিকপিছু উৎপাদন বাড়েনি। আবার কয়েকটি স্থানে অযৌক্তিকভাবে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফলে দেশকে তার মাশুল গুণতে হচ্ছে। বিশ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইস্পাত কারখানায়, এক ঘন্টা কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ হোল ২ লক্ষ টাকার উৎপাদন নষ্ট হওয়া। যাঁরা এভাবে কাজ বন্ধ করে দেন, সম্ভবতঃ তাঁরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন নন যে এর ফলে কারখানার যন্ত্রপাতির কর্মক্ষমতা কতখানি নষ্ট হচ্ছে। সব থেকে বড় কথা, এরফলে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

যেখানে ৯০ লক্ষ টন উৎপাদন হবার কথা সেখানে এবারে উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৭০ লক্ষ টনেরও কম। অথচ উৎপাদন এবং চাহিদার মধ্যেকার ব্যবধানের শতকরা ৮০ ভাগ আমরা মেটাতে পারি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা না হয়ে এই ব্যবস্থার [illegible] করতে আমাদের বিদেশ থেকে ইস্পাত আমদানী করতে হচ্ছে। উন্নত দেশগুলির কাছ থেকে বেশী দাম দিয়ে পণ্য কিনে আমরা তাদের আরো ধনী হবার সুযোগ করে দিচ্ছি। কারণ, উন্নতির সুযোগ গ্রহণে আমরা অপারগ।

সুষ্ঠু সরবরাহ

সুষ্ঠু উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, বিশেষজ্ঞ সেবা, মেরামতী ব্যবস্থা, সুযোগ্য পরিচালন, প্রভৃতির সুযোগ যাতে সবদা অকৃপণভাবে পাওয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে, কোন রকমে কাজ চালানো গোছের ব্যবস্থায় চলবে না। যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা কাঁচামাল সুষ্ঠুভাবে সরবরাহের জন্য ত্রৈমাসিক বা ষান্মাষিক ভিত্তিতে না করে, একটা নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে। ইস্পাত কারখানার ক্ষেত্রে এই সময় সীমা তিন বছরের হওয়া উচিত। প্রতি বছরের শেষে, পরিকল্পনা এবং তার অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

সর্বোচ্চমাত্রায় উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি লৌহ তৈরীর সঙ্গে সম্পর্কীত। জাপানের উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানে লৌহ চুল্লী আয়তনের প্রতি ঘন মিটারে, প্রতিদিন ২.৫ মেট্রিক টন করে উত্তপ্ত ধাতু (হট মেটাল) উৎপন্ন হচ্ছে। আমাদের দেশে এর পরিমাণ হোল এক টনের মত। লৌহ চুল্লীতে ব্যবহৃত কয়লার ব্যবহারও আমাদের দেশে যথেষ্ট বেশী। প্রতি টন উত্তপ্ত ধাতুর জন্য ৮০০ থেকে ৯০০ কিলোগ্রাম কয়লা খরচ হয়। অথচ প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির ফলে জাপানে এর খরচ ৫০০ কিলোগ্রামেরও [illegible] এই খরচ ৩০০ কিলোগ্রামে নামিয়ে আনতে সক্ষম হবেন। সারা বিশ্বে উন্নত মানের কয়লার ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই।

আমাদের দেশের কয়লায় মধ্যে ছাইয়ের অংশ বেশী। তা সত্ত্বেও ব্লাস্ট ফার্নেসের উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এজন্য প্রথম করণীয় হোল, চাজের আকারের আকরিক লৌহ আরো ছোট করতে হবে। বর্তমানে, আমরা সাধারণতঃ ৭৫ মিঃ মিঃ ব্যাসের আকরিক লৌহ ব্যবহার করি। জাপান দেশে এর আয়তন ৪০ মিঃ মিঃ। আকরিক লৌহকে ছোট ছোট আকারে ভেঙে নিয়ে ব্যবহার করতে বিশেষ অসুবিধা বা বড় ধরনের বিনিয়োগেরও প্রয়োজন হবে না।

আর একটি সমস্যার দিকে এবারে দৃষ্টিপাত করা যাক। উন্নত দেশগুলিতে লৌহ চুল্লীর উৎপাদন তাপ ১৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছেছে। বড় রকম মেরামতীর সময় আমাদের ব্লাস্ট ফার্নেসগুলির উৎপাদন তাপ বাড়ানো যেতে পারে। আবার, উত্তপ্ত ধাতু উৎপাদনের সর্বাধিক যোগ দিতে গেলে, ইস্পাত তৈরীর পর অতিরিক্ত ধাতুকে লৌহ পিণ্ডে রূপান্তরিত করার সুবিধা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে বাড়তি উত্তপ্ত ধাতুকে লৌহ পিণ্ডে বিক্রি করা যায়। লৌহ পিণ্ডের আভ্যন্তরীণ চাহিদা সম্পর্কে যখন আশান্বিত হবার কারণ নেই, তখন এর উৎপাদন কম করার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। পূর্ব অভিজ্ঞতাতেও দেখা গেছে যে, উদ্বৃত্ত ইস্পাত ও লৌহ পিণ্ড বিদেশের বাজারে বিক্রি হয়ে গেছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ মে. টন। পরবর্তী [illegible] রপ্তানি কম করেছি। আশা করা যায়

যে, জাপান ব্যতিরেকে অন্যান্য বাজার আমাদের অনুকূল হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কয়েকটি উন্নত দেশ আবহাওয়া দূষিতকরণ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার ফলে, আমাদের কাছ থেকে লৌহ পিণ্ড কিনতে আগ্রহী হবে। তাছাড়া, আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহের বিকাশশীল অর্থনীতির পটভূমিকায় ফাউণ্ড্রি গ্রেড লৌহ পিণ্ডের ভালো বাজার পাওয়া যাবে।

ব্যয় সঙ্কোচন

আর একটি প্রশ্ন হোল, আমরা 'সিনটারিং' এর ওপর জোর দেব, না 'পেলেট' ধরনের রূপান্তরিত আকর ব্যবহার করবো। গত ৭।৮ বছর ধরে এই নিয়ে বিতর্ক চলেছে। এক্ষেত্রে কারিগরী দিকগুলি খুব ভালোভাবে বিবেচনা করেই আমাদের অগ্রসর হওয়া সমীচীন। দূরবর্তী স্থানে পরিবহনের দিক থেকে পেলেট সুবিধাজনক। অন্যদিকে সিনটার কারখানা এলাকাতেই উৎপন্ন করতে হয়। কারণ সিনটার-এ কারখানার অনেক অব্যবহার্য বস্তু কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে। অধিক লৌহ ও আকর রপ্তানিতে এ পর্যন্ত বড় বড় চাকই পাঠানো হয় এবং মিহি আকর সবটা কাজে লাগানো হয় না। এই মিহি আকরকে ভবিষ্যতে পেলেট-এ রূপান্তরিত করে কাজে লাগান যেতে পারে এবং তা বৃহদাকার আকরের চেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে; এমন কি তা ব্যয় সঙ্কোচেও সাহায্য করবে। কিরিবুরু, বাইলাডিলা, গোয়া—বলতে গেলে প্রতি খনিতে মিহি আকর স্তূপীকৃত হয়ে থাকলেও রপ্তানিতে বৃহদাকার আকর ব্যবহার করা হয়। খনি থেকে আকরিক লৌহ উত্তোলনের সময় যে নীলাভ মিহি আকার সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ লৌহাংশ থাকে। সুতরাং নীলাভ এবং মিহি আকর পেলেট-এ রূপান্তরিত করলে এর উপযোগ যথেষ্ট বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। কাজেই মিহি নীলাভ আকর কাজে লাগানোর নীতি গ্রহণ করলে তা পালেট রূপে রপ্তানিই বিধেয় বলে মনে হয়।

ব্লাস্ট ফারনেস, এল্. ডি কনর্ভাটার প্রাইমারী রোলিং মিল, কনটিনিউয়াস কাস্টিং মেশিন, এবং অন্যান্য রোলিং মিলের আয়তন বৃদ্ধি এবং প্রোসেসিংএর ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি হয়েছে। এর ফলে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যয় সংকোচ সম্ভব। অবশ্য ব্লাষ্ট ফারনেস, এল ডি কনর্ভাটার এবং রোলিং মিল প্রভৃতি যন্ত্রপাতির আয়তন বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সংক্রান্ত কাজের জটিলতাও বাড়বে। তাই স্বয়ংক্রিয় কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

বর্তমান পরিস্থিতিতে অগ্রগতির পর্যায়ে বৃহদায়তন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা খুব যুক্তিযুক্ত হবেনা। সমকালীন ও সম মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বিনিয়োগ বাহুল্য কমবে; ফলে লভ্যাংশও বাড়বে। এতে বিশেষজ্ঞ মন্ত্রণা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস, কারখানা স্থাপনের সময় সংক্ষিপ্ততা ইত্যাদি যে হবে তাই নয়, রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যাও দূর হবে। সর্বোপরি, উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যসূচী ত্বরান্বিত হবে এবং আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি আরো দ্রুততর হবে।

নবীনতম পদ্ধতি

সারা পৃথিবীতে এখন এল ডি প্রক্রিয়ায় ইস্পাত উৎপাদনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। শুরুতে রৌরকেল্লা ইস্পাত কারখানায় একটি ৪০ টনি এল. ডি. কনর্ভাটার বসানো হয়। কারখানা সম্প্রসারণের সময় তা বাড়িয়ে ৬০ টনের করা হয়েছে। বোকারোতে প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ২.৫ মেট্রিক টন পর্যন্ত, একটি বড় 'এল্ ডি ভেসেল' বসানো হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে দুটি ২৫০ টনের এল. ডি কনর্ভাটার বসানোর প্রস্তাব রয়েছে। মোটামুটিভাবে এগুলিকে বড় বলা গেলেও পৃথিবীর অন্যত্র ৩০০।৩৫০ টনের এল. ডি. কনর্ভাটার ব্যবহৃত হচ্ছে। নতুন ভাবে ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার যেসব প্রচেষ্টা চলেছে, তা হয় এল. ডি কনর্ভাটারের মাধ্যমে, না হয় ইলেকট্রিক ফারনেসে। আমাদের দেশে ইস্পাত উৎপাদনে আধুনিক ধরনের ১০০—২৫০ টনি এল. ডি. কনর্ভাটারের ওপর জোর দেওয়া শ্রেয় মনে হয়।

এল. ডি. কনর্ভাটারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল, 'অপারেশানাল ফ্লেক্সিবিলিটি' বাড়ানো এবং উত্তাপ সময় কমানো। এখানেও আবার আমাদের দেশের উৎপাদন পদ্ধতি এবং এল ডি. কনর্ভাটারের আভ্যন্তরিক নির্মাণ আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় অনেক পেছনে। এদেশে ব্যবহৃত এল. ডি. কনর্ভাটারের উত্তাপ সহ্যসীমা যেখানে ২৫০ মান, সেখানে উন্নত দেশে ব্যবহৃত এল. ডি ৭০০ মান উত্তাপ সহনশীল। এজন্য ভাল রিফ্র্যাকটরি সরঞ্জাম এবং লাইনিং তৈরী করার প্রধান সমস্যা দূর করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এল. ডি. কনর্ভাটার পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদনে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। যেমন উচ্চ কার্বনযুক্ত ইস্পাত, মিশ্র ইস্পাত, এমন কি নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত পর্যন্ত এল. ডি. প্রক্রিয়ায় তৈরী হচ্চে। এটা আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের দেশে এ ব্যাপারে একাগ্র চেষ্টা চালানো উচিত। এর পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা, বিশেষ ধরনের ইস্পাতের অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিকল্পনায় কাজে লাগবে।

তা'বলে আমাদের সাবেকী খোলা লৌহ চুল্লিতে উৎপাদনে অবহেলা করলে চলবেনা। ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অর্থাৎ ওপেন হার্থ ফারনেস, কম সাহায্য করছেনা। 'অক্সিজেন ল্যান্সিং', ফেটলিং এবং ব্লাস্ট ফারনেসের ছাদ তৈরীর উপযুক্ত রিফ্র্যাক্টরি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় লাঘব এবং উৎপাদন ঊর্ধ্বহারে বজায় রাখা সম্ভব। আমাদের ক্ষেত্রে আলোচ্য পদ্ধতি অত্যন্ত দরকারী; কারণ বর্তমানে ইস্পাত গলানোর মোট পরিমাণের শতকরা ৮০ ভাগ সম্পাদিত হয় খোলা লৌহ চুল্লির সাহায্যে।

'কনটিনিউয়াস কাস্টিং' প্রভৃতি বিভাগ

অন্যান্তর বড় অবদান, যার ফলে গত দশকে প্রচণ্ড অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে উৎপাদনে ব্যয় কম হয়। উৎপাদন ক্ষমতা ৩/৪ মিলিয়ান টন হলে তবেই প্রাইমারি স্ল্যাবিং এবং ব্লুমিং মিলে ব্যয় সাশ্রয়ের কথা ভাবা যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট আকারের কন্‌টিনিউয়াস কাস্টিং প্ল্যান্ট স্থাপন করাই বরণীয়। সাবেকী ব্লুমিং এবং স্ল্যাবিং মিলে ধাতু পিণ্ড থেকে উৎপাদন যেখানে শতকরা ৮৬ ভাগের মত, সেখানে কনটিনিউয়াস কাস্টিং মেশিনে উৎপাদন শতকরা ৯৫ ভাগ। অর্থাৎ সাবেকী রোলিং মিল-এর চেয়ে শতকরা ৮।৯ ভাগ বেশী। বিশুদ্ধ ইস্পাত উৎপাদন ব্যয় সংকোচনে সাহায্য করবে।

১৯৫৫ সালে সমগ্র বিশ্বে কনটিনিউয়াস কাস্টিং পদ্ধতিতে উৎপাদন ছিল ০ ৫ মিলিয়ন টন, ১৯৭০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭ মি টনে, এবং ১৯৭২ সালে হবে ৮৫ মি টন। সে তুলনায় আমাদের উৎপাদন ক্ষমতার কথা না তুললেই ভাল। বহু আগে মহীশূরে ১০ হাজার টনের ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ছোট কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। পরে মোট ১ লক্ষ টনের ইস্পাত কারখানা স্থাপন করলেন মুকুন্দ গোষ্ঠি। তামিল নাড়ুর আরকোনামে আরও একটি কারখানা এবছর চালু করা হবে। এটি উৎপাদন করবে ১ লক্ষ টন বিলেট। বাড়তি পড়তি লোহার সন্তোষজনক যোগানের ফলে বহু উদ্যোগী শিল্পপতিরা কনটিনিউয়াস কাস্টিং প্রক্রিয়ায় ইস্পাত উৎপাদনের বৈদ্যুতিক চুল্লি বসিয়েছেন। এখন স্থির হয়েছে ৫০,০০০ টনের কনটিনিউয়াস কাস্টিং মেশিন বসিয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট ইস্পাত কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিলেট এবং অতিরিক্ত ইস্পাত উৎপাদন করা হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ধরনের ইস্পাতের জড় করে রাখার সম্ভাবনা বেশী বলে জানা গেছে। উত্তপ্ত ইস্পাতকে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করার ফলেই এটা হয়। আগেকার পদ্ধতিতে ইস্পাতকে ধীরে ধীরে কয়েকদিন ধরে ঠাণ্ডা করার বদলে জল ছিটিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঠাণ্ডা করা হয়। এর ফলে ইস্পাতে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার এদিকে ভালোভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। (দুর্গাপুর স্টীল টাইডিং এর সৌজন্যে)

ভিলাইএর ষষ্ঠ ব্লাস্ট ফারনেস

ভিলাইএর ষষ্ঠ ব্লাস্ট ফারনেসটি ৩১শে জুলাই চালু করা হয়। ভিলাই ইস্পাত কারখানার প্রথম দফা সম্প্রসারণ কার্যসূচীতে এই ইউনিট থেকে বছরে ৬ লক্ষ টন লোহ পিণ্ড উৎপাদন করা যাবে।

নতুন ব্লাস্ট ফারনেসের নক্সা ও নির্মাণ কাজ হিন্দুস্থান ইস্পাত কারখানার কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনীয়ারিং এবং ডিজাইন বিউরো সম্পূর্ণ রূপে ভারতীয় যন্ত্রবিদ্‌দের দ্বারা সম্পন্ন করেছে। এই প্রথমবার ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারগণ ব্লাস্ট ফারনেস সংক্রান্ত সমুদয় কাজ নিজেরাই সমাধা করলেন।

এই চুল্লীটি তৈরী করতে খরচ পড়েছে ১৪ কোটি টাকা এবং শতকরা ৭৫ ভাগ দেশীয় যন্ত্রপাতি এতে ব্যবহার করা হয়েছে। বেশীর ভাগ সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে রাঁচীর ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং করপোরেশন, দুর্গাপুরের মাইনিং এণ্ড এ্যালায়েড মেশিনারি করপোরেশন এবং অন্যান্য ভারতীয় প্রস্তুতকারকগণ। ব্লাস্ট ফারনেসের জন্য প্রয়োজনীয় শতকরা ৬৬ ভাগ যন্ত্রপাতি, ৬৭ ভাগ রিফ্রাকটরি এবং স্ট্রাকচারাল দেশীয় সূত্রে পাওয়া গেছে। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সম্পূর্ণ নির্মাণকার্য ভারতীয় যন্ত্রকুশলী ও কারিগররাই সম্পন্ন করেছেন।

বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য উন্নত দেশের মত ব্লাস্ট ফারনেসটিতেও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়েছে। সাবেকী ব্লাস্ট ফারনেসের তুলনায়, এই ইউনিটের কয়েকটি বিশেষ গঠনগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, ফারনেসটিতে একটি এয়ার কুলিং বটম থাকবে। ফারনেসের লাইনিং জীর্ণ হয়ে গেলে, তা পরিমাপ এবং পরীক্ষা করার জন্য রেডিও আইসোটোপ-এর সংস্থান রাখা হয়েছে, নির্মাণের দিক থেকেও ব্লাস্ট ফারনেসটিতে অনেক নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফারনেসের ভিত্তি নির্মাণে ২৬ ঘণ্টার রেকর্ড সময়ের মধ্যে, একযোগে ২ হাজার ঘন মিটার রিইনফোর্সড কনক্রিট ঢালা হয়। এছাড়াও যন্ত্রপাতির বড় বড় অংশগুলির সম্মেলন করে ঠিক জায়গায় বসানোর কাজ, ভারতীয় যন্ত্রবিদ্‌গণ নিপুণভাবে সম্পন্ন করেছেন। রিফ্রাকটরি লাইনিং এর কাজও রেকর্ড সময়ে সম্পূর্ণ হয়েছে।

পরবর্তী সম্প্রসারণে, কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে বছরে ৪০ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য ইস্পাত উৎপাদনের নতুন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা হবে, যাতে দেশের শিল্প ক্ষেত্রের ক্রম বর্দ্ধমান চাহিদা মেটাতে, ইস্পাতকে ভারী প্লেটে এবং অন্যান্য দ্রব্যে রূপান্তরিত করা যায়। এই সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রকল্পের বিস্তারিত রিপোর্ট হিন্দুস্থান ইস্পাত কারখানার কেন্দ্রীয় বিউরো প্রণয়ন করেছেন।

দেশের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা ভিলাই চালু হবার পর থেকে ১৫ ৭ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদন হচ্ছে। ভারী রেল, স্ট্রাকচারাল, ইস্পাতের তার প্রভৃতি সহ এই কারখানায় উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্য দক্ষিণ-পূর্ব এবং পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং দূর-সংযোগ ব্যবস্থা

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে ভারতীয় ডাক এবং তারবিভাগের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। সারা দেশ জুড়ে সংযোগ সঞ্চারের এক জাতীয় 'জাল' বোনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যাতে দেশের এক প্রান্তের মানুষ অপর প্রান্তের মানুষের সঙ্গে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সোজাসুজি সংযোগ স্থাপন করতে পারে এবং সেই পরিকল্পনা রূপায়নের পথে ডাক এবং তার বিভাগ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশের বড় বড় শহরের অনেকগুলোর মধ্যেই "সাবস্ক্রাইবার ট্রাঙ্ক ডায়ালিং এবং "টেলেক্স" ব্যবস্থা চালু হ'য়ে যাবার ফলে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যাচ্ছে এবং কথা বলা, বা টেলিপ্রিন্টারের সাহায্যে বার্তা বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে।

বড় বড় শহর এবং শিল্প কেন্দ্রের বাইরে দেশের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পড়ে রয়েছে সেইসব অঞ্চলগুলোকেও পরিকল্পনার আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়নি। দূরসংযোগের জন্যে "ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক"-এর সঙ্গে এই অঞ্চলগুলোকে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে নিকটতম টেলিফোন এক্সেচেঞ্জ বা ট্রাঙ্ক এক্সচেঞ্জের ডিস্‌টেন্স পাব্লিক কল্ অফিস এবং নিকটতম বড় টেলিগ্রাফ অফিসের সঙ্গে যুক্ত টেলিগ্রাফ অফিস খোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিকল্পনাতে মোট চার হাজার পাব্লিক কল অফিস, এবং চার হাজার টেলিগ্রাফ অফিস খোলার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এর জন্যে যথাক্রমে ১২ কোটি এবং সাত কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়াও চতুর্থ পরিকল্পনাতে দূরাঞ্চল এবং দুর্গম অঞ্চলে বেতার যুক্ত পি. সি. ও খোলার কথাও ভাবা হয়েছে এবং এর জন্য মোট এক কোটি টাকা বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে। এই বেতার সংযোগের জন্যে যে এক চ্যানেল বিশিষ্ট অতি উচ্চ কম্পন (V.H.F) প্রয়োগকারী যন্ত্রের প্রয়োজন হবে, তা তৈরী করা হবে আমাদের দেশেই। পরিকল্পনার পাঁচ বছরে এরকম দু'শ পি. সি. ও খোলা যাবে বলে ধরা হয়েছে।

সুশান্ত কুমার রায়

বর্তমানে আমাদের দেশে মোট ৩,৮২১টি ডিস্‌টেন্স পাব্লিক কল্ অফিস রয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনাতে এর প্রায় পঞ্চাশ শতাংশকে স্থানীয় টেলিফোন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ গুলোর বেশীর ভাগই হবে ছোট ছোট স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং অন্যগুলি ম্যানুয়েল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ।

ডাক এবং তার বিভাগের প্ল্যানিং শাখা কোন কোন অঞ্চলের ছোট স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জগুলোকে সংযুক্ত করে তাদের মধ্যে গ্রুপ ডায়ালিং স্কীম করার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং বর্তমানে এটা পরীক্ষাধীন রয়েছে। এ পরীক্ষা সফল হলে, কাছাকাছি এলাকাগুলিতে যেখানে এরকম ছোট ছোট স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন কেন্দ্র রয়েছে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা আরও সহজ হবে।

আশা করা যাচ্ছে, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে আমাদের সারা দেশে; বিশেষ করে, পল্লী অঞ্চলের দূর-সংযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। এর পথে বিশেষ করে সহায় হবে আমাদেরই দেশে তৈরী, তামার তারের বিকল্প এ্যালুমিনিয়মের তার A.C.S.R তার এবং এর ফলে আমাদের মূল্যবান বিদেশী মুদ্রাও সঞ্চয় হবে।

সমবায়ে সার তৈরী

ভারতীয় কৃষি সমবায় সার উৎপাদক সংস্থা গুজরাটের কলোল ও কাণ্ডলায় সার উৎপাদনের দুটি কারখানা নির্মাণের চুক্তি সাক্ষরিত করে সমবায় ভিত্তিতে সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক পদচিহ্ন সৃষ্টি করলেন। কলোলের কারখানায় বাৎসরিক উৎপাদন ধরা হয়েছে চার লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া এবং কাণ্ডলার কারখানায় তিন রকম মানের এন. পি. কে জাতীয় সার তৈরী হবে বছরে চার লক্ষ মেট্রিক টন।

এন. পি. কে জাতীয় সার তৈরীর কারখানা ১৯৭৩ এর শেষাশেষি এবং অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়া সারের ইউনিট দুটি তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হবে ১৯৭৪ এর প্রথম ত্রৈমাসিকের মধ্যে।

সমবায় ভিত্তিতে উৎপাদিত সার বিতরণের ভার পাবেন উক্ত উদ্যোগের দশ লক্ষ শেয়ার হোল্ডার। দশটি প্রদেশের দশটি সমবায় প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত কারখানার শেয়ার হোল্ডার। এই প্রদেশগুলি হোল-পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, হরিয়াণা, গুজরাট, মধ্য প্রদেশ, তামিল নাড়ু, রাজস্থান, মহীশূর এবং অন্ধ্র প্রদেশ।

ধনধান্যে পড়ুন

দেশকে জানুন

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প পুনরুজ্জীবন প্রয়াস

অক্রূর নাথ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে সংকট দেখা দেবার মূল কারণ হ'ল এ রাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা। দেশের সরকারে যদি স্থায়িত্ব না থাকে তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হবেই। পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছর যাবৎ সরকারের মধ্যে ঘন ঘন পরিবর্তন ও রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, শ্রমিক মালিকের সম্পর্কের অবনতি—এ রাজ্যের শিল্প-সংকটের অন্যতম কারণ। শিল্পপতিরা সংশয়ের মধ্যে অধিক বিনিয়োগ নীতি ত্যাগ করে মূলধন অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবেন। এরই অনিবার্য পরিণাম হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ২৫০টির অধিক শিল্পসংস্থা বন্ধ হয়ে আছে, বেকার সমস্যা আরও ভয়াবহ হয়েছে—শিল্প লাইসেন্স মঞ্জুরের সংখ্যা ক্রমশ: নেমে আসছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে এ দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের জন্য কয়েকদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, রাজ্যসরকার কর্তৃক ঘোষিত "ষোল-দফা" কার্যসূচীর কথা উল্লেখ করেছেন। এ কার্যসূচীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হ'ল প্রধান :—

১। যে সব শিল্প লোকসানে চলছে সেগুলির পরিচালন ভার সরকার নিজের হাতে নেবেন ;

২। শিল্প আইনের সংশোধন করা ,

৩। বিভিন্ন কলকারখানায় একাধিক 'শিফ্‌ট' চালু করা ;

৪। এ রাজ্য যাতে সহজে কাঁচামাল পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা ;

৫। শিল্পে ঋণদান সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন এবং ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ;

৬। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর দু'হাজার ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা স্থাপন ;

৭। জেলায় জেলায় সমীক্ষা চালিয়ে শিল্প স্থাপন ও বেকার যুবকদের চাকুরী দানের ব্যবস্থা করা ;

৮। কলকাতা, হাওড়া এবং ২৪ পরগণা' বাদে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গকে "অনুন্নত এলাকা" বলে ঘোষণা করা ;

তাছাড়া শ্রমিক মালিকের সম্পর্কের উন্নতি, আবেদন পত্রের দ্রুত মঞ্জুরি প্রভৃতি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাও এ ষোলদফা কার্যসূচীর মধ্যে আছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সমস্যার মূলে যে কারণগুলি বর্তমান সেগুলিকে দূরীভূত করার কথাই ঐ ষোলদফা কার্যসূচীর মধ্যে গ্রহণ ক'রে রাজ্যসরকার পশ্চিমবঙ্গের শিল্প পুনরুজ্জীবনের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ফেলেছেন একথা বলা যায়।

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পসংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। তাদের মধ্যে ভারতীয় শিল্প বিনিয়োগ কর্পোরেশন, ভারতীয় শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং স্টেটব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া প্রধান। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দেখা যায়, সর্বভারতীয় ঋণ প্রদানের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের অংশ শতকরা ৬.৭ ভাগ থেকে বেড়ে হয়েছে শতকরা ১১.৭ ভাগ। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী শিল্প সংস্থাগুলি পশ্চিমবঙ্গ অর্থ কর্পোরেশনের কাছ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সালে ঋণ পায় ৫৭.৭ লক্ষ টাকা, ১৯৬৮-৬৯ সালে তা দাঁড়ায় ৭৬.৪ লক্ষ টাকায়।

বিভিন্ন ঋণদান সংস্থা থেকে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ আপাততঃ বৃদ্ধি পেয়েছে দেখা গেলেও প্রকৃত বিনিয়োগ যে আশানুরূপ হচ্ছে না তা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই যাতে ঋণদান সংস্থাগুলিকে সুসংগঠিত করা যায় এবং শিল্পে ঋণদান যাতে সহজতর হয় তার দিকে লক্ষ্য দেওয়া এখনই কর্তব্য।

ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কৃষিতে যে উদ্বৃত্ত দেখা দেবে তা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োগ করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। সেজন্য ক্ষুদ্র শিল্পগুলি জেলা বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে গড়ে তোলা উচিত। তাহলে একাধারে স্থানীয় লোকেদের ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা যেমন মিটবে, অন্যদিকে বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের সমস্যাও তত আশঙ্কাপূর্ণ থাকবে না।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার সন্তোষজনক বলা যায়। ১৯৬১-৬২ সাল থেকে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত এ রাজ্যে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩,৫৭১ থেকে ১৬,৮১০টিতে পৌঁছেছে। এর উপর রাজ্য সরকারের "ষোলদফা" কার্যসূচীতে উল্লেখিত প্রতিবছর দু'হাজার ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা স্থাপন যদি সম্ভব হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের সংকট অনেকটা কাটিয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

সম্প্রতি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সুফল আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংক শাখার প্রসারের ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসংস্থাগুলি, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন করপরেশনের সাফল্যজনক কাজকর্ম

সুভাষ বসু

চার বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন লিঃ স্থাপিত হয় মাত্র ১৩.৩৮ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে। ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা পশ্চিম বাংলার ৩৬টি কোম্পানীকে সহজ শর্তে প্রতিষ্ঠানগত ঋণ দেয় ৯৫.৬৯ লক্ষ টাকা এবং বিনিয়োগের ওপর মোট উদ্বৃত্ত থাকে ২.৪৭ লক্ষ টাকার মত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মালিকানাধীন এই করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হোল ৫ কোটি টাকা। কেবল কলকাতা শহর নয়, বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত নানা রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠান এই করপোরেশনের কাছ থেকে ঋণ লাভ কোরতে পারে। করপোরেশন যে-সব শিল্পকে সাহায্য দিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঋণ পেয়েছে—এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রায়-৩৩.৩৫ লক্ষ টাকা। এরপর রসায়ন ও ঔষধপত্র শিল্প-১১.৫০ লক্ষ টাকা, মুদ্রণ শিল্প-১০.৩৫ লক্ষ টাকা। অবশিষ্টাংশ পায় কেবলস্, কাঁচ ও মৃৎ শিল্প, খাদ্য সংরক্ষণ, বস্ত্রশিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি। করপোরেশন কর্তৃক সাহায্যদানের ফলে রাজ্যে সাত হাজারেরও বেশী ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়েছে।

এইসব শিল্পের মধ্যে অন্ততঃ ২৫টি হোল মাঝারী ও ছোট শিল্প। স্থায়ী ও চলতি মূলধন হিসেবে এগুলি করপোরেশনের কাছ থেকে ঋণ পেয়েছে। কয়েকটি শিল্প যে-সব শেয়ার বাজারে ছেড়েছিল করপোরেশন সেগুলিরও দায় গ্রহণ করে।

অল্প কয়েক যন্ত্রবিদ-উদ্যোক্তা, যাঁদের হাতে বেশ লাভজনক প্রকল্প রয়েছে অথচ উপযুক্ত সিকিউরিটির অভাবে কোন প্রতিষ্ঠান তাঁদের ঋণদানের বিষয়টি চিন্তাও করে দেখেননি, এই করপোরেশন তাঁদেরও সাহায্য দিয়েছেন।

উদ্যোক্তাদের উৎসাহদান

দু' একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। দক্ষিণ কলকাতায় পেস্‌কেল একটি ছোট কারখানা। সয়াবিন থেকে এরা 'পুষ্টিন' নামে এক ধরণের প্রোটিন খাদ্য তৈরী করে। এই খাদ্যটি ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। দু' বছর আগে পুরোপুরিভাবে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের সাহায্য পুষ্ট হয়ে এই সংস্থাটি কাজ শুরু করে। করপোরেশন সংস্থাটিকে ৪৩,০০০ টাকা ঋণ দেয়। আজ এই কারখানায় ২৫ জন ব্যক্তি কাজ কোরছেন এবং এর বাৎসরিক উৎপাদন হোল প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মূল্যের।

অনুরূপভাবে উত্তর কলকাতার একটি ছোট মুদ্রণ প্রেস—প্রেস এজেন্টস্ মূলধনের অভাবে প্রেস সম্প্রসারণ কোরতে অক্ষম ছিল। করপোরেশন দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেয় ৮৫,০০০৲ হাজার টাকা। এই সাহায্যের ফলে প্রেসটি ৪০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি কোরতে সক্ষম হয়।

মধ্য কলকাতার একটি এঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান—মেকানিক্যাল স্পেশালিটিস্ (প্রাইভেট) লিঃ করপোরেশনের কাছ থেকে দেড় লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এই প্রতিষ্ঠানের অনৈক মুখপাত্র বলেন যে "এ ধরণের বিনিয়োগে করপোরেশন বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছে। এ ধরণের ঝুঁকি নিতে আর কোন প্রতিষ্ঠানকে দেখা যায় না। আর এ ঝুঁকি না নিলে আমাদের মত প্রতিষ্ঠান কোন দিনই মাথা তুলতে পারতো না। তাছাড়া সুনিপুন যন্ত্রবিদ-উদ্যোক্তাগণ নিজেদের ব্যবসা শুরু করার কথাও ভাবতেন না।"

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন এ ধরণের উদ্যোক্তাদের নিয়ে সীমাবদ্ধ যুক্ত প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ কোরতে ইচ্ছুক। করপোরেশন ব্যাপকভাবে দায় গ্রহণ করবে এবং শিল্প অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলির মূলধনী শেয়ার গ্রহণ কোরতেও ইচ্ছুক। করপোরেশন ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণের ওপর ৮ শতাংশ, ২ লক্ষ পর্যন্ত ৯ শতাংশ এবং ২ লক্ষের ওপর ১০ শতাংশ সুদ গ্রহণ করে। ঋণ পরিশোধের সময়ও বেশ দীর্ঘ।

শিল্প প্রসার

পশ্চিম বাংলার শিল্পরেখা অন্যান্য রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র। এখানে রয়েছে প্রধানতঃ বড় বড় শিল্প এবং এর অধিকাংশ কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ। এবং কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। এই রাজ্যে সুষম শিল্পোন্নয়নের জন্যে সবার আগে প্রয়োজন হোল, উপযুক্ত ভৌগোলিক ভিত্তিতে শিল্পগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে করপোরেশন অগ্রণী হয়ে বিভিন্ন জেলায় স্থায়ীর

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বন্যা কবলিত এলাকায় লাঠিশাল ধানের চাষ

অমিয় কিশোর মণ্ডল

উপর্যুপরি খরা ও বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। এ বছরও পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলার কয়েক হাজার বর্গমাইল বন্যা কবলিত হয়েছে। বহু বর্গমাইল এলাকায় আউস পাট ও আমন ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ডি. ভি. সি জলাধার যখন তৈরী করা হয়েছিল তখন সবাই মনে করেছিলেন যে এই ডিভিসি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে আসবে। কিন্তু আজকের পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের কাছে এই ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী ও রূপনারায়ণের বুকে দিনের পর দিন পলি জমার ফলে নিকাশী ব্যবস্থা একেবারে অচল। ফলে ডিভিসির সঞ্চিত জল যখনই ছাড়ছে তখনই নিম্ন দামোদর নিকাশী না করতে পেরে আবাদী জমির উপর স্বতই ধাবমান হচ্ছে। ফলে হাওড়া ও হুগলী জেলার বেশ কয়েকটা থানা জলমগ্ন। ১৯৬৮ সালে এই বন্যা দেখা দিয়েছিল অক্টোবর মাসে। কৃষক আউষ ও পাট তুলে ফেলেছিল। ১৯৭০ সালে বন্যা আসে সেপ্টেম্বরে। মাঠে বোনা আউশ ধান ও পাট পাকা অবস্থায় মার খেয়েছিল। ১৯৭১ সালে বন্যা আরো এগিয়ে এল জুলাই-আগষ্ট মাসে। মাঠে আধপাকা আউস ধান। পাট ও সদ্য রোয়া আমন ও বীজতলা জলের তলায় চলে গেল। এবার বর্ষার মরশুম একটু আগেই লেগেছিল। তাই উৎসাহ সহকারে কৃষক আউস, পাট ও আমন একটু জলদি লাগিয়ে ছিল। কিন্তু রাক্ষুসী বন্যা সেই আশা একেবারে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। সময় যখন হাতে আছে তখন কেউ কেউ বীজতলা ফেলার জন্য, কেউ বীজ যোগাড় করতে, কেউ বা অন্য উপায় অবলম্বন করতে ছুটোছুটি করতে লাগল। কৃষক সহজে হাল ছাড়তে চায় না।

চারটি উপায়

এই রকম পরিস্থিতিতে চারটি পন্থার কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) যেখানে বন্যার প্রকোপ খুব বেশী নয় এবং ডাঙ্গা জমি কিছু কিছু এখনও জেগে আছে সেখানে আবার বীজতলা তৈরী করা সম্ভব। শ্রাবনের শেষে বীজ ফেললে ভাদ্রের শেষে সেই বীজতলা রোয়া যাবে। তবে বীজের পরিমাণ বেশী দিতে হবে কারণ রোয়া খুব ঘন লাগাতে এবং একটি গোছে ২।৩টির পরিবর্তে ৪।৫টি বীজতলা দিতে হবে। নতুবা নাবী লাগানোর জন্য পাশকাঠির সংখ্যা কম হবে। ফলনও সেই অনুপাতে কমে যেতে পারে। বীজতলা যাতে তাড়াতাড়ি তৈরী করা যায় সেই জন্য ৬ কাঠা জমিতে বীজ-তলা তৈরী করার জন্য দেড় কেজি নাই-ট্রোজেন দিলে বীজতলার বাড় ত্বরান্বিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ যেখানে অতিরিক্ত জলচাপের জন্য জমি খালি পাওয়া মুস্কিল সেখানে "ড্যাপোগ" পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরী করা যায়। এই পদ্ধতিতে কোন খালি বারান্দায় অথবা খালি জায়গায় একটি পলি-থিন কাগজে অথবা কলা পাতার উপরে ১১´ × ৪´ পরিমিত জায়গায় ৫।৬ কেজি (যা এক বিঘাই রোয়া যাবে) কলাওয়ালা বীজ দুই স্তর বিছিয়ে দিয়ে রীতিমত সামান্য সামান্য জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। রোদের তেজ হতে রক্ষা করার জন্য ঢাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। ১৪।১৫ দিন পর বীজতলা প্রস্তুত হয়ে যাবে। জমিতে ১৪।১৫ দিন পর জল যদি নেমে যায় তো বীজতলা রোয়া যাবে। নতুবা বীজতলা চাপরে রেখে একটু বড় করে দিতে পারেন। এতে আগের পদ্ধতির তুলনায় খরচ কম পড়ে। শিকড় অক্ষত থাকে, সময় কম লাগে ফলন বেশী হয়। তবে জল যদি না নেমে যায় তাহলে এই পদ্ধতি কোন কাজে লাগবে না।

তৃতীয়তঃ, যেখানে জল চাপ হওয়ায় মাঝে মাঝে চারা মরে যাওয়ার দরুণ ফাঁক হয়ে গেছে সেই সব ক্ষেত্রে অন্য জমি হতে ধানের গোছের উদ্বৃত্ত পাশকাটি ভেঙ্গে এনে এই সব ফাঁক গুলো পুরণ করতে পারেন। একে বলে Split trans-plantation পদ্ধতি।

চতুর্থতঃ এছাড়া বন্যা কবলিত এলাকা ও ডুবো জায়গার জন্য এফ. আর ৪৩বি, এস. সি ১২৮১, পাটনাই ইত্যাদি জাতের ধান ব্যবহার করা উচিত।

লাঠিশাল ধান

বন্যাপরিস্থিতি যখন এই রকম অনিশ্চিত তখন মাথায় চিন্তা আসে কেমন করে জলদি ও জলচাপ সহ্যকারী বীজ এখানে লাগানো যায়। হাতে কলমে পরীক্ষার পর জানা গেছে লাঠিশাল ধান এই পরি-স্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম। ধানটি

বুঝেছেন বাগনান ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপদ রাউত ও আরো কয়েকজন। লাঠিশালের প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন গত বোরো মরশুমে দেড় কাঠা জমিতে লাঠিশাল ধান লাগিয়ে ২ মন অর্থাৎ একরপিছু ৮০ মন ধান পেয়েছিলেন।

লাঠিশালের বিশেষত্ব হল সেচ কম হলে চলবে। সপ্তাহে একটা সেচ অর্থাৎ মোট ১৬-২০টা সেচ লাগে। খরা পরিস্থিতিও সহ্য করতে পারে। আই. আর-৮ এর তুলনায় সময় কম লাগে।

শ্রীকৃষ্ণ পদ রাউত জানালেন যে লাঠিশাল ধানটি মোটা আকারের, চাল সাদা, সময় নিয়েছে মাত্র ১১৩ দিন। মাঠে তখন জল দাঁড়িয়ে আছে ৫৩ সে মি (প্রায় ২১ ইঞ্চি), প্রতি গাদাতে ৮-১০টা বীজ, বিঘা প্রতি ১২ কেজি ইউরিয়া, ১০ মন গোবর সার দিয়ে লাগানো হয়েছিল। মাঝে একটা নিড়ানী দেওয়া হয়েছিল। প্রারম্ভিকভাবে একটা লাঙল দিয়ে ১৪ কাঠা জমিতে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে জমি তৈরী করতে হয়েছিল। খরচ তাই একটু বেশী হয়েছিল।

এই সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাবলী নিচে পরিবেশন করা হোল :

১) ধানের জাত—লাঠিশাল;

২) রোয়ার দূরত্ব—৩০ X ২০ সে মি,

৩) প্রতিঝোপে পাশকাঠির সংখ্যা—২৩,

৪) প্রতি শিষের গড় মাপ—২৭ সে.মি.

৫) প্রতি শিষে গড়ে ধানের সংখ্যা

(১) দানা বিশিষ্ট ৮৬

(২) চিটা ৬

৬) প্রতি শিষে গড়ে ধানের ওজন ৩ গ্রাম

৭) গাছের গড় উচ্চতা ১৩৮ সে.মি

৮) ফলন........

কাঁচাধান ৪ কেজি

কাঁচাখড় ১০ ,,

৯) একর পিছু ফলন—

শুকনো ধান ১৪.৪ কুইন্টাল

শুকনো খড় ৩২.০০ ,,

বাগনান ব্লকের আরেকজন উৎসাহী কৃষক শ্রীকান্তিক নায়ক মশায় জানালেন যে তিনিও মেদিনীপুর হতে 'বাদাম' নামে একটা দেশী ধান মাত্র ১ কেজি এনে ১২ই বৈশাখ বীজ দিয়েছিলেন। তারও crop-cutting নিয়ে দেখা গেল যে ফলন লাঠিশালের অনুরূপ হয়েছে তবে এই ধান লাঠিশালের তুলনায় অনেক সরু।

উপরোক্ত দুটি ধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধা হল পরাগ মিলনের সময় ঝড় জল হলেও বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলেও ধানের চিটা ভাগ বেড়ে যায় না। আই. আর-৮ এর পক্ষে এই অসুবিধা আছে। তাছাড়া আই আর-৮ এর জলচাপ সহ্য করার ক্ষমতা নেই। আই. আর-৮ ধান হয় ডুবে গেছে নতুবা কোনমতে মৃতপ্রায় অবস্থায় জেগে রয়েছে। আরো জানা গেল যে গত সপ্তাহে শ্রী কান্তিক নায়ক মশায় লাঠিশাল ধানের বীজ বীজতলায় ফেলেছেন। ভাদ্রের শেষে রোয়া লাগাবেন। সুতরাং লাঠিশাল ধান তিন মরশুমে অতি সহজেই লাগাতে পারা যায়।

আগামী বছর হতে এই এলাকার চাষীরা নিশ্চয়ই লাঠিশাল ধান বুনতে উদ্বুদ্ধ হবেন ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। এ বছর মাঠ সব সাদা হয়ে আছে। আগামী বছর মাঠে এই সময় সোনালী ধানের হাসি দেখা নিশ্চই অলীক কল্পনা হবে না। গ্রামীন অর্থনীতি বন্যা পরিস্থির ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

শিল্পে পুনরুজ্জীবন প্রয়াস

(৯ পৃষ্ঠার পর)

শিল্পগুলি ব্যাংক থেকে সহজে ঋণ নিয়ে আরও গতিশীল হয়ে উঠতে পারে।

চতুর্থ যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যের জন্য ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিশেষ সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। মোট ব্যয়ের ৬৮.৬% কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে সাহায্য হিসেবে পাওয়া যাবে। এ অবস্থায় শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা যদি সফল ক'রে তোলা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে এ রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের সাফল্যজনক কাজকর্ম

(১০ পৃষ্ঠার পর)

সম্পদ, সুনিপুন কারিগর এবং চাহিদা অনুসারে ছোট ও মাঝারি ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোরছে।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষামূলকভাবে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে একটি ২-টনি ছোট্ট কাগজের কল স্থাপনের মনস্থ করেছে। এর জন্যে মূলধন বিনিয়োগ করা হবে প্রায় ৫.৫৬ লক্ষ টাকা। এই এলাকায় 'সাবাই' ঘাস জন্মায়। এই ঘাস আর খড় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। কৃষি প্রধান এবং বনাঞ্চী অঞ্চলে একটি কাগজের এবং কাগজের বোর্ড তৈরীর শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হোল, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এলাকাগুলিতে শিল্পোদ্যম প্রসার।

পুরায় রবার চাষ

অজয় রায়

ভারতে প্রায় ১৬,০০০ হেক্টর ভূমিতে রবারের চাষ হয়। উৎপাদন বাড়াতে হলে আরও নূতন ভূমিতে রবার চাষ করা এবং কম উৎপাদনক্ষম রবার বাগানগুলিতে উচ্চ উৎপাদনশীল রবার গাছ পুনরায় রোপণ করা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে বর্তমানে রবার বাগানগুলি হতে যে রবার পাওয়া যায় তার দ্বারা চাহিদা পূরণ করা মোটেই সম্ভব হবে না।

বর্তমানে ভারতে উৎপন্ন রবার প্রয়োজনের অনুপাতে অত্যন্ত কম। মোট প্রয়োজনের শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ রবার ভারতে উৎপন্ন হয়। কৃত্রিম উপায়ে রবার উৎপাদন করে বাকী প্রয়োজন ৪০ ভাগের প্রায় ১০ ভাগ মিটাতে হয়। অবশিষ্ট ৩০ ভাগ চাহিদা মিটাতে হয় মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে—সিংহল, মালয় ও অন্যান্য দেশ থেকে রবার আমদানী করে।

কেরালা রাজ্যেই সবচেয়ে বেশী রবার উৎপন্ন হয়। ভারতের মোট উৎপাদিত রবারের ৮৫ শতাংশ কেরালাতে উৎপন্ন হয়। তারপর তামিলনাড়ু ও মহীশূরের স্থান। এদিকে ভারতে রবারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে ভারত সরকার নানা অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে রবার চাষ করে এর উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। ভারতে রবার চাষে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং রবার চাষীরা যাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি জানতে পারেন তার জন্য রবার বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বোর্ডের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রবার চাষীরা নানা পরামর্শ লাভ করে থাকেন।

সংসদের এষ্টিমেট কমিটির একটি মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রবার বোর্ড ত্রিপুরায় রবার চাষের উপযোগী ভূমি পাওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে একটি সাধারণ জরীপ করেছিলেন। জরীপে দেখা যায় যে, ত্রিপুরার বহু অঞ্চলে রবার চাষের উপযোগী জমি রয়েছে। কেবলমাত্র শীতকালে (ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারী) ত্রিপুরাতে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের নীচে আসে। রবার চাষের পক্ষে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রী ফা: এর নীচে আসা অনুকূল নয়। রবার বোর্ডের মতে রবার গাছের বিশ্রাম নেওয়ার সময়ের সঙ্গে এই তাপ মাত্রা নীচে আসার সময়ের মিল আছে।

পরীক্ষামূলকভাবে রবার রোপণের কাজ চলেছে।

ত্রিপুরার বন বিভাগ উদ্যোগী হয়ে ১৯৬৩ সালে রবার চাষ শুরু করেন। প্রথমাবস্থায় পত্তিছড়ি ও মানুতে পরীক্ষামূলকভাবে ২০ একর জমিতে রবার চাষ করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় রবার চাষ সাফল্যজনক হয়। এই সাফল্য ও রবার গাছের দ্রুত পরিবর্ধনে উৎসাহিত হয়ে বন বিভাগ দুধপুর, পাথরিয়া, কাকুলিয়া এবং পশ্চিম দুধুয়াতে রবার চাষের সম্প্রসারণ করেন। ১৯৬৮ সালের শেষে ত্রিপুরায় ১৭৫ হেক্টারের বেশী জমিতে রবার চাষ করা হয়।

ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চল সাব্রুম, বিলোনীয়া ও উদয়পুর মহকুমা ও সদর মহকুমার এবং উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জায়গায় প্রাথমিক ভাবে যে রবার বাগান করা হয় তা রবার বোর্ডের নির্দেশ ও পরামর্শ মতই

করা হয়। রবার সংগ্রহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রশিক্ষণের জন্য ত্রিপুরার বন বিভাগের কিছু কর্মীকে কেরালায় পাঠান হয়। সাধারণত: রবার গাছের অষ্টম বছর থেকে রস সংগ্রহ করা হয়ে থাকে এবং ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত রবার গাছ থেকে রস পাওয়া যায়। তারপর রবার গাছ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

উৎপাদন ব্যয়

ত্রিপুরায় প্রতি একর রবার বাগান ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বৎসরে এক হাজার টাকা খরচ পড়বে। উচ্চ ফলন জাতের বীজ ব্যবহার করে প্রতি একর রবার বাগান থেকে ৪৫০ থেকে ৬৫০ কিলোগ্রাম শুকনো রবার পাওয়া যাবে। এই রবারের বাজার দর প্রতি কিলোগ্রাম ৫ টাকা থেকে ৫ টাকা ৩০ পয়সা। প্রতি হেক্টর রবার বাগান থেকে বার্ষিক লাভ প্রায় ৩৭,০০০ এবং এই আয় এক নাগাড়ে ২২ বৎসর অর্জন করা যায়। এরপর প্রতিটি রবার গাছ জ্বালানী কাঠ হিসেবে বিক্রী করলে ন্যূন পক্ষে ৫০০ টাকা লাভ করা যায়।

গত বছর যে মাসে উদয়পুর মহাকুমার পত্তিছড়ি রবার বাগান থেকে রস সংগ্রহ সুরু হয়। রবার বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে পত্তিছড়িতে রবার শুকাবার জন্য একটি জায়গা নির্বাচন করা হয়। কেরালার কোট্টায়াম থেকে একটি রবার শিটিং রোলার কেনা হয়েছে। তাছাড়া রবার প্রস্তুতের নানা যন্ত্রপাতিও কেনা হয়েছে। প্রতি একদিন অন্তর ১০০টি গাছ থেকে যে রস সংগ্রহ করা হচ্ছে তাতে ১০০ কিলোগ্রাম কাঁচা রবার পাওয়া যায়। এই হিসেবে প্রতি হেক্টার রবার বাগানের একজন মালিক ৩৭০০০ টাকা উপার্জন করতে পারেন। উৎপাদন পরের বছর ১৫ শতাংশ বাড়বে।

ত্রিপুরায় রবার চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে ভারতের রবার বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন, বর্তমানে ১০,০০০ একর জমিতে রবার চাষ আরম্ভ করা যেতে পারে।" ইতিমধ্যে রবার বোর্ড পূর্ব ভারতে শুধু ত্রিপুরাতেই একটি শাখা-অফিস খুলেছেন।

ত্রিপুরায় রবার চাষের সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই কেরালার চেয়ে উজ্জ্বলতর কেননা, ক) কেরালায় রবার গাছের যে সব রোগ সাধারণত: দেখা যায়, ত্রিপুরায় এখনও সেসব রোগ দেখা যায়নি; (খ) ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাত বিক্ষিপ্ত বলে 'টেপিং' এর জন্য অনেক দিন সময় পাওয়া যাবে; (গ) ত্রিপুরায় রবার বাগান করার হেক্টর প্রতি খরচ কেরালার চেয়ে কম; (ঘ) ত্রিপুরায় এ পর্যন্ত উৎপাদনের যে হার লক্ষ্য করা গেছে তা কেরালায় উৎপাদনের হারের বেশী হতে পারে।

বে-সরকারী ক্ষেত্রে রবার বাগান করার জন্যও সরকার থেকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রেও আশাব্যঞ্জক উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। কৈলাসহর ও মাত্রাপুরে বে-সরকারী মালিকানায় ইতিমধ্যেই দুইটি রবার বাগান করার কাজ শুরু হয়েছে।

রস সংগ্রহের পূর্বে রবার গাছে চিহ্ন দেওয়া হচ্ছে

চামড়ার পরিধেয়

মাদ্রাজের কেন্দ্রীয় চর্মজাত গবেষণা কেন্দ্র 'টাই' এবং 'ডাই' শ্রেণীর এক জাতীয় চামড়া উদ্ভাবন করেছে। কলকাতা কাশ্মীর, বোম্বাই ও মাদ্রাজের চর্ম শিল্পপতিরা এ জাতীয় চামড়ার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন।

এ ধরণের চামড়ায় বিবিধ নক্সা তোলা সহজ বলে বিদেশের বাজারেও আদৃত হবে আশা করা হচ্ছে। পরিধেয় তৈরীতেও এ ধরণের চামড়া ব্যবহার করা চলে বলে, পরিধেয় প্রস্তুতকারকরাও এতে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। ইতিমধ্যে বোম্বাই এর একটি পরিধেয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এই চামড়ার সৌখিন জামা কাপড় তৈরী করে বিদেশের বাজারে চালান দিয়ে আশাতীত ফল পেয়েছে।

ভারতে বয়স্ক শিক্ষা : অতীত ও ভবিষ্যৎ

ভারতে বয়স্ক শিক্ষার সমস্যা—মূলতঃ বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের সমস্যা, যাঁরা শৈশবে কখনও স্কুলে যাননি। এঁদের সংখ্যাই বেশী। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, অবসর সময়ের সদ্ব্যবহারের বিষয়ে তাঁদের শিক্ষিত করে তোলা। অবশ্য, অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের সমস্যা কিছুটা ভিন্ন। উন্নত দেশে বয়স্ক শিক্ষা হোল প্রথম জীবনের শিক্ষা গ্রহণের পরবর্তী বা শেষ পর্ব। কাজেই, আমাদের ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে এই কার্যসূচীকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

গড়পড়তা ভারতীয় দুবিকরা শুধু অক্ষর জ্ঞান লাভের বিষয়ে খুব বেশী উৎসাহী নয়; কারণ এতে আপাত কোন লাভ তাঁরা দেখতে পায় না। সুতরাং প্রথম লক্ষ্য হোল, এই মনোভাবকে দূর করে তাদের মনে বিশ্বাস জাগাতে হবে যে, শিক্ষা জীবনকে সজীব ও সতেজ কোরে তোলে, এবং পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ এনে দেয়। যদিও এটা করা খুব সহজ নয়। এজন্য গ্রামে গ্রামে সচিত্র বক্তৃতা অভিযান চালাতে হবে। সেদিক থেকে সিনেমা এবং রেডিওর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আসলে, গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে না এলে, আমাদের কোন প্রকল্পই সফল হতে পারে না।

বর্তমানে বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারে বড় ধরনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিশেষ করে স্বাধীনতালাভের পর থেকে। ইংরেজরাও এই সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল, এবং কয়েকটি প্রকল্পের কাজ শুরুও করেছিল। এরমধ্যে "Each one, teach one"—কার্যসূচীটি সে সময় খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করার উপর প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীর চাকুরীতে পাকা হওয়া নির্ভর করতো।

১৯৪৭ সাল থেকে ভারতে শিক্ষিতের হার বছরে শতকরা ০.৭৫ হারে বেড়েছে। ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৬৮ সালে শিক্ষিতের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৬.৬, ২৩.৭ এবং ৩২.০। এই বৃদ্ধির হার যদি বজায় থাকে তাহলে আশা করা যায়, ১৯৭১ সাল নাগাদ শিক্ষিতের হার হবে শতকরা ৩৫ এবং ১৯৮১ সালে তা গিয়ে দাঁড়াবে শতকরা ৪৯। পরিসংখ্যানের দিক থেকে দেখতে গেলে এটা উন্নতির লক্ষণ সন্দেহ নেই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে, ১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৬৭ সালে দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা আরো ৬ কোটি বেড়েছে। কারণ হোল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শিক্ষিতের হার বাড়ছেনা।

শিক্ষার মান

শিক্ষার মান কোনদিক থেকেই খুব একটা আশাপ্রদ নয়। 'শিক্ষিত'—এই পর্যায়ের বেশীর ভাগই কোনরকমে নাম সই করতে পারে মাত্র। শিক্ষিত জনসংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ সাধারণভাবে লিখতে ও পড়তে পারে। কেবল মাত্র শতকরা ১০ ভাগই শিক্ষার একটা যুক্তি সংগত স্তরে পৌঁছেছে। এছাড়া পুরুষ ও মহিলার মধ্যে শিক্ষার ব্যবধান ক্রম বর্দ্ধমান। এই ব্যবধান ১৯৫১ সালে ছিল শতকরা ১৭ ভাগ এবং ১৯৬১ সালে শতকরা ২১.৫ ভাগ। কারণ স্ত্রী শিক্ষার প্রসার পুরুষের তুলনায় কম। শিক্ষার সমস্যা শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশী। ১৯৫১ সালে এই ব্যবধান ছিল শতকরা ২২.৮ ভাগ এবং ১৯৬১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ২৮ ভাগ।

শিক্ষার ন্যূনতম মান হওয়া উচিত মাতৃভাষায় নাম স্বাক্ষর করতে পারা ছাড়া, সহজ ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারা এবং সরল গণিত ও সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, প্রাথমিক স্তরে লিখতে ও পড়তে পারার উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে বয়স্কশিক্ষাকে এক নতুন ভাবধারায় সঞ্জীবিত করা হোল—বর্তমানে যাকে বলা হয় সমাজ শিক্ষা।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল, নব-শিক্ষিতদের জন্য উপযুক্ত পুস্তক প্রণয়ন করা। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই কিছু ভালো কাজ হয়েছে। তবে সাধারণ জ্ঞান ছাড়া, ব্যক্তিকে নিজস্ব বৃত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার দিকেও সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। এই ধরণের পুস্তকাদি প্রণয়ন ব্যাপক কর্মসূচীর ভিত্তিতে করতে হবে। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় পর্যায়ে করলেই চলবে না, রাজ্য সরকার এবং সামাজিক সংস্থাগুলির মাধ্যমেও করতে হবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলন স্বাভাবিক ভাবেই এর একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, গ্রন্থাগার যেন শুধুমাত্র বই বা পত্র পত্রিকা রাখার জায়গায় পর্যবসিত না হয়। একটা মনোরম পরিবেশে সকলের যাতায়াতের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়া উচিত। ভোজনালয়, বাসে, ট্রেনের কামরায় পড়ার কিছু সামগ্রী রাখা যেতে পারে। হাসপাতালে বয়স্ক রুগীদের পড়ার সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া উচিত। এমনকি

ভ্রাম্যমাণ সেন্দ্রেও এ ধরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভ্রাম্যমান পাঠাগারেরও ব্যবস্থা করা যায়।

আশাব্যঞ্জক নয়

আমাদের একথা মানতেই হবে যে গত ২০ বছরে উপর উপর কিছু কাজকর্ম হলেও উপযুক্ত নেতৃত্ব, প্রয়োজনীয় অর্থ এবং জনগণের উৎসাহের অভাবে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন একটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার কাজ হাতে নিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়, ডিগ্রি কলেজ এবং স্কুলগুলির সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবা কার্যসূচীর ক্ষেত্রে, বয়স্ক শিক্ষা প্রসার একটা উল্লেখযোগ্য অংশরূপে বিবেচিত হতে পারে। নিম্ন বুনিয়াদী পর্যায় থেকে M. Ed. পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সের পাঠ্য সূচীতে, বয়স্ক শিক্ষাকে একটা অন্যতম বিষয় রূপে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সমাজ শিক্ষাকে B T এবং B. Ed কোর্সে ঐচ্ছিক বিষয় করা যায়, কিংবা শিক্ষা মনস্তত্ত্ব এবং সাধারণ শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কীত পাঠ্য সূচীর সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। M.Ed স্তরেও একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকা বিশেষ জরুরী ; সেক্ষেত্রেও প্রাকৃটিক্যাল্ জ্ঞান সহ বয়স্ক শিক্ষাদান বিষয়টিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিষয়ের মর্যাদা দেওয়া উচিত।

ছুটির সময় শিক্ষক ও ছাত্রদের দিয়েও সাক্ষর অভিযান চালানো যেতে পারে। কলেজে, বিশেষ করে প্রশিক্ষণ কলেজ ও ডিগ্রি কলেজে, সাক্ষর ক্লাব গঠন করা যেতে পারে—যেখানে ছাত্ররা স্বেচ্ছায় সাক্ষর অভিযানে এগিয়ে আসবে।

জেলখানার প্রাপ্তবয়স্ক কয়েদীদের শিক্ষার বিষয়ে চরম উদাসীনতা—সবথেকে দুঃখ জনক বলে মনে হয়েছে। কয়েদীদের সুস্থজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে জেলখানার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তথাপি কারান্তরালে সত্যিকারের কোন শিক্ষা দেওয়া হয়না। অথচ, বয়স্কশিক্ষা প্রকল্পে এই সমস্যা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অপরাধের মূল অনুসন্ধান করে, তার উপযুক্ত প্রতিবিধান করার উদ্দেশ্যে জেলখানায় মনস্তাত্ত্বিকদের নিয়োগ করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এবং সিনেমা ও রেডিও সহযোগে সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কীত কথিকা প্রভৃতির দ্বারা অপরাধীদের বহুলাংশে সংশোধন করা সম্ভব। যে সমাজ সংস্কার বা সংশোধনে বিশ্বাস করে না সে সমাজ কখনও টিকে থাকতে পারে না।

সবশেষে, শিক্ষা দ্বারা অর্থাগম্ভ রাখার প্রশ্ন। নতুবা বয়স্ক শিক্ষা অভিযান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এজন্য আরো বেশী ডাকযোগে শিক্ষা, সান্ধ্য কালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অবসর কালীন শিক্ষাসূচী প্রভৃতি থাকা দরকার। জ্ঞান আহরণ তথা ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সর্বস্তরে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত।

বয়স্ক শিক্ষা এবং জাতীয় প্রগতির মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। কাজেই বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে অধিক অর্থ ব্যয়ের পরিণাম নিশ্চয়-ভক্ত হবে। কোন উন্নয়নশীল দেশেরই এ ক্ষেত্রে ইতস্তত করা উচিত নয়। ভারত আজ যেসব চালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা তার মধ্যে সর্ববৃহৎ। কাজেই, দৃঢ়তার সঙ্গে এর মোকাবিলা করতে হবে।

ভারত আর্থ মুভার্স

রাষ্ট্রায়ত্ব উদ্যোগের অন্তর্গত ভারত আর্থ মুভার্স লিমিটেড ৯০-২৫০ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত ভারী ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে মাত্র সাত বছরের মধ্যে তাদের উৎপাদন বাড়িয়েছেন ৫০ গুণ। এই কারখানার প্রারম্ভিক বছরে—১৯৬৪-৬৫ সালে—উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ছিল ৩৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার মত। ১৯৭০-৭১ সালে বর্দ্ধিত পণ্যের মূল্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা।

সম্পাদকের দপ্তর

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

"ধনধান্যের" একটি সংখ্যা স্থানীয় পাঠাগারে পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি এই কারণে, এমন একটি সংবাদ সমৃদ্ধ, রচনা সমৃদ্ধ কাগজ প্রকৃতই বিরল। নিছক সাহিত্য, নিছক আমোদ প্রমোদের ভীড়ে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীর খবর কিম্বা সংস্কৃতি অথবা শিল্পের খবর হারিয়ে যেতে বসেছে। সংবাদ পত্রে যে খবর, যে প্রবন্ধ থাকে না, সাহিত্য পত্রে যা উপেক্ষিত, সেই সমস্ত জিনিষ এই পত্রে পরিবেশিত। এই কাগজটি কেন আরো আগে নজরে পড়েনি আমি জানি না।

প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনায় যে উচ্চস্তরের সাংবাদিকতার প্রকাশ, তার জন্যে আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সালের সংখ্যাটি আমার হাতে এসেছে। "রূপ সৃষ্টিতে কাপড়ের পুতুল" শীর্ষক সুখপাঠ্য এবং তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধের পাশাপাশি "দীনবন্ধু এণ্ডরুজ", আবার "বাংলার চাষ, চাষী ও প্রবচন", ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাদের লেখা একই সঙ্গে পড়ার সুযোগ পেয়েছি।

নমস্কারান্তে
শ্রী তারক নাথ পাত্র
মাকের রাস্তা,
চুঁচুড়া, হুগলী
৩১. ৮. ৭১

* মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

সংবাদ পরিক্রমা

প্রতিবেদক

মুর্শিদাবাদ

সম্প্রতি বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ তারাসুন্দরী বিদ্যালয়ের শতপঞ্চবিংশতি (১২৫) বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে তিনদিন ব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ১৮৪৫ সালের ১৫ই মার্চ লণ্ডনের মিশনারী সোসাইটির দুজন সদস্য—শ্রী হিল ও শ্রী লে সেস মুর্শিদাবাদের খাগড়ায় এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের পর আরও দুই জন মিশনারী মিশনের কার্যে বহরমপুর আসেন এবং এঁদেরই প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে ১৮৬৮ সালে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্যালয়টি সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং পরের বছর মাত্র ১৩টি ছাত্র নিয়ে আবার চালু হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সোসাইটি বিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৫ই জানুয়ারী ১৯৪৭ থেকে এই বিদ্যালয় খাগড়া বয়েজ হাইস্কুল নামে সোসাইটির পুরাতন ভবনেই চলতে থাকে। সোসাইটি কয়েকটি শর্তে স্কুল কর্তৃপক্ষকে মাসিক এক টাকা ভাড়ায় ঐ ভবনটি ব্যবহার করতে দেন। ১৯৬০ সালে সোসাইটি ঐ বাড়ী সন্নিহিত মাঠ এবং অন্যান্য সম্পত্তি ১৬ হাজার টাকায় স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিক্রি করে দিতে চাইলে খাগড়ার এক দানশীলা মহিলা শ্রীমতি তারাসুন্দরী সাহা, স্কুল কর্তৃপক্ষকে ১৭,১২৫ টাকা দান করেন এবং তাঁরা ঐ টাকায় সোসাইটির কাছ থেকে সম্পত্তিটি কিনে নেন। স্কুলটির নামও পরিবর্তিত করে কৃষ্ণনাথ-তারাসুন্দরী উচ্চ-মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় রাখা হয়। স্কুলটির বর্তমান ছাত্র সংখ্যা সহস্র'রও বেশী।

নদীয়া

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকারের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় এবং ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য লগ্নী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্যে নদীয়া জেলায় ১৯৭০-৭১ সালে কতকগুলি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ঢালাই কারখানা, বাস ও লরির বডি তৈরির কারখানা এবং ইস্পাতের আসবাব পত্র, মেশিনের বেল্ট, জাহাজের প্রপেলার, হাল্কা মেশিন ও যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ইত্যাদি তৈরির কারখানা। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই কৃষ্ণনগর ও কল্যাণীতে স্থাপিত হয়েছে। গত আর্থিক বছরে নদীয়ার নূতন ও পুরাতন অনেকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার সাহায্য পায়।

পরীক্ষামূলক নিবিড় শিল্পোন্নয়নের জন্যে এই জেলার পাঁচটি সহর বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলি হল, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, রাণাঘাট, শান্তিপুর এবং চাকদহ। এখানে শিল্পোন্নয়ন কার্যসূচী সার্থক হলে জেলার অন্যান্য স্থানে অনুরূপ উন্নয়ন কার্য চালানো হবে। হস্তচালিত তাঁত এবং পিতল কাঁসা শিল্পের উন্নয়নের জন্যে শান্তিপুর নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ দেবার একটি বিশেষ কার্যসূচী রচিত হয়েছে।

এই জেলায় শিল্প সম্ভাবনা প্রচুর। আরও অনেক শিল্পই এখানে গড়ে উঠতে পারে। এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল, প্লাইউড তৈরির কারখানা, মোটর জন্যে সাসপেন্ট ও তার যন্ত্রাংশ, মোজাইক ফোমাপুষেবুল শীট ও স্লিপ, কাগজ ও পার্টিকাল বোর্ড তৈরির কারখানা ইত্যাদি।

হুগলী

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসের বন্যায় হুগলী জেলায় ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবি মরশুমে যে কৃষি কার্যসূচী রূপায়িত করেন, তার সাফল্য আশানুরূপ হয়েছে। আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে এই কর্মসূচী অনুযায়ী অতিরিক্ত ৩৩ হাজার একরে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান এবং অতিরিক্ত ২৫ হাজার একরে উচ্চফলনশীল গমের চাষ হয়। মোট প্রায় এক লক্ষ ৩৩ হাজার একরে বোরো ধান ও গমের চাষ করা হয় এবং ফলন পাওয়া যায় ২ লক্ষ মেট্রিক টনের উপর। তাছাড়া, প্রায় ৪৮ হাজার একরে আলু, ডাল, তৈলবীজ এবং অন্যান্য শাকসব্জীরও চাষ হয়। হুগলী জেলায় শুধু রবিখন্দে মোট প্রায় সাড়ে দশ কোটি টাকার রবিশস্য উৎপাদিত হয়। স্মরণ থাকতে পারে যে ১৯৭০ সালের বন্যায় এই জেলায় খরিফ শস্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি টাকার মত। গত রবি মরশুমের জন্য রচিত কৃষি কার্যসূচীর সার্থক রূপায়ণে এই ক্ষতির প্রায় ৭০ শতাংশ পূর্ণ হয়। শুধু তাই নয় এ সাফল্য হুগলী জেলায় "সবুজ-বিপ্লব" এর পথ আরও প্রসারিত করেছে।

সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসারও হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯০০ অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে।

তা' ছাড়া, কেন্দ্রের পরিচালনায় ক্ষুদ্র খামার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হুগলী জেলার প্রায় ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চাষীকে আনা হবে। হুগলীই পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় জেলা যেখানে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। উন্নত সেচ ব্যবস্থা, জমি সংস্কার, পশু পালন, পোল্ট্রি ইত্যাদির মাধ্যমে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামারগুলিকে এমন ভাবে গড়ে

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

চিত্তরঞ্জন এঞ্জিন তৈরীর কারখানা

১৯৫০ সালে চিত্তরঞ্জন এঞ্জিন তৈরীর কারখানায় কাজ শুরু হয়। এ পর্যন্ত, এই ২১ বছরে, এই কারখানায় ২৭১১টি এঞ্জিন তৈরী হয়েছে। এরমধ্যে ২৩৩২টি বাষ্প চালিত এঞ্জিন, ২৯৮টি বিদ্যুৎ চালিত এবং ৮১টি ডিসেল এঞ্জিন।

এই উৎপাদনের ফলে, চিত্তরঞ্জন কারখানা ১০২ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে সক্ষম হয়। কেবল বাষ্প চালিত এঞ্জিনের দরুণই ৮০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো যায়। অবশিষ্ট দু' ধরণের এঞ্জিনের দ্বারা প্রায় ২০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচে এবং বাকী অর্থ বাঁচে স্টিল ফাউণ্ড্রি কাসটিং-এর দরুণ।

১৯৭০-৭১ সালে চিত্তরঞ্জন কারখানায় ৫০টি বিদ্যুৎ-চালিত এঞ্জিন, ৩৩টি বাষ্প-চালিত এবং ৪০টি ডিজেল এঞ্জিন তৈরী হয়। এই কারখানায় এখন ১৯টি বাষ্প চালিত এঞ্জিন তৈরীর বরাত রয়েছে; এগুলি তৈরী হয়ে গেলে এই কারখানায় কেবল বিদ্যুৎ চালিত ও ডিজেল এঞ্জিন তৈরী হবে। এ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ঢেলে সাজাবার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আশা করা যায় চতুর্থ পরিকল্পনার শেষাশেষি এই কারখানায় ৭২টি বিদ্যুৎ চালিত এবং ৪৮টি ডিজেল এঞ্জিন তৈরী করা সম্ভব হবে।

এইসব এঞ্জিন তৈরীর জন্যে যন্ত্রাংশ আমদানি ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ায় এখন নির্ভয়ে বলা যায় যে, বিদ্যুৎ চালিত এঞ্জিন তৈরীর বিষয়ে দেশ স্বয়ম্ভর হয়েছে। অন্য দিক থেকে দেখলে রেলপথ বৈদ্যুতিকরণ সূচী অব্যাহত থাকায় এটা স্পষ্ট যে এই দাবী অহেতুক নয়; কারণ এঞ্জিন তৈরীর ওপর এই সূচী নির্ভরশীল।

যাত্রীবাহী এবং মালগাড়ীর জন্যে ১০৮ মিশ্র ধরনের এ. সি এঞ্জিন এবং ৬টি বিভিন্ন ধরনের এঞ্জিন তৈরীর জন্যে এই কারখানা একটি বিশেষ সূচীর কাজ হাতে নিয়েছে। এগুলির ডিজাইন ও নক্সা দেশেই তৈরী। এর প্রত্যেকটির ওজন হবে ১১২.৮ মেট্রিক টন এবং খরচ পড়বে প্রায় ২১ লক্ষ টাকার মত। যন্ত্রাংশ আমদানির প্রয়োজন হবে ৬.৪৪ লক্ষ টাকার মত। এতে থাকবে ৬৫৮ অশ্ব-শক্তি যুক্ত ৬টি এ. সি, ট্র্যাকসন্ মোটর। ৮৮০ টন ওজনের একটি যাত্রীবাহী ট্রেনকে এই এঞ্জিন ঘন্টায় ১২০ কিলোমিটার গতিতে টেনে নিয়ে যেতে পারবে। আর ৩৬৬০ টনের একটি মালগাড়ী টানতে পারবে ঘন্টায় ৯৭ কিলোমিটার বেগে। এ কাজের জন্যে কোন বিদেশী সহযোগিতার প্রয়োজন হবে না।

চিত্তরঞ্জন এঞ্জিন তৈরীর কারখানায় সম্প্রতি বিদ্যুৎ চালিত ডি সি এঞ্জিন তৈরী হয়েছে। এরজন্যে কোন বৈদেশিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয় নি। এগুলি এখন পরীক্ষামূলক ভাবে সেন্ট্রাল রেলে মালগাড়ী চালানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই রপ্তানি বাজারে নেমেছে। কয়াসী রেলপথকে এখান থেকে ট্র্যাক্‌সন্ মোটর কেসিং, বর্মাকে বয়লার এবং ইরানকে ম্যাকানিক্যাল স্টীম যোলনোমুক সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের মধ্যে সরকারী ক্ষেত্র থেকে ৬০টি ডিজেল এঞ্জিনের বরাতের মধ্যে ২৩টি ইতিমধ্যেই সরবরাহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলি পরবর্তী ২/৩ বছরের মধ্যে সরবরাহ করা হবে।

—

সংবাদ পরিক্রমা

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

বোঝা হচ্ছে যে কোন অবস্থাতেই তারা এগিয়ে চলতে সক্ষম হয়। জেলার সবকটি ব্লকই এই প্রকল্পের আওতায় আসবে। এই প্রকল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন কার্যসূচী রূপায়ণের জন্যে চতুর্থ যোজনাকালে কেন্দ্রীয় সরকার দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন।

এ ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ ৮১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ব্যয়ে এই জেলার পুরশুড়া, খানাকুল, আরামবাগ এবং গোঘাট থানার অন্তর্গত ৩৫০টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের এক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন বলে প্রকাশ। সংশ্লিষ্ট মহল আশা করেন যে, আগামী বছরের প্রথম দিকেই এই কার্যসূচীর চূড়ান্ত রূপদান করা সম্ভব হবে। এই কার্যসূচী অনুযায়ী এই অঞ্চলের প্রায় ১২০০ অগভীর নলকূপকে বিদ্যুত চালিত করা হবে। হুগলী জেলার জঙ্গিপাড়া, তারকেশ্বর ও হরিপাল থানার ২৬৬টি গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের জন্যে এবং প্রায় ৮৪০টি অগভীর নলকূপ বিদ্যুতচালিত করার জন্যে পর্ষদ আরও একটি কার্যসূচী রচনা করছেন বলে জানা গেছে। এতে খরচ পড়বে প্রায় ৮৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। অর্থাৎ পর্ষদের উপরোক্ত দুটি স্কীমে মোট খরচ পড়বে এক কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার উপর। এতে হুগলী জেলার সাতটি থানার অন্তর্গত ছয়শ'রও বেশী গ্রামে বিজলী আসবে এবং প্রায় ২০৪০টি অগভীর নলকূপ বিদ্যুত চালিত হবে।

জেলার সড়ক উন্নয়ন কাজের জন্যেও একটি বিরাট স্কীম গৃহীত হয়েছে। এর জন্যে বরাদ্দ হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এই টাকা হুগলী জেলার ১০টি পৌর প্রতিষ্ঠানকে ৫ লক্ষ টাকা করে দান করে দেবেন। ইতিমধ্যে পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে সড়ক উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

শুকর পালনের গুরুত্ব

দিলীপ কুমার রায়

ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দারিদ্র দূরীকরণের জন্য এ পর্যন্ত সরকার নানা ভাবে জনসাধারণের মধ্যে নানা আশা উদ্দীপনার সঞ্চার করে আসছেন। স্বাধীনতা লাভের পরেই অভাব অনটন দূর করার জন্য নেওয়া হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। কিন্তু সরকারী সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বেকার বাড়ছে বই কমছে না। জনসাধারণের মধ্যেও নানা অসন্তোষ দিন দিন পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এটা মনে রাখা দরকার যে অলস মস্তিষ্ক হল শয়তানের আবাস। কাজেই দেশের অর্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিত যুবকরা যদি কর্মহীন হয় তবে দেশের প্রতি তাদের আস্থা কমবে বই কি। সরকার যদি দেশের প্রতিটি লোকের ভরণপোষণ দিতে সক্ষম না হয়, তবে জনগণের প্রতি আনুগত্য আশা করা বৃথা। তবে আশার কথা এই যে সরকার এখন বিভিন্ন ভাবে জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

একদিকে যেমন অধিক "ফলনশীল চাষ" আবাদের ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে, অন্য দিকে তেমন আশানুরূপ ভাবে জন জীবনে আশা উৎসাহও বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকের জাতীয়করণ, রাজন্য ভাতা বিলোপের সিদ্ধান্ত, আর বৈষম্য বিলোপের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কর পদ্ধতি প্রবর্তনে অনেক আশারই সৃষ্টি করেছে একথা বলা যায়। তবে দেশের ক্রমবর্দ্ধমান বেকারী যুব মানসে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার বেকারী নিরসনের জন্য 'গরিবি' 'অনুদান' এই সব ব্যবস্থার চাইতে যদি এদেশের জনশক্তির সঙ্গে হাল ধরে পশুপালন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা যায় তবে দেশের নাগরিকদের যেমন প্রোটিন খাদ্যের অভাব হ'তে বাঁচানো যায়, তেমনি খাদ্য সমস্যারও কিছুটা সমাধান হয়।

ভারতের প্রায় ৭২ শতাংশ লোক আমিষ ভোজী। কাজেই যদি শুকর পালনের ব্যাপক প্রসার এ দেশে হয় তবে যারা ঐ খাদ্য পছন্দ করেন তারা তা প্রচুর পরিমাণে পৌঁছে পাবেন—শুকর বছরে একসঙ্গে প্রায় ৮।১০ টি বাচ্চা প্রসব করে। ওদের মাংসও বেশ পুষ্টিকর, এবং ওদের জন্য এমন কোন খাদ্যের প্রয়োজন নেই যা সাধারণ মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। কাজেই এ দেশের নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাড়াও যদি উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও এর পালনে উৎসাহ দেখান তবে বর্তমানে যারা শুকর পালন কাজে লিপ্ত আছেন, তাঁরাও উৎসাহ পাবেন এবং শুকরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে একটা পুষ্টিকর খাদ্যও সাধারণ মানুষ হাতের কাছে পাবে।

বর্তমানে যে ৭টি শুকর প্রজনন কেন্দ্র আছে তা চাহিদার তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। পশ্চিমবঙ্গে হরিণঘাটা, অন্ধ্র প্রদেশের গনভরম এবং মহারাষ্ট্রের আরে অঞ্চলে যেভাবে শুকর পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যদি তার আরও ব্যাপক প্রসার করা যায় তাতে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা ঐ কাজে উৎসাহ পাবে। যদি খামা ভিত্তিকভাবে প্রত্যেক অঞ্চলে ২৫০টি করে শুকর চাষের প্রাথমিক ব্যবস্থা করা যায় তাতে কম পক্ষে খাদ্যের মাংস সংকট হ্রাস পাবে। এতে পালকদের একটা নির্দিষ্ট আয়ও হাতে থাকবে। কৃষি চাষের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আয় অনেক সময়ে অনিশ্চিত থাকে, কারণ ফসলের হার প্রাকৃতিক আনুকূল্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শুকর পালনের ক্ষেত্রে সহজেই নির্দিষ্ট আয়ের পথ পাকা।

এছাড়া শুকরদের মধ্যে রোগ হয় কম। সে কারণে যদি খামা ভিত্তিক ভাবে শুকর চাষের প্রসার ঘটান যায় তাতে অল্প শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিতদেরও কাজ দেওয়া যাবে—সাধারণ মানুষ প্রোটিন আহার্য পাবে এবং সরকারী আনুকূল্য ও সহযোগের ভিত্তিতে এর প্রসার ঘটলে জনগণের মধ্যে এই চাষের জন্য দ্বিধাভাবও কেটে যাবে।

শুকর পালন শিল্পের প্রসারের জন্য প্রথমেই সরকারী উদ্যোগ দরকার হবে। কারণ এ দেশের বেশীর ভাগ উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এটা নীতিগত ভাবে পছন্দ করেন না; কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এদেশে গো-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেও অনেকে গো-পালনে উৎসাহী নন। কাজেই শরীর গঠনে দুধ উপকারী জেনেও অনেকে তা খাদ্য হিসেবে পান না এবং অপুষ্টিজনিত ব্যাধি, রক্তাল্পতা, বাত প্রভৃতি রোগে কষ্ট পান। সেই কারণে ঐ শুকর চাষের গুরুত্ব যদি প্রথমে সরকারী উদ্যোগে করে জনসাধারণকে দেখিয়ে দেওয়া যায়, তবে জনসাধারণ কাজে উৎসাহ পাবে। শুকর পশু হিসাবেও ভাল, সহজেই পোষ মানে, নিজের ঘর অপরিষ্কার করে না এবং এদের খাদ্যও খুব সহজ ও সাধারণ।

ভারতের প্রায় ৭২ শতাংশ লোক আমিষভোজী। কাজেই এদেশে যদি শুকর পালনের ব্যাপক প্রসার করা যায় তাহলে সাধারণ মানুষ একটি পুষ্টিকর খাদ্য হাতের কাছে পাবে।

কৃষি সমাচার

সুফলা

নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার গবেষণার ফলে 'সুফলা' নামের একটি নতুন জাতের সরিষা উদ্ভাবিত হয়েছে। এই নতুন জাতের সরিষায় জাব পোকা ও ছিদ্র প্রতিরোধের শক্তি বেশী। সুফলার ফলন হয় ১০০—১২০ দিনে এবং প্রতি হেক্টরে ফসল পাওয়া যায় ১৫ থেকে ১৭ কুইন্টাল।

এই জাতের গাছ হয় খাড়া খাড়া আর সরিষার বীজগুলো বড় ও পুষ্ট হয় বলে তেলও হয় বেশী (প্রায় ৩৮ থেকে ৪০%)।

সুফলা সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত যে কোন সময় বোনা যায়।

সুষম সারে পেয়াজের ফলন বাড়ে

রাজস্থানের উদয়পুরস্থিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান পালকবিদদের মতে পেঁয়াজ চাষে সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার বিশেষ করে পটাশ ফসফেট ও নাইট্রোজেন প্রয়োগে হেক্টর প্রতি প্রায় ৩৩,০০০ কেজি ফলন তোলা সম্ভব।

বেশী ফলন পাওয়ার জন্য চারা নেড়ে বসানোর পর প্রথমবার এবং প্রায় ৩০ দিন পরে দ্বিতীয় বার সমমাত্রায় নাইট্রোজেনের মাধ্যমে ইউরিয়া সরবরাহ করতে বলা হয়। আর পেঁয়াজ চারা নেড়ে বসানোর একদিন পরে সুপার ফসফেটের মাধ্যমে ফসফোরিক এ্যাসিড এবং মিউরেট অফ পটাশ ক্ষেতে ছড়াতে ও মাটিতে মিশিয়ে দিতে সুপারিশ করা হয়েছে।

জই ও বারসিমের মিশ্রচাষে বেশী পরিমাণে গোখাদ্য পাওয়া যায়

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, জই (ওটস) ও বারসিমের মিশ্রচাষে একদিকে যেমন বেশী ফলন পাওয়া যায়, অপর দিকে তেমনি ফসলের মিশ্রণ গো-খাদ্যের পক্ষেও উপকারী।

দেখা গেছে, জই ও বারসিমের মিশ্রচাষে প্রতি হেক্টরে ৯৬,৪৮০ কেজি ফলন পাওয়া গেছে। সে তুলনায় শুধু জই চাষে ফলনের পরিমাণ হয়েছে মাত্র ১০,৪০০ কেজি। তাছাড়া এদুটি ফসলের মিশ্র চাষে কম করে পাঁচ ছয় কিস্তিতে গো-খাদ্য সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু শুধু জই চাষে দুই বারের বেশী ফসল কাটা যায় না।

জই ও বারসিমের মিশ্র খাদ্যে গরুর পেট ফোলা রোগ হয় না, আর তারা এ খাদ্য পছন্দও করে বেশী।

দফায় দফায় নাইট্রোজেন প্রয়োগে ধানের ফলন

ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে ধান চারা নেড়ে বসানোর সময় মোট নাইট্রোজেন একবারে না দিয়ে যদি দুই—তিন দফায় প্রয়োগ করা যায়, তবে ফলন বেশী হয়।

উচ্চ ফলনশীল জাতের চারা নেড়ে বসানোর সময় আর বিয়ান আসার সময় মোট নাইট্রোজেনের শতকরা ৫০ ৭৫ ভাগ প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে।

তবে অপেক্ষাকৃত হালকা মাটিতে মোট নাইট্রোজেন চারা নেড়ে বসানো, বিয়ান ও থোড় আসার সময় সম পরিমাণে তিন দফায় পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়া উচিত।

বন্যাবাহিত জমিতে নাইট্রোজেন মাটিতে না দিয়ে মাটির গভীরে প্রয়োগ করলে হেক্টর প্রতি প্রায় ৫০০ কেজি বাড়তি ফলন পাওয়া সম্ভব।

পুসা-বৈশাখী মুগের ফলন কি করে বাড়াবেন

পরীক্ষায় জানা গেছে যে, পুসা-বৈশাখী মুগের বেশী ফলন পেতে হলে প্রতি হেক্টর জমিতে ১২৫ কেজি এমোনিয়াম সালফেট ও ৪০০ কেজি সুপার ফসফেট মিশ্রণ প্রয়োগ করা দরকার। এই ভাবে রাসায়নিক সার দেওয়ায় হেক্টর প্রতি ২০০ টাকা খরচ পড়লেও লাভের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০০ টাকা, অর্থাৎ রাসায়নিক সারের জন্য মোট যা খরচ হয়েছে সে তুলনায় লাভ হয়েছে তিন গুণ বেশী।

ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বীজের ঠিক নীচেই এই রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে বেশী উপকার পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁরা আরও বলেন যে, 'সিংগল টিউব সিড ড্রিলের' সাহায্যে সার দেওয়া সুবিধাজনক।

কো-২ ভারতীয় জোয়ার

কোয়েম্বাটুরে অবস্থিত কৃষি অনুসন্ধান সংস্থা কো-২ নামের অন্য জাতের এক নতুন জোয়ার (কোড়া মিলেট-[illegible]) [illegible] চাষের জন্য বাজারে ছেড়েছেন।

কো-১ জাতের তুলনায় এই নতুন জাতটি শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বেশী ফলন দেয়। তাছাড়া স্থানীয় অন্যান্য জাতের থেকে এটা প্রায় ৩০ দিন আগেই পাকে।

এই স্থানীয় জোয়ার বোনার সময় সারির মধ্যে ৪৫ সেন্টিমিটার এবং প্রতি চারার মধ্যে ১৫ সেন্টিমিটার দূরত্ব রাখা উচিত। প্রতি হেক্টরে [illegible] ৫ কেজি বীজ বুনতে হয়। হেক্টর প্রতি জোয়ারের ফলন দাঁড়ায় প্রায় ১২০০ কেজি।

চাল গম ও ভুট্টার তুলনায় এই জাতীয় জোয়ারে ক্যালসিয়াম, লোহা, প্রোটিন ও খনিজ পদার্থ বেশী পরিমাণে বর্তমান। তাই এ দানার সাহায্যে নানা রকম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার তৈরি হয়।

REGD NO D-23

পরিবার পরিকল্পনা অভিযান

ছিয়াশি লক্ষ দম্পতি অর্থাৎ প্রজননক্ষম শ্রেণীর ৮.৬ শতাংশ নির্বীর্যকরণ ও পরিবার পরিকল্পনার বিবিধ আয়োজনের কল্যাণে অবাঞ্ছিত সন্তান জন্মের দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। সংবাদটি পরিবার পরিকল্পনার এবারের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনার বিস্তৃত ক্ষেত্রে যেসব তথ্যাদি পাওয়া গেছে সেগুলিও কম উল্লেখনীয় নয়। প্রচলিত জন্ম নিরোধক মারফৎ সাহায্য করা হয়েছে ১.৯ শতাংশ দম্পতিকে। স্ত্রী ও পুরুষ বিলিয়ে প্রচলিত প্রথায় জন্ম নিরোধক ব্যবহারের সংখ্যা ১৯৬৯-৭০ এর ২৭ লক্ষ ১০ হাজার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার জন।

১৯৭০-৭১ সালে পরিবার পরিকল্পনা খাতে ৫২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে প্রাদেশিক ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের খাতে ব্যয় হয়েছে ৪৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা এবং বাকি অংশ কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির খাতে ব্যয় করেছেন পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রক স্বয়ং।

ইদানিং বিভিন্ন রাজ্যে ১৬টি পরিবার পরিকল্পনা বহির্শাখা চালু আছে। এদের মধ্যে ছয়টি কাজ করছে আহ্‌মেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, ভুপাল, কলকাতা, চণ্ডীগড় এবং লক্ষ্ণৌএ। এগুলি আঞ্চলিক দপ্তরের স্বাস্থ্য সঙ্গে যুক্ত। আঞ্চলিক স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্তর্গত পল্লী এলাকায় ৯০টি প্রধান কেন্দ্র ও ১২৮০টি আধা-প্রধান কেন্দ্র খোলার কাজও সমাপ্ত প্রায়। 'ইউ এস এইড' হতে প্রাপ্ত ১৫ কোটি টাকার মধ্যে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা উপরোক্ত খাতে গৃহাদি নির্মাণ কাজে ব্যয় করা হবে স্থির হয়েছে।

শহরাঞ্চলেও পরিবার পরিকল্পনার কেন্দ্র স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১,৭৭৭টি মাতৃ মঙ্গল তথা পরিবার পরিকল্পনার কেন্দ্র কাজ করে চলেছে। এর মধ্যে ৮৫২টি কেন্দ্র পরিচালনা করছেন বিভিন্ন রাজ্য সরকার, ৩৬৬টি আঞ্চলিক সংস্থা এবং ৩৩৭টি স্ব-প্রণোদিত প্রতিষ্ঠান। এছাড়া, ১৯১টি কেন্দ্র পরিচালনের ভার নিয়েছে রেল ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

টেলিভিশান কর্মীদের শিক্ষণ

রাষ্ট্র সঙ্ঘের উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মসূচী অনুযায়ী ভারতে টেলিভিশান মারফৎ বয়স্ক শিক্ষার প্রসার, পরিবার পরিকল্পনা এবং অধিক ফলন কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারণে রাষ্ট্র সঙ্ঘের টেলিভিশান উন্নয়ন শাখা ভারতীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করবে।

এই কার্যসূচী অনুসারে পুনায় একটি টেলিভিশান শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, যা অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত টেলিভিশান কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী তৈরীর ভার নেবে। এই জাতীয় প্রচেষ্টার এটিই প্রথম পদক্ষেপ।

রাষ্ট্র সঙ্ঘের টেলিভিশান সম্প্রসারণ সংস্থা আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশনস্ সঙ্ঘ মারফৎ কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে এবং পুনার টেলিভিশান কেন্দ্রের জন্য টেলিভিশান সেট ও তার যন্ত্রপাতি ছাড়াও আটজন অভিজ্ঞ কর্মীকে এদেশে পাঠাবেন মনস্থ করেছেন। বৈদেশিক মুদ্রার হিসেবে এসব কাজের জন্য ব্যয় দাঁড়াবে ১.২ মিলিয়ান ডলার। প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং স্থানীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা বাবদ খরচ ভারত সরকার ব্যয় করবেন ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা।

মহারাষ্ট্রে প্লাটিনাম সন্ধান

মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা জেলায় উচ্চ মানের দুষ্প্রাপ্য প্লাটিনামযুক্ত পাথর এবং অন্যান্য ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলে প্লাটিনামযুক্ত পাথরের সম্ভাব্য সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৮,০০০ মেট্রিক টন।

ধনধান্যে

পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে, তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য। এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যথার্থ রূপ তুলে ধরা 'ধনধান্যে'র অন্যতম উদ্দেশ্য।

নিয়মাবলী

ধনধান্যে প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়।

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাদের নিজস্ব।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশ কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা এবং কোনোও রচনার প্রাপ্তি স্বীকার জানানো সম্ভব নয়।

নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ডাক টিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ে এই ঠিকানায় পাঠাবেন—

"যোজনা"
যোজনা ভবন
পার্লামেন্ট স্ট্রীট,
নিউ দিল্লী—১

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ-বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নতুন দিল্লী ১, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ—করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

তৃতীয় বর্ষ ৮ম সংখ্যা
১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ : ২৮শে ভাদ্র ১৮৯৩
Vol. III : No : 8 : Sept. 19, 1971

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
শরদিন্দু সান্যাল

সহ সম্পাদক
সমর ঘোষ

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
সুভাষ বসু

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস. ভি. রাঘবন

সংবাদদাতা (শিলং)
ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

সংবাদদাতা (ত্রিবান্দ্রাম)
বসন্ত কুমার পিল্লে

সংবাদদাতা (বোম্বাই)
অবিনাশ গোডবোলে

ফোটো অফিসার
টি. এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট
বলরাম মণ্ডল

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নিউ দিল্লী ১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ ৩৮৫৪৮১/৪০২

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

"শিরদার ত সরদার"। মাথা দিতে পার ত নেতা হবে। আমরা সকলে ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই, তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

এই সংখ্যায়

খাদ্যোৎপাদনে নব দিগন্ত

১৯৭০-৭১ সালে দেশে রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পরিমাণ হোল ১০৭.৮১ মিলিয়ন টন। সুতরাং বলা যায় ৫৫০ মিলিয়ন দেশবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করা আগের মত অত প্রকট হয়ে দেখা দেবে না। ভারতীয় কৃষির ইতিহাসে এই প্রথম শস্যোৎপাদন ১০০ মিলিয়ন টনের ওপর হোল। গমের ক্ষেত্রে চার বছরের মধ্যে উৎপাদন চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কোন মান হিসেবে এটা একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। মাত্র ২০ বছর আগে আমাদের দেশে যখন সুপরিকল্পিত-ভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ শুরু হয় তখন খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল মাত্র ৫১ মিলিয়ন টন।

এই অপূর্ব সাফল্যের কৃতিত্ব হোল ডঃ নরম্যান্ বোরলগের অধিনায়কত্বায় বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের। ডঃ স্বামীনাথনের নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কার্যকলাপ সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং কয়েকটি উচ্চতম পুরস্কারের দ্বারাও তাঁদের সম্মানিত করা হয়। মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ফিলিপিন, তাইওয়ান ইত্যাদি সুদূর দেশগুলিতে বিভিন্ন পরিবেশ ও আবহাওয়ার মধ্যে থেকে এইসব বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মীগণ জনগণের দুঃখ দুর্দশা বহুল পরিমাণে লাঘব কোরতে সক্ষম হয়েছেন, যা এর আগে আর কখনও সম্ভব হয়নি। এছাড়া তাঁরা বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন যে মনুষ্য সমাজের কল্যাণে, জাতীয়তার সংকীর্ণ বেড়াজাল পেরিয়ে একত্রে চিন্তা কোরতে এবং একত্রে কাজ কোরতে বিজ্ঞানীরা সক্ষম।

ভারতীয় কৃষকগণের প্রচেষ্টাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। যদিও দেশের মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে এবং কয়েক প্রকার শস্য যেমন, গম ইত্যাদির ক্ষেত্রে 'সবুজ বিপ্লব' দেখা গেছে। যাই হোক এখন বলা যায় যে ভারত আজ তার কৃষি ব্যবস্থা অনেক ন্যায় সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোরতে পেরেছে*। আর এই পদ্ধতির মধ্যে অন্তঃনিহিত রয়েছে তার সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার শক্তি। মানুষের বাঁচার প্রধান ও প্রাচীনতম হাতিয়ার ছিল লাঙল ও বলদ। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে বহু বছর ধরে এর আর কোন পরিবর্তন হয়নি। উপস্থিত এদিকে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

এ যাবৎ যে 'সবুজ বিপ্লব' দেখা গেছে তা হয়েছে খাদ্যোৎ-পাদনের পরিমাণে। ভারতে ধর্মীয় কারণে অধিকাংশ জনগণ প্রাণীজ প্রোটিন হিসাবে মাত্র একটি সামগ্রী ব্যবহার করেন—তা হোল দুধ। কিন্তু এই দুধকে আবার আরও পুষ্টিকর কোরতে গিয়ে একে পরিণত করা হয় প্রাণীজ চর্বি বা ফ্যাটে—যাকে আমরা বলি ঘি। এই রূপান্তরের ফলে প্রোটিন পুষ্টির মারাত্মক রকম অভাব দেখা দেয় এবং নানা রকম উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে।

কৃষি বিজ্ঞানীগণ, এ সমস্যা সমাধানের দুটি পথ দেখিয়েছেন। প্রথম উচ্চ শ্রেণীর গো-মহিষাদির সংমিশ্রণে আরও ভাল জাতের দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি কোরে দুধ উৎপাদন আরও বাড়ানো এবং দ্বিতীয় গম ও রাই-এর সংমিশ্রণে [illegible] প্রোটিন বিশিষ্ট ভাল জাতের শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি। দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধনের পথে ইতিমধ্যেই খানিকটা অগ্রসর হওয়া গেছে কিন্তু শঙ্কর শস্যের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় না। এর প্রজননের বিষয়টি এখনও গবেষণাগারে আবদ্ধ। তবে ডঃ বোরলগের কথায় বলা যায় "প্রগতির কোন বিরাম নেই, সব সময়েই আমরা প্রগতির পথে এগুতে পারি এবং এগুনো উচিৎ।"

গবেষণাগারে না হয় সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল কিন্তু আসল সমস্যা হোল সেটিকে কাজে লাগানো। ভারতের মত এক বিরাট দেশে নানা রকম সমস্যা রয়েছে এবং গবেষণালব্ধ ফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার মত সম্পদও খুঁজে বার করা দরকার। অগ্রাধিকার বশতঃ সমাধানগুলি খুঁজে বার করার জন্যে যদি আমাদের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মনিষীদের কাজে—লাগাতে হয় তাহলে এটাও স্পষ্ট যে সেগুলি কার্যকরী করার জন্যেও উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ কোরতে হবে।

ভারতকে যদি ব্যাপকভাবে উন্নত ধরনের পুষ্টি সম্পন্ন খাদ্যদ্রব্য দিয়ে পুষ্টির অভাব দূর কোরতে হয়, তাহলে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার সঙ্গে সমতা রেখে সম্প্রসারণ সংস্থাগুলিকেও তৎপর কোরে তুলতে হবে। বহুদিন ধরে আমাদের বিজ্ঞানীগণ আমাদের শোনাচ্ছেন যে রান্নার মাধ্যম হিসেবে ঘিয়ের চেয়ে ভিটামিনযুক্ত বনস্পতি অনেক ভাল। কারণ এতে অতিরিক্ত পুষ্টিকর দ্রব্য যোগ করা হয়েছে এবং এতে কোলেস্টরল, যা নাকি রোগের অন্যতম কারণ, তার পরিমাণ অনেক কম। কিন্তু আমরা কি সে কথা শুনি? বরং আরও বেশী পয়সা দিয়ে সন্দেহজনক মানের প্রাণীজ ফ্যাট পছন্দ করি। বহু দিন ধরে আমরা সয়াবিনের প্রশংসা শুনে আসছি, কিন্তু বড় বড় শহর ছাড়া এটি এখনও তেমন-ভাবে বাজারে দেখা যায় না। চীনে বাদাম থেকে তৈরী পুষ্টিযুক্ত আটার বেলায়ও এ কথা বলা যায়। পুষ্টি বিশেষজ্ঞগণ বহু দিন থেকে বলে আসছেন যে ব্যাপকভাবে পুষ্টির অভাব দূর করার জন্যে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে সস্তা। ভারতের উপকূল-ভাগে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি ও টুনা মাছ পাওয়া যায়। এগুলি প্রাণীজ প্রোটিনে পূর্ণ। কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে সেগুলি শোভা পায় পাশ্চাত্য দেশগুলির ভোজ টেবিলে। আর আমরা আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে আমদানি করি জাহাজ ভর্তি [illegible] জাতীয় খাদ্য। এ অবস্থায় বিজ্ঞানীগণ আমাদের আর কি সাহায্য কোরতে পারেন।

রাষ্ট্র সঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন

বিশ্ব কৃষি উৎপাদনে দুই শতাংশ বৃদ্ধি

১৯৭০ সালে বিশ্বে কৃষি উৎপাদন দুই শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য উৎপাদনে দূর প্রাচ্যের দেশগুলি অগ্রগতি অপ্রতিহত রেখেছে এবং ঐসব অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আশঙ্কাজনকভাবে বাড়েনি। সংবাদটি পাওয়া গেছে রাষ্ট্র সঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাৎসরিক প্রতিবেদনে।

খাদ্য শস্য উৎপাদনে পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ওসিয়ানিয়া এবং জাপান ১৯৬৯ এর উৎপাদনের তুলনায় কোন রকম বৃদ্ধি ঘটাতে পারেনি। যারপূর্ব ইউরোপে কৃষি উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা কমই ছিল এদের তুলনায় সোভিয়েট রাশিয়ার অবস্থা অনেক ভাল। ১৯৬৯ সালে উৎপাদনে ৪ শতাংশ অধোগতি দেখা দেওয়া সত্বেও এবছর সামগ্রিক ভাবে উৎপাদন ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

বাড়-ফসলি গমের দেশ মেক্সিকো ঐ বছর গম উৎপাদনে বিশেষ জোর দেয়নি—তারা কারণ দেখিয়েছে উদ্বৃত্ত ফসল রপ্তানি করা যায় এমন দেশের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। এই ধরণের আমদানিকারী দেশের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ ভারতের কথাই ধরা যাক্। ভারত ১৯৬৭ সালে আমদানি করত ৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন গম। অধিক ফলনশীল গমের কল্যাণে ১৯৭০ সালে ভারতের সম্ভাব্য আমদানি কমে দাঁড়াতে পারে ২৮ লক্ষ মে টনে।

ধান্য উৎপাদনে রেকর্ড

এ সত্বেও বিশ্বের মুখ্য খাদ্য শস্য গমের উৎপাদন—১৯৬৯ এর উৎপাদনের উপর বাড়েনি। ১৯৬৯এ বিশ্বে গম উৎপাদন ছিল ২৮ কোটি ৬০ লক্ষ মে. টন। গম উৎপাদন আশাব্যঞ্জক না হলেও ধান উৎপাদনে নয়া রেকর্ড কায়েম করা হয়েছে। ১৯৭০ সালে ধান উৎপন্ন হয় ২০ কোটি ৮২ লক্ষ মে টন।

১৯৭০ সালে নিম্ন মানের খাদ্য শস্যের এবং প্রাণীজ খাদ্যের উপর বিশেষ নজর না দেওয়ার ফলে এদের উৎপাদন পড়ে যায়। এর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপে ফলমূলাদি উৎপাদন এবং সয়াশুঁটি শিল্পে উৎপাদন নেমে এসেছে।

কৃষিজ বাণিজ্যে অগ্রগতি

বিশ্ব কৃষিজ দ্রব্য বাণিজ্যের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী মৎস্য ও বনজ সম্পদ ছাড়া ১৯৭০ সালে রপ্তানির মূল্য দাঁড়ায় ১৩ শতাংশ। সম্পূর্ণ তথ্য গোচরে এলে খতিয়ানে দেখা যাবে ১৯৫২ সালের পর আলোচ্য বছরে কৃষি রপ্তানির অগ্রগতি এই বছরের বিশ্বের মোট বানিজ্য অগ্রগতির সঙ্গে তুলনীয়।

উন্নয়নশীল দেশে কৃষি উৎপাদন

উন্নয়নশীল দেশে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৩ ও ৪ শতাংশ। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে জনপিছু কৃষি উৎপাদন বাড়েনি বল্লেই চলে। উপরোক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে রাষ্ট্র সঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল ডঃ এ. এইচ বোয়েরমা বলেন—"১৯৬০ এর গোটা দশকে উন্নয়নশীল দেশে জনপিছু খাদ্য উৎপাদন তো বাড়েই নি, অধিকন্তু আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে উৎপাদন মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। অবশ্য ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এসব দেশ এটুকু সন্তুষ্টি পেতে পারে যে অন্ততঃ তাদের মাথাপিছু উৎপাদন পড়ে যায়নি। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে এটুকু যথেষ্ট নয়।"

উন্নত দেশে কৃষির অবস্থা

উন্নত দেশগুলিও কৃষি ক্ষেত্রে কোন রকম উন্নতি দেখাতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ার কৃষি উৎপাদন ৩ শতাংশ কমেছে, নিউজিল্যাণ্ড উৎপাদনের পূর্ব মাত্রায় চলছে। খাদ্যোৎপাদনে উত্তর আমেরিকা, ও ওসিয়ানিয়া এক ও দুই শতাংশ পেছিয়ে পড়েছে। জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইজরাইলে খাদ্যোৎপাদন এক শতাংশ বেশী হয়েছে।

১৯৬৯ সালে বিশ্বে মৎস্য চাষে সাময়িক ঘাটতি দেখা দেয়। সাময়িক বলা হোল, কেননা পরের বছরই উৎপাদন প্রচণ্ডভাবে বাড়ে—৬ কোটি ১০ লক্ষ মেট্রিক টন। এ পর্যন্ত মৎস্য উৎপাদনে এটি একটি রেকর্ড। বরাবরের মত দক্ষিণ আমেরিকা ৭০' সালেও তাদের অগ্রগতি অপ্রতিহত রাখতে পেরেছে। শতাংশে মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৬ ভাগ এবং মূল্যায়নে তা দাঁড়িয়েছে ৩০০ কোটি ডলার।

খাদ্যোৎপাদনে অপ্রতিহত অগ্রগতি

১৯৭০-৭১ সাল ভারতের কৃষি ইতিহাসে এক নব দিগন্তের সূচনা করল। এইবার সর্বপ্রথম খাদ্যোৎপাদন ১০০ কোটি মেট্রিক টন সীমা অতিক্রম করেছে।

খাদ্য শস্য উৎপাদনের খতিয়ান অনুযায়ী ১৯৭০-৭১ সালে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৭.৮১ মিলিয়ান মেট্রিক টন। ১৯৬৯-৭০ সালে এই উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৯.৫০ মিলিয়ান মেট্রিক টন। গতবারের চাইতে কর্ষিত এলাকায় যৎসামান্য বৃদ্ধি অবশ্য হয়েছে ২০ মি. হেক্টার (মোট কর্ষিত জমি ১২৩.৯০ মি. হেক্টর), কিন্তু ৮.৪ শতাংশ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে খাদ্য শস্য উৎপাদনই প্রধানত: অগ্রণী।

গম উৎপাদনে নতুন রেকর্ড

কৃষি মন্ত্রকের অর্থনৈতিক এবং পরিসংখ্যান দপ্তরের হিসেবে অনুযায়ী, এইবার নিয়ে উপর্যুপরি চতুর্থবার গম উৎপাদনে পুরোন রেকর্ড ভেঙে নতুন, আবার নতুন রেকর্ড কায়েম, এই ভাঙাগড়ার পালা চলেছে। এবছর গম উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ২৩.২ মিলিয়ান মেট্রিক টন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ধরা হয়েছিল চতুর্থ যোজনার শেষ ভাগ পর্যন্ত গম উৎপাদন ২৪ মিলিয়ান মে টন দাঁড়াবে। দেখা যাচ্ছে সবুজ বিপ্লবের কল্যাণে উপরোক্ত সীমা দুই/এক বছরের মধ্যে অতিক্রম করা মোটেই অসম্ভব কাজ হবে না।

বিশেষভাবে বলতে হবে ধান উৎপাদনের কথা। এক্ষেত্রে কর্ষিত এলাকা প্রকৃতপক্ষে নেমে গ্যাছে ০.৭ শতাংশ ভাগ; এ সত্ত্বেও গত বারের চাইতে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৭ শতাংশ ভাগ। অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় খাদ্য শস্য বাজরা উৎপাদনেও আশাতীত সাফল্য লাভ হয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে যে উৎপাদন সীমা ধার্য করা হয়েছিল, এবছর তা অতিক্রম করেও বর্ধিত উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন।

ডাল উৎপাদন, মানতে হবে, আশানুরূপ হয়নি। গতবছরের চাইতে এবার উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে কিছু কম হয়েছে। এবছরের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে যে কয়টি প্রদেশ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে তাদের মধ্যে রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, তামিল নাড়ু, বিহার, হরিয়াণা অন্যতম। আর যেসব প্রদেশে উৎপাদন নেমে এসেছে তার মধ্যে আছে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর। নীচে কয়েকটি খাদ্য শস্যের উৎপাদন সম্বন্ধে কিছু বলা হোল:

ধান

খাদ্য শস্যের মধ্যে ধান উৎপাদনই অগ্রাধিকার করে আছে। ১৯৭০-৭১ সালে চাল উৎপাদনের রেকর্ড হোল ৪২.৪৫ মিলিয়ান মেট্রিক টন। গতবারের চাইতে এবারে উৎপাদন হয় ২ ০২ মিলিয়ন মে. টন বেশী এবং শতাংশে এই বৃদ্ধির হার ৫ ভাগ। এবারের উৎপাদনের বিশেষত্ব হোল কর্ষিত এলাকার পরিমাণ নেমে আসা সত্ত্বেও উৎপাদন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়েছে। যেসব প্রদেশ উৎপাদন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে তাদের মধ্যে রয়েছে তামিল নাড়ু, বিহার, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট এবং পাঞ্জাব। এই উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে হোল হেক্টর পিছু উৎপাদনে উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি। গত বছরের তুলনায় ১৯৭০-৭১ সালে হেক্টর পিছু উৎপাদন বেড়েছে [illegible] শতাংশ ভাগ।

গম

গম উৎপাদনে এইবার নিয়ে উপর্যুপরি চতুর্থবার সফল্য শিখর অভিযান জয়যুক্ত হয়েছে। এবারের উৎপাদন যা হয়েছে তাকে সর্বকালের রেকর্ড বলে ধরা যায়।

গতবারের চাইতে ৩.১৫ মিলিয়ান মে. টন অথবা শতকরা হিসেবে ১৫.৭ শতাংশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে এবারের গম উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ২৩.২৫ মিলিয়ান মে. টন।

এবারের উন্নতক্রম উৎপাদনের পথিক হয়েছে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট। হেক্টর পিছু উৎপাদনেও হয়েছে অভূতপূর্ব সাফল্য—১৯৭০-৭১ এর উৎপাদন গত বছরের তুলনামূলক উৎপাদনের চাইতে ৯০ কেজি অথবা শতকরা হারে ৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য হরিয়াণা ও পাঞ্জাবে উৎপাদন গত সীমার চাইতে অনেক বেশী হয়েছে। অধিক কি, এ দুটি প্রদেশের হেক্টর পিছু উৎপাদন যে কোন উন্নত দেশের হেক্টর পিছু গম উৎপাদনের সমকক্ষ।

বাজরা

অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় খাদ্য শস্যের মধ্যে পড়ে বাজরা। এবছরে তার উৎপাদন গত বছরের তুলনায় বাড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ। এ বছরে বাজরা উৎপাদনে রাজস্থান এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গত বছরের ৮ ০৮ মে টন থেকে উৎপাদন বাড়িয়ে তোলা হয় ২৬.৭৪ লক্ষ মে. টন। এছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধিতে অন্যান্য প্রদেশ, যেমন গুজরাট, হরিয়াণা উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, মহিশূর ও তামিল নাড়ুরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

ভুট্টা উৎপাদনেও নতুন রেকর্ড কায়েম করা হয়। ১৯৭০-৭১তে ৭ ৪১ মিলিয়ান মে. টন ভুট্টা উৎপাদন গতবারের উৎপাদন ৫.৬৭ মিলিয়ান মে. টনের চাইতে প্রায় ৩০ শতাংশ বেশী। উল্লেখযোগ্য উৎপাদন হয়েছে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, বিহার, গুজরাট এবং মহীশূরে।

খরিফ ও রবি খন্দের শস্য জোয়ার উৎপাদন কিন্তু গতবারের চাইতে ১৬ শতাংশ কম হয়েছে। এবারের উৎপাদন ছিল ৮.১৬ মি. মে. টন।
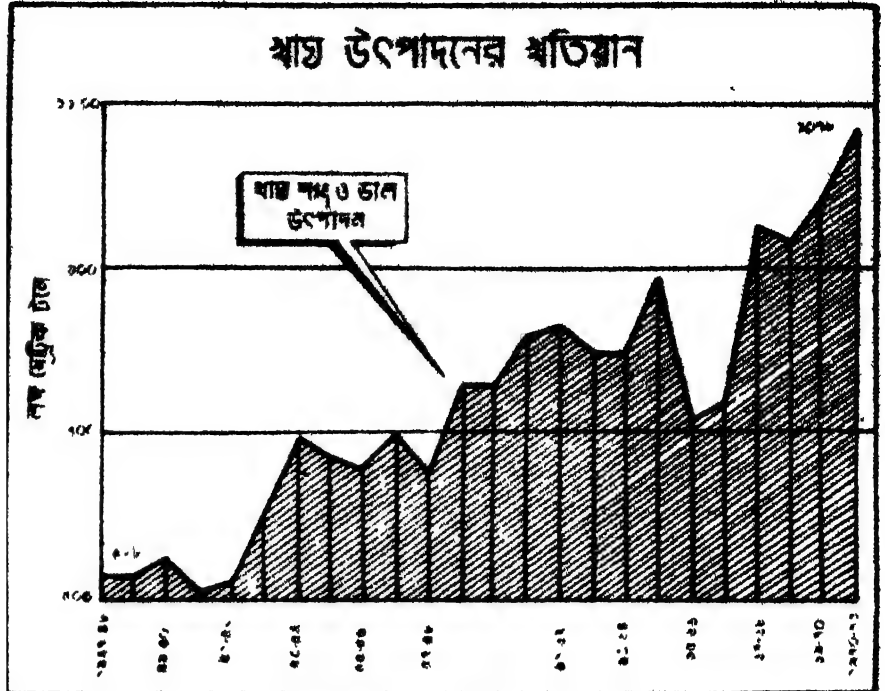
'রাগি' উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে যৎ-

সামান্য। ১৯৭০-৭১ সালের উৎপাদন দাঁড়ায় ২.২০ মি. মে. টন—গতবার ছিল ২.১২ মে.মি. টন। অবশ্য 'রাগি' শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে এজন্য যে, গতবছরের চাইতে কথিত এলাকা ৯ শতাংশ ভাগ কম হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়নি। মহিশূর, মহারাষ্ট্র, বিহার ও তামিলনাড়ু 'রাগি' উৎপাদনে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছে।

রবি খন্দের আর একটি শস্য যব। সামগ্রিক শস্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ স্থান নিলেও তা অপাংক্তেয় হয়ে পড়েনি। ১৯৭০-৭১ সালে দেশে যব উৎপাদন দাঁড়ায় ২.৮৭ মি. মে. টন।

ডাল উৎপাদন

খাদ্য শস্যের সামগ্রিক অগ্রগতি সত্বেও ডাল উৎপাদন আশানুরূপ হয়নি। প্রকৃত-পক্ষে এবছর ছোলার ডালের উৎপাদন পড়ে যায় ৩ লক্ষ মে. টন। ১৯৭০-৭১ এ মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ৫২.৫ লক্ষ মে. টন। উৎপাদন নিম্নমুখী হওয়ার দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমটি যথাসময়ে বরুণদেবের কৃপা হতে শস্যটি বঞ্চিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় কারণটি হোল, গম এবং ভুট্টার মত উচ্চ ফলনশীল বীজের মত এটি সুলভ নয়। অবশ্য সব রকমের ডাল মিলিয়ে মিশিয়ে এবারের মোট উৎ-পাদন দাঁড়ায় ১১.৫৮ মি. মে. টন—যা গতবারের উৎপদনের চাইতে সামান্য কম।

এবারের খাদ্য শস্য উৎপাদনের একটি বিশেষত্ব হোল, বৃষ্টিপাত সিঞ্চিত এলাকায় বর্ষা আশানুরূপ হয়নি। যেমন পাঞ্জাবে এবারে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস মাস পর্যন্ত রবি খন্দের শস্য বৃষ্টির আনুকূল্য লাভ করেনি বল্লেই চলে। এছাড়া, এপ্রিল মে মাসে শস্য পাকার মুখে অকাল বর্ষণ ও শিলা বৃষ্টির প্রাবল্যে শস্যের প্রভূত ক্ষতি হয়। অবস্থা আরো সঙ্গিন হয়ে ওঠে কেননা ঠিক এই সময়েই ভাকরা বাঁধে জল নেমে যাওয়ার দরুণ হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দেয়। এর ফলে সেচের কাজেও বাধার সৃষ্টি হয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্বেও হরিয়াণা ও পাঞ্জাব যে উপর্যুপরি চতুর্থ বার গম উৎপাদনে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখতে পেরেছে, তা থেকেই সিদ্ধ হয় "সবুজ বিপ্লবের" কল্যাণে কৃষকরা আজ আর পূর্বের মত প্রকৃতি নির্ভর নয়। ভারতের কৃষি উৎ-পাদনে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ইস্পাত শিল্পের সমস্যা

সম্প্রতি ইস্পাত শিল্পে নানান সমস্যা দেখা দেওয়ায়, উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে এবং উৎপাদন মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক কারখানায় উৎপাদন-ক্ষমতার তুলনায় কম উৎপাদন হচ্ছে। টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কারখানায় উৎপাদন নির্দিষ্ট ক্ষমতার তুলনায় মোটামুটি সন্তোষজনক এবং ভিলাই ইস্পাত কারখানাতেও উৎপাদন বেশ উৎসাহ ব্যঞ্জক হলেও রাষ্ট্রায়ত্ত অন্যান্য ইস্পাত উৎপাদনকারী উদ্যোগ লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে পড়েছে।

ইস্পাত শিল্পে শ্রমিক অশান্তি ছাড়াও, পরিচালন এবং প্রযুক্তি বিদ্যায় ক্ষেত্রেও নানান রকম সমস্যা রয়েছে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির পেছনে শ্রমিকের দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মজুরী বাড়া সত্বে শ্রমিকপিছু উৎপাদন বাড়েনি। আবার কয়েকটি স্থানে অযৌক্তিকভাবে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফলে দেশকে তার মাশুল গুণতে হচ্ছে। বিশ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইস্পাত কারখানায়, এক ঘন্টা কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ হোল ২ লক্ষ টাকার উৎপাদন নষ্ট হওয়া। যাঁরা এভাবে কাজ বন্ধ করে দেয়, সম্ভবতঃ তাঁরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন নয় যে এর ফলে কারখানার যন্ত্রপাতির কর্মক্ষমতা কতখানি নষ্ট হচ্ছে। সব থেকে বড় কথা, এরফলে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

যেখানে ৯০ লক্ষ টন উৎপাদন হবার কথা সেখানে এবারে উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৭০ লক্ষ টনেরও কম। অথচ উৎপাদন এবং চাহিদার মধ্যেকার ব্যবধানের শতকরা ৮০ ভাগ আমরা মেটাতে পারি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা না হয়ে, এই ব্যবধান পূর্ণ করতে আমাদের বিদেশ থেকে ইস্পাত আমদানী করতে হচ্ছে। উন্নত দেশগুলির কাছ থেকে বেশী দাম দিয়ে পণ্য কিনে আমরা তাদের আরো ধনী হবার সুযোগ করে দিচ্ছি। কারণ, প্রযুক্তির সুযোগ গ্রহণে আমরা অপারগ।

সুষ্ঠু সরবরাহ

সুষ্ঠু উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, বিশেষজ্ঞ সেবা, মেরামতী ব্যবস্থা, সুযোগ্য পরিচালন প্রভৃতির সুযোগ যাতে সর্বদা অকৃপণভাবে পাওয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে, কোন রকমে কাজ চালানো গোছের ব্যবস্থায় চলবে না। যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা কাঁচামাল সুষ্ঠুভাবে সরবরাহের জন্য ত্রৈমাসিক বা ষান্মাষিক ভিত্তিতে না করে, একটা নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে। ইস্পাত কারখানার ক্ষেত্রে এই সময় সীমা তিন বছরের হওয়া উচিত। প্রতি বছরের শেষে, পরিকল্পনা এবং তার অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

সর্বোচ্চমাত্রায় উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি লৌহ তৈরীর সঙ্গে সম্পর্কীত। জাপানের উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানে লৌহ চুল্লী আয়তনের প্রতি ঘন মিটারে, প্রতিদিন ২.৫ মেট্রিক টন করে উত্তপ্ত ধাতু (হট মেটাল) উৎপন্ন হচ্ছে। আমাদের দেশে এর পরিমাণ হোল এক টনের মত। লৌহ চুল্লীতে ব্যবহৃত কয়লার ব্যবহারও আমাদের দেশে যথেষ্ট বেশী। প্রতি টন উত্তপ্ত ধাতুর জন্য ৮০০ থেকে ৯০০ কিলোগ্রাম কয়লা খরচ হয়। অথচ প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির ফলে জাপানে এর খরচ ৫০০ কিলোগ্রামেরও কম।- এবং এই দশকের শেষাশেষি তাঁরা এই খরচ ৩০০ কিলোগ্রামে নামিয়ে আনতে সক্ষম হবেন। সারা বিশ্বে উন্নত মানের কয়লার ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই।

আমাদের দেশের কয়লায় মধ্যে ছাইয়ের অংশ বেশী। তা সত্বেও ব্লাস্ট ফারনেসের উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এজন্য প্রথম করণীয় হোল, চালের আকারের আকরিক লৌহ আরো ছোট করতে হবে। বর্তমানে, আমরা সাধারণতঃ ৭৫ মিঃ মিঃ মাপের আকরিক লৌহ ব্যবহার করি। অন্য দেশে এর আয়তন ৪০ মিঃ মিঃ। আকরিক লৌহকে ছোট ছোট আকারে ভেঙে নিয়ে ব্যবহার করতে বিশেষ অসুবিধা বা বড় রকমের বিনিয়োগেরও প্রয়োজন হবে না।

আর একটি সমস্যার দিকে এখানে দৃষ্টিপাত করা যাক। উন্নত দেশগুলিতে লৌহ চুল্লীর উৎপাদন তাপ ১৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছেছে। বড় রকম মেরামতীর সময় আমাদের ব্লাস্ট ফারনেসগুলির উৎপাদন তাপ বাড়ানো যেতে পারে। আবার, উত্তপ্ত ধাতু উৎপাদনের সর্বাধিক যোগ দিতে গেলে, ইস্পাত তৈরীর পর অতিরিক্ত ধাতুকে লৌহ পিণ্ডে রূপান্তরিত করার সুবিধা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে বাড়তি উত্তপ্ত ধাতুকে লৌহ পিণ্ডে বিক্রি করা যায়। লৌহ পিণ্ডের আভ্যন্তরিণ চাহিদা সম্পর্কে যখন আশাহত হবার কারণ নেই, তখন এর উৎপাদন কম করার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। পূর্ব অভিজ্ঞতাতেও দেখা গেছে যে, উদ্বৃত্ত ইস্পাত ও লৌহ পিণ্ড বিদেশের বাজারে বিক্রি হয়ে গেছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ মে. টন। পরবর্তী কয়েক বছরে, ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা এর রপ্তানি কম করেছি। আশা করা যায়

যে, জাপান ব্যতিরেকে অন্যান্য বাজার আমাদের অনুকূল হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কয়েকটি উন্নত দেশ আবহাওয়া দূষিতকরণ সমস্যায় সম্মুখীন হওয়ার ফলে, আমাদের কাছ থেকে লৌহ পিণ্ড কিনতে আগ্রহী হবে। তাছাড়া, আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহের বিকাশশীল অর্থনীতির পটভূমিকায় ফাউণ্ড্রি গ্রেড লৌহ পিণ্ডের ভালো বাজার পাওয়া যাবে।

ব্যয় সঙ্কোচন

আর একটি প্রশ্ন হোল, আমরা 'সিনটারিং' এর উপর জোর দেব, না 'পেলেট' ধরনের রূপান্তরিত আকর ব্যবহার করবো। গত ৭।৮ বছর ধরে এই নিয়ে বিতর্ক চলেছে। এক্ষেত্রে কারিগরী দিকগুলি খুব ভালোভাবে বিবেচনা করেই আমাদের অগ্রসর হওয়া সমীচীন। দূরবর্তী স্থানে পরিবহনের দিক থেকে পেলেট সুবিধাজনক। অন্যদিকে সিনটার কারখানা এলাকাতেই উৎপন্ন করতে হয়। কারণ সিনটার-এ কারখানার অনেক অব্যবহার্য বস্তু কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে। অধিক লৌহ ও আকর রপ্তানিতে এ পর্যন্ত বড় বড় চাকই পাঠানো হয় এবং মিহি আকর সর্বদা কাজে লাগানো হয় না। এই মিহি আকরকে ভবিষ্যতে পেলেট-এ রূপান্তরিত করে কাজে লাগান যেতে পারে এবং তা বৃহদাকার আকরের চেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে; এমন কি তা ব্যয় সঙ্কোচেও সাহায্য করবে। কিরিবুরু, বাইলাডিলা, গোয়া—বলতে গেলে প্রতি খনিতে মিহি আকর স্তূপীকৃত হয়ে থাকলেও রপ্তানিতে বৃহদাকার আকর ব্যবহার করা হয়। খনি থেকে আকরিক লৌহ উত্তোলনের সময় যে নীলাভ মিহি আকার সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ লৌহাংশ থাকে। সুতরাং নীলাভ এবং মিহি আকর পেলেট-এ রূপান্তরিত করলে এর উপযোগ অনেকই বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। কাজেই মিহি নীলাভ আকর কাজে লাগানোর নীতি গ্রহণ করলে তা প্যালেট রূপে রপ্তানিই বিবেচ্য বলে মনে হয়।

ব্লাস্ট ফারনেস, এল্. ডি কনভার্টার প্রাইমারী রোলিং মিল, কন্টিনিউয়াস কাষ্টিং মেসিন, এবং অন্যান্য রোলিং মিলের আয়তন বৃদ্ধি এবং প্রোসেসিং-এর ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি হয়েছে। এর ফলে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যয় সংকোচ সম্ভব। অবশ্য ব্লাষ্ট ফারনেস, এল ডি কনভার্টার এবং রোলিং মিল প্রভৃতি যন্ত্রপাতির আয়তন বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সংক্রান্ত কাজের জটিলতাও বাড়বে। তাই স্বয়ংক্রিয় কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

বর্তমান পরিস্থিতিতে অগ্রগতির পর্যায়ে বৃহদায়তন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা খুব যুক্তিযুক্ত হবেনা। সমকালীন ও সব মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বিনিয়োগ বাহুল্য কমবে; ফলে লভ্যাংশও বাড়বে। এতে বিশেষজ্ঞ মন্ত্রণা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস, কারখানা স্থাপনের সময় সংক্ষিপ্ততা ইত্যাদি যে হবে তাই নয়, রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যাও দূর হবে। সর্বোপরি, উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যসূচী ত্বরান্বিত হবে এবং আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি আরো দ্রুততর হবে।

নবীনতম পদ্ধতি

সারা পৃথিবীতে এখন এল ডি প্রক্রিয়ায় ইস্পাত উৎপাদনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। শুরুতে রৌরকেল্লা ইস্পাত কারখানায় একটি ৪০ টনি এল, ডি. কনভার্টার বসানো হয়। কারখানা সম্প্রসারণের সময় তা বাড়িয়ে ৬০ টনের করা হয়েছে। বোকারোতে প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ২.৫ মেট্রিক টন পর্যন্ত, একটি বড় 'এল্ ডি ভেসেল' বসানো হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে দুটি ২৫০ টনের এল. ডি কনভার্টার বসানোর প্রস্তাব রয়েছে। মোটামুটিভাবে এগুলিকে বড় বলা গেলেও পৃথিবীর অন্যত্র ৩০০।৩৫০ টনের এল. ডি. কনভার্টার ব্যবহৃত হচ্ছে। নতুন ভাবে ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার যেসব প্রচেষ্টা চলেছে, তা হয় এল. ডি কনভার্টারের মাধ্যমে, না হয় ইলেকট্রিক ফারনেসে। আমাদের দেশে ইস্পাত উৎপাদনে ব্যাপারটি ক্ষেত্রে ১০০—২৫০ টনি এল. ডি. কনভার্টারের উপর জোর দেওয়া শ্রেয় বলে মনে হয়।

এল. ডি. কনভার্টারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল, 'অপারেশনাল এ্যাভেলেবিলিটি' বাড়ানো এবং উত্তাপ সময় কমানো। এখানেও আবার আমাদের দেশের উৎপাদন পদ্ধতি এবং এল ডি. কনভার্টারের আভ্যন্তরিক নির্মাণ আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় অনেক পেছনে। এদেশে ব্যবহৃত এল. ডি. কনভার্টারের উত্তাপ সহ্যসীমা যেখানে ২৫০ মাস, সেখানে উন্নত দেশে ব্যবহৃত এল. ডি ৭০০ মাস উত্তাপ সহনশীল। এজন্য ভাল রিফ্র্যাকটরি সরঞ্জাম এবং লাইনিং তৈরী করার প্রধান সমস্যা দূর করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এল. ডি. কনভার্টার পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদনে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। যেমন উচ্চ কার্বনযুক্ত ইস্পাত, মিশ্র ইস্পাত, এমন কি নিকলজ ইস্পাত পর্যন্ত এল. ডি. প্রক্রিয়ায় তৈরী হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের দেশে এ ব্যাপারে একাগ্র চেষ্টা চালানো উচিত। এর পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ধরনের ইস্পাতের অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিকল্পনার কাজে লাগবে।

তা বলে আমাদের সাবেকী খোলা লৌহ চুল্লিতে উৎপাদনে অবহেলা করলে চলবেনা। ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অর্থাৎ ওপেন হার্থ ফারনেস, কম সাহায্য করছেনা। 'অক্সিজেন ল্যানসিং', কেটলিং এবং ব্লাস্ট ফারনেসের ছাদ তৈরীর উপযুক্ত রিফ্রাক্টরি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় লাঘব এবং উৎপাদন উর্দ্ধ হারে বজায় রাখা সম্ভব। আমাদের ক্ষেত্রে আলোচ্য পদ্ধতি অত্যন্ত ফলকারী; কারণ বর্তমানে ইস্পাত গলানোর মোট পরিমাণের শতকরা ৮০ ভাগ সম্পাদিত হয় খোলা লৌহ চুল্লির সাহায্যে।

'কন্টিনিউয়াস কাস্টিং' প্রযুক্তি বিদ্যার

অন্যতম বড় অবদান, যার ফলে এই দশকে প্রচণ্ড অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে উৎপাদনে ব্যয় কম হয়। উৎপাদন ক্ষমতা ৩/৪ মিলিয়ান টন হলে তবেই প্রাইমারি স্ল্যাবিং এবং ব্লুমিং মিলে ব্যয় সাশ্রয়ের কথা ভাবা যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট আকারের কন্‌টিনিউয়াস কাস্টিং প্লান্ট স্থাপন করাই বরণীয়। সাবেকী ব্লুমিং এবং স্ল্যাবিং মিলে ধাতু পিণ্ড থেকে উৎপাদন যেখানে শতকরা ৮৬ ভাগের মত, সেখানে কনটিনিউয়াস কাস্টিং মেশিনে উৎপাদন শতকরা ৯৫ ভাগ। অর্থাৎ সাবেকী রোলিং মিল-এর চেয়ে শতকরা ৮।৯ ভাগ বেশী। শিশু ইস্পাত উৎপাদন ব্যয় সংকোচনে সাহায্য করবে।

১৯৫৫ সালে সমগ্র বিশ্বে কনটিনিউয়াস কাস্টিং পদ্ধতিতে উৎপাদন ছিল ০.৫ মিলিয়ন টন, ১৯৭০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭ মি টনে, এবং ১৯৭২ সালে হবে ৮৫ মি টন। সে তুলনায় আমাদের উৎপাদন ক্ষমতার কথা না তুললেই ভাল। বহু আগে মহীশূরে ১০ হাজার টনের ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ছোট কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। পরে মোট ১ লক্ষ টনের ইস্পাত কারখানা স্থাপন করলেন মুকুন্দ গোষ্ঠি। তামিল নাড়ুর আরকোনামে আরও একটি কারখানা এবছর চালু করা হবে। এটি উৎপাদন করবে ১ লক্ষ টন বিলেট। বাড়তি পড়তি লোহার সন্তোষজনক যোগানের ফলে বহু উদ্যোগী শিল্পপতিরা কনটিনিউয়াস কাস্টিং প্রক্রিয়ায় ইস্পাত উৎপাদনের বৈদ্যুতিক চুল্লি বসিয়েছেন। এখন স্থির হয়েছে ৫০,০০০ টনের কনটিনিউয়াস কাস্টিং মেশিন বসিয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট ইস্পাত কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিলেট এবং অতিরিক্ত ইস্পাত উৎপাদন করা হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ধরনের ইস্পাতের জড় হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী বলে জানা গেছে। উত্তপ্ত ইস্পাতকে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করার জন্যেই এটা হয়। আলোচ্য পদ্ধতিতে ইস্পাতকে ধীরে ধীরে কয়েকদিন ধরে ঠাণ্ডা করার বদলে জল ছিটিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঠাণ্ডা করা হয়। এর ফলে ইস্পাতে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার এদিকে ভালোভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। (● দুর্গাপুর স্টীল টাইডিং এর সৌজন্যে)

ভিলাইএর ষষ্ঠ ব্লাষ্ট ফারনেস

ভিলাইএর ষষ্ঠ ব্লাস্ট ফারনেসটি ৩১শে জুলাই চালু করা হয়। ভিলাই ইস্পাত কারখানার প্রথম দফা সম্প্রসারণ কার্যসূচীতে এই ইউনিট থেকে বছরে ৬ লক্ষ টন লৌহ পিণ্ড উৎপাদন করা যাবে।

নতুন ব্লাস্ট ফারনেসের নক্সা ও নির্মাণ কাজ হিন্দুস্থান ইস্পাত কারখানার কেন্দ্রীয় ইন্‌জিনীয়ারিং এবং ডিজাইন বিউরো সম্পূর্ণ রূপে ভারতীয় যন্ত্রবিদদের দ্বারা সম্পন্ন করেছে। এই প্রথমবার ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারগণ ব্লাস্ট ফারনেস সংক্রান্ত সমুদয় কাজ নিজেরাই সমাধা করলেন।

এই চুল্লীটি তৈরী করতে খরচ পড়েছে ১৪ কোটি টাকা এবং শতকরা ৭৫ ভাগ দেশীয় যন্ত্রপাতি এতে ব্যবহার করা হয়েছে। বেশীর ভাগ সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে রাঁচীর ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং করপোরেশন, দুর্গাপুরের মাইনিং এণ্ড এ্যালায়েড মেশিনারি করপোরেশন এবং অন্যান্য ভারতীয় প্রস্তুতকারকগণ। ব্লাস্ট ফারনেসের জন্য প্রয়োজনীয় শতকরা ৬৬ ভাগ যন্ত্রপাতি, ৬৭ ভাগ রিফ্রাকটরি এবং স্ট্রাকচারাল দেশীয় সূত্রে পাওয়া গেছে। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সম্পূর্ণ নির্মাণকার্য ভারতীয় যন্ত্রকুশলী ও কারিগররাই সম্পন্ন করেছেন।

বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য উন্নত দেশের মত ব্লাস্ট ফারনেসটিতেও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়েছে। সাবেকী ব্লাস্ট ফারনেসের তুলনায়, এই ইউনিটের কয়েকটি বিশেষ গঠনগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, ফারনেসটিতে একটি এয়ার কুলডহার্থ থাকবে। ফারনেসের লাইনিং জীর্ণ হয়ে গেলে, তা পরিমাপ এবং পরীক্ষা করার জন্য রেডিও আইসোটোপ-এর সংস্থান রাখা হয়েছে। নির্মাণের দিক থেকেও ব্লাস্ট ফারনেসটিতে অনেক নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফারনেসের ভিত্তি নির্মাণে ২৬ ঘন্টার রেকর্ড সময়ের মধ্যে, একযোগে ২ হাজার ঘন মিটার সিমেন্টকোসড কনক্রিট ঢালা হয়। এছাড়াও যন্ত্রপাতির বড় বড় অংশগুলির সম্মেলন করে ঠিক জায়গায় বসানোর কাজ, ভারতীয় যন্ত্রবিদগণ নিপুনভাবে সম্পন্ন করেছেন। রিফ্রাকটরি লাইনিং এর কাজও রেকর্ড সময়ে সম্পূর্ণ হয়েছে।

পরবর্তী সম্প্রসারণে, কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে বছরে ৪০ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য ইস্পাত উৎপাদনের নতুন সুযোগ সুবিধা গ্রহন করা হবে, যাতে দেশের শিল্প ক্ষেত্রের ক্রম বর্দ্ধমান চাহিদা মেটাতে, ইস্পাতকে ভারী প্লেটে এবং অন্যান্য দ্রব্যে রূপান্তরিত করা যায়। এই সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রকল্পের বিস্তারিত রিপোর্ট হিন্দুস্থান ইস্পাত কারখানার কেন্দ্রীয় বিউরো প্রণয়ন করেছেন।

দেশের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা ভিলাই চালু হবার পর থেকে ১৫.৭ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদন হচ্ছে। ভারী রেল, স্ট্রাকচারাল, ইস্পাতের তার প্রভৃতি সহ এই কারখানার উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্য দক্ষিণ-পূর্ব এবং পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং দূর-সংযোগ ব্যবস্থা

সুশান্ত কুমার রায়

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে ভারতীয় ডাক এবং তারবিভাগের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। সারা দেশ জুড়ে সংযোগ সঞ্চারের এক জাতীয় 'জাল' বোনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যাতে দেশের এক প্রান্তের মানুষ অপর প্রান্তের মানুষের সঙ্গে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সোজাসুজি সংযোগ স্থাপন করতে পারে এবং সেই পরিকল্পনা রূপায়নের পথে ডাক এবং তার বিভাগ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশের বড় বড় শহরের অনেকগুলোর মধ্যেই "সাবুসক্রাইবার ট্রাঙ্ক ডায়ালিং এবং "টেলেক্স" ব্যবস্থা চালু হ'য়ে যাবার ফলে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যাচ্ছে এবং কথা বলা, বা টেলিপ্রিন্টারের সাহায্যে বার্তা বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে।

বড় বড় শহর এবং শিল্প কেন্দ্রের বাইরে দেশের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পড়ে রয়েছে সেইসব অঞ্চলগুলোকেও পরিকল্পনার আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়নি। দূরসংযোগের জন্যে "ন্যাশন্যাল নেটওয়ার্ক"-এর সঙ্গে এই অঞ্চলগুলোকে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে নিকটতম টেলিফোন এক্স্‌চেঞ্জ বা ট্রাঙ্ক এক্স্‌চেঞ্জের ডিস্‌টেন্স পাব্লিক কল্ অফিস এবং নিকটতম বড় টেলিগ্রাফ অফিসের সঙ্গে যুক্ত টেলিগ্রাফ অফিস খোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিকল্পনাতে মোট চার হাজার পাব্লিক কল অফিস, এবং চার হাজার টেলিগ্রাফ অফিস খোলার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এর জন্যে যথাক্রমে ১২ কোটি এবং সাত কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়াও চতুর্থ পরিকল্পনাতে দুরাঞ্চল এবং দুর্গম অঞ্চলে বেতার যুক্ত পি. সি ও খোলার কথাও ভাবা হয়েছে এবং এর জন্য মোট এক কোটি টাকা বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে। এই বেতার সংযোগের জন্যে যে এক চ্যানেল বিশিষ্ট অতি উচ্চ কম্পন (V.H.F) প্রয়োগকারী যন্ত্রের প্রয়োজন হবে, তা তৈরী করা হবে আমাদের দেশেই। পরিকল্পনার পাঁচ বছরে এরকম দু'শ পি. সি ও খোলা যাবে বলে ধরা হয়েছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে মোট ৩,৮২১টি নং ডিস্‌টেন্স পাব্লিক কল্ অফিস রয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনাতে এর প্রায় পঞ্চাশ শতাংশকে স্থানীয় টেলিফোন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ গুলোর বেশীর ভাগই হবে ছোট ছোট স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং অন্যগুলি ম্যানুয়েল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ।

ডাক এবং তার বিভাগের প্ল্যানিং শাখা কোন কোন অঞ্চলের ছোট স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জগুলোকে সংযুক্ত করে তাদের মধ্যে গ্রুপ ডায়ালিং স্কীম করার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং বর্তমানে এটা পরীক্ষাধীন রয়েছে। এ পরীক্ষা সফল হলে, কাছাকাছি এলাকাগুলিতে যেখানে এরকম ছোট ছোট স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন কেন্দ্র রয়েছে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা আরও সহজ হবে।

আশা করা যাচ্ছে, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে আমাদের সারা দেশে; বিশেষ করে, পল্লী অঞ্চলের দূর-সংযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। এর পথে বিশেষ করে সহায় হবে আমাদেরই দেশে তৈরী, তামার তারের বিকল্প এ্যালুমিনিয়মের তার A.C.S.R তার এবং এর ফলে আমাদের মূল্যবান বিদেশী মুদ্রাও সঞ্চয় হবে।

সমবায়ে সার তৈরী

ভারতীয় কৃষি সমবায় সার উৎপাদক সংস্থা গুজরাটের কলোল ও কাণ্ডলায় সার উৎপাদনের দুটি কারখানা নির্মাণের চুক্তি সাক্ষরিত করে সমবায় ভিত্তিতে সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক পদচিহ্ন সৃষ্টি করলেন। কলোলের কারখানায় বাৎসরিক উৎপাদন ধরা হয়েছে চার লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া এবং কাণ্ডলার কারখানায় তিন রকম মানের এন. পি. কে জাতীয় সার তৈরী হবে বছরে চার লক্ষ মেট্রিক টন।

এন. পি কে জাতীয় সার তৈরীর কারখানা ১৯৭৩ এর শেষাশেষি এবং অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়া সারের ইউনিট দুটি তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হবে ১৯৭৪ এর প্রথম ত্রৈমাষিকের মধ্যে।

সমবায় ভিত্তিতে উৎপাদিত সার বিতরণের ভার পাবেন উক্ত উদ্যোগের দশ লক্ষ শেয়ার হোল্ডার। দশটি প্রদেশের দশটি সমবায় প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত কারখানার শেয়ার হোল্ডার। এই প্রদেশগুলি হোল-পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, হরিয়াণা, গুজরাট, মধ্য প্রদেশ, তামিল নাড়ু, রাজস্থান, মহীশূর এবং অন্ধ্র প্রদেশ।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প পুনরুজ্জীবন প্রয়াস

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে সংকট দেখা দেবার মূল কারণ হ'ল এ রাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা। দেশের সরকারে যদি স্থায়িত্ব না থাকে তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হবেই। পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছর যাবৎ সরকারের মধ্যে ঘন ঘন পরিবর্তন ও রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, শ্রমিক মালিকের সম্পর্কের অবনতি—এ রাজ্যের শিল্প-সঙ্কটের অন্যতম কারণ। শিল্পপতিরা সংশয়ের মধ্যে অধিক বিনিয়োগ নীতি ত্যাগ করে মূলধন অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবেন। এরই অনিবার্য পরিণাম হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ২৫০টির অধিক শিল্পসংস্থা বন্ধ হয়ে আছে, বেকার সমস্যা আরও ভয়াবহ হয়েছে—শিল্প লাইসেন্স মঞ্জুরের সংখ্যা ক্রমশ: নেমে আসছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে এ দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের জন্য কয়েকদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, রাজ্যসরকার কর্তৃক ঘোষিত "ষোল-দফা" কার্যসূচীর কথা উল্লেখ করেছেন। এ কার্যসূচীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হ'ল প্রধান :—

১। যে সব শিল্প লোকসানে চলছে সেগুলির পরিচালনা ভার সরকার নিজের হাতে নেবেন ;

২। শিল্প আইনের সংশোধন করা ;

৩। বিভিন্ন কলকারখানায় একাধিক 'শিফ্‌ট' চালু করা ;

৪। এ রাজ্য যাতে সহজে কাঁচামাল পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা ;

৫। শিল্পে ঋণদান সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন এবং ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ;

৬। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর দু'হাজার ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা স্থাপন ;

৭। জেলায় জেলায় সমীক্ষা চালিয়ে শিল্প স্থাপন ও বেকার যুবকদের চাকুরী দানের ব্যবস্থা করা ,

৮। কলকাতা, হাওড়া এবং ২৪ পরগণা' বাদে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গকে "অনুন্নত এলাকা" বলে ঘোষণা করা ;

তাছাড়া শ্রমিক মালিকের সম্পর্কের উন্নতি, আবেদন পত্রের দ্রুত মঞ্জুরি প্রভৃতি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাও এ ষোলদফা কার্যসূচীর মধ্যে আছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সমস্যার মূলে যে কারণগুলি

শঙ্কর নাথ ঘোষ

বর্তমান সেগুলিকে দূরীভূত করার কথাই ঐ ষোলদফা কার্যসূচীর মধ্যে গ্রহণ ক'রে রাজ্যসরকার পশ্চিমবঙ্গের শিল্প পুনরুজ্জীবনের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ফেলেছেন একথা বলা যায়।

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পসংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। তাদের মধ্যে ভারতীয় শিল্প বিনিয়োগ কর্পোরেশন, ভারতীয় শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং স্টেটব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া প্রধান। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দেখা যায়, সর্বভারতীয় ঋণ প্রদানের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের অংশ শতকরা ৬.৭ ভাগ থেকে বেড়ে হয়েছে শতকরা ১১.৭ ভাগ। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী শিল্প সংস্থাগুলি পশ্চিমবঙ্গ অর্থ কর্পোরেশনের কাছ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সালে ঋণ পায় ৫৭.৭ লক্ষ টাকা, ১৯৬৮-৬৯ সালে তা দাঁড়ায় ৭৬.৪ লক্ষ টাকায়।

বিভিন্ন ঋণদান সংস্থা থেকে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ আপাততঃ বৃদ্ধি পেয়েছে দেখা গেলেও প্রকৃত বিনিয়োগ যে আশানুরূপ হচ্ছে না তা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই যাতে ঋণদান সংস্থাগুলিকে সুসংগঠিত করা যায় এবং শিল্পে ঋণদান যাতে সহজতর হয় তার দিকে লক্ষ্য দেওয়া এখনই কর্তব্য।

ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কৃষিক্ষেত্রে যে উদ্বৃত্ত দেখা দেবে তা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োগ করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। সেজন্য ক্ষুদ্র শিল্পগুলি জেলা বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে গড়ে তোলা উচিত। তাহলে একাধারে স্থানীয় লোকেদের ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা যেমন মিটবে, অন্যদিকে বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের সমস্যাও তত আশঙ্কাপূর্ণ থাকবে না।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার সন্তোষজনক বলা যায়। ১৯৬১-৬২ সাল থেকে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত এ রাজ্যে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩,৫৭১ থেকে ১৬,৮১০টিতে পৌঁছেছে। এর উপর রাজ্য সরকারের "ষোলদফা" কার্যসূচীতে উল্লেখিত প্রতিবছর দু'হাজার ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা স্থাপন যদি সম্ভব হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের সংকট অনেকটা কাটিয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

সম্প্রতি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সুফল আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংক শাখার প্রসারের ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসংস্থাগুলি, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের সাফল্যজনক কাজকর্ম

সুভাষ বসু

চার বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন লিঃ স্থাপিত হয় মাত্র ১৩.৩৮ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে। ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা পশ্চিম বাংলার ৩৬টি কোম্পানীকে সহজ শর্তে প্রতিষ্ঠানগত ঋণ দেয় ৯৫.৬৯ লক্ষ টাকা এবং বিনিয়োগের ওপর মোট উদ্বৃত্ত থাকে ২.৪৭ লক্ষ টাকার মত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মালিকানাধীন এই করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হোল ৫ কোটি টাকা। কেবল কলকাতা শহর নয়, বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত নানা রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠান এই করপোরেশনের কাছ থেকে ঋণ লাভ কোরতে পারে। করপোরেশন যে-সব শিল্পকে সাহায্য দিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঋণ পেয়েছে—এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রায়-৩৩.৩৫ লক্ষ টাকা। এরপর রসায়ন ও ঔষধপত্র শিল্প-১১ ৫০ লক্ষ টাকা, মুদ্রণ শিল্প-১০.৩৫ লক্ষ টাকা। অবশিষ্টাংশ পায় কেবলস্, কাঁচ ও মৃৎ শিল্প, খাদ্য সংরক্ষণ, বস্ত্রশিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি। করপোরেশন কর্তৃক সাহায্যদানের ফলে রাজ্যে সাত হাজারেরও বেশী ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়েছে।

এইসব শিল্পের মধ্যে অন্ততঃ ২৫টি হোল মাঝারী ও ছোট শিল্প। স্থায়ী ও চলতি মূলধন হিসেবে এগুলি করপোরেশনের কাছ থেকে ঋণ পেয়েছে। কয়েকটি শিল্প যে-সব শেয়ার বাজারে ছেড়েছিল করপোরেশন সেগুলিরও দায় গ্রহণ করে।

অন্য দু'একে যন্ত্রবিদ-উদ্যোক্তা, যাঁদের হাতে বেশ লাভজনক প্রকল্প রয়েছে অথচ উপযুক্ত সিকিউরিটির অভাবে কোন প্রতিষ্ঠান তাঁদের ঋণদানের বিষয়টি চিন্তাও করে দেখেননি, এই করপোরেশন তাঁদেরও সাহায্য দিয়েছেন।

উদ্যোক্তাদের উৎসাহদান

দু' একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। দক্ষিণ কলকাতায় সেন্কেল একটি ছোট্ট কারখানা। সয়াবিন থেকে এরা 'পুষ্টিন' নামে এক ধরণের প্রোটিন খাদ্য তৈরী করে। এই খাদ্যটি ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। দু' বছর আগে পুরোপুরিভাবে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের সাহায্য পুষ্ট হয়ে এই সংস্থাটি কাজ শুরু করে। করপোরেশন সংস্থাটিকে ৪৩,০০০ টাকা ঋণ দেয়। আজ এই কারখানায় ২৫ জন ব্যক্তি কাজ কোরছেন এবং এর বাৎসরিক উৎপাদন হোল প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মূল্যের।

অনুরূপভাবে উত্তর কলকাতায় একটি ছোট্ট মুদ্রণ প্রেস—প্রেস এজেন্টস্ মূলধনের অভাবে প্রেস সম্প্রসারণ কোরতে অক্ষম ছিল। করপোরেশন দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেয় ৮৫,০০১৲ হাজার টাকা। এই সাহায্যের ফলে প্রেসটি ৪০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি কোরতে সক্ষম হয়।

মধ্য কলকাতায় একটি এঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান—মেকানিকাল স্পেশালিটিস্ (প্রাইভেট) লিঃ করপোরেশনের কাছ থেকে দেড় লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এই প্রতিষ্ঠানের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে "এ ধরণের বিনিয়োগে করপোরেশন বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছে। এ ধরণের ঝুঁকি নিতে আর কোন প্রতিষ্ঠানকে দেখা যায় না। আর এ ঝুঁকি না নিলে আমাদের মত প্রতিষ্ঠান কোন দিনই মাথা তুলতে পারতো না। তাছাড়া সুনিপুন যন্ত্রবিদ-উদ্যোক্তাগণ নিজেদের ব্যবসা শুরু করার কথাও ভাবতেন না।"

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন এ ধরণের উদ্যোক্তাদের নিয়ে সীমাবদ্ধ যুক্ত প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ কোরতে ইচ্ছুক। করপোরেশন ব্যাপকভাবে দায় গ্রহণ করবে এবং শিল্প অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলির মূলধনী শেয়ার গ্রহণ কোরতেও ইচ্ছুক। করপোরেশন ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণের ওপর ৮ শতাংশ, ২ লক্ষ পর্যন্ত ৯ শতাংশ এবং ২ লক্ষের ওপর ১০ শতাংশ সুদ গ্রহণ করে। ঋণ পরিশোধের সময়ও বেশ দীর্ঘ।

শিল্প প্রসার

পশ্চিম বাংলার শিল্পরেখা অন্যান্য রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র। এখানে রয়েছে প্রধানতঃ বড় বড় শিল্প এবং এর অধিকাংশ কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ। এবং কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। এই রাজ্যে সুষম শিল্পোন্নয়নের জন্যে সবার আগে প্রয়োজন হোল, উপযুক্ত ভৌগোলিক ভিত্তিতে শিল্পগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে করপোরেশন অগ্রণী হয়ে বিভিন্ন জেলায় স্থানীয়

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বন্যা কবলিত এলাকায় লাঠিশাল ধানের চাষ

অমিয় কিশোর মণ্ডল

উপর্যুপরি খরা ও বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। এ বছরও পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলায় কয়েক হাজার বর্গমাইল বন্যা কবলিত হয়েছে। বহু বর্গমাইল এলাকার আউস পাট ও আমন ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ডি. ভি. সি জলাধার যখন তৈরী করা হয়েছিল তখন সবাই মনে করেছিলেন যে এই ডিভিসি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসবে। কিন্তু আজকের পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের কাছে এই ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী ও রূপনারায়ণের বুকে দিনের পর দিন পলি জমায় ফলে নিকাশী ব্যবস্থা একেবারে অচল। ফলে ডিভিসির সঞ্চিত জল যখনই ছাড়ছে তখনই নিম্ন দামোদর নিকাশী না করতে পেরে আবাদী জমির উপর স্বতই ধাবমান হচ্ছে। ফলে হাওড়া ও হুগলী জেলার বেশ কয়েকটা থানা জলমগ্ন। ১৯৬৮ সালে এই বন্যা দেখা দিয়েছিল অক্টোবর মাসে। কৃষক আউষ ও পাট তুলে ফেলেছিল। ১৯৭০ সালে বন্যা আসে সেপ্টেম্বরে। মাঠে বোনা আউশ ধান ও পাট পাকা অবস্থায় মার খেয়েছিল। ১৯৭১ সালে বন্যা আরো এগিয়ে এল জুলাই-আগষ্ট মাসে। মাঠে আধপাকা আউস ধান। পাট ও সদ্য রোয়া আমন ও বীজতলা জলের তলায় চলে গেল। এবার বর্ষার মরশুম একটু আগেই লেগেছিল। তাই উৎসাহ সহকারে কৃষক আউস, পাট ও আমন একটু জলদি লাগিয়ে ছিল। কিন্তু রাক্ষুসী বন্যা সেই আশা একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিল। সময় যখন হাতে আছে তখন কেউ কেউ বীজতলা ফেলার জন্য, কেউ বীজ যোগাড় করতে, কেউ বা অন্য উপায় অবলম্বন করতে ছুটোছুটি করতে লাগল। কৃষক সহজে হাল ছাড়তে চায় না।

চারটি উপায়

এই রকম পরিস্থিতিতে চারটি পন্থার কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) যেখানে বন্যার প্রকোপ খুব বেশী নয় এবং ডাঙা জমি কিছু কিছু এখনও জেগে আছে সেখানে আবার বীজতলা তৈরী করা সম্ভব। শ্রাবণের শেষে বীজ ফেললে ভাদ্রের শেষে সেই বীজতলা রোয়া যাবে। তবে বীজের পরিমাণ বেশী দিতে হবে কারণ রোয়া খুব ঘন লাগাতে এবং একটি গোছে ২।৩টির পরিবর্ত্তে ৪।৫টি বীজতলা দিতে হবে। মজুরা নামী লাগানোর জন্য পাশকাঠির সংখ্যা কম হবে। ফলনও সেই অনুপাতে কমে যেতে পারে। বীজতলা যাতে তাড়াতাড়ি তৈরী করা যায় সেই জন্য ৬ কাঠা জমিতে বীজতলা তৈরী করার জন্য সেড় কেজি নাইট্রোজেন দিলে বীজতলার বাড় ত্বরান্বিত হবে।

দ্বিতীয়ত: যেখানে অতিরিক্ত জলচাপের জন্য জমি খালি পাওয়া মুস্কিল সেখানে "ডাপোগ" পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরী করা যায়। এই পদ্ধতিতে কোন খালি বারান্দায় অথবা খালি জায়গায় একটি পলিথিন কাগজে অথবা কলা পাতার উপরে ১১´ × ৪´ পরিমিত জায়গায় ৫।৬ কেজি (যা এক বিঘায় রোয়া যাবে) কলাওয়ালা বীজ দুই স্তর বিছিয়ে দিয়ে রীতিমত সামান্য সামান্য জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। রোদের তেজ হতে রক্ষা করার জন্য ঢাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। ১৪।১৫ দিন পর বীজতলা প্রস্তুত হয়ে যাবে। জমিতে ১৪।১৫ দিন পর জল যদি নেমে যায় তো বীজতলা রোয়া যাবে। মজুরা বীজতলা চাপড়ে বেঁধে একটু বড় করে নিতে পারেন। এতে আগের পদ্ধতির তুলনায় খরচ কম পড়ে। শিকড় অক্ষত থাকে, সময় কম লাগে ফলন বেশী হয়। তবে জল যদি না নেমে যায় তাহলে এই পদ্ধতি কোন কাজে লাগবে না।

তৃতীয়ত:, যেখানে জল চাপ হওয়ায় মাঝে মাঝে চারা মরে যাওয়ার দরুণ ফাঁক হয়ে গেছে সেই সব ক্ষেত্রে অন্য জমি হতে ধানের গোছের উদ্বৃত্ত পাশকাঠি ভেঙে এনে এই সব ফাঁক গুলো পূরণ করতে পারেন। একে বলে Split transplantation পদ্ধতি।

চতুর্থত: এছাড়া বন্যা কবলিত এলাকা ও ডুবো জায়গার জন্য এফ. আর ৪৩বি, এস. সি ১২৮১, পাটনাই ইত্যাদি জাতের ধান ব্যবহার করা উচিত।

লাঠিশাল ধান

বন্যাপরিস্থিতি যখন এই রকম অনিয়ন্ত্রিত তখন মাথায় চিন্তা আসে কেমন করে জলদি ও জলচাপ সহ্যকারী বীজ এখানে লাগানো যায়। হাতে কলমে পরীক্ষার পর জানা গেছে লাঠিশাল ধান এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম। ধানটি

বুনেছেন বাগনান ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপদ রাউত ও আরো কয়েকজন। লাঠিশালের প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন গত বোরো মরশুমে দেড় কাঠা জমিতে লাঠিশাল ধান লাগিয়ে ২ মন অর্থাৎ একরপিছু ৮০ মন ধান পেয়েছিলেন।

লাঠিশালের বিশেষত্ব হল সেচ কম হলে চলবে। সপ্তাহে একটা সেচ অর্থাৎ মোট ১৬-২০টা সেচ লাগে। খরা পরিস্থিতিও সহ্য করতে পারে। আই. আর-৮ এর তুলনায় সময় কম লাগে।

শ্রীকৃষ্ণ পদ রাউত জানালেন যে লাঠিশাল ধানটি মোটা আকারের, চাল সাদা, সময় নিয়েছে মাত্র ১১৩ দিন। মাঠে তখন জল দাড়িয়ে আছে ৫৩ সে. মি (প্রায় ২১ ইঞ্চি), প্রতি যাদাতে ৮-১০টা বীজ, বিঘা প্রতি ১২ কেজি ইউরিয়া, ১০ মন গোবর সার দিয়ে লাগানো হয়েছিল। মাঝে একটা নিড়ানী দেওয়া হয়েছিল। প্রারম্ভিকভাবে একটা লাঙল দিয়ে ১৪ কাঠা জমিতে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে জমি তৈরী করতে হয়েছিল। খরচ তাই একটু বেশী হয়েছিল।

এই সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাবলী নিচে পরিবেশন করা হোল :

১) ধানের জাত—লাঠিশাল;

২) রোয়ার দূরত্ব—৩০ × ২০ সে মি,

৩) প্রতিথোপে পাশকাঠির সংখ্যা—২৩;

৪) প্রতি শিষের গড় মাপ—২৭ সে মি.

৫) প্রতি শিষে গড়ে ধানের সংখ্যা

(১) দানা বিশিষ্ট ৮৬

(২) চিটা ৬

৬) প্রতি শিষে গড়ে ধানের ওজন ৩ গ্রাম

৭) গাছের গড় উচ্চতা ১৩৮ সে.মি

৮) ফলন........

কাঁচাধান ৪ কেজি

কাঁচাখড় ১০ „ .

৯) একর পিছু ফলন—

শুকনো ধান ১৪.৪ কুইন্টাল

শুকনো খড় ৩২.০০ „

বাগনান ব্লকের আরেকজন উৎসাহী কৃষক শ্রীকাত্তিক নায়ক মশায় জানালেন যে তিনিও মেদিনীপুর হতে 'বালাব' নামে একটা দেশী ধান মাত্র ৩ কেজি এনে ১২ই বৈশাখ বাদা দিয়েছিলেন। তারও crop-cutting নিয়ে দেখা গেল যে ফলন লাঠিশালের অনুরূপ হয়েছে তবে এই ধান লাঠিশালের তুলনায় অনেক সরু।

উপরোক্ত দুটি ধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধা হল পরাগ মিলনের সময় ঝড় জল হলেও বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলেও ধানের চিটা ভাগ বেড়ে যায় না। আই. আর-৮ এর পক্ষে এই অসুবিধা আছে। তাছাড়া আই. আর-৮ এর জলচাপ সহ্য করার ক্ষমতা নেই। আই. আর-৮ ধান হয় ডুবে গেছে নতুবা কোনমতে মৃতপ্রায় অবস্থায় জেগে রয়েছে। আরো জানা গেল যে গত সপ্তাহে শ্রী কাত্তিক নায়ক মশায় লাঠিশাল ধানের বীজ বীজতলায় ফেলেছেন। ভাদ্রের শেষে রোয়া লাগাবেন। সুতরাং লাঠিশাল ধান তিন মরশুমে অতি সহজেই লাগাতে পারা যায়।

আগামী বছর হতে এই এলাকার চাষীরা নিশ্চয়ই লাঠিশাল ধান বুনতে উদ্বুদ্ধ হবেন ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। এ বছর মাঠ সব সাদা হয়ে আছে। আগামী বছর মাঠে এই সময় সোণালী ধানের হাসি দেখা নিশ্চই অলীক কল্পনা হবে না। গ্রামীন অর্থনীতি বন্যা পরিস্থির ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

শিল্পে পুনরুজ্জীবন প্রয়াস

(৯ পৃষ্ঠার পর)

শিল্পগুলি ব্যাংক থেকে সহজে ঋণ নিয়ে আরও গতিশীল হয়ে উঠতে পারে।

চতুর্থ যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যের জন্য ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিশেষ সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। মোট ব্যয়ের ৬৮.৬% কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে সাহায্য হিসেবে পাওয়া যাবে'। এ অবস্থায় শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা যদি সফল ক'রে তোলা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে এ রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের সাফল্যজনক কাজকর্ম

(১০ পৃষ্ঠার পর)

সম্পদ, সুনিপুন কারিগর এবং চাহিদা অনুসারে ছোট ও মাঝারি ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোরছে।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষামূলকভাবে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে একটি ২-টনি ছোট কাগজের কল স্থাপনের মনস্থ করেছে। এর জন্যে মূলধন বিনিয়োগ করা হবে প্রায় ৫.৫৬ লক্ষ টাকা। এই এলাকায় 'সাবাই' ঘাস জন্মায়। এই ঘাস আর খড় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। কৃষি প্রধান এবং বনানী অঞ্চলে একটি কাগজের এবং কাগজের বোর্ড তৈরীর শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা পর্য্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হোল, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এলাকাগুলিতে শিল্পোদ্যম প্রসার।

ত্রিপুরায় রবার চাষ

অজয় রায়

ভারতে প্রায় ১৬,০০০ হেক্টর ভূমিতে রবারের চাষ হয় । উৎপাদন বাড়াতে হলে আরও নূতন ভূমিতে রবার চাষ করা এবং কম উৎপাদনক্ষম রবার বাগান-গুলিতে উচ্চ উৎপাদনশীল রবার গাছ পুনরায় রোপণ করা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে বর্তমানে রবার বাগানগুলি হতে যে রবার পাওয়া যায় তার দ্বারা চাহিদা পূরণ করা মোটেই সম্ভব হবে না ।

বর্তমানে ভারতে উৎপন্ন রবার প্রয়োজনের অনুপাতে অত্যন্ত কম । মোট প্রয়োজনের শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ রবার ভারতে উৎপন্ন হয়। কৃত্রিম উপায়ে রবার উৎপাদন করে বাকী প্রয়োজন ৪০ ভাগের প্রায় ১০ ভাগ মিটাতে হয় । অবশিষ্ট ৩০ ভাগ চাহিদা মিটাতে হয় মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে—সিংহল, মালয় ও অন্যান্য দেশ থেকে রবার আমদানী করে ।

কেরালা রাজ্যেই সবচেয়ে বেশী রবার উৎপন্ন হয় । ভারতের মোট উৎপাদিত রবারের ৮৫ শতাংশ কেরালাতে উৎপন্ন হয় । তারপর তামিলনাড়ু ও মহীশূরের স্থান । এদিকে ভারতে রবারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে ভারত সরকার নানা অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে রবার চাষ করে এর উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন । ভারতে রবার চাষে দ্রুত বৃদ্ধি এবং রবার চাষীরা যাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পারেন তার জন্য রবার বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় । এই বোর্ডের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রবার চাষীরা নানা পরামর্শ লাভ করে থাকেন ।

সংসদের এষ্টিমেট কমিটির একটি মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রবার বোর্ড ত্রিপুরায় রবার চাষের উপযোগী ভূমি পাওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে একটি সাধারণ জরীপ করেছিলেন। জরীপে দেখা যায় যে, ত্রিপুরার বহু অঞ্চলে রবার চাষের উপযোগী জমি রয়েছে । কেবল-মাত্র শীতকালে (ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারী)

পরীক্ষামূলকভাবে রবার শোধনের কাজ চলেছে ।

ত্রিপুরাতে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রী ফারেন-হাইটের নীচে আসে । রবার চাষের পক্ষে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রী ফা: এর নীচে আসা অনুকূল নয় । রবার বোর্ডের মতে রবার গাছের নিদ্রায় যাওয়ার সময়ের সঙ্গে এই তাপ মাত্রা নীচে আসার সময়ের মিল আছে ।

ত্রিপুরার বন বিভাগ উদ্যোগী হয়ে ১৯৬৩ সালে রবার চাষ শুরু করেন । প্রথমাবস্থায় পত্তিছড়ি ও মানুতে পরীক্ষা-মূলকভাবে ২০ একর জমিতে রবার চাষ করা হয় । প্রাথমিক অবস্থায় রবার চাষ সাফল্যজনক হয় । এই সাফল্য ও রবার গাছের দ্রুত পরিবর্ধনে উৎসাহিত হয়ে বন বিভাগ দুধপুর, পাথলিয়া, কাকুলিয়া এবং পশ্চিম ত্রিপুরাতে রবার চাষের সম্প্রসারণ করেন । ১৯৬৮ সালের শেষে ত্রিপুরায় ১৭৫ হেক্টারের বেশী জমিতে রবার চাষ করা হয় ।

ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চল সাব্রুম, বিলোনীয়া ও উদয়পুর মহাকুমা ও সদর মহাকুমার এবং উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জায়গায় প্রাথমিক ভাবে যে রবার বাগান করা হয় তা রবার বোর্ডের নির্দেশ ও পরামর্শ মতই

করা হয়। রবার সংগ্রহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রশিক্ষণের জন্য ত্রিপুরার বন বিভাগের কিছু কর্মীকে কেরালায় পাঠান হয়। সাধারণত: রবার গাছের অষ্টম বছর থেকে রস সংগ্রহ করা হয়ে থাকে এবং ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত রবার গাছ থেকে রস পাওয়া যায়। তারপর রবার গাছ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

উৎপাদন ব্যয়

ত্রিপুরার প্রতি একর রবার বাগান ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বৎসরে এক হাজার টাকা খরচ পড়বে। উচ্চ ফলন জাতের বীজ ব্যবহার করে প্রতি একর রবার বাগান থেকে ৪৫০ থেকে ৬৫০ কিলোগ্রাম শুকনো রবার পাওয়া যাবে। এই রবারের বাজার দর প্রতি কিলোগ্রাম ৫ টাকা থেকে ৫ টাকা ৩০ পয়সা। প্রতি হেক্টর রবার বাগান থেকে বার্ষিক লাভ প্রায় ৩৭,000 এবং এই আয় এক নাগাড়ে ২২ বৎসর অর্জন করা যায়। এরপর প্রতিটি রবার গাছ জ্বালানী কাঠ হিসেবে বিক্রী করলে নূন পক্ষে ৫00 টাকা লাভ করা যায়।

গত বছর যে মাসে উদয়পুর মহাকুমার পতিছড়ি রবার বাগান থেকে রস সংগ্রহ সুরু হয়। রবার বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে পতিছড়িতে রবার শুকাবার জন্য একটি জায়গা নির্বাচন করা হয়। কেরালার কোট্টায়াম থেকে একটি রবার শিটিং রোলার কেনা হয়েছে। তাছাড়া রবার প্রস্তুতের নানা যন্ত্রপাতিও কেনা হয়েছে। প্রতি একদিন অন্তর ১00টি গাছ থেকে যে রস সংগ্রহ করা হচ্ছে তাতে ১00 কিলোগ্রাম কাঁচা রবার পাওয়া যায়। এই হিসেবে প্রতি হেক্টার রবার বাগানের একজন মালিক ৩৭000 টাকা উপার্জন করতে পারেন। উৎপাদন পরের বছর ১৫ শতাংশ বাড়বে।

ত্রিপুরায় রবার চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে ভারতের রবার বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন, "ত্রিপুরাতে বর্তমানে ১0,000 একর জমিতে রবার চাষ আরম্ভ করা যেতে পারে।" ইতিমধ্যে রবার বোর্ড পূর্ব ভারতে শুধু ত্রিপুরাতেই একটি সাব-অফিস খুলেছেন।

ত্রিপুরায় রবার চাষের সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই কেরালার চেয়ে উজ্জ্বলতর কেমনা, ক) কেরালায় রবার গাছের যে সব রোগ সাধারণত: দেখা যায়, ত্রিপুরায় এখনও সেসব রোগ দেখা যায়নি; (খ) ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাত বিক্ষিপ্ত বলে 'টেপিং' এর জন্য অনেক দিন সময় পাওয়া যাবে, (গ) ত্রিপুরায় রবার বাগান করার হেক্টর প্রতি খরচ কেরালার চেয়ে কম; (ঘ) ত্রিপুরায় এ পর্যন্ত উৎপাদনের যে হার লক্ষ্য করা গেছে তা কেরালায় উৎপাদনের হারের বেশী হতে পারে।

বে-সরকারী ক্ষেত্রে রবার বাগান করার জন্যও সরকার থেকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রেও আশাব্যঞ্জক উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। কৈলাসহর ও মাত্রাপুরে বে-সরকারী মালিকানায় ইতিমধ্যেই দুইটি রবার বাগান করার কাজ শুরু হয়েছে।

রস সংগ্রহের পূর্বে রবার গাছে চিহ্ন দেওয়া হচ্ছে

চামড়ার পরিধেয়

মাদ্রাজের কেন্দ্রীয় চর্মজাত গবেষণা কেন্দ্র 'টাই' এবং 'ডাই' শ্রেণীর এক জাতীয় চামড়া উদ্ভাবন করেছে। কলকাতা কাশ্মীর, বোম্বাই ও মাদ্রাজের চর্ম শিল্পপতিরা এ জাতীয় চামড়ার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন।

এ ধরণের চামড়ায় বিবিধ নক্সা তোলা সহজ বলে বিদেশের বাজারেও আদৃত হবে আশা করা হচ্ছে। পরিধেয় তৈরীতেও এ ধরণের চামড়া ব্যবহার করা চলে বলে, পরিধেয় প্রস্তুতকারকরাও এতে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। ইতিমধ্যে বোম্বাই এর একটি পরিধেয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এই চামড়ার সৌখিন জামা কাপড় তৈরী করে বিদেশের বাজারে চালান দিয়ে আশাতীত ফল পেয়েছে।

ভারতে বয়স্ক শিক্ষা : অতীত ও ভবিষ্যৎ

ভারতে বয়স্ক শিক্ষার সমস্যা—মূলতঃ বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের সমস্যা, যাঁরা শৈশবে কখনও স্কুলে যাননি। এঁদের সংখ্যাই বেশী। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, অবসর সময়ের সদ্ব্যবহারের বিষয়ে তাঁদের শিক্ষিত করে তোলা। অবশ্য, অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের সমস্যা কিছুটা ভিন্ন। উন্নত দেশে বয়স্ক শিক্ষা হোল প্রথম জীবনের শিক্ষা গ্রহণের পরবর্তী বা শেষ পর্ব। কাজেই, আমাদের ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে এই কার্যসূচীকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

গড়পড়তা ভারতীয় কৃষিকরা শুধু অক্ষর জ্ঞান লাভের বিষয়ে খুব বেশী উৎসাহী নয় ; কারণ এতে আপাতঃ কোন লাভ তাঁরা দেখতে পায় না। সুতরাং প্রথম লক্ষ্য হোল, এই মনোভাবকে দূর করে তাদের মনে বিশ্বাস জাগাতে হবে যে, শিক্ষা জীবনকে সজীব ও সতেজ কোরে তোলে, এবং পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ এনে দেয়। যদিও এটা করা খুব সহজ নয়। এজন্য গ্রামে গ্রামে সচিত্র বক্তৃতা অভিযান চালাতে হবে। সেদিক থেকে সিনেমা এবং রেডিওর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আসলে, গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে না এলে, আমাদের কোন প্রকল্পই সফল হতে পারে না।

বর্তমানে বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারে বহু ধরনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিশেষ করে স্বাধীনতালাভের পর থেকে। ইংরেজরাও এই সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল, এবং কয়েকটি প্রকল্পের কাজ শুরুও করেছিল। এরমধ্যে "Each one, teach one"—কার্যসূচীটি সে সময় খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করার উপর প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীর চাকুরীতে থাকা হওয়া নির্ভর করতো।

১৯৪৭ সাল থেকে ভারতে শিক্ষিতের হার বছরে শতকরা ০.৭৫ হারে বেড়েছে। ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৬৮ সালে শিক্ষিতের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৬.৬, ২৩.৭ এবং ৩২.০। এই বৃদ্ধির হার যদি বজায় থাকে তাহলে আশা করা যায়, ১৯৭১ সাল নাগাদ শিক্ষিতের হার হবে শতকরা ৩৫ এবং ১৯৮১ সালে তা গিয়ে দাঁড়াবে শতকরা ৪৯। পরিসংখ্যানের দিক থেকে দেখতে গেলে এটা উন্নতির লক্ষণ সন্দেহ নেই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে, ১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৬৭ সালে দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা আরো ৬ কোটি বেড়েছে। কারণ হোল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শিক্ষিতের হার বাড়ছেনা।

শিক্ষার মান

শিক্ষার মান কোনদিক থেকেই খুব একটা আশাপ্রদ নয়। 'শিক্ষিত'—এই পর্যায়ের বেশীর ভাগই কোনরকমে নাম সই করতে পারে মাত্র। শিক্ষিত জনসংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ সাধারণভাবে লিখতে ও পড়তে পারে। কেবল মাত্র শতকরা ১০ ভাগই শিক্ষার একটা যুক্তি সংগত স্তরে পৌঁছেছে। এছাড়া পুরুষ ও মহিলার মধ্যে শিক্ষার ব্যবধান ক্রম বর্দ্ধমান। এই ব্যবধান ১৯৫১ সালে ছিল শতকরা ১৭ ভাগ এবং ১৯৬১ সালে শতকরা ২১.৫ ভাগ। কারণ স্ত্রী শিক্ষার প্রসার পুরুষের তুলনায় কম। শিক্ষার সমস্যা শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশী। ১৯৫১ সালে এই ব্যবধান ছিল শতকরা ২২.৮ ভাগ এবং ১৯৬১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ২৮ ভাগ।

শিক্ষার ন্যূনতম মান হওয়া উচিত মাতৃভাষায় নাম স্বাক্ষর করতে পারা ছাড়া, সহজ ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারা এবং সরল গণিত ও সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, প্রাথমিক ভাবে লিখতে ও পড়তে পারার উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে বয়স্কশিক্ষাকে এক নতুন ভাবধারায় সঞ্জীবিত করা হোল—বর্তমানে যাকে বলা হয় সমাজ শিক্ষা।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল, নব-শিক্ষিতদের জন্য উপযুক্ত পুস্তক প্রণয়ন করা। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই কিছু ভালো কাজ হয়েছে। তবে সাধারণ জ্ঞান ছাড়া, ব্যক্তিকে নিজস্ব বৃত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার দিকেও সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। এই ধরনের পুস্তকাদি প্রণয়ন ব্যাপক কর্মসূচীর ভিত্তিতে করতে হবে। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় পর্যায়ে করলেই চলবে না, রাজ্য সরকার এবং সামাজিক সংস্থাগুলির মাধ্যমেও করতে হবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলন স্বাভাবিক ভাবেই এর একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, গ্রন্থাগার যেন শুধুমাত্র বই বা পত্র পত্রিকা রাখার জায়গায় পর্যবসিত না হয়। একটা মনোরম পরিবেশে সকলের যাতায়াতের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়া উচিত। ভোজনালয়, বাসে, ট্রেনের কামরায় পড়ার কিছু সামগ্রী রাখা যেতে পারে। হাসপাতালে বয়স্ক রুগীদের পড়ার সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া উচিত। এমনকি

ছুলকাটার সেলুনেও এ ধরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভ্রাম্যমান পাঠাগারেরও ব্যবস্থা করা যায়।

আশাব্যঞ্জক নয়

আমাদের একথা মানতেই হবে, যে গত ২০ বছরে উপর উপর কিছু কাজকর্ম হলেও উপযুক্ত নেতৃত্ব, প্রয়োজনীয় অর্থ এবং জনগণের উৎসাহের অভাবে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন একটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার কাজ হাতে নিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়, ডিগ্রি কলেজ এবং স্কুলগুলির সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবা কার্যসূচীর ক্ষেত্রে, বয়স্ক শিক্ষা প্রসার একটা উল্লেখযোগ্য অংশরূপে বিবেচিত হতে পারে। নিম্ন বুনিয়াদী পর্যায় থেকে M. Ed. পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সের পাঠ্য সূচীতে, বয়স্ক শিক্ষাকে একটা অন্যতম বিষয় রূপে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সমাজ শিক্ষকে B T এবং B. Ed কোর্সে ঐচ্ছিক বিষয় করা যায়, কিংবা শিক্ষা মনস্তত্ত্ব এবং সাধারণ শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কীত পাঠ্য সূচীর সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। M. Ed স্তরেও একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকা বিশেষ জরুরী; সেক্ষেত্রেও প্রাক্টিকাল্ জ্ঞান সহ বয়স্ক শিক্ষাদান বিষয়টিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিষয়ের মর্যাদা দেওয়া উচিত।

ছুটির সময় শিক্ষক ও ছাত্রদের দিয়েও সাক্ষর অভিযান চালানো যেতে পারে। কলেজে, বিশেষ করে প্রশিক্ষণ কলেজ ও ডিগ্রি কলেজে, সাক্ষর ক্লাব গঠন করা যেতে পারে—যেখানে ছাত্ররা স্বেচ্ছায় সাক্ষর অভিযানে এগিয়ে আসবে।

জেলখানার প্রাপ্তবয়স্ক কয়েদীদের শিক্ষার বিষয়ে চরম উদাসীনতা—সবথেকে দুঃখ জনক বলে মনে হয়েছে। কয়েদীদের সুস্থজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে জেলখানার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তথাপি কারান্তরালে সংস্কারের কোন শিক্ষা দেওয়া হয়না। অথচ, বয়স্কশিক্ষা প্রকল্পে এই সমস্যা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অপরাধের মূল অনুসন্ধান কোরে, তার উপযুক্ত প্রতিবিধান করার উদ্দেশ্যে জেলখানায় মনস্তাত্ত্বিকদের নিয়োগ করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এবং সিনেমা ও রেডিও সহযোগে সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কীত কথিকা প্রভৃতির দ্বারা অপরাধীদের বহুলাংশে সংশোধন করা সম্ভব। যে সমাজ সংস্কার বা সংশোধনে বিশ্বাস করে না সে সমাজ কখনও টিকে থাকতে পারে না।

সবশেষে, শিক্ষা ধারা অব্যাহত রাখার প্রশ্ন। নতুবা বয়স্ক শিক্ষা অভিযান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এজন্য আরো বেশী ডাকযোগে শিক্ষা, সান্ধ্য কালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অবসর কালীন শিক্ষাসূচী প্রভৃতি থাকা দরকার। জ্ঞান আহরণ তথা ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সর্বস্তরে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত।

বয়স্ক শিক্ষা এবং জাতীয় প্রগতির মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। কাজেই বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে অধিক অর্থ ব্যয়ের পরিণাম নিশ্চয় শুভ হবে। কোন উন্নয়নশীল দেশেরই এ ক্ষেত্রে ইতস্তত করা উচিত নয়। ভারত আজ যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা তার মধ্যে সর্ববৃহৎ। কাজেই, দৃঢ়তার সঙ্গে এর মোকাবিলা করতে হবে।

ভারত আর্থ মূভার্স

রাষ্ট্রায়ত্ব উদ্যোগের অন্তর্গত ভারত আর্থ মূভার্স লিমিটেড ৯০-২৫০ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত ভারী ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে মাত্র সাত বছরের মধ্যে তাদের উৎপাদন বাড়িয়েছেন ৫০ গুণ। এই কারখানার প্রারম্ভিক বছরে—১৯৬৪-৬৫ সালে—উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ছিল ৩৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার মত। ১৯৭০-৭১ সালে বর্দ্ধিত পণ্যের মূল্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা।

সম্পাদকের দপ্তর

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

"ধনধান্যের" একটি সংখ্যা স্থানীয় পাঠাগারে পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি এই কারণে, এমন একটি সংবাদ সমৃদ্ধ, রচনা সমৃদ্ধ কাগজ প্রকৃতই বিরল। নিছক সাহিত্য, নিছক আমোদ প্রমোদের ভীড়ে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীর খবর কিম্বা সংস্কৃতি অথবা শিল্পের খবর হারিয়ে যেতে বসেছে। সংবাদ পত্রে যে খবর, যে প্রবন্ধ থাকে না, সাহিত্য পত্রে যা উপেক্ষিত, সেই সমস্ত জিনিষ এই পত্রে পরিবেশিত। এই কাগজটি কেন আরো আগে নজরে পড়েনি আমি জানি না।

প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনায় যে উচ্চস্তরের সাংবাদিকতার প্রকাশ, তার জন্যে আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সালের সংখ্যাটি আমার হাতে এসেছে। "রূপ সৃষ্টিতে কাপড়ের পুতুল" শীর্ষক সুখপাঠ্য এবং তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধের পাশাপাশি "দীনবন্ধু এণ্ডরুজ", আবার "বাংলার চাষ, চাষী ও প্রবচন", ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাদের লেখা একই সঙ্গে পড়ার সুযোগ পেয়েছি।

নমস্কারান্তে

শ্রী তারক নাথ পাত্র
মাঝের রাস্তা,
চুচুঁড়া, হুগলী
৩১. ৮. ৭১

---

* মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

সংবাদ পরিক্রমা

প্রতিবেদক

মুর্শিদাবাদ

সম্প্রতি বহরমপুরে গুরুদাস তারাসুন্দরী বিদ্যালয়ের শতপঞ্চবিংশতি (১২৫) বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে তিনদিন ব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ১৮৪৫ সালের ১৫ই মার্চ লণ্ডনের মিশনারী সোসাইটির দুজন সদস্য—শ্রী হিল ও শ্রী লে সেল মুর্শিদাবাদের খাগড়ায় এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের পর আরও দুই জন মিশনারী মিশনের কার্যে বহরমপুর আসেন এবং এঁদেরই প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে ১৮৬৮ সালে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্যালয়টি সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং পরের বছর মাত্র ১৩টি ছাত্র নিয়ে আবার চালু হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সোসাইটি বিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৫ই জানুয়ারী ১৯৪৭ থেকে এই বিদ্যালয় খাগড়া বয়েজ হাইস্কুল নামে সোসাইটির পুরাতন ভবনেই চলতে থাকে। সোসাইটি কয়েকটি শর্তে স্কুল কর্তৃপক্ষকে মাসিক এক টাকা ভাড়ায় ঐ ভবনটি ব্যবহার করতে দেন। ১৯৬০ সালে সোসাইটি ঐ বাড়ী সন্নিহিত মাঠ এবং অন্যান্য সম্পত্তি ১৬ হাজার টাকায় স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিক্রি করে দিতে চাইলে খাগড়ার এক দানশীলা মহিলা শ্রীমতি তারাসুন্দরী সাহা, স্কুল কর্তৃপক্ষকে ১৭,১২৫ টাকা দান করেন এবং তাঁরা ঐ টাকায় সোসাইটির কাছ থেকে সম্পত্তি কিনে নেন। স্কুলটির নামও পরিবর্তিত করে গুরুদাস-তারাসুন্দরী উচ্চ-মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় রাখা হয়। স্কুলটির বর্তমান ছাত্র সংখ্যা নয়শ'রও বেশী।

নদীয়া

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকারের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় এবং ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য লগ্নী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্যে নদীয়া জেলায় ১৯৭০-৭১ সালে কতকগুলি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ঢালাই কারখানা, বাস ও লরির বডি তৈরির কারখানা এবং ইস্পাতের আসবাব পত্র, মেশিনের বেল্ট, জাহাজের প্রপেলার, হাল্কা মেশিন ও যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ইত্যাদি তৈরির কারখানা। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই কৃষ্ণনগর ও কল্যানীতে স্থাপিত হয়েছে। গত আর্থিক বছরে নদীয়ার নূতন ও পুরাতন অনেকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার সাহায্য পায়।

পরীক্ষামূলক নিবিড় শিল্পোন্নয়নের জন্যে এই জেলার পাঁচটি শহর বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলি হল, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, রাণাঘাট, শান্তিপুর এবং চাকদহ। এখানে শিল্পোন্নয়ন কার্যসূচী সার্থক হলে জেলার অন্যান্য স্থানে অনুরূপ উন্নয়ন কার্য চালানো হবে। হস্তচালিত তাঁত এবং পিতল কাঁসা শিল্পের উন্নয়নের জন্যে শান্তিপুর নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ দেবার একটি বিশেষ কার্যসূচী রচিত হয়েছে।

এই জেলায় শিল্প সম্ভাবনা প্রচুর। আরও অনেক শিল্পই এখানে গড়ে উঠতে পারে। এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল, প্লাইউড তৈরির কারখানা, সেচের জন্যে পাম্পসেট ও তার যন্ত্রাংশ, লোহার কোলাপ্সেবল্ গেট ও গ্রিল্, কাগজ ও পাটকাঠির বোর্ড তৈরির কারখানা ইত্যাদি।

হুগলী

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসের বন্যায় হুগলী জেলার ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবি মরশুমে যে কৃষি কার্যসূচী রূপায়িত করেন, তার সাফল্য আশানুরূপ হয়েছে। আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে এই কর্মসূচী অনুযায়ী অতিরিক্ত ৩৩ হাজার একরে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান এবং অতিরিক্ত ২৫ হাজার একরে উচ্চফলনশীল গমের চাষ হয়। মোট প্রায় এক লক্ষ ৩৩ হাজার একরে বোরো ধান ও গমের চাষ করা হয় এবং ফসল পাওয়া যায় ২ লক্ষ মেট্রিক টনের উপর। তাছাড়া, প্রায় ৪৮ হাজার একরে আলু, ডাল, তৈলবীজ এবং অন্যান্য শাকসব্জীরও চাষ হয়। হুগলী জেলায় গত রবিখন্দে মোট প্রায় সাড়ে দশ কোটি টাকার রবিশস্য উৎপাদিত হয়। স্মরণ থাকতে পারে যে ১৯৭০ সালের বন্যায় এই জেলায় খরিফ শস্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি টাকার মত। গত রবি মরশুমের জন্য রচিত কৃষি কার্যসূচীর সার্থক রূপায়ণে এই ক্ষতির প্রায় ৭০ শতাংশ পূর্ণ হয়। শুধু তাই নয় এ সাফল্য হুগলী জেলায় "সবুজ-বিপ্লব" এর পথ আরও প্রসারিত করেছে।

সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসারও হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯০০ অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে।

তা' ছাড়া, কেন্দ্রের পরিচালনায় ক্ষুদ্র খামার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হুগলী জেলায় প্রায় ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চাষীকে আনা হবে। হুগলীই পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় জেলা যেখানে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। উন্নত সেচ ব্যবস্থা, জমি সংস্কার, পশু পালন, পোলট্রি ইত্যাদির মাধ্যমে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামারগুলিকে এমন ভাবে গড়ে

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

চিত্তরঞ্জন এঞ্জিন তৈরীর কারখানা

১৯৫০ সালে চিত্তরঞ্জন এঞ্জিন তৈরীর কারখানার কাজ শুরু হয়। এ পর্যন্ত, এই ২১ বছরে, এই কারখানায় ২৭১১টি এঞ্জিন তৈরী হয়েছে। এরমধ্যে ২৩৩২টি বাষ্প চালিত এঞ্জিন, ২৯৮টি বিদ্যুৎ চালিত এবং ৮১টি ডিসেল এঞ্জিন।

এই উৎপাদনের ফলে, চিত্তরঞ্জন কারখানা ১০২ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে সক্ষম হয়। কেবল বাষ্প চালিত এঞ্জিনের দরুণই ৮০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো যায়। অবশিষ্ট দু' ধরণের এঞ্জিনের দ্বারা প্রায় ২০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচে এবং বাকী অর্থ বাঁচে স্টিল ফাউণ্ড্রি কাসটিং-এর দরুণ।

১৯৭০-৭১ সালে চিত্তরঞ্জন কারখানায় ৫০টি বিদ্যুৎ-চালিত এঞ্জিন, ৩৩টি বাষ্প-চালিত এবং ৪০টি ডিজেল এঞ্জিন তৈরী হয়। এই কারখানায় এখন ১৯টি বাষ্প চালিত এঞ্জিন তৈরীর বরাত রয়েছে; এগুলি তৈরী হয়ে গেলে এই কারখানায় কেবল বিদ্যুৎ চালিত ও ডিজেল এঞ্জিন তৈরী হবে। এ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই জনশক্তি ও যন্ত্রপাতি ঢেলে সাজাবার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আশা করা যায় চতুর্থ পরিকল্পনার শেষাশেষি এই কারখানায় ৭২টি বিদ্যুৎ চালিত এবং ৪৮টি ডিজেল এঞ্জিন তৈরী করা সম্ভব হবে।

এইসব এঞ্জিন তৈরীর জন্যে যন্ত্রাংশ আমদানি ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ায় এখন নির্ভয়ে বলা যায় যে, বিদ্যুৎ চালিত এঞ্জিন তৈরীর বিষয়ে দেশ স্বয়ম্ভর হয়েছে। অন্য দিক থেকে যেখানে রেলপথ বৈদ্যুতিকরণ সূচী অব্যাহত থাকায় এটা সুস্পষ্ট যে এই দাবী অহেতুক নয়; কারণ এঞ্জিন তৈরীর ওপর এই সূচী নির্ভরশীল।

যাত্রীবাহী এবং মালগাড়ীর জন্যে ১০৮ মিশ্র ধরনের এ. সি এঞ্জিন এবং ৬টি বিভিন্ন ধরনের এঞ্জিন তৈরীর জন্যে এই কারখানা একটি বিশেষ সূচীর কাজ হাতে নিয়েছে। এগুলির ডিজাইন ও নক্সা দেশেই তৈরী। এর প্রত্যেকটির ওজন হবে ১১২.৮ মেট্রিক টন এবং খরচ পড়বে প্রায় ২১ লক্ষ টাকার মত। যন্ত্রাংশ আমদানির প্রয়োজন হবে ৬.৪৪ লক্ষ টাকার মত। এতে থাকবে ৬৩৪ অশ্ব-শক্তি যুক্ত ৬টি এ. সি. ট্রাকশন্ মোটর। ৮৮০ টন ওজনের একটি যাত্রীবাহী ট্রেনকে এই এঞ্জিন ঘন্টায় ১২০ কিলোমিটার গতিতে টেনে নিয়ে যেতে পারবে। আর ৩৬৬০ টনের একটি মালগাড়ী টানতে পারবে ঘন্টায় ৯৭ কিলোমিটার বেগে। এ কাজের জন্যে কোন বিদেশী সহযোগিতার প্রয়োজন হবে না।

চিত্তরঞ্জন এঞ্জিন তৈরীর কারখানায় সম্প্রতি বিদ্যুৎ চালিত ডি সি এঞ্জিন তৈরী হয়েছে। এরজন্যে কোন বৈদেশিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয় নি। এগুলি এখন পরীক্ষামূলক ভাবে সেন্ট্রাল রেলে মালগাড়ী চালানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্চে।

এই প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই রপ্তানি বাজারে নেমেছে। ফরাসী রেলপথকে এখান থেকে ট্রাকশন্ মোটর কেসিং, বর্মাকে বয়লার এবং ইরানকে ম্যাঙ্গানিজ স্টীল মোনোব্লক সরবরাহ করা হচ্চে। দেশের মধ্যে সরকারী ক্ষেত্র থেকে ৬০টি ডিজেল এঞ্জিনের বরাতের মধ্যে ২৩টি ইতিমধ্যেই সরবরাহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলি পরবর্তী ২/৩ বছরের মধ্যে সরবরাহ করা হবে।

সংবাদ পরিক্রমা

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

তোলা হবে যাতে যে কোন অবস্থাতেই তারা এগিয়ে চলতে সক্ষম হয়। জেলার সবকটি ব্লকই এই প্রকল্পের আওতায় আসবে। এই প্রকল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন কার্যসূচী রূপায়ণের জন্যে চতুর্থ যোজনা-কালে কেন্দ্রীয় সরকার দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন।

এ ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ ৮১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ব্যয়ে এই জেলার পুরশুড়া, খানাকুল, আরামবাগ এবং গোঘাট থানার অন্তর্গত ৩৫০টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের এক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন বলে প্রকাশ। সংশ্লিষ্ট মহল আশা করেন যে, আগামী বছরের প্রথম দিকেই এই কার্যসূচীর চূড়ান্ত রূপদান করা সম্ভব হবে। এই কার্যসূচী অনুযায়ী এই অঞ্চলের প্রায় ১২০০ অগভীর নলকূপকে বিদ্যুত চালিত করা হবে। হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া, তারকেশ্বর ও হরিপাল থানার ২৬৬টি গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের জন্যে এবং প্রায় ৮৪০টি অগভীর নলকূপ বিদ্যুতচালিত করার জন্যে পর্ষদ আরও একটি কার্যসূচী রচনা করছেন বলে জানা গেছে। এতে খরচ পড়বে প্রায় ৮৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। অর্থাৎ পর্ষদের উপরোক্ত দুটি স্কীমে মোট খরচ পড়বে এক কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার উপর। এতে হুগলী জেলার সাতটি থানার অন্তর্গত হাজার'এর বেশী গ্রামে বিজলী আসবে এবং প্রায় ২০৪০টি অগভীর নলকূপ বিদ্যুত চালিত হবে।

জেলায় সড়ক উন্নয়ন কাজের জন্যেও একটি বিরাট স্কীম গৃহীত হয়েছে। এর জন্যে বরাদ্দ হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এই টাকা হুগলী জেলার ১০টি পৌর প্রতিষ্ঠানকে ৫ লক্ষ টাকা করে ভাগ করে দেবেন। ইতিমধ্যে পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে সড়ক উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

শুকর পালনের গুরুত্ব

দিলীপ কুমার রায়

ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দারিদ্র দূরীকরণের জন্য এ পর্যন্ত সরকার নানা ভাবে জনসাধারণের মধ্যে নানা আশা উদ্দীপনার সঞ্চার করে আসছেন। স্বাধীনতা লাভের পরেই অভাব অনটন দূর করার জন্য নেওয়া হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। কিন্তু সরকারী সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বেকার বাড়ছে বই কমছে না। জনসাধারণের মধ্যেও নানা অসন্তোষ দিন দিন পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এটা মনে রাখা দরকার যে অলস মস্তিষ্ক হল শয়তানের আবাস। কাজেই দেশের অর্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিত যুবকরা যদি কর্মহীন হয় তবে দেশের প্রতি তাদের আস্থা কমবে বই কি। সরকার যদি দেশের প্রতিটি লোকের ভরনপোষণ দিতে সক্ষম না হয়, তবে জনগণের প্রতি আনুগত্য আশা করা বৃথা। তবে আশার কথা এই যে সরকার এখন বিভিন্ন ভাবে জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

একদিকে যেমন অধিক "ফলনশীল চাষ" আবাদের ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে, অন্য দিকে তেমন আশানুরূপ ভাবে জন জীবনে আশা উৎসাহও বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকের জাতীয়করণ, রাজন্য ভাতা বিলোপের সিদ্ধান্ত, আর বৈষম্য বিলোপের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কর পদ্ধতি জনমনে অনেক আশারই সৃষ্টি করেছে একথা বলা যায়। তবে দেশের ক্রমবর্দ্ধমান বেকারী যুব মানসে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার বেকারী নিরসনের জন্য 'দান' 'অনুদান' এই সব ব্যবস্থার চাইতে যদি এদেশের জনশক্তির সঙ্গে তাল রেখে পশুপালন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা যায় তবে দেশের নাগরিকদের যেমন প্রোটিন খাদ্যের অভাব হতে বাঁচানো যায়, তেমনি খাদ্য সমস্যারও কিছুটা সমাধান হয়।

ভারতের প্রায় ৭২ শতাংশ লোক আমিষ ভোজী। কাজেই যদি শূকর পালনের ব্যাপক প্রসার এ দেশে হয় তবে যারা ঐ খাদ্য পছন্দ করেন তারা তা প্রচুর পরিমাণে পেতে পারেন। শূকর বছরে একসঙ্গে প্রায় ৮।১০ টি বাচ্চা প্রসব করে। ওদের মাংসও বেশ পুষ্টিকর, এবং ওদের জন্য এমন কোন খাদ্যের প্রয়োজন নেই যা সাধারণ মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। কাজেই এ দেশের নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাড়াও যদি উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও এর পালনে উৎসাহ দেখান তবে বর্তমানে যারা শূকর পালন কাজে লিপ্ত আছেন, তাঁরাও উৎসাহ পাবেন এবং শুকরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে একটা পুষ্টিকর খাদ্যও সাধারণ মানুষ হাতের কাছে পাবে।

বর্তমানে যে ৭টি শূকর প্রজনন কেন্দ্র আছে তা চাহিদার তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। পশ্চিমবঙ্গে হরিণঘাটা, অন্ধ্র প্রদেশের গনভরম এবং মহারাষ্ট্রের আরে অঞ্চলে যেভাবে শূকর পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যদি তার আরও ব্যাপক প্রসার করা যায় তাতে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা ঐ কাজে উৎসাহ পাবে। যদি থানা ভিত্তিকভাবে প্রত্যেক অঞ্চলে ২৫০টি করে শূকর চাষের প্রাথমিক ব্যবস্থা করা যায় তাতে কম পক্ষে খাবার মাংস সংকট হ্রাস পাবে। এতে পালকদের একটা নির্দিষ্ট আয়ও হাতে থাকবে। কৃষি চাষের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আয় অনেক সময়ে অনিশ্চিত থাকে, কারণ ফসলের হার প্রাকৃতিক আনুকূল্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শূকর পালনের ক্ষেত্রে সহজেই নির্দিষ্ট আয়ের পথ পাকা।

এছাড়া শূকরদের মধ্যে রোগ হয় কম। সে কারণে যদি থানা ভিত্তিক ভাবে শূকর চাষের প্রসার ঘটান যায় তাতে অল্প শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিতদেরও কাজ দেওয়া যাবে—সাধারণ মানুষ প্রোটিন আহার্য পাবে এবং সরকারী আনুকূল্য ও সহচার্যের ভিত্তিতে এর প্রসার ঘটলে জনগণের মধ্যে এই চাষের জন্য দ্বিধাভাবও কেটে যাবে।

শূকর পালন শিল্পের প্রসারের জন্য প্রথমেই সরকারী উদ্যোগ দরকার হবে। কারণ এ দেশের বেশীর ভাগ উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এটা নীতিগত ভাবে পছন্দ করেন না; কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এদেশে গো শিল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেও অনেকে গো-পালনে উৎসাহী নন। কাজেই শরীর গঠনে দুধ উপকারী জেনেও অনেকে তা খাদ্য হিসেবে পান না এবং অপুষ্টিজনিত ব্যাধি, রিকেটস, বাত প্রভৃতি রোগে কষ্ট পান। সেই কারণে ঐ শূকর চাষের গুরুত্ব যদি প্রথমে সরকারী উদ্যোগে করে জনসাধারণকে দেখিয়ে দেওয়া যায়, তবে জনসাধারণ কাজে উৎসাহ পাবে। শূকর পশু হিসাবেও ভাল, সহজেই পোষ মানে, নিজের ঘর অপরিষ্কার করে না এবং এদের খাদ্যও খুব সহজ ও সাধারণ।

ভারতের প্রায় ৭২ শতাংশ লোক আমিষভোজী। কাজেই এদেশে যদি শুকর পালনের ব্যাপক প্রসার করা যায় তাহলে সাধারণ মানুষ একটি পুষ্টিকর খাদ্য হাতের কাছে পাবে।

আরও একটি সন্তান ...

ভেবে দেখুন

ঠিকমতো লালন-পালন করতে
পারবেন কি না।

নিরোধ

কৃষি সমাচার

সুফলা

নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থায় গবেষণার ফলে 'সুফলা' নামের একটি নতুন জাতের সরিষা উদ্ভাবিত হয়েছে। এই নতুন জাতের সরিষার জাব পোকা ও রোগ প্রতিরোধের শক্তি বেশী। সুফলার ফলন হয় ১০০—১২০ দিনে এবং প্রতি হেক্টারে দানা পাওয়া যায় ১৫ থেকে ১৭ কুইন্টাল।

এই জাতের গাছ হয় খাড়া খাড়া আর সরিষার বীজগুলি বড় ও পুষ্ট হয় বলে তেলও হয় বেশী (প্রায় ৩৮ থেকে ৪০%)

সুফলা সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত যে কোন সময় বোনা যায়।

সুষম সারে পেয়াজের ফলন বাড়ে

রাজস্থানের উদয়পুরস্থিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান পালকবিদদের মতে পেঁয়াজ চাষে সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার, যথাক্রমে পটাশ, ফসফেট ও নাইট্রোজেন প্রয়োগে হেক্টার প্রতি প্রায় ৩৩,০০০ কেজি ফলন তোলা সম্ভব।

বেশী ফলন পাওয়ার জন্য চারা নেড়ে বসানোর পরে প্রথমবার এবং তার ৩০ দিন পরে দ্বিতীয় বার সমমাত্রায় নাইট্রোজেনের মাধ্যমে ইউরিয়া সরবরাহ করতে বলা হয়। আর পেঁয়াজ চারা নেড়ে বসানোর একদিন পরে সুপার ফসফেটের মাধ্যমে ফসফোরিক এ্যাসিড এবং মিউরেট অফ পটাশ ক্ষেতে ছড়াতে ও মাটিতে মিশিয়ে দিতে সুপারিশ করা হয়েছে।

জই ও বারসিমের মিশ্রচাষে বেশী পরিমাণে গোখাদ্য পাওয়া যায়

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, জই (ওট্‌স) ও বারসিমের মিশ্রচাষে একদিকে যেমন বেশী ফলন পাওয়া যায়, অপর দিকে তেমনি ফসলের গুণ গো-খাদ্যের পক্ষেও উপকারী।

দেখা গেছে, জই ও বারসিমের মিশ্রচাষে প্রতি হেক্টারে ৯৬,৪৮০ কেজি ফলন পাওয়া গেছে। সে তুলনায় শুধু জই চাষে ফলনের পরিমাণ হয়েছে মাত্র ১০,৪০০ কেজি। তাছাড়া এদুটি ফসলের মিশ্র চাষে কম করে পাঁচ বার কিস্তিতে গো-খাদ্য সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু শুধু জই চাষে দুই বারের বেশী ফসল কাটা যায় না।

জই ও বারসিমের মিশ্র খাদ্যে পশুর পেট ফোলা রোগ হয় না, অথচ তারা এ খাদ্য পছন্দও করে বেশী।

দফায় দফায় নাইট্রোজেন প্রয়োগে ধানের ফলন বেশী

ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে ধান চারা নেড়ে বসানোর সময় মোট নাইট্রোজেন একবারে না দিয়ে যদি দুই—তিন দফায় প্রয়োগ করা যায়, তবে ফলন বেশী হয়।

উচ্চ ফলনশীল জাতের চারা নেড়ে বসানোর সময় আর বিয়ান আসার সময় মোট নাইট্রোজেনের শতকরা ৫০—৭৫ ভাগ প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে।

তবে অপেক্ষাকৃত হালকা মাটিতে মোট নাইট্রোজেন চারা নেড়ে বসানো, বিয়ান ও থোড় আসার সময় সম পরিমাণে তিন দফায় পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়া উচিত।

বন্যাবাহিত জমিতে নাইট্রোজেন মাটিতে না দিয়ে মাটির গভীরে প্রয়োগ করলে হেক্টার প্রতি প্রায় ৫০০ কেজি বাড়তি ফলন পাওয়া সম্ভব।

পুসা-বৈশাখী মুগের ফলন কি করে বাড়াবেন

পরীক্ষায় জানা গেছে যে, পুসা-বৈশাখী মুগের বেশী ফলন পেতে হলে প্রতি হেক্টার জমিতে ১২৫ কেজি এমোনিয়াম সালফেট ও ৪০০ কেজি সুপার ফসফেট মিশ্রণ প্রয়োগ করা দরকার। এই ভাবে রাসায়নিক সার দেওয়ায় হেক্টার প্রতি ২০০ টাকা খরচ পড়লেও লাভের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০০ টাকা, অর্থাৎ রাসায়নিক সারের জন্য মোট যা খরচ হয়েছে সে তুলনায় লাভ হয়েছে তিন গুণ বেশী।

ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বীজের ঠিক নীচেই এই রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে বেশী উপকার পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁরা আরও বলেন যে, 'সিংগল টিউব সিড্ ড্রিলের' সাহায্যে সার দেওয়া সুবিধাজনক।

কো-২ ভারাগু জোয়ার

কয়ম্বাটুরে অবস্থিত কৃষি অনুসন্ধান সংস্থা কো-২ নামের জলদি জাতের এক রকম জোয়ার (কোডো মিলেট-ভারাগু) বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে চাষের জন্য বাজারে ছেড়েছেন।

কো-১ জাতের তুলনায় এই নতুন জাতীয় জোয়ার শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বেশী ফলন দেয়। তাছাড়া স্থানীয় অন্যান্য জাতের থেকে কো-২ জাত প্রায় ৩০ দিন আগেই পাকে।

এই জাতীয় জোয়ার বোনার সময় সারির মধ্যে ৪৫ সেন্টি মিটার এবং প্রতি চারার মধ্যে ১৫ সেন্টি মিটার দূরত্ব রাখা উচিত। প্রতি হেক্টার জমিতে ২৫ কেজি বীজ বুনলে হেক্টার প্রতি জোয়ারের ফলন দাঁড়ায় প্রায় ১২০০ কেজি।

চাল, [illegible] তুলনায় এই জাতীয় জোয়ারে ক্যালসিয়াম, লোহা, প্রোটিন ও [illegible] বেশী পরিমাণে বর্তমান। [illegible] সাহায্যে নানা-রকম [illegible] আহার্য প্রস্তুত হয়।

REGD. NO. D-23

পরিবার পরিকল্পনা অভিযান

ছিয়াশি লক্ষ দম্পতি, অর্থাৎ প্রজননক্ষম শ্রেণীর ৮.৬ শতাংশ নির্বীর্জকরণ ও পরিবার পরিকল্পনার বিবিধ আয়োজনের কল্যাণে অবাঞ্ছিত সন্তান জন্মের দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। সংবাদটি পরিবার পরিকল্পনার এবারের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনার বিস্তৃত ক্ষেত্রে যেসব তথ্যাদি পাওয়া গেছে সেগুলিও কম উল্লেখনীয় নয়। প্রচলিত জন্ম নিরোধক মারফৎ সাহায্য করা হয়েছে ১.৯ শতাংশ দম্পতিকে। স্ত্রী ও পুরুষ মিলিয়ে প্রচলিত প্রথায় জন্ম নিরোধক ব্যবহারের সংখ্যা ১৯৬৯-৭০ এর ২৭ লক্ষ ১০ হাজার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার জন।

১৯৭০-৭১ সালে পরিবার পরিকল্পনা খাতে ৫২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে প্রাদেশিক ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের খাতে ব্যয় হয়েছে ৪৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা এবং বাকি অংশ কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির খাতে ব্যয় করেছেন পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর স্বয়ং।

ইদানিং বিভিন্ন রাজ্যে ১৬টি পরিবার পরিকল্পনা বহিশাখা চালু আছে। এদের মধ্যে ছয়টি কাজ করছে—আহমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, ভুপাল, কলকাতা, চণ্ডীগড় এবং লক্ষ্ণৌ-এ। এগুলি আঞ্চলিক দপ্তরের শাখা সঙ্গে যুক্ত। আঞ্চলিক শাখা দপ্তরের অন্তর্গত পল্লী এলাকায় ৯০টি প্রধান কেন্দ্র ও ১২৮০টি আধা-প্রধান কেন্দ্র খোলার কাজও সমাপ্ত প্রায়। 'ইউ এস. এইড' হতে প্রাপ্ত ১৫ কোটি টাকার মধ্যে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা উপরোক্ত খাতে গৃহাদি নির্মাণ কাজে ব্যয় করা হবে স্থির হয়েছে।

শহরাঞ্চলেও পরিবার পরিকল্পনার কেন্দ্র স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১,৭৭৭টি মাতৃ মঙ্গল তথা পরিবার পরিকল্পনার কেন্দ্র কাজ করে চলেছে। এর মধ্যে ৮৫২টি কেন্দ্র পরিচালনা করছেন বিভিন্ন রাজ্য সরকার, ৩৬৬টি স্থানীয় সংস্থা এবং ৩৩৭টি স্ব-প্রণোদিত প্রতিষ্ঠান। এছাড়া, ১৯১টি কেন্দ্র পরিচালনের ভার নিয়েছে রেল ও প্রতিরক্ষা দপ্তর।

টেলিভিশান কর্মীদের শিক্ষণ

রাষ্ট্র সঙ্ঘের উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মসূচী অনুযায়ী ভারতে টেলিভিশান মারফৎ বয়স্ক শিক্ষার প্রসার, পরিবার পরিকল্পনা এবং অধিক ফলন কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারণে রাষ্ট্র সঙ্ঘের টেলিভিশান উন্নয়ন শাখা ভারতীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করবে।

এই কার্যসূচী অনুসারে পুনায় একটি টেলিভিশান শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, যা অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত টেলিভিশান কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী তৈরীর ভার নেবে। এই জাতীয় প্রচেষ্টার এটিই প্রথম পদক্ষেপ।

রাষ্ট্র সঙ্ঘের টেলিভিশান সম্প্রসারণ সংস্থা আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশনস্ সঙ্ঘ মারফৎ কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে এবং পুনার টেলিভিশান কেন্দ্রের জন্য টেলিভিশান সেট ও তার যন্ত্রপাতি ছাড়াও আট জন অভিজ্ঞ কর্মীকে এদেশে পাঠাবেন মনস্থ করেছেন বৈদেশিক মুদ্রায় হিসেবে এসব কাজের জন্য ব্যয় দাঁড়াবে ১.২ মিলিয়ান ডলার। প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং স্থানীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা বাবদ খরচে ভারত সরকার ব্যয় করবেন ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা।

মহারাষ্ট্রে প্লাটিনাম সন্ধান

মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা জেলায় উচ্চ মানের দুষ্প্রাপ্য প্লাটিনামযুক্ত পাথর এবং অন্যান্য ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলে প্লাটিনামযুক্ত পাথরের সম্ভাব্য সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৮,০০০ মেট্রিক টন।

ধনধান্যে

পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে, তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য। এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যথার্থ রূপ তুলে ধরা 'ধনধান্যে'র অন্যতম উদ্দেশ্য।

নিয়মাবলী

'ধনধান্যে' প্র\u09CD\u09A4ি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়।

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাদের নিজস্ব।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা এবং কোনোও রচনার প্রাপ্তি স্বীকৃতি জানানো সম্ভব নয়।

নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ে, এই ঠিকানায় পাঠাবেন—

"যোজনা"
যোজনা ভবন
পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট,
নিউ দিল্লী—১

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ-
বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্স্ ডিভিশন,
পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১,
এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সোসাইটি লি:—করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ডলার সঙ্কট ও ভারত

ডলার সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি নিক্সন যে ক'টি বিশেষ ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমেরিকার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উন্নয়ন সাম্রাজ্যে নতুন দুই শরিক হোল পশ্চিম জার্মেনি ও জাপান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যস্ত এই দু'টি রাষ্ট্র আজ ডলারের সাম্রাজ্যে তীব্র আঘাত হেনে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিচ্ছে। দ্বিতীয় মহাসমরের ২৬টি বছর ধরে আমেরিকা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানে পুর্ণবাসন প্রকল্পে, তথা ছোট বড় বিভিন্ন দেশকে অস্ত্র সম্ভারে সুসজ্জিত করতে ও ভিয়েত-নামের যুদ্ধের মত অর্থগ্রাসী যুদ্ধের খরচ জোগাতে জোগাতে ধন কুবের আমেরিকার ভাণ্ডারেও টান পড়েছে। আশ্চর্য কি, অবি-মৃষ্যকারিতা কু ফলের দিকেই ঠেলে দেয়।

পর্যুদস্ত আমেরিকান অর্থনীতিকে পূর্বের মত গতিশীল করে তুলতে রাষ্ট্রপতি নিক্সন যেসব বিশেষ ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন তাকে বলা যায় আর্থিক "শক্তি টনিক।" এই বিশেষ ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রথম এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিধিনিষেধ হোল, সাময়িকভাবে কোন দেশের আন্তর্জাতিক মুদ্রাকে ডলারে রূপান্তরিত করা যাবে না। অর্থাৎ সোজা কথায়, অর্থনৈতিক শক্তি পরীক্ষায় ডলার, ইয়েন ও ডয়েস মার্কের তুলনায় হীন বল হয়ে পড়েছে। সেই হেতু আমেরিকা চায় ডলারের বিনিময়মূল্য পূর্ববৎ রাখতে অন্যান্য দেশ একটা সমঝোতায় এগিয়ে আসুক। এর ফলে পশ্চিম জার্মেনি, জাপান ও অন্যান্য উন্নত দেশ যারা আমেরিকার সাথে বাণিজ্য বিস্তার করে লাভবান হয়েছে, তারা তাদের মুদ্রার বিনিময় মূল্য অপরিবর্তিত রাখতে পারবে কিনা সে বিষয়ে দ্বিধান্বিত। অবশ্য এমতাবস্থায় আমেরিকার নিজের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করাই বিধেয়। কিন্তু নিজের বেলায় আঁটিসাঁটি হলেও অন্যের বেলায় দাঁত কপাটি প্রবাদটি অপ্রিয় হলেও সত্য। অতএব, শ্রী নিক্সন যে পাঁচকাট নিয়েছেন তার অন্যান্য বিধিনিষেধের মধ্যে আছে তিন মাস আয় ও দ্রব্য মূল্যে স্থিতিশীলতার আদেশ, আমদানির যাবতীয় সামগ্রীতে ১০ শতাংশ সারচার্য, বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস ১০ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ হ্রাস করা হয়েছে ৪,৭০০ মিলিয়ান ডলার।

এটা ভাবলে ভুল হবে যে, আর্থিক জগতে যে আলোড়ন এসেছে তা আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপের দেশ বা জাপানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের মত দেশও এর আঁচ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।° আমেরিকার অনুরোধ মত যদি পশ্চিম জার্মেনি ও জাপান তাদের মুদ্রার উচ্চ মূল্যায়ন করে তাহলে যেসব ভারতীয় পণ্য জার্মেনি বা জাপানে যাবে তাদের রপ্তানি পড়ে যাবে। অপর পক্ষে, এসব দেশ থেকে আমদানিতে আমাদের ব্যয় বাড়বে। অনুমান করা হচ্ছে, ইউরোপীয় খোলা বাজারের সঙ্গে যুক্ত দেশগুলিও জাপান থেকে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বাবদ ক্ষতি হবে ৩০ কোটি টাকা। এছাড়া, এসব দেশ থেকে ভারত ঋণ হিসেবে যে সাহায্য পেয়েছে তা সুদে আসলে শোধ দেবার খরচাও বেড়ে যাবে।

ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক স দেও ভারসাম্য ভারতের বিপক্ষে যাবে। এরপর থেকে ঐ দেশে ভারতীয় রপ্তানি পর্বের মত অবাধে চলাচল করতে পারবে না। অবশ্য রাষ্ট্রপতি নিক্সন আমদানির ওপর ১০ শতাংশ কর ধার্যের ব্যাপারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যেসব আমদানির ওপর "কোটা" বিধি চালু আছে এবং আমদানিকৃত যেসব পণ্যের ওপর এ পর্যন্ত কোন কর বসানো হয়নি, সেগুলির ওপর নতুন আমদানি নীতির বিধি নিষেধ বর্তাবে না। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রপ্তানির ৮৫ শতাংশ করের কবল থেকে বাঁচবে। বাকি যে ১৫ শতাংশের ওপর করের বোঝা চাপবে তাতে চামড়ার পণ্য, উলের পোষাক আসাক ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি উল্লেখ্য। শেষের পণ্যটির ওপর করের বোঝা বাড়ার ফলে রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কেননা রপ্তানি বাণিজ্যে এই নবীন শিল্পটি ইতিমধ্যেই অনেক আশার সঞ্চার করেছে। অবশ্য ১০ শতাংশ সারচার্য আরোপ করা ততটা গুরুত্ব-পূর্ণ না হলেও, এর পর থেকে আমেরিকার বাণিজ্য নীতি রক্ষণ-শীলতার দিকে কতটা মোড় নেয়, সেটাই ভাববার বিষয়। আমে-রিকার এই রক্ষণশীলতার দিকে আকর্ষণ উন্নয়নশীল দেশগুলির বাণিজ্যে হতাশার সৃষ্টি করবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন সময়েই রক্ষণশীলতার দিকে অনুরাগ দেখা দিচ্ছে, যখন উন্নয়নশীল দেশ-গুলি উন্নত দেশের কাছ থেকে তাদের পণ্য আমদানির ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা পাবার আশা করছিল। যদিও ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ অল্প, ডলার সঙ্কটের কষ্টি পাথরে যাচাই করে যে শিক্ষা পাওয়া গেছে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে আবার বিপদে না পড়তে হয়, তার জন্য বিদেশের বাজারে নিজেদের রপ্তানি মাল আরও আকর্ষণীয় ও সুলভ করে তোলাই যথার্থ বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচিত হবে।

উন্নয়নশীল দেশের জন্য আমেরিকা যে বৈদেশিক সাহায্য

দিয়ে থাকে, নতুন নীতি অনুযায়ী তার পরিমাণ হ্রাস করার ফলে ঐসব দেশ, বিশেষ করে ভারত, বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পুষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সাহায্যের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে ঐসব প্রতিষ্ঠান থেকে উন্নয়নশীল দেশের ভাগের সাহায্য মাত্রাও স্বাভাবিকভাবে কমে আসবে। ১৯৬৯-৭০ সালে যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল ১৯৭০-৭১ সালে তার নীট পরিমাণ কমে যায় ৩৫ শতাংশ। যদিও দেনার সুদের খরচা মেটাতে মেটাতে নীট আদায় যথেষ্ট কমে যায়, তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে ওঠে যেটি তা হোল, মোট প্রতিশ্রুত ঋণের পরিমাণ যত আশা করা হয়েছিল বাস্তবে তার চেয়ে কম ঋণ হাতে এসেছে। এর ফলে বৈদেশিক সাহায্য ও নীট বিনিয়োগের আনুপাতিক হার ১৯৭০-৭১ সালে নেমে আসে ৮ শতাংশ। এর পূর্বে ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে এই সাহায্যের পরিমাণ ছিল, যথাক্রমে ১১.৫ ও ২২ শতাংশ। ভবিষ্যতে ঋণদান গতি প্রকৃতি যদি বর্তমানের নীতি অনুসরণ করে চলে, তাহলে পরিকল্পিত কর্মসূচীর ওপর তার আঘাত হবে সুদূরপ্রসারী।

সৌভাগ্যক্রমে ইদানিং ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বাবদ বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা সন্তোষজনক। মাত্র কয়েক বছর আগেও, ১৯৬৪-৬৫ সালে, বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের পরিমাণ মারাত্মক হ্রাস করে যায়—নেমে আসে ৫২৪.৩ মিলিয়ান ডলারে। এর সঙ্গে সঙ্গে ঐ বছর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারে ঋণ শোধের টাকাও ক্রমশঃ বেড়ে দাঁড়ায় ২২৫ মিলিয়াম ডলারে। অতঃপর দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গতিশীলতা ধীরে ধীরে ফিরে আসার ফলে ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় খাতে জমার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৯৪.৬ মিলিয়াম ডলার। এছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের ঋণের সমস্ত দায়ও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূলতঃ দুটি কারণে অবস্থার এরূপ উন্নতি সম্ভব হয়—আমদানির সংকুচিত এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে আমদানির দাম বেড়ে গিয়েছে এবং বিকল্প স্বদেশীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদন অভিযান আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। তাছাড়া উপর্যুপরি কয়েক বছর কৃষি উৎপাদনে অপ্রত্যাশিত বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির দায় কমিয়ে এনেছে।

ডলার সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ের আর একটি দিক বিশেষ করে ভাববার সময় এসেছে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ের এক তৃতীয়াংশ ভাগ ডলারে, অথচ ইদানিং বেশীর ভাগ দেশেরই চেষ্টা ডলার থেকে সরে আসার। ডলার ও স্বর্ণ বিনিময় নিয়ামক ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরা ডলার বিনিময়ে ততখানি উৎসাহ প্রকাশ নাও করতে পারে। সেরকম পরিস্থিতিতে ভারতকে বিদেশী বাজারে সঞ্চিত ডলারের বিনিময়ে লেন দেনে লোকসান গুণতে হবে। সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে ডলার ও টাকার বিনিময় হার অপরিবর্তিত থাকবে। যুক্ত রাজ্যও প্রায় অনুরূপ ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিলেও তা চার সেন্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে। বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে কতদিন এ ব্যবস্থা চালানো যাবে তা বলা মুস্কিল। তবে যদি ডলারের অবমূল্যায়ন করা হয়, তাহলে ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

রাষ্ট্রপতি নিক্সন ডলার সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে স্বার্থ রক্ষার খাতিরে যেসব বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ঘোষণা করেছেন, তা আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ব্যতীত অন্য পন্থা নেই।

পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীবর্গকে বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ জানাই।

প্রধান সম্পাদক

রপ্তানি বাণিজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ভূমিকা

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত এক দশকে ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে বিদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানির পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র দশ-বছর আগেও যেখানে অতি সাধারণ শিল্প সামগ্রী রপ্তানি করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হত, আজ সেখানে আমরা অতি সূক্ষ্ম ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছি। আমাদের রপ্তানি সম্ভারের মধ্যে আছে ডিজেল ইঞ্জিন, এয়ার কন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটর, বস্ত্র শিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক পাখা ও মটর, রেডিও, বৈদ্যুতিক তার ও কেবল, মোটরগাড়ি, সাইকেল, রেল কোচ ও ওয়াগন প্রভৃতি আরও বহুবিধ যন্ত্রপাতি। বিগত কয়েক বৎসরের ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানির মূল্য নিচে দেওয়া হল :—

বৎসর	রপ্তানি পণ্যের মূল্য (কোটি টাকা হিসাবে)
১৯৬৫-৬৬	২৯.৭৭
১৯৬৬-৬৭	৩১.১৪
১৯৬৭-৬৮	৪১ ৪৮
১৯৬৮-৬৯	৮৪.৯৭
১৯৬৯-৭০	১০৭.০০
১৯৭০-৭১	১১৪.২০

এ থেকেই বোঝা যাবে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য কত গুরুত্ব পূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে চলেছে।

আমাদের রপ্তানি পণ্যের একটা বড় অংশ, অর্থাৎ শতকরা ৭২ ভাগই এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্নদেশ আমদানি করে থাকে এবং প্রায় শতকরা ২০ ভাগ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়ে থাকে। ভারতের কিছু কিছু শিল্পসংস্থা উন্নতিশীল দেশগুলিতে শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। অর্থাৎ কারিগরী জ্ঞান, দক্ষ যন্ত্রবিদ ও মূলধন সরবরাহ করে ভারতীয় সংস্থাগুলি উন্নতিশীল দেশগুলির সহযোগিতায় শিল্প স্থাপন করেছেন এবং সেই সব শিল্পোদ্যোগে উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা ভারতীয় প্রযুক্তি বিদ্যায় এক গৌরবময় কৃতিত্ব।

বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানি বিষয়ে সাহায্য এবং উৎসাহ দেবার জন্য ভারত সরকার এবং বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ১৯৫৫ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদ ভারত সরকারকে রপ্তানির নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে এবং সমস্যার সমাধানের উপায়ও সুপারিশ করে। এছাড়া বিদেশের বাজার সম্বন্ধে রপ্তানিকারকদের অবহিত করা এবং বিদেশী ক্রেতাদের ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য সম্বন্ধে নানাবিধ খবরাখবর পরিবেশন করাও পরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ। প্রায় ৩০০০টি বিভিন্ন উৎপাদক, রপ্তানিকারক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এই পরিষদের তালিকাভুক্ত। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ প্রচেষ্টায় পরিষদ এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করছে।

রপ্তানিকারকদের বিদেশে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। এর ফলে যাঁরা সহজ সর্তে অর্থাৎ দীর্ঘ মেয়াদী মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে শিল্প সামগ্রী রপ্তানি করতে সক্ষম হন তাঁরাই সাফল্য লাভ করেন। এছাড়া উন্নতিশীল দেশ গুলিতে নানা প্রকার আর্থিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের দরুণ রপ্তানিকারকদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। এইসব অসুবিধা দূর করবার জন্য এবং রপ্তানিকারকদের স্বার্থ যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখার জন্য এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি করপোরেশন রপ্তানি সামগ্রীগুলিকে যথোপযুক্ত বীমার দ্বারা সুরক্ষিত করবার ব্যবস্থা করেছেন। বিভিন্ন উৎপাদক ও রপ্তানিকারক এই সংস্থাগুলির সহায়তায় তাদের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত হয়েছেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং রপ্তানি সামগ্রীর একটি বড় অংশ হল ইস্পাত জাত দ্রব্যাদি। ১৯৭০-৭১ সালে ১১৪'২০ কোটি টাকার রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ৫২'৬০ কোটি টাকার পণ্য ছিল ইস্পাত জাত দ্রব্য। এর মধ্যে আছে রেল ওয়াগন, রেল কোচ, ইস্পাতের তার এবং মেশিনারি ও আরও বহুবিধ যন্ত্রপাতি। কাজেই রপ্তানি বাণিজ্যের সাফল্য ইস্পাত জাত দ্রব্যের উৎপাদনের উপরই বহুল পরিমাণে নির্ভর

শীল। কিন্তু আমাদের ইস্পাত কারখানাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ইস্পাত সরবরাহ করতে অপারগ হওয়ায় উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হচ্ছে, এবং এর ফলে রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নানা রকম অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। তবে ভারত সরকার এ সম্বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দিয়েছেন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রক ইস্পাত আমদানির বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন।

ইস্পাত জাত দ্রব্যাদির মধ্যে রেল ওয়াগন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বৎসরে অন্ততঃ চল্লিশ হাজার ওয়াগন নির্মাণের সুযোগ সুবিধা ভারতীয় শিল্প কারখানাগুলিতে আছে। এই পরিমাণের অন্ততঃ অর্ধেক অর্থাৎ কুড়ি হাজার ওয়াগন ভারত বিদেশে রপ্তানি করতে সক্ষম। ভারতের ওয়াগন নির্মাতারা দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ঘানা, কেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বিপুল পরিমাণে ওয়াগন রপ্তানির অর্ডার পেয়েছেন। অতি সম্প্রতি ৩৬০০টি রেলওয়াগন সরবরাহের জন্য ভারতের সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই রপ্তানির মূল্য প্রায় ৪৮ কোটি টাকা।

ইস্পাত সরবরাহ ব্যবস্থা

ইস্পাত রপ্তানিতে আশানুরূপ অগ্রগতি দেখা দিলেও বিভিন্ন শিল্প কারখানাগুলিতে ইস্পাতের চাহিদা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় ইস্পাত রপ্তানির পরিমাণ স্বভাবতই কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮, ১৯৬৮-৬৯ এবং ১৯৬৯-৭০ সালে যথাক্রমে ৪,৭০,০০০ টন, ১৩,২০,০০০ টন এবং ১৩,৪০,০০০ টন ইস্পাত বিদেশে রপ্তানি করলেও ১৯৭০-৭১ সালে রপ্তানির পরিমাণ কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১০,০০.০০০ টনে। আবার এরই পাশাপাশি দেশীয় শিল্পে ইস্পাতের চাহিদা পূরণের জন্য ১৯৭১-৭২ সালে ৪০০,০১০ টন বিশেষ ধরনের ইস্পাত আমদানির প্রয়োজন [illegible] হচ্ছে। ইস্পাত বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভারত সরকার ইস্পাত অগ্রাধিকার সমিতি (Steel Priority Committee) গঠন করেছেন। সমিতি কর্তৃক বণ্টিত ইস্পাতের সরবরাহ ও উৎপাদন প্রচেষ্টার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নজর রাখার জন্য লৌহ ও ইস্পাত কন্ট্রোলার কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে আঞ্চলিক অফিস খুলেছেন। এর ফলে আশা করা যাচ্ছে আগামী বৎসর গুলিতে ইস্পাত জাত পণ্য রপ্তানি আরও বৃদ্ধি পাবে।

পশ্চিমবঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে সারা ভারতের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৬৫ সালে সমগ্র ভারতে উৎপাদিত ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই শতকরা ৩০ ভাগ উৎপাদিত হয়েছিল। স্বভাবতই রপ্তানি বাণিজ্যে পশ্চিমবঙ্গের এক গৌরবময় ভূমিকা ছিল। কিন্তু ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালের অর্থনৈতিক মন্দার ফলে এখানকার কলকারখানাগুলি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়। এর কারণ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোদ্যোগ প্রথাসিদ্ধ পথে পরিচালিত হয় এবং প্রধানত সরকারী কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভরশীল। বিদেশের বাজারে নানাপ্রকার উন্নত ও নূতন ধরণের জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানাগুলি চিরাচরিত সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত থাকায় রপ্তানি বাণিজ্যের এই নবদিগন্তের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এছাড়া ওয়াগণ প্রভৃতি শিল্প প্রধানত রেল দপ্তরের অর্ডারের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু গত তিন চার বৎসর যাবৎ ওয়াগনের চাহিদা ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ায় ওয়াগন শিল্প গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এক সময় কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদবর্তী বাজার (Hinterland) ছিল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও উত্তর প্রদেশ নিয়ে এক বিরাট ভূখণ্ড কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীতে ক্রমশঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের রপ্তানি পণ্যগুলি এই নূতন বন্দরের সুযোগ গ্রহণ করতে থাকে এবং এর ফলে কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদবর্তী বাজার ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়। আজকাল নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী আসামের রপ্তানি যোগ্য চা গৌহাটি থেকে রেলপথে সরাসরি [illegible] কাণ্ডলা বন্দরে পাঠানো হচ্ছে। পূর্বে বিদেশে চা রপ্তানির প্রায় অধিকাংশই কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমেই পরিচালিত হত। এছাড়া শ্রমিক অশান্তি পশ্চিমবঙ্গে লেগেই আছে এবং মূলধনেরও নিদারুণ অভাব দেখা দিয়েছে। এর ফলে শত শত কারখানা বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ বন্ধ থাকায় হাজার হাজার মানুষ বেকারীর অভিশাপ বহন করে চলেছেন। এই সব নানাবিধ কারণে কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিল্পোদ্যমের প্রসার গুরুতর ভাবে ব্যাহত হয় এবং কলিকাতা বন্দরের গুরুত্বও ক্রমাগত হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পক্ষে এ এক দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা।

এই অবস্থার নিরসনের জন্য ১৯৭০ সাল থেকেই সরকারী ও বেসরকারী স্তরে নানাপ্রকার প্রচেষ্টার কথা শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে আছে হলদিয়া প্রকল্প, হুগলী নদীর উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি নানাবিধ পরিকল্পনা। রুগ্ন ও বন্ধ কলকারখানাগুলিকে সাহায্য করবার জন্য, ও নূতন শিল্পোদ্যোগে সহায়তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্প পুনর্গঠন কর্পোরেশন গঠন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারও এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। ১৯৭০ সালে সমগ্র ভারতে মোট ১৬ হাজার কল কারখানা স্থাপিত হয়েছে, তন্মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে হয়েছে মাত্র এক হাজারটি। বর্তমানে অন্ততঃ দুই হাজার কল কারখানা যাতে খোলা যায় তজ্জন্য সরকার উদ্যোগী

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

সুনীল বণিক,

পূর্ব ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণ কেন্দ্র কলকাতার আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে-পেতে এখন শহরতলী ছাড়িয়েছে ১.৩ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারে। জন সংখ্যা ৮.৫ মিলিয়ন। প্রায় তিনশো বছরের প্রাচীন কলকাতা আজ জরাগ্রস্ত। শহরের মানুষ বিশুদ্ধ হাওয়া পায় না, যান চলাচলের স্থান নেই রাস্তায় নিরাপদে হাঁটা তো দূরের কথা কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে চলেও যানবাহনে পড়ে হাত পা ভাঙা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। ময়লা আবর্জনা রাস্তায় রাস্তায় স্তুপীকৃত; জল নিকাশনের ব্যবস্থা অতি শোচনীয়।

ঐতিহাসিক কলকাতার আজ এ দশা কেন? কি ভাবে এর উন্নতি সম্ভব এবং সে উদ্দেশ্যে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে—সেটাই হোল এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা—এই তিনটি গ্রাম নিয়ে শহর কলকাতার পত্তন। ১৬৯৮ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই তিনটি গ্রাম কিনে নেয় মাত্র ১৩ শ' টাকায়। তখন এর আয়তন ছিল ৬৮৬ হেক্টেয়ার। তিন শো'রও কম বছরের মধ্যে এই তিনটি গ্রাম ভারতের বৃহত্তম শহর এবং শিল্প বাণিজ্য ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে এখন রয়েছে কলকাতা এবং হাওড়ার করপোরেশন এলাকাগুলি, হুগলী নদীর উভয় পারে অবস্থিত ৩৩টি মিউনিসিপালিটি এবং ৩৭টি মিউনিসিপালিটি বহির্ভূত শহরাঞ্চল। উত্তরে বাঁশবেড়িয়া থেকে দক্ষিণে বারুইপুর বজবজ, পূর্বে বারাসত থেকে পশ্চিমে বৈদ্যবাটী পর্যন্ত এখন এর পরিধি। এই এলাকার পরিমাপ হোল ১৪৮০ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৮.৫ মিলিয়ন। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতি হোল ৫,৭৪৩।

এশিয়ার যে কোন শহরে গেলে দেখতে পাবেন শহরাঞ্চল বেড়েছে এলোমেলোভাবে; কিন্তু কলকাতার ক্ষেত্রে বলা যায় অবস্থা অতি জঘন্য। জনসংখ্যাবৃদ্ধি অনুপাতে শহরের সুযোগ সুবিধা মোটেই বৃদ্ধি পায়নি, বাসস্থান ক্রমশঃ ঘিঞ্জি হয়ে বন্ধ হতে যাবার উপক্রম, বাসস্থানের অভাব তো আছেই, তার ওপর আছে যানবাহনের অভাব, পানীয় জলের অভাব—এক কথায় বলা যায় সব কিছুরই অভাব।

১৮৯০ সালে কলকাতা করপোরেশনের এক্তিয়ার ছিল ৪৯ বর্গ কিলোমিটার পরিমাপ এলাকার; এখন তা দাঁড়িয়েছে ৭৮ বর্গ কিলোমিটারে। জনসংখ্যা ৪.৫ মিলিয়ন এবং হেক্টার প্রতি জনবসতি হোল ৭৫০। শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশী। জন্মহার বৃদ্ধি ও ব্যাপক জনাগম এর অন্যতম কারণ।

ভিন্ন প্রদেশীয়

ভারতের নানা জায়গা থেকে লোক এসে কলকাতায় আস্তানা পাতে পয়সা রোজগারের আশায়। দূর দূরান্তের শহর, গ্রাম থেকে লোক এসে কলকাতায় জড় হয় পয়সা রোজগার করে পরিবারবর্গকে পাঠাবার জন্যে। এইসব কারণে কলকাতার

হাওড়া ষ্টেশন থেকে হাওড়া ব্রিজে প্রবেশের পথ। জনতায়, যানজটে পীড়িত কলকাতার দুর্গতির এই ছবিটিকে বাঁচাবার জন্যে একটি সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণের কাজ চালু করা হয়েছে।

আগত বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা ক্রমশ: বাড়তে থাকে। শহরের সামাজিক জীবনে এ ধরণের লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি সুদূর-প্রসারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-নীতি বিভাগ শহরের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে ১৯৫৭-৫৮ সালে শহরে এ ধরণের লোকের সংখ্যা ছিল ৪৪ শতাংশ। এই হার ক্রমশ: বেড়েই চলেছে। ফলে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হিন্দি ভাষীর সংখ্যা ক্রত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শহরের পশ্চাদবর্ত্তী ভূমি এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৩ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারে। ভুটান, সিকিম এবং নেপাল ছাড়াও উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের এক বিরাট এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত। এইসব এলাকার অর্থ-নৈতিক জীবনে কলকাতা বন্দরের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ব্যাপারটা কিছু নতুন নয়। ১৮৯১ সালের আদম-শুমারের রিপোর্টেও দেখা যায় যে কল-কাতার আগত ব্যক্তিগণ কলকাতায় জন্মান নি, তাঁরা কলকাতার বাইরে থেকেই এসেছেন।

অবশ্য শহরের অর্থনীতিতে এঁদের অবদান মোটেই কম নয়—এ রাজ্যের মোট আয়ের প্রায় ৩৪ শতাংশ। রাজ্যের শ্রমিক সংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ এসেছেন রাজ্যের বাইরে থেকে।

কর্ম-সন্ধানী ছাড়াও ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কলকাতার শিল্পাঞ্চলেই কেবল পূর্ব বঙ্গ থেকে আগত আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১.৪ মিলিয়ন। এখন এঁদের অধিকাংশ থাকেন বস্তী এলাকায়, যেখানে হেক্টর প্রতি জনবসতি হোল ৬০০০। ১৯৭০ সালের একাফে (ECAFE) অঞ্চলের সামাজিক পরিস্থিতির পঞ্চম পর্যা-লোচনায় বলা হয়েছে যে, এ রাজ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ব্যক্তি রাস্তায় থাকেন। এছাড়া অন্য ব্যক্তি আছেন যাঁরা প্রতিদিন শহরের বাইরে থেকে আসেন পড়াশুনা করতে অথবা রোজগারের ধান্দায়। তাঁরা শহরের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন কিন্তু শহরের উন্নয়নের খরচ অথবা উন্নয়নের দিকে নজর দেন না।

বৈচিত্র্য

কলরব কোলাহল মুখর এই বিরাট শহরটিতে কত ঐতিহাসিক ঘটনাই না ঘটেছে। দেশের কত আমূল পরিবর্তন এখানে সাধিত হয়েছে। একদিক থেকে একে বলা যায় ক্ষুদ্র ভারত। বিভিন্ন ধরণের মানুষ, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন পরিবেশ বহু বিভিন্নতার সমাবেশ হয়েছে এই শহরটিতে। মনোরম অট্টালিকা, সজ্জিত বিপণী, মনমুগ্ধকর আলোর মালার পাশেই দেখতে পাবেন এঁদো পচা দুর্গন্ধময় স্থান যেখানে হাজার হাজার

বাড়ি কোনরকমে [illegible] কোনরে জোড়াতালি দেওয়া শুধু প্রায় বস্তিতে। সেখানে না আছে কোন জলের ব্যবস্থা, না আছে কোন শৌচাগার। অব্যবস্থার চরম!

বাসস্থান, স্কুল, ক্লিনিক, জলাধার ইত্যাদির পাশেই দেখতে পাবেন কারখানা, [illegible], চোলাইখানা। খোলা জায়গা বা সবুজ ক্ষেত্র দেখতে চাওয়া দুরাশা।

প্রতিদিন জলের প্রয়োজন ৭০০ মিলিয়ন লিটার; সে জায়গায় সরবরাহ হয় ৪৬০ মিলিয়নেরও কম। মিউনিসিপালিটি বহির্ভূত এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই বল্লেই হয়। ফলে মহামারীর প্রকোপ খুবই বেশী। গোড়ায় পয়: প্রণালীর ব্যবস্থা ছিল ৬ লক্ষ ব্যক্তির জন্য।
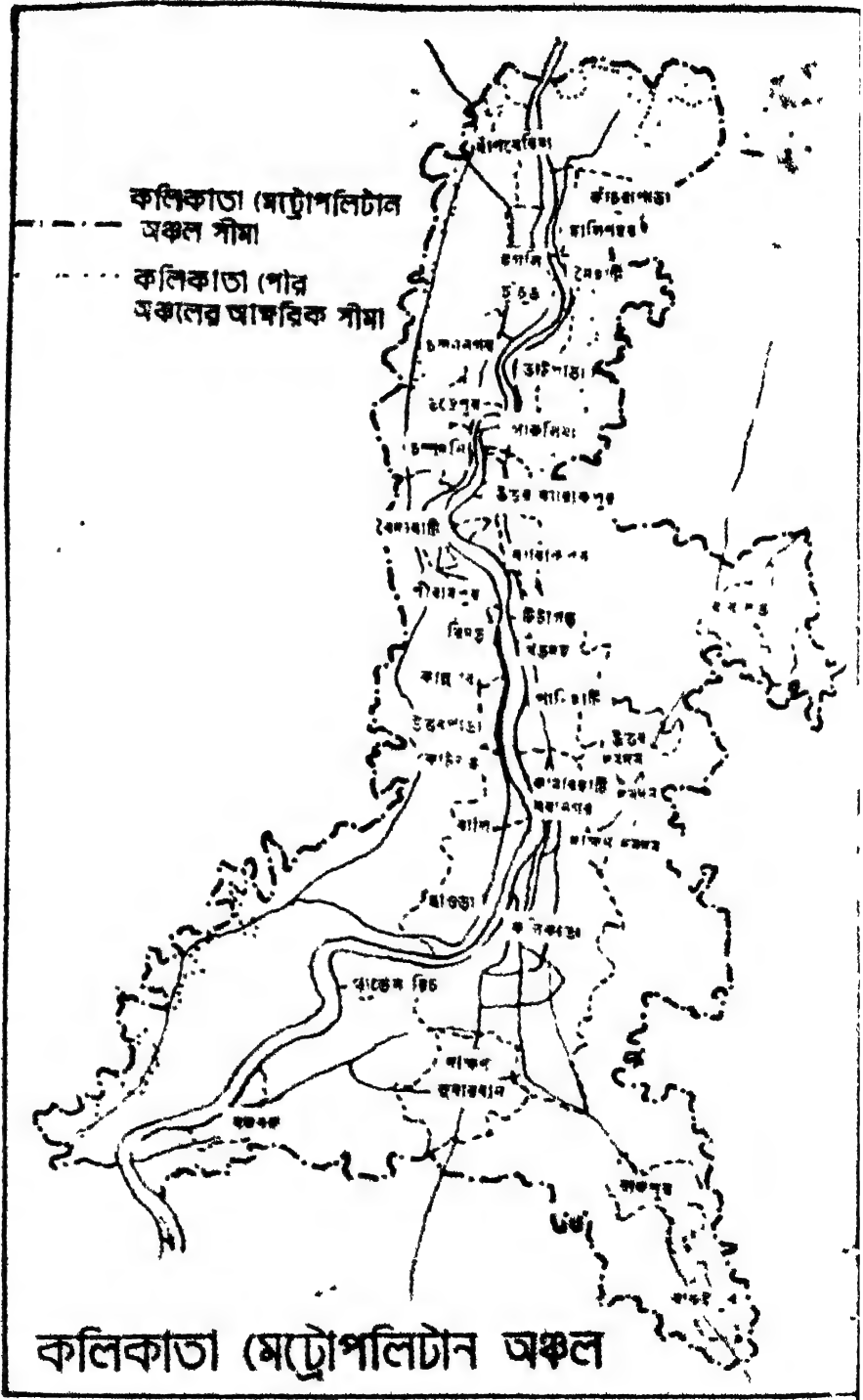
যেসব এলাকায় জল নিকাশনের ব্যবস্থা নেই অথবা যেখানে পয়:প্রণালী বহুদিন যাবৎ অবহেলিত, সেখানে সারা বর্ষায় জল জমে থাকে; ফলে যানবাহন চলাচলের অসুবিধা এবং মহামারী দেখা দেয়। আবর্জনা সরাবার জন্যে মিউনিসিপালিটির যে ব্যবস্থা রয়েছে তার দ্বারা প্রতিদিনের আবর্জনার মাত্র অর্দ্ধেক সরানো যায়। ফলে দিন দিন এই আবর্জনা জমতেই থাকে—হয় রাস্তার ওপর খোলা জায়গায়, নয় গর্তে ডোবায় অথবা বদ্ধ খালে। এতে জল কলুষিত হয় এবং শহরে মশা মাছির উপদ্রব বাড়তে থাকে। বায়ু কলুষিত হওয়াও একটি সমস্যা এবং বর্তমানের আইনের দ্বারা তার কোন সুরাহা করা যাচ্ছে না।

পরিবহন

পরিবহন ব্যবস্থা চিরকালই নড়বড়ে। হাঁটাপথগুলি দখল করে আছে ব্যবসাদারেরা। তাদের পণ্য সামগ্রীতে রাস্তা ভর্তি অথবা এখানে ওখানে একটা কোরে দোকানঘর। সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলিতে ধাক্কাধাক্কি না কোরে এগুবার জো নেই—সে রাস্তায় আহত হবার অথবা পকেট কাটা যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং পথিককে বাধ্য হয়ে পথেই নেমে পড়তে হয়। যানবাহনগুলির চলার পথ এমনিতেই সঙ্কীর্ণ তার ওপর পথচারীর ভিড়ে সেগুলির গতি আরও মন্থর হয়ে পড়ে। তার ওপরে ফুটপাতের ওপর গরু রাখার খোঁয়াড় বা ছোটখাট রান্নার ব্যবস্থা দেখতে পাওয়াও মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

বৃহত্তর কলকাতার অধিকাংশ রাস্তা সংকীর্ণ এবং বহুদিন যাবৎ সেগুলি মেরামতি হয়নি। মিউনিসিপালিটি প্রতি বছর রাস্তা মেরামতের জন্যে ব্যয় করে আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকা। তাতে ৮০০ কিলোমিটার মত পথের রক্ষণাবেক্ষণ কতটা সম্ভব? শহরের প্রধান রেল ষ্টেশন হোল দুটি—হাওড়া ও শিয়ালদা। প্রতিদিন প্রায় তিন লক্ষ যাত্রী এখান দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু এ দুটির চেহারা দেখলে দু:খও হয় কষ্টও হয়। ডেলী প্যাসেঞ্জারদের দু:খ দুর্দশার শেষ নেই। ট্রেনের দেরী, জায়গার অভাব ইত্যাদির আর উল্লেখ নাই করা হোল।

কলকাতা রাজ্য পরিবহন সংস্থা এবং ট্রাম কোম্পানী তাদের পুরোনো গাড়ীগুলোর জায়গায় নতুন গাড়ী কিনতে অথবা গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি কোরতে অক্ষম। কারণ তাদের সম্পদ অতি সামান্য, অনবরত তারা লোকসান দিয়ে যাচ্ছে, অথচ ভাড়া বাড়াবার ক্ষমতা তাদের নেই। ট্রাম বাসে লোকেরা যে কিভাবে ঝুলতে ঝুলতে যায় তা চোখে দেখলে প্রাণ আঁৎকে ওঠে। রাজনৈতিক যে কোন গণ্ডগোল শুরু হলেই সবার আগে ধরাশায়ী হয় ট্রাম বাস।

কিছুদিন আগেও শহরের নিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের জন্যে কেউই কোন রকম চিন্তাই করেন নি—না জনগণ, না পৌর প্রশাসন ব্যবস্থা। এই উন্নয়নের প্রয়োজন যে নিতান্তই জরুরী একথাও কেউ কোন দিন ভেবে দেখেন নি। বৃটিশ আমলে যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য কোরে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন, তাঁরাও শহরের উন্নয়ন অথবা শহরটিকে আধুনিক কোরে তোলার কথা কখনও চিন্তা করেন নি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল শহরের এই দুরবস্থার সুযোগ নেন, অথচ শহরের শোচনীয় দুরবস্থা দূর করার কথা ভেবে দেখার সময় তাদের আর হয়নি।

এই পটভূমিকায় যদি আমরা ভেবে থাকি যে এইভাবেই কলকাতা ১৯৮০ দশকের সম্মুখীন হতে পারবে, সেটা হবে সম্পূর্ণ অলীক চিন্তা। কারণ সেই সময় জন সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

কলকাতার সমস্যা বহুদিন যাবৎ কেবল জাতীয় সমস্যা নয় আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে রয়েছে। ১৯৬০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি পরামর্শদাতা দল কলকাতা পরিদর্শন করে। অবিলম্বে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, পয়: প্রণালী ও জল নিকাশন ব্যবস্থা এবং রাস্তা ঘাটের উন্নয়নের জন্যে এই দল সুপারিশ করে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কয়েকটি পরিকল্পনা অনুমোদন করে যার দ্বারা পরবর্তী ৩০ বছরের মধ্যে আনুমানিক ১৪ মিলিয়ন বাসিন্দার জন্যে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে এবং শহরের আবর্জনা সন্তোষজনকভাবে সাফ করা যাবে।

১৯৬০ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্ক মিশন কলকাতা পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেয় যে, কলকাতার শহরাঞ্চল উন্নয়নের সমস্যা বহুদিন যাবৎ অবহেলিত হওয়ায় এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। মিশন সুপারিশ করে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সরাসরিভাবে সমস্ত দায় দায়িত্ব এবং আর্থিক বোঝা বহন করা। কারণ কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের এমন শক্তি বা আর্থিক সামর্থ নেই যে শহরের এই দারুণ সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়।

১৯৬১ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বৃহত্তর কলকাতা পরিকল্পনা সংস্থা (CMPO) স্থাপন করে এই মহানগরের নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা ও উন্নয়নের

উদ্দেশ্যে। বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্যে এই সংস্থা ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় ১৯৬৬ সালে এক ব্যাপক ও সুসংবদ্ধ 'মাষ্টার প্ল্যান' প্রণয়ন করে। ১৯৬২ সালে সরকার একটি নগর ও পল্লী পরিকল্পনা বিভাগও স্থাপন করে এবং শহরের শিল্প বনিয়াদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন করপোরেশন গঠন করে।

কেন্দ্রীয় সরকারও কলকাতার সমস্যাটি জাতীয় সমস্যা রূপে গ্রহণ করে শহরের উন্নয়নের জন্যে চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। ১৯৬৯ সালে পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭০ সালের ১৬ই জুলাই এক রাষ্ট্রপতির আইন অনুসারে বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা স্থাপন করে। এই সংস্থার কাজ হোল কতকগুলি বিশেষ সমস্যা যেমন, পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল সরবরাহ, পয়ঃ প্রণালী ও জল নিকাশনের ব্যবস্থা, বস্তিবাসীদের থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা, যানবাহন চলাচল সহজতর করা ইত্যাদি কাজে সংহতি সাধন এবং এই কাজ জোরদার করা। চতুর্থ পরিকল্পনা-কালে ব্যয়ের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ৪৩ কোটি টাকা সমেত প্রায় ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক সম্পদের প্রধান উৎসগুলি হোল—কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী, রাজ্য সরকারের বরাদ্দ, জনগণের কাছ থেকে এবং অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে গৃহীত ঋণ। এ ছাড়া আছে সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত চুঙ্গি কর হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ।

বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নের জন্যে যে ২৫টি শিল্প বনিয়াদ উন্নয়নের প্রকল্প রয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলি অনুমোদন লাভ করেছে এবং সেগুলির জন্যে কিছু কিছু অর্থ বরাদ্দও হয়েছে। বিশুদ্ধ জল সরবরাহের জন্যে ৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ২০টি প্রকল্প আছে; জল নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্যে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৪টি প্রকল্প রয়েছে এবং যানবাহন ও চলাচলের সুবিধার জন্যে ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে কতকগুলি প্রকল্প আছে।

বৃহত্তর কলকাতার আশে পাশে যাতায়াতের সুবিধার জন্যে ভারতীয় রেল পথের কয়েকটি পরিকল্পনা আছে যাতে সহর যাত্রীদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এর মধ্যে আছে ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সুবরবন ডিসপারসাল

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কর্মচঞ্চল হাওড়ার পথ ঘাট উন্নতির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।
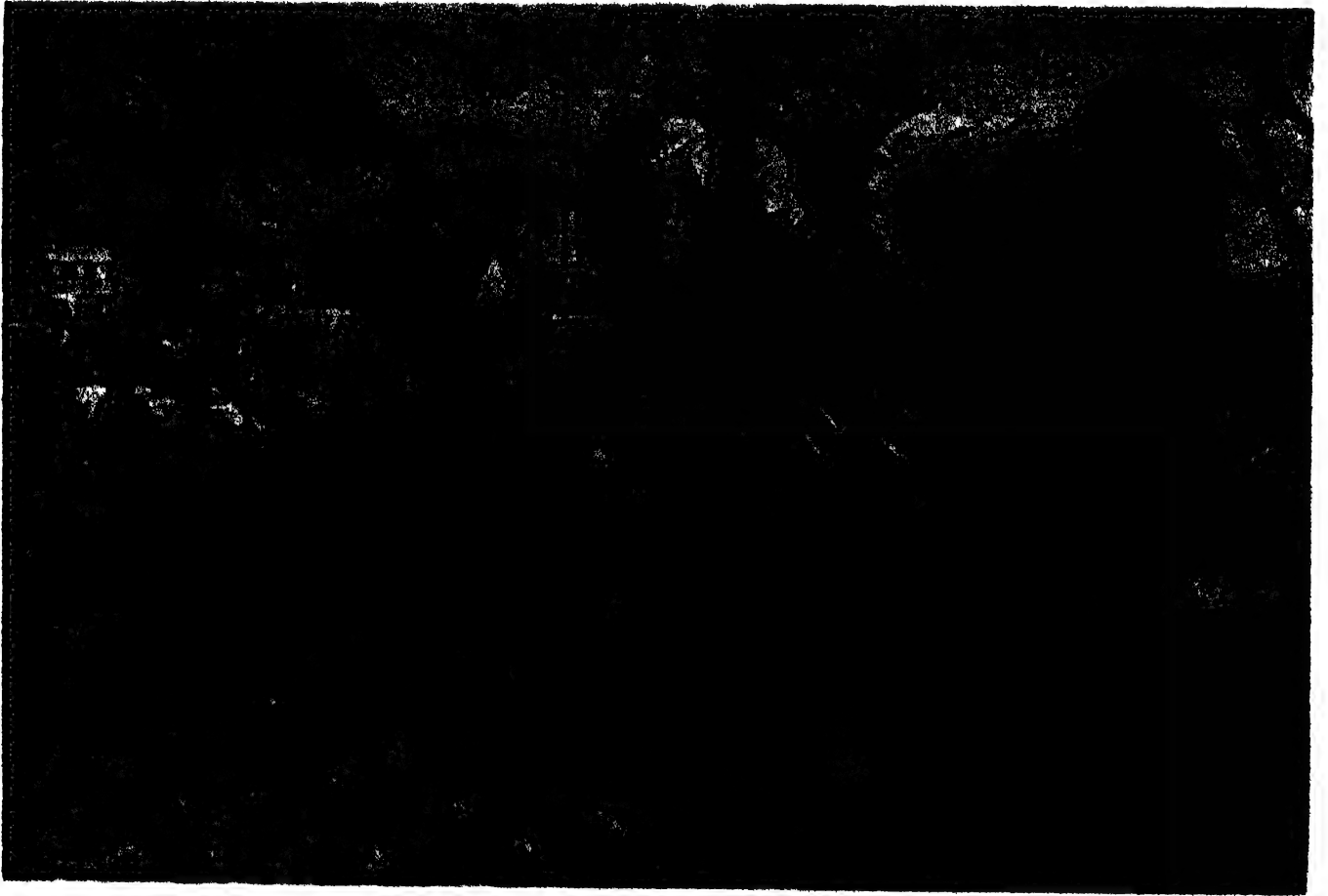
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়

ডঃ নীল রতন সেন

জন্ম : লাভপুর, বীরভূম ; ২৩ জুলাই, ১৮৯৮ । মৃত্যু, কলকাতা ; ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ । প্রথম প্রকাশিত বই : ত্রিপত্র, কবিতাগ্রন্থ, ১৯২৭ । উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ : জলসা ঘর : ছোটগল্প-১৯৩৭, ধাত্রী দেবতা : উপন্যাস-১৯৪০, কালিন্দী : উপন্যাস ১৯৪০, কবি : উপন্যাস-১৯৪১, দুইপুরুষ : নাটক-১৯৪২, পঞ্চগ্রাম : উপন্যাস-১৯৪৩, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : উপন্যাস-১৯৪৭, নাগিনী কন্যার কাহিনী : উপন্যাস-১৯৫২, আরোগ্য নিকেতন : উপন্যাস-১৯৫২, সপ্তপদী : উপন্যাস-১৯৫৭, রাধা : উপন্যাস-১৯৫৮, মহাশ্বেতা : উপন্যাস-১৯৬০, যোগভ্রষ্ট : উপন্যাস-১৯৬০ ॥ প্রাপ্ত সম্মান : রবীন্দ্র পুরস্কার ১৯৫৫, সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার ১৯৫৬, তাসখন্দে ভারতীয় সাহিত্য প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব ১৯৫৭, নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের সভাপতিত্ব ১৯৫৯, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব ১৯৬৬, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ১৯৬৭ ।

তিয়াত্তর বছরের পরিণত বার্ধক্যে তারাশঙ্কর বিদায় নিলেন। কয়েক বছর ধরেই ব্যক্তিগত আলোচনায়, আত্মস্মৃতিধর্মী নানা রচনায় এই বিদায় পর্বের প্রস্তুতি চলছিল। আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কা কারণে অকারণে বারবার তাঁর পাঠকদের সচকিত করছিল। এবারে সেই নির্মম মুহূর্তটিকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেলনা। বিশ বছরের উপর তিনি বাংলার সাহিত্য সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। এবারে সেই আসনটি শূন্য হল। এই অভাববোধ ইতিপূর্বেও ঘটেছে। শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা শরৎচন্দ্রের শূন্যস্থান পূরণ হয়নি। ঘরে বাইরে নানা অঘটন অবিচারে যে দৃঢ় প্রত্যয়বোধের কণ্ঠটি দুর্দিন আসেও শোনা গেছে, সে কণ্ঠ এবার চিরদিনের জন্যই নীরব হল।

কিন্তু শিল্পীর কণ্ঠ তো নীরব হবনা। তিন বছর আগেও এই রাজধানীতে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার নিতে এসে তারাশঙ্কর তাঁর গণদেবতার যে মূর্তি শ্রোতৃবর্গের মনে এঁকে রেখে গেছেন সে মূর্তি কখনোই ম্লান হবার নয়। লক্ষকোটি অর্ধশিক্ষিত গাঁয়ের মানুষের সংস্কারবোধে, ধর্মবোধে বা ন্যায়নীতির আদর্শের বোধে যে ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর শিল্পে, গল্প উপন্যাস নাটকের চরিত্রাবলীতে তার ভাস্বর মূর্তিটি ধরা পড়েছে। জীবনশিল্পী তারাশঙ্করের বিচিত্র শিল্পকর্মের মধ্যেই আরও দীর্ঘকাল তাঁর সরব কণ্ঠটি শোনা যাবে।

একদিক থেকে দেখতে গেলে তারাশঙ্করের শিল্পজগত খুবই সীমাবদ্ধ। মুখ্যতঃ রুক্ষ্ম কাঁকুরে লালমাটির দেশ রাঢ়-বাংলাকে তিনি তার বিচরণের ক্ষেত্র রূপে বেছে নিয়েছিলেন। সেই দেশেরই মানুষ তিনি, সারাজীবন তাদের সুখদুঃখের সঙ্গী হয়ে সমাজকর্মী হিসাবে তাদেরই মধ্যে কাটিয়েছেন। সুতরাং এ অঞ্চলের সমাজের নানাস্তরের মানুষকে তিনি দেখেছেন,—তাদের জীবনবোধ, প্রবৃত্তি, হিংসা, রূঢ়তা, প্রেম-ঘৃণা-বেদনা, তাদের ধর্মচেতনা ও দেশপ্রীতি—বিচিত্র অনুভূতির রসে আলোড়িত মানুষগুলির তিনি জীবনচর্যার অংশীদার হয়েছেন। তাই তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়তে বসে একদিকে যেমন রাঢ়-বাংলার আঞ্চলিকটুকু উপভোগ করা যায়, অপরদিকে তেমনি চিরন্তন মানবমনের নানা সংস্কার, প্রবৃত্তি ও প্রত্যয়বোধের এক গভীরতর আলোড়নও প্রত্যক্ষ করা যায়।

গাঁয়ের ছেলে তারাশঙ্কর নাকি ভাল অভিনয় করতে পারতেন। নাটক লেখায় তাঁর সহজাত দক্ষতার পরিচয় কবি, কালিন্দী, দুইপুরুষ, বিংশ-শতাব্দী প্রভৃতি জনপ্রিয় নাটকগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। এই নট ও নাট্যকার সুলভ নিরপেক্ষতা তাঁর গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলিকেও বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এক সংযত নিরপেক্ষতার বোধ নিয়ে তিনি তাঁর পাত্র-পাত্রীদের গড়ে তোলেন, ঘটনার আবর্তে তারা ধীরে ধীরে মূর্তিমান হয়ে ওঠে, তারপর আপনা থেকেই অনিবার্য ঘটনার স্রোতে পরিণতির মুখে এগিয়ে চলে। লেখকও সেখানে আমাদেরই মত নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র। এক সুকঠিন নিস্পৃহতার বোধ চরিত্রগুলিকে যেন রক্তমাংসের বাস্তবতা এনে দেয়। এই অতিমাত্রায় বাস্তব মানুষগুলি যখন প্রবৃত্তির হাতের ক্রীড়নক হয়ে ঘটনার প্রেক্ষাপটে দেখা দেয় আমরা তাদের মধ্যে যেন ট্রাজিক্যালিক চিরন্তন নরনারীকেই বিচিত্র ঘটনাজালে আবদ্ধ হয়ে ছটফট করতে দেখি। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর আঘাতে তাদের পতন যেন গ্রীকের পতনের মতই সমগ্র সমাজদেহে এক ধ্বংসকারী

শিল্পরূপ এনে দেয়। এমনভাবে মানবের পূর্ণ ভাবমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করা এবং তাকে নানা বিপর্যয়ের মধ্যে প্রস্তর কঠিন শিল্পমূর্তিকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে এক নিস্পৃহ নিরপেক্ষ শিল্পী মানস কাজ করেছে। জানিনা, সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে যে শিল্পী কলমের আঁচড়ে ছবি এঁকে চলেছিলেন, শেষ কয়েকটি বছরে রঙ ও রেখায় চিত্রপটে তারই প্রতিফলনে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন কিনা। পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য করবেন, তারাশঙ্কর স্বভাবে চিত্রশিল্পী। বর্ণনায় বলিষ্ঠ রেখাঙ্কনে তাই তাঁর চরিত্রগুলি যেন ভাস্কর মূর্তি হয়ে উঠতে চায়। এখানেই তিনি বঙ্কিমের উত্তরসূরী, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র মেজাজের শিল্পী।

একদিকে দুর্নিবার প্রবৃত্তির আবেগ অপরদিকে অপ্রতিরোধ্য নিয়তির আকর্ষণ—এই উভয়ের হাতে লাঞ্ছিত মানবাত্মার অসহায়ত্বের ছবি তারাশঙ্করের সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য। 'দেবতার ব্যাধি'র ভক্তর ঘোষাল বা 'অগ্রদানী'র পূর্ণ চক্রবর্তী এই শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। আদর্শে, প্রেমে, কর্তব্যবোধে যে মানুষ পূর্ণ হয়ে উঠতে চায় নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি, অথবা অদৃশ্য নিয়তি বার বার তাকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। এই মহিমান্বিত মানব ট্র্যাজেডীবোধ তারাশঙ্করের শিল্পকে স্থায়িত্ব দান করেছে।

তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসেই আঞ্চলিক বিভিন্ন বিচিত্র জীবিকার নরনারীর শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য চমৎকার ফুটেছে দেখতে পাওয়া যায়। বেদে, বাজিকর, ময়িয়াল, মাঝি, কৃষক, পড়ন্ত জমিদার, নতুন শিল্পমালিক, শ্রমিক, ভিক্ষুক, চিকিৎসক, আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক—অসংখ্য মানুষের সমারোহ। যে অমোঘ নিয়তির বাঁধনে তারা বাঁধা পড়েছে তার থেকেই জীবনট্র্যাজেডীর উদ্ভব। তিনি যখন নাগিনী কন্যাকে আঁকেন সর্পিনীর প্রেরণা-র্ধর্ব কেহ যৌবন পর্যন্ত তার সত্তাকে সঞ্চারিত করে দেন। যেখানে কবিতার নতুন ডাক্তারের আদর্শগত বিরোধের চিত্রটি আঁকেন সেখানে উভয়ের সংস্কারবোধ ও যুক্তিবোধ যেন পূর্ণ ভাবমূর্তিতে ফুটে ওঠে। এই অধিকাংশ চরিত্রচিত্রে লেখকের পাকা অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। বোধহয় সে জন্যেই তারাশঙ্করের সৃষ্ট নরনারী এত প্রত্যক্ষ বলিষ্ঠ জীবনবোধে প্রভাবিত, অসামান্য,—আবার একাগ্রভাবেই স্বাভাবিক।

তারাশঙ্কর সমকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁর কাহিনীগুলি স্থাপন করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তখন ভেঙে পড়ছে, নতুন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা আসর জাঁকিয়ে বসছেন। এক মুগ্ধ বেদনার অতীতস্মৃতি-চারী দৃষ্টিতে লেখক সেই বিলীয়মান আভিজাত্যের গৌরব এবং নব্য ধনতন্ত্রের সঙ্কীর্ণতা প্রত্যক্ষ করেছেন। সমকালীন রাজনীতির আবহাওয়াও তাঁর উপন্যাস নাটকে এক নতুন আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা করেছে। ধাত্রী দেবতা-গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম ত্রয়ী উপন্যাসে দেশপ্রীতির এই আবহ পাঠক লক্ষ্য করবেন। দুইপুরুষ নাটকে নব্য ধনিকের শোষণের বিরুদ্ধে আদর্শবাদীর বিদ্রোহ কিছুটা রোমান্টিক আবহাওয়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন। মনে আছে ২৫/৩০ বৎসর পূর্বেকার পরাধীন বাংলার নব্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ যুবক-যুবতীরা কি উদ্দীপনার সঙ্গে এই নাটকটি তখন শহরে পল্লীতে অভিনয় করতেন। কালিন্দীতে পুরোনো জমিদারীর আভিজাত্য বিলীয়মান, নতুন শিল্পতন্ত্রের অজগর ক্ষুধা সরল পল্লীর মানুষগুলিকে গ্রাস করতে উদ্যত। আরোগ্য নিকেতনে পুরোনো ও নতুন চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব। হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় গাঁয়ের নীচতলার মানুষের যুগ-ভাঙার কলধ্বনি। এরই মাঝে মাঝে কিছুটা অপরিচয়ের রহস্যালোকের সঞ্চারী ছবি এঁকেছেন কবি, নাগিনী কন্যার কাহিনী জাতীয় গল্পে। এদের লেখক বাইরে থেকেই দেখেছেন, তাইই রোমান্স যেন ভাবমূর্তি লাভ করেছে।

রুক্ষ মাটির কঠিনতায় রাঢ়-বাংলার কঙ্করাকীর্ণ রক্তিমাঞ্চলটি যেন এক রুক্ষ তপশ্চর্যার আবহাওয়া গড়ে তুলেছে। সেই তপস্যায় যেদিন সরসতার ধারা নেমে আসে তার সর্বধ্বংসী রুদ্ররূপও কম ভয়াবহ নহে।—এসব সত্ত্বেও রাঢ়ের জমি উর্বরা—মানুষগুলির অন্নের অভাব ঘটেনা। জীবনেও আনন্দ রসের বৈচিত্র্য কিছু কম নেই। এখানকার মানুষগুলি তাই কিছুটা বিচিত্র,—কোমলে কঠোরে রহস্যময়। তার মধ্যেই তাদের ধ্যানের রুদ্রদেবতার প্রতিষ্ঠা। তারাশঙ্করের শিল্পদৃষ্টিতে এই আপাত কঠোর ধরিত্রীর রুক্ষ সন্তানদের প্রাণের সরসতা ধরা পড়েছে। কঠিন ইক্ষুর অন্তরে যে মিষ্টরস রয়েছে তিনি তাকে আবিষ্কার করেছেন।—এই কাঠিন্যের আবরণ ভেঙে সেই সরসতার উৎসটি টেনে বার করেছেন। সে কারণেই তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে আপাতভাবে যে ভাষায় একটি কঠিন আবরণ লক্ষ্য করা যায়, কিছুটা চড়াই উতরাই ভাঙবার পর তার অন্তরালে মূল রসের উৎসে পৌছান সম্ভবপর হয়। তখন আর বুঝতে কষ্ট হয়না যে এই আপাত কঠিন আবরণের সাহায্যে তিনি একটি বাস্তব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাই সেখানে বর্ণনার গতিও যেন অনেকটা শ্লথ হয়ে পড়েছে। পূর্ণ আবহটি গড়ে উঠবার পর পাঠক একবার তার অন্তরে প্রবেশ করলে এক অসীম রস নিবিড়তায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। তখন আর ভাষার দার্ঢ্য বা বর্ণনার স্তিমিত গতি অনুভব করা যায়না।

ব্যক্তি তারাশঙ্করকে যাঁরা চিনতেন প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন, তাঁর ভিতো-

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

উন্নয়নে উপেক্ষিতা

লতিকা চক্রবর্তী

১৯৭১ খৃষ্টাব্দের জন গণনার কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ইহার প্রাথমিক প্রতিবেদনে পশ্চিমবঙ্গের যে চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে, তা নৈরাশ্যব্যঞ্জক হলেও এ রাজ্যের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ আশার আলো লক্ষ্য করা যায়। এ রাজ্যে গত দশ বছরে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৮৯% হারে আর সেই তুলনায় ৩০.১৯% হারে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে।

কিন্তু 'এহ বাহ্য:'। নারী প্রগতির এই উজ্জ্বল পটাবরণের অন্তরালে যে একটা অন্ধকার দিক রয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

জন সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের চতুর্থতম রাজ্য। পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান লোক সংখ্যা ৩৪,৪৪০,০১৫ জন। এই বিরাট জন সংখ্যার প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ৮৯২ জন মহিলা। যে রাজ্যে পুরুষ অপেক্ষা মহিলার সংখ্যা বেশী, সেখানে রাজ্যের যে কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে মহিলারা যাতে অংশ গ্রহণের অবাধ সুযোগ পান এবং তাঁরাও যাতে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে অংশ গ্রহণে উন্মুখ হন, সে দিকে লক্ষ্য রেখে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ যদি এ সম্পর্কে উদাসীন থাকে, তাহলে দেশের প্রত্যাশিত উন্নতি ব্যাহত হতে বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যসূচী নিয়ে সামান্য আলোচনা করে বক্তব্য বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা যাক।

এ কথা সকলেরই জানা আছে যে পশ্চিমবঙ্গের মোট জন সমষ্টির গরিষ্ঠতম অংশ বাস করে গ্রামে। গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। সমাজ উন্নয়ন পরি-কল্পনার বিভিন্ন কার্যসূচীতে গ্রামবাসী যাতে সক্রিয় ভাবে অংশ নিতে পারে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়নের দায়িত্ব ও ক্ষমতা গ্রামবাসীর উপর প্রত্যক্ষ ভাবে অর্পণ করার উদ্দেশ্যেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গ্রাম সভা ও পঞ্চায়েত। মহিলারা যাতে পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার জন্য উৎসুক হন এবং পঞ্চায়েতের কাজ কর্মে সক্রিয় ভাবে যুক্ত থাকেন, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবার জন্য রাজ্যে একজন মহিলা পঞ্চায়েত অধিকারিকও আছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কি সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কি গ্রাম পঞ্চায়েত সর্বত্রই মহিলাদের ভূমিকা খুবই নগণ্য। এর কারণ হিসাবে নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা যায়, কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির অক্ষমতাই যে এর প্রধানতম কারণ, সে কথা অস্বীকার করে কোন লাভ নাই।

ধরা যাক, কৃষির উন্নতির জন্য কোন নূতন কৃষি প্রণালী প্রবর্তনের জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ সচেষ্ট এবং সে জন্য কৃষকদের ক্ষেতে Result Demonstration, Method demonstration থেকে আরম্ভ করে প্রচার পত্র ও প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচার মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে চাষীদের যে সবকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু একটু খোলা মন খোলা চোখ নিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে এইসব প্রচার ব্যবস্থা মূলতঃ পুরুষদের জন্য। কৃষি-কাজে কি একা পুরুষরাই অংশ গ্রহণ করে? এক্ষেত্রে মেয়েদেরও যে একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে, সে কথা ভুলে গেলে তো চলবে না। কোন নূতন কৃষি-প্রণালী গ্রহণ, কি উন্নত জাতের কোন নূতন বীজ বপনে চাষীর মনে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। কখন কখন সে নূতন কোন কিছু গ্রহণে আদৌ রাজী নয়। কখনও বা হয়ত সে নূতন কোন কৃষি-প্রণালী অবলম্বন করে; কিন্তু তার জন্য দীর্ঘ সময়ের মানসিক অস্তর্দ্বন্দ্ব ভুগতে দিতে হয়। গ্রহণ বা বর্জন যে সিদ্ধান্তই সে নিক না কেন, তার দায় দায়িত্ব তার একার। এখন চাষীর ঘরণীর যদি একথা জানা থেকে যে এই নূতন প্রণালী অনুযায়ী চাষ করলে, কি এই নূতন বীজ বপন করলে 'সোনা ফসল' ফলবে, আর তার ফলে তার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হয়ে উঠবে পরিপূর্ণ, তাহলে সে নিজেই নূতন মতে নূতন পথে চলবার জন্য স্বামীকে প্রেরণা দেবে।

আবার ধরুণ, সয়াবীন চাষের কথা। দুধের অভাবে আমাদের দেশের শিশুরা আজ রুগ্ন ও দুর্বল। গো-দুগ্ধের বিকল্প হিসাবে শিশুদের সয়াবীনের দুধ খাওয়াতে পারলে শিশু-পুষ্টির এই সমস্যার সহজ সমাধান হয়। তাই সয়াবীনের চাষ ও সয়াবীনের দুধ খাওয়ার জন্য দেশবাসীকে উৎসাহিত করা হয়। কি ভাবে সয়াবীনের দুধ ও দুগ্ধ জাত দ্রব্য সামগ্রী তৈরী করা যায়, সে সম্পর্কে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক আয়োজনের তুলনায় মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এমনই তুচ্ছ যে এ বিষয়ে আশানুরূপ উৎসাহ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ব্লকের নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রাম থেকে গুটিকয়েক মহিলাকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে এসে এক দিন কি দু'দিনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তা প্রশিক্ষণের পরিবর্তে প্রহসনে পরিণত হয়। অথচ সয়াবীনের দুগ্ধ সম্পর্কে গ্রামের মেয়ে-দের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারলে

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

কাঠের গুঁড়োর নতুন ভূমিকা

আলোক সেন

আমরা বহু জিনিসকেই অপ্রয়োজনীয় মনে করে নষ্ট করি। অনেক সময় আবার সেগুলি ব্যবহার করলেও উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করি না। সেও আর এক রকমের অপচয়। এমনি এক ধরণের অপচয় হয় কাঠের গুঁড়োর ক্ষেত্রে। বরফ সংরক্ষণ কিম্বা এ ধরণের কিছু কিছু কাজে কাঠের গুঁড়োর ব্যবহার হলেও, অনেক সময় দেখা যায় বিপুল পরিমাণ কাঠের গুঁড়ো জ্বালানী হিসাবে বা অন্য ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জ্বালানী হিসাবে কাঠের গুঁড়োর উপ-যোগিতা এমন বেশী নয়। তাই এ ধরণের ব্যবহারকে প্রকৃতপক্ষে অপচয়ই বলা চলে।

কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে কাঠের গুঁড়োর মর্যাদা অনেক বেড়েছে। কৃষি ও পশু পালনের ক্ষেত্রে কাঠের গুঁড়ো ও কাঠের পরিত্যক্ত অংশ ব্যবহার করে প্রভূত ফল পাওয়ায় এখন নানাভাবে এর ব্যবহার হয়ে চলেছে। সার হিসাবে কাঠের গুঁড়ো একটি বিশিষ্ট স্থান পেতে পারে। কাঠের গুঁড়োতে আছে ০.২৪% নাইট্রোজেন, ০.২০% ফসফরাস যৌগ (P_2O_5) এবং ০.৪৫% পটাস যৌগ (K_2O) সুতরাং উদ্ভিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব খাদ্যই (NPK) কাঠের গুঁড়ো যোগাতে পারে। কাঠের ছাইও উদ্ভিদের খাদ্য পূরণে বিরাট দায়িত্ব পালন করতে পারে। কেননা ছাই-এ ও পটাসের পরিমাণ কম থাকে না।

জৈব উপাদান

কাঠের গুঁড়োতে জৈব উপাদান হিসাবে আছে সেলুলোজ লিগনিন, প্রভৃতি পদার্থ। উদ্ভিদের পক্ষে ট্যানিন, রেজিন টারপেনটাইন প্রভৃতি পদার্থগুলি বিষের মত ক্ষতিকর। কাঠের গুঁড়োতে এগুলির পরি-মাণ খুব কম হওয়ায় উদ্ভিদের পক্ষে সহা-য়ক হতে পারে। এছাড়া কাঠের গুঁড়োতে অ্যাসিডের মাত্রাও যথেষ্ট কম। তাই সেদিক থেকেও উদ্ভিদের খাদ্য পূরণে কোন সৃষ্টি হয় না। তবে একটি অসু-বিধা হ'ল এই যে পচনের সময়ে অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের সহযোগিতা না পেলে কাঠের গুঁড়োর সারে উদ্ভিদ উপযুক্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন থেকে বঞ্চিত হয়। তবে এই অসুবিধা দূর করাও খুব কষ্টকর নয়। কম্পোষ্ট সার তৈরীর সময় কাঠের গুঁড়োর সঙ্গে কিছু কাঁচা ঘাস পাতা, তরি-তরকারীর খোসা এবং কিছু রাসায়নিক নাইট্রোজেন, চুন ও ফসফেট যোগ করে দিলে, এই নতুন ধরণের কম্পোষ্ট সারের খাদ্যমান বহু গুণ বেড়ে যাবে। উদ্ভিদের পক্ষে খাদ্য আত্মীকরণ খুব সহজেই সম্ভব হবে।

সার হিসাবে মানুষের মূত্রের মূল্য কম নয়। তবে সরাসরি এর ব্যবহার বিপদ-জনক। শহরাঞ্চলের প্রস্রাবাগারগুলিতে যে ট্যাঙ্কে মূত্র জমা করা হয় সেখানে কাঠের গুঁড়ো ঢেলে দিলে মূত্র সহজেই শোষিত হবে। এই শোষিত ভিজা কাঠের গুঁড়োকে রোদে শুকিয়ে পরে জমিতে ব্যবহার করা অত্যন্ত নিরাপদ ও নির্ভর-যোগ্য। মানুষের মূত্রে নির্গত নাইট্রোজেন যৌগ সূর্যালোকে ও তাপে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদের নাইট্রোজেন পূরণে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে ওঠে।

উদ্ভিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যোপা-দানের হিসাবে নানা ধরণের জৈব খনিজ সার প্রয়োজন হয়। অথচ সহজে ও সস্তায় সেগুলি সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এই অসুবিধাটি সহজেই দূর করা যায়। অ্যামোনিয়াম, সালফেট, ইউরিয়া প্রভৃতি প্রচলিত সারগুলি গাছ ও ফল ক্ষরণে কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে পরে সেগুলিকে রোদে শুকিয়ে নিয়ে জমিতে ব্যবহার করলে উদ্ভিদের প্রয়োজন মিটবে অনায়াসে।

অ্যামোনিয়াম সালফেটের দানাগুলি সহজেই জমাট বেঁধে যায়। এতে জমিতে সার প্রয়োগে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এই অসুবিধা সহজেই দূর করতে পারে কাঠের গুঁড়ো। শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ কাঠের গুঁড়ো অ্যামোনিয়া সারের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে জমাট বাঁধতে পারে না।

সব্জি বাগানে সার

ফুল ও ফল চাষের ক্ষেত্রে জমিতে অল্প পরিমাণে কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। মাটির ওপরে একটি আবরণ-সৃষ্টি করার ফলে আগাছা জন্মাতে পারে না। এছাড়া জল ধারণ, তাপ মাত্রার সমতা রক্ষা এবং নিজস্ব ক্রমিক পচনের ফলে ফুল ও ফল চাষে উন্নত ফলন হায় দেখা যায়। তবে সার হিসাবে এর সহযোগিতা পেতে হলে কাঠের গুঁড়োর সঙ্গে কিছু রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারও মিশিয়ে দেওয়া দরকার।

কৃষির সঙ্গে সঙ্গে পশু পালনের ক্ষেত্রে কাঠের গুঁড়োর যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। হাঁস মুরগীর আস্তানায় বেশ পুরু করে কাঠের গুঁড়ো বিছিয়ে দিলে তাপের সমতা রক্ষা হওয়ায় এবং মেঝে শুষ্ক থাকায় ভাল ফল পাওয়া যায়। গরু, মোষ বা ছাগলের গোয়ালের মেঝেতেও প্রতিদিন কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া ভাল। পশু-মূত্র কাঠের গুঁড়োয় শোষিত হওয়ায় গোয়াল ঘর বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।

"র‍্যামী"—বস্ত্র শিল্পে এক নবীনতম সংযোজন

বর্তমানে পশ্চিম বাঙলায় মাত্র ৩৮টি কাপড়ের কল আছে। এইগুলি নিজ রাজ্যের মোট চাহিদার মাত্র এক পঞ্চমাংশ পূরণ করে। কলগুলিকে কাঁচা মাল তুলো দূর থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় ও উৎপাদন ব্যয় বেশী হয়। তুলার অভাব দূর করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫০০০ একর জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ করছেন এবং জানা যাচ্ছে যে পরীক্ষা সফল হয়েছে। আশা করা যায় যে আরও বেশী জমিতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ সফল হবে।

পূর্ব বাঙলা থেকে অনেক দক্ষ তাঁতী পশ্চিম বাঙলায় চলে আসায় তাঁতের উৎপাদন বেশ কিছুটা বেড়েছে। পশ্চিম বাঙলা সরকার তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করছেন।

রেশম শিল্পেও চাষেরই প্রাধান্য। গুটি পোকার জন্য তুঁত গাছের চাষ করতে হয়। পশ্চিম বাঙলায় প্রচলিত প্রথায় গুটিপোকা পালনের ফলে শতকরা ৪০।৫০ ভাগ ডিম নষ্ট হয়। চৌকি প্রথায় গুটি পোকার চাষ করলে অনেক বেশী ডিম বাঁচে, খরচও কম হয়। জাপানী ও দেশী গুটি পোকার মিশ্রণে ভাল রেশম কীট পাওয়া যায় ও তাতে ভাল রেশম উৎপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রেও পশ্চিম বাঙলা সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন।

পশ্চিম বাঙলা সরকারের চেষ্টা নিকট ভবিষ্যতে বাঙলায় কার্পাস ও রেশম বস্ত্র শিল্প সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বলে আশা হলেও, বর্তমানের টেরিলিন, টেরিকটনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে কিনা সন্দেহ। কারণ কার্পাস ও রেশম বস্ত্র অপেক্ষা টেরিলিন টেরিকটন টেকসই ও বিনা ইস্ত্রিতে ব্যবহার করা চলে। মনে হয় এ ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙলার বস্ত্র শিল্পকে সাহায্য করতে পারে উত্তর বাঙলার সুবিখ্যাত ফসল—র‍্যামী। সরকার এদিকে লক্ষ্য দিলে বাঙলায় বস্ত্র শিল্পের যেমন একদিক উন্নতি ঘোচতে পারে, তেমনই শিল্পের ক্ষেত্রে অনগ্রসর উত্তর বাঙলার অর্থনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেবে।

মন্দিরা আচার্য

বর্তমানে টেরিলিন টেরিকটনের বাজারে র‍্যামী সুতোর প্রস্তুত বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। প্রথমত র‍্যামী চাষ সহজ এবং চাষের ব্যয় খুবই কম। ফলে র‍্যামী সুতোর বোনা কাপড়ের মূল্য টেরিলিন, টেরিকটন বা অন্য যে কোন মূল্যবান বস্ত্র অপেক্ষা কম হবে। দ্বিতীয়ত, মূল্য কম হ'লেও ঐ সব মূল্যবান বস্ত্রের মতই র‍্যামী বস্ত্র টেকসই হবে।

র‍্যামী এক রকম পাট বা শন জাতীয় গাছ। এর আঁশ থেকে টেকসই সূক্ষ্ম সুতো প্রস্তুত করা যায়। উত্তর বাঙলার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় চাষীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য কিছুটা র‍্যামীর চাষ করে। কোচবিহারের স্থানীয় লোকদের কাছে র‍্যামী "কুদকুরা" নামে পরিচিত। জলপাইগুড়ির স্থানীয় লোকেরা র‍্যামীকে জানে "খীরা" বলে।

এই দুই জেলায় চাষীরা অবশ্য র‍্যামীর চাষ করে এর থেকে কাপড় বোনার জন্য নয়। তারা র‍্যামীর শক্ত অংশ থেকে সুতো তৈরী করে মাছ ধরার জাল বোনার ও পাখী ধরার ফাঁদ তৈরী করার জন্য।

র‍্যামী পাট জাতীয় গাছ হলেও চাষের দিক থেকে র‍্যামী চাষ অনেক সুবিধাজনক। পাট চাষের জন্য নিচু ও উর্বর জমির দরকার। অপর পক্ষে র‍্যামী ডাঙা জমিতে চাষ করা চলে। পাটের মত প্রতি বছর র‍্যামীর চাষ করা দরকার হয় না। র‍্যামী একবার বুনলে দশ থেকে বারো বছর পর্যন্ত তার থেকে ফসল পাওয়া যায়। র‍্যামী গাছে ডাল পালা হয়। সেই ডাল কেটে তার আঁশ থেকে সুতো তৈরী হয়। ডাল বছরে তিন চার বার কাটা যেতে পারে।

উৎপাদন ব্যয়

কৃত্রিম ও স্বাভাবিক যত প্রকারে বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল উৎপন্ন করা যায়, তার মধ্যে র‍্যামী সুতোর ফলন সর্বাপেক্ষা বেশী ও উৎপাদন ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম। এই জন্য আশা করা অন্যায় নয় যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে র‍্যামী বস্ত্রের জয় হবেই।

উত্তর বাঙলায় যেসব জমিতে চা বাগান করা সম্ভব নয় ও যেসব জমিতে অন্য ফসল ফলান হয় না, সেসব জমিতে ব্যাপকভাবে র‍্যামী চাষের সম্ভাবনা রয়েছে।

র‍্যামীর ব্যবহার প্রসার ও র‍্যামী চাষ ব্যাপকতর করার জন্য কয়েক বছর থেকে জলপাইগুড়িতে মোহিত নগর ফার্ম চেষ্টা করছে। এই ফার্মের চেষ্টার ফলে নিজেদের জাতের র‍্যামী চাষের উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছে।

র‍্যামীর ব্যবহার ব্যাপক প্রচারিত [illegible] এবং বস্ত্র শিল্পে র‍্যামী সুতোর ব্যবহার [illegible] হলে, উত্তর বাঙলার চাষী সম্প্রদায় [illegible] অতিরিক্ত আয়ের পথ খুলে যাবে। উত্তর বাঙলার অন্যতম কৃষি পণ্য চা। চা চাষের ক্ষেত্রে কৃষক সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন লাভ হয়নি। কারণ চা বাগান তৈরীর

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

মহানগর কলকাতা

৮ পৃষ্ঠার পর

লাইন প্রকল্প এবং ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাটির নীচে ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল পথ প্রকল্প। এর দ্বারা আশা করা যায় ঘন্টায় ৫০ হাজার যাত্রী বহন করা সম্ভব হবে।

বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থার প্রকল্পগুলি ছাড়াও রয়েছে হুগলী নদীর ওপর প্রিন্সেপ্ ঘাটের কাছে দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ। এর জন্যে আনুমানিক ব্যয় হবে ১৬ কোটি টাকা। ১৯৬৯ সালে স্থাপিত সেতু কমিশন এই কাজ হাতে নিয়েছে। হুগলী নদীর ওপর এই দ্বিতীয় সেতুটি নির্মাণ করা হলে, হাওড়ার পোলের ওপর চাপ অনেকটা হ্রাস পাবে। হাওড়ার পোলটি উপস্থিত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত—প্রতিদিন ৬ লক্ষ পদচারী এবং ৫০ হাজার যানবাহন এই সেতু পার হয়।

১৯৭০-৭২ সালে, বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা যেসব প্রকল্পের কাজ হাতে নিচ্ছে তার মধ্যে বৃহত্তমটি হোল—বস্তি সাফ্ এবং জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তা [illegible]ইত্যাদির দ্বারা বস্তি এলাকার পারি-[illegible]অবস্থার উন্নয়ন। এই প্রকল্পের জন্যে ব্যয় হবে ১০ কোটি টাকা; এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৮ কোটি টাকা দিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ৬০০ জন ব্যক্তি নিয়ে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্‌নিক্যাল্ বিভাগ খোলা হয়েছে।

এছাড়া কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে। বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা এ উদ্দেশ্যে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানকে ১.৫ কোটি টাকা দিয়েছে। অভিন্ন প্রচেষ্টার সহযোগিতার জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করা সি. এম. ডি এর নীতি। এই নীতি অনুসারে সি. এম. ডি. এ. বৃহত্তর কলকাতা জল ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ, কলকাতার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট, হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট, কলকাতার রাষ্ট্র পরিবহন সংস্থা, বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং মিউনিসিপালিটিগুলিকে অর্থ সাহায্য দেয়, যাতে এই সংস্থাগুলি বিভিন্ন পরিকল্পনার কাজ চালিয়ে যেতে পারে। পরিকল্পনাগুলি অবশ্য সামগ্রিকভাবে তত্ত্বাবধান করে সি. এম. ডি. এ।

বৃহত্তর কলকাতার জন্যে গঠিত জল ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্থা (সি. এম. ডব্লু. এস. এ) ইতিমধ্যেই শহরে জল জমার সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে পয়:প্রণালী, জল নিকাশন ইত্যাদি সংক্রান্ত কয়েকটি পরিকল্পনার কাজ হাতে নিয়েছেন। কলকাতা ও হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট, সড়ক ও সেতু আরও প্রশস্ত করার কাজ এবং স্বল্প ব্যয়ে ঘর তৈরীর কাজ হাতে নিয়েছে। শহরের ময়লা ও আবর্জনার যে শোচনীয় অবস্থা হয়ে রয়েছে তার সুরাহা করার জন্যেও কাজ শুরু হয়েছে।

রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত ৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ কৃষ্টপুর—ভাঙর খালের উন্নয়ন কার্য সমাপ্ত হলে কেবল যে কলকাতার জল নিকাশন ব্যবস্থার উন্নতি হবে তা নয়, নৌকা ও বজরা যোগে মালপত্র পাঠাবার একটা জলপথও গড়ে উঠবে। এর কাজ ন্যস্ত রয়েছে রাজ্য সরকারের ওপর। টালির নালা আরও প্রশস্ত ও উন্নয়নের জন্যেও কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণ হলে নৌকা চলাচল ও জল নিকাশন উভয় কাজই চলবে।

সি. এম. ডি. এর পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে প্রায় ১২ শ বস্তির ৫.৬ লক্ষ বাসিন্দার বসবাসের ব্যবস্থা হবে; কিন্তু শহরের ৩ হাজার বস্তিতে বসবাস করে প্রায় ১৫ লক্ষ বাসিন্দা। সুতরাং বলা যায় যে এ উদ্দেশ্যে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে তা পর্য্যাপ্ত নয় এবং এর দ্বারা তাদের শোচনীয় বাসস্থানের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হবে না। এখন প্রয়োজন হোল সমস্ত বস্তি এলাকা তুলে দিয়ে স্বল্প ব্যয়ে বহু তলার বাড়ী তৈরী করে সেখানে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। পথচারী ও দরিদ্র শ্রমজীবীদের কাজ ও বাজার ব্যবস্থা করতে পারলে শহরাঞ্চলের চাপ এবং আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থার উন্নতি হবে। ব্যাপকভাবে নির্মাণ কার্য শুরু হলে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রচুর জায়গা পাওয়া যাবে এবং তা থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা দিয়ে নতুন নতুন ঘর বাড়ী তৈরীতে সাহায্য হবে। সি. এম. ডি. এর পরিকল্পনাগুলির সাফল্য নির্ভর কোরছে বিভিন্ন কার্যকরী সংস্থার কাজ-কর্মের ওপর। যে বিরাট কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার মোকাবিলা করার জন্যে এইসব সংস্থা এখনও ঠিক তৈরী হয়ে ওঠেনি। সি. এম. ডি. এ এবং অন্যান্য মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জমি দখলের বিষয়ে আইনগত কিছু কিছু অসুবিধা রয়েছে। এ ছাড়া অন্য যেসব অসুবিধা রয়েছে তার মধ্যে আছে—সরকারী মাল কিনা ব্যবস্থা, অত্যাবশ্যকীয় কাঁচা মালের অভাব, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং শ্রমিক বিশৃঙ্খলা। পরিকল্পনাগুলির কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন কোরতে হলে প্রয়োজন—সমস্ত কাজের মধ্যে সংহতি সাধন এবং বিভিন্ন মিউনিসিপালিটি ও কার্যকরী সংস্থাগুলির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা। বিভাগগুলিরও উচিৎ নিজেদের মধ্যে কোঁদল ও সংগঠনমূলক প্রতিদ্বন্দ্বীতার অবসান ঘটানো।

রপ্তানি বাণিজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ভূমিকা

(৪ পৃষ্ঠার পর)

হবেন। আশা করা যায় পশ্চিম বঙ্গের নূতন কারখানায় লাইসেন্সের দরখাস্তগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হবে।

ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। এই শিল্প আমাদের বহু প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা এনে দেয়। অর্থনৈতিক মন্দা কেটে যাওয়ার পর ভারত এখন এক সমৃদ্ধির সম্ভাবনার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সম্ভাবনাকে আমাদের বাস্তবায়িত করতে হবে।

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক

বিশ্বনাথ ঘোষ

বর্তমান কারখানা ব্যবস্থায় শ্রমিক যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তার মোকাবিলার জন্যই শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে যে কারখানা ব্যবস্থার প্রসার ঘটে সেটাই শ্রমিক আন্দোলনকে অপরিহার্য করে তোলে। ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদের নীতি অনুসৃত হওয়ায় শ্রমিকদের নানা ধরণের সামাজিক অবিচার ও দুঃখকষ্ট বরণ করতে হয়। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রমিকগণ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে।

বর্তমান বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে এবং উভয়ের মধ্যে নতুন করে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য একটা সংস্কার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া মালিকের তুলনায় এককভাবে শ্রমিকের দরাদরির ক্ষমতা একেবারেই নগন্য। এই অবস্থায় শ্রমিক যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তার দরাদরির ক্ষমতা না বাড়ায় তাহলে মালিক কর্তৃক শোষিত হবার আশঙ্কা থাকে।

ট্রেড ইউনিয়নের চরম লক্ষ্য কি, এ সম্পর্কে মত পার্থক্য আছে। কার্ল মার্ক্সের মতে ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হ'ল ধনতন্ত্র উচ্ছেদ করা, সরকার কবজায় করা এবং শ্রমিকরাজ প্রবর্তন করা। অপর পক্ষে সিডনে ও বিয়াট্রিস ওয়েবের মতে ট্রেড ইউনিয়ন শিল্পে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারের একটি বাহন মাত্র।

ভারতে স্বাধীনতার পরে, বিশেষ করে ১৯৪৭-৫৮ সালে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক সংগঠনের প্রতি মালিকের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী, দেশে গণ-আন্দোলনের ঢেউ এবং যুদ্ধোত্তর যুগের অর্থনৈতিক দুর্দশা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্প্রসারণের অনুকূল ছিল। জাতীয় শ্রমিক কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৬৪-৬৫ সালে ট্রেড ইউনিয়ন ও তার সদস্য সংখ্যা ছিল ১১০২৩ এবং ৪৪.৬৬ লক্ষ। ১৯৬৪-৬৫ সালে ৭১.২ শতাংশ ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০১'র কম। অপরপক্ষে মাত্র ১.৭ শতাংশ ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০০০ এর উর্ধ্বে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশের শ্রমিক সঙ্ঘগুলি আকারে ছোট।

১৯৬২-৬৩ সালে ভারতের মোট শ্রমিক সংখ্যার (কৃষি শ্রমিক ধরা হয়নি) ২৪ শতাংশ ছিল ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত। অপর পক্ষে ইংল্যান্ডে শ্রমিক সংখ্যার ৯০ শতাংশ ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত। আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত সদস্য সংখ্যার অনুপাত বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন রূপ। যেমন কয়লা শিল্পে ৬১ শতাংশ, তামাক শিল্পে ৫৬ শতাংশ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ৬১ শতাংশ, ব্যাঙ্ক শিল্পে ৫১ শতাংশ, বীমা ব্যবসায়ে ৩১ শতাংশ, রেল পরিবহনে ৩১ শতাংশ এবং বাগিচা শিল্পে ২৮ শতাংশ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য।

১৯৬৬ সালে উল্লিখিত চারটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা নিম্নে দেখানো হলো : *

ট্রেড ইউনিয়নের আয়ের প্রধান উৎস হ'ল সদস্যদের দেয় চাঁদা। ১৯৬৪-৬৫ সালে চাঁদা বাবদ মোট আয়ের ৭৯.৫ শতাংশ সংগৃহীত হয়। এ'ছাড়া দান বাবদ মোট আয়ের ১৫.১ শতাংশ, সাময়িক পত্র বিক্রয় এবং লগ্নী অর্থের উপর সুদ বাবদ ১'৪ শতাংশ এবং বাকি অংশ বিবিধ সূত্র থেকে সংগৃহীত হয়। ব্যয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসারদের বেতন ও ভাতা এবং অফিস পরিচালনা বাবদ ব্যয় হয় ৪৬'৮ শতাংশ। শ্রমিকদের সামাজিক কল্যাণের জন্য ব্যয় হয় মাত্র ৪.০ শতাংশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলির আর্থিক অবস্থা দুর্বল। ইউনিয়নগুলির আকার ছোট বলে সদস্য সংখ্যা অল্প আর সেই কারণে তাদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল।

বৈশিষ্ট্য

আমাদের দেশের ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য যে শ্রমিক নেতার পরিবর্তে বাইরের নেতারাই ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা ও নেতৃত্ব করে থাকেন। অনেক

★ কয়েকটি বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা

INTUC	AITUC	HMS	UTUC	মোট
১৪,১৭,৫৫৩	৪,৩১৬৬৪	৪ ৩৬,৮৭৭	৯৩,৪৫৪	২৩,৮১,৫৪৮
(৫৯·৫)	(১৮·২)	(১৮·৩)	(৪·০)	(১০০·০)

[illegible] ৩রা অক্টোবর ১৯৭১ পৃষ্ঠা ১৫

কখনও এই সব বহিরাগত নেতারা রাজনৈতিক দলভুক্ত হন এবং তাঁদের নিজের কোন রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়নকে পরিচালিত করেন। আর এর ফলে শ্রমিক আন্দোলনে রাজনৈতিক দলাদলি প্রবেশ করে শ্রমিকদের সংহতি বিনষ্ট করে। অবশ্য পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করেছেন যে শ্রমিক আন্দোলনের যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে সেটা এই সকল বহিরাগত নেতাদের প্রচেষ্টায়ই সম্ভবপর হয়েছে। বর্তমানে এটা সুখের কথা যে ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনায় বহিরাগত নেতাদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। জাতীয় শ্রম কমিশন মনে করেন যে আইনগত বাধার পরিবর্তে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মাধ্যমে বহিরাগত নেতৃত্বের অবসান ঘটানো প্রয়োজন।

জাতীয় শ্রম কমিশন ইউনিয়ন নিরাপত্তার প্রভৃতি পর্যালোচনা করেছেন। ইউনিয়ন নিরাপত্তা বলতে বোঝায় যে ইউনিয়ন মালিকের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করবে যে ইউনিয়নের সদস্য নয় এমন কোন শ্রমিককে নিয়োগ করা চলবে না। ইউনিয়ন নিরাপত্তার দুটো পদ্ধতি আছে—(১) বদ্ধদ্বার নীতি—এই ব্যবস্থায় মালিক শুধুমাত্র ইউনিয়ন সদস্যদিগকেই নিয়োগ করতে পারবে, (২) ইউনিয়ন দ্বারনীতি—এই ব্যবস্থায় নতুন শ্রমিক যদি ইউনিয়নের সদস্য না হয়ে থাকে, তবে কাজে যোগদানের পরই তাঁকে ইউনিয়নের সদস্য হতে হবে।

যেখানে সংগঠিত এবং সুদৃঢ় ট্রেড ইউনিয়ন আছে সেখানে ইউনিয়ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ট্রেড ইউনিয়নকে জোরদার করবে। এই ব্যবস্থা শ্রমিকের পক্ষেও সুবিধাজনক। ইহা ইউনিয়ন সংক্রান্ত কাজে মালিকের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ দূর করবে, সদস্যদের নিরাপত্তা দৃঢ়তর করবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনার জন্য ভেতর থেকে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করবে। এই ব্যবস্থায় মালিকও লাভবান হবে কারণ সে জানে যে সংস্থার সঙ্গে সে কাজ করছে, সেটা সকল শ্রমিকের প্রতিনিধি।

এই ব্যবস্থার অসুবিধা এই যে ইহা সংগঠনে যোগদানের স্বাধীনতা খর্ব করে। ইহা শ্রমিকদের সংগঠনে যোগদানে বাধ্য করে যেটা সব ক্ষেত্রে শ্রমিকের মনঃপূত নাও হতে পারে। শ্রমিক ইউনিয়নের সকল নীতি মানতে বাধ্য এবং মতবিরোধ ঘটলে ইউনিয়ন সদস্যকে বহিষ্কার করবে, আর সেক্ষেত্রে তার চাকরী যাবে। জাতীয় শ্রম কমিশনের মতে ইউনিয়ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবাস্তব এবং অবাঞ্ছনীয়। উপরন্ত এটা আমাদের সংবিধানের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

চেক্ অফ্ ব্যবস্থা

জাতীয় শ্রম কমিশন এদেশে চেক্ অফ্ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথাও বিবেচনা করেছেন। চেক্ অফ্ ব্যবস্থা হল—মালিক নিয়মিত ভাবে শ্রমিকের মাহিনা থেকে ইউনিয়নের দেয় চাঁদা কেটে নিয়ে ইউনিয়নকে তা দেবার দায়িত্ব নেবে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ইউনিয়নের নেতারা শ্রমিকদের বাড়ী অথবা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে চাঁদা আদায় করে।

এই ব্যবস্থায় সুবিধা হ'ল যে চাঁদা আদায়ের জন্য প্রতি মাসে প্রত্যেক সদস্যের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না আর নিয়মিত ভাবে চাঁদা পাওয়া যায়। চাঁদা বাকী পড়ার সম্ভাবনাও কমে যায়। এই ব্যবস্থার অসুবিধা হ'ল যে এর ফলে মালিক শ্রমিক সংগঠনের অবস্থা, সদস্য সংখ্যা প্রভৃতি তথ্য জেনে যায়। যদি চেক্ অফ প্রথা প্রবর্তন করা হয় তাহলে ইহা শুধুমাত্র স্বীকৃত ইউনিয়নের মধ্যেই সীমিত থাকবে। চেক্ অফ্ ব্যবস্থার সুবিধা চাইবার অধিকার ইউনিয়নের থাকবে এবং যদি স্বীকৃত ইউনিয়ন উহা দাবী করে তাহলে মালিকপক্ষকে সেই দাবী মেনে নিতে হবে।

---

*এই নিবন্ধে যে সকল পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয়েছে তার উৎস হ'ল Report of the National Commission on Labour (1959).

উন্নয়নে উপেক্ষিতা

১১ পৃষ্ঠার পর

দেশের একটি বৃহৎ জনসংখ্যার সমাধান খুব সহজেই করা যেত।

প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি চাই

কেন এমন হল ? এর উত্তরে দু'টি কারণ বলা যেতে পারে। প্রথমটি ঐতিহ্যানুসারী। নারী-পুরুষের সমানাধিকারের যুগেও আমাদের পুরুষ-প্রধান সমাজ অন্তরের অন্তস্তল থেকে নারীকে সর্ব বিষয়ে সমানাধিকার দানের বিরোধী। তার ফলেই উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রায় সর্ব স্তরেই নারীকে অধিকার দানের ক্ষেত্রে 'নৈব নৈব চ' মনোভাবের বহিঃ প্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ, যে কোন কারণেই হোক্ না কেন, আমাদের দেশের শিক্ষিতা মহিলারাও নানা কারণে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তেমন উৎসাহী নন। কিন্তু এর ফলে সমাজ যে কি ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সে কথা কি কেউ ভেবে দেখেছেন !

ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত তাঁর একটি গানে বলেছেন :

"মায়ের জাতে মুক্তি দেরে
ও তোর যাত্রা পথের বিজয় রথের
চক্র তোদের ঠেলবে কেরে।"

আজ অনেক দিন হল, আমরা সে যুগ পার হয়ে চলে এসেছি। মহিলাদের গতিবিধি আজ গৃহ প্রাঙ্গণের সীমিত পরিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলেও আজ স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে গ্রামের মহিলারা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ থেকে আজও বঞ্চিত। জন সংখ্যার একটি বিরাট অংশ জন উন্নয়নমূলক কর্ম প্রকল্পে অপাংক্তেয় ও উপেক্ষিত।

উন্নয়নে মহিলাদের উপেক্ষিতা রাখার অর্থ দেশের ভবিষ্যতকে বিপন্ন করা। সমাজের অগ্রণী নেতাদের আজ একথা চিন্তা করার সময় এসেছে। দেশের মহিলাদের আজ সব কিছু কুণ্ঠা ও জড়তা পরিত্যাগ করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। কাঠ, খড় আর মাটির তাল থেকে মূর্ত হয়ে উঠেছেন দেবী দুর্গা মৃৎশিল্পীর শিল্পবোধ এবং পুরুষাণুক্রমে প্রাপ্ত কারিগরি শিক্ষার অভিনব প্রয়োগ কৌশলে। প্রতিমার রূপবিন্যাসে তুলির শেষ স্পর্শটুকু লাগাচ্ছেন শিল্পী।

'মূর্তি গড়ার কারিগর'

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সেই আলোতে মালাতে ধূপ দীপে সাজানো পূজা মণ্ডপে শত শত ভক্ত নরনারী যখন প্রতিমার সামনে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে উৎসবের আনন্দের অংশীদার, ঢাকীর ঢাক যখন বিভিন্ন বোলে কেঁপে কেঁপে উৎসবের আনন্দকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, তখন কিন্তু প্রতিমার নির্মাতা শিল্পীকে সেই উৎসবের পরিবেশে অথবা আলোকিত মণ্ডপের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

শিল্পীর আটচালায় তখন অন্ধকার নেমেছে। কেনা বেচা শেষ। এখন হিসেব মেলাবার সময়। দিনের পর দিন ধরে কাঠের কাঠামোয় খড় জড়িয়ে তার উপর ধীরে ধীরে একটু একটু করে মাটির প্রলেপ বসিয়ে, রোদে শুকিয়ে শুকিয়ে আবার প্রলেপ দিয়ে শিল্পী পরিবার ঠাকুর গড়ছেন। ছোট বড়, মাঝারি নানা আকারের, নানা ভঙ্গিতে সাজিয়ে সাজিয়ে। এক একটি 'কম্পোজিশান' এক এক রকমের। দেব দেবীর উপাসকদের রুচিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। মুখটি হওয়া চাই সুন্দর হয়ত কোন অভিনেতা অভিনেত্রীর ধাঁচের, চুলের কায়দাটি হওয়া চাই অতি আধুনিক। শিল্পীকেও তাই আধুনিক দুনিয়ার খবর রাখতে হয়, শিখতে হয় নতুন ঢংএ কেশ বিন্যাসের কায়দা। বছরে বছরে পাল্টাতে হয় মুখের ছাঁচ। শিল্পীর ঘরে সারা বছরই কাজ চলে কারণ আমাদের দেশে বারো মাসে তেরো পার্বন। ছোট বড় মিলিয়ে দেব দেবী অসংখ্য।

এতো এক পুরুষের ব্যাপার নয়। এই আটচালায় বসে বর্তমান শিল্পীর পিতা, প্রপিতামহ আরো পেছতে পারলে, হয়ত বৃদ্ধ প্রপিতামহকেও দেখা যেত একই কায়দায় ঠাকুর গড়ছেন। কলা কৌশল তো কিছুই পাল্টায়নি। পাল্টেছে দেব দেবীর চেহারা আর সাজ পোষাক। চালচিত্র উঠে গেছে। ডাকের সাজ হার মেনেছে। কার্তিক হয়েছেন সভ্য যুবক। সরস্বতী কলেজে যাওয়া মেয়েটির মত চেহারা করেছেন। মা দুর্গা নাচের ঢঙে হেসে হেসে মিস ইণ্ডিয়া অথবা মিস ইউনিভার্সের মত পিস্তলই খেলার ছলে একটি অসুরকে আলতো আঘাত করছেন।

শিল্পীর ঘরে হঠাৎ হাজির হলে, তিনি একটু অপ্রস্তুত হবেন। তাড়াতাড়ি একটি জামা গায়ে দিয়ে একটু ভদ্র হবার চেষ্টা করবেন। জামাটি হয়ত পারিবারিক। অর্থাৎ ঐ একটিই জামা, যার যখন বাইরে যাবার দরকার হয় গায়ে ফেলে বেরিয়ে যান। পরিবারের সভ্য সংখ্যা নেহাত কম নয়। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে পরিবারের কর্মক্ষম সকলেই শিল্পীর সহযোগী।'

শিল্পী সহজে মুখ খুলতে চাইবে না। বলবেন, 'আমাদের সোসাইটির সেক্রেটারি বাবুকে জিজেস করুন, লেখা পড়া জানা লোক, সব বলতে পারবেন।' এঁরা ঠাকুর গড়েন, ঠাকুর গড়ার কৌশলটি বংশানুক্রমে রপ্ত। অনায়াসে অবলীলাক্রমে তাল তাল মাটিকে হাতের চাপে নানা রূপে সাজিয়ে দেবার কারদাটি এঁদের কাছে কিছুই নয়; কিন্তু ঐ হিসেব-পত্তর? ওরে বাবা। অফিস হল ঐ জামার বুক পকেট। বাপ, ঠাকুরদাদার মাথা বন্ধক ছিল মহাজনের কাছে। হাত পাতলেই টাকা আবার হাত বাড়ালেই টাকা। টাকার টাকা সুদ। সোজা হিসেব। কিন্তু এখন অবস্থা পাল্টেছে। এই তো শিল্পীর মুখে 'সোসা-ইটি' শব্দটি শোনা গেল।

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ

শিল্পী পরিবার এখন মৃৎ শিল্পী সমিতির সভ্য। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, রাজ্যের কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার এঁদের মূলধন যোগাচ্ছেন ঋণ হিসেবে। কলকাতার কুমার টুলির প্রায় প্রতিটি পরিবারই ব্যাঙ্ক অথবা ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার থেকে কিছু না কিছু ঋণ পেয়েছেন। দেশের অন্যতম বৃহৎ ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, মৃৎ শিল্পীদের ঋণ দেবার ব্যাপারে এক নজির সৃষ্টি করেছেন। মহাজনদের কাঁস থেকে এইসব শিল্পীদের রক্ষার জন্যে, সমিতির সহযোগিতার দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা। কোথায় হিসেব, কোথায় খাতা, কোথায় জামীন, এঁদের কিছুই নেই, তবুও ব্যাঙ্ক ঝুঁকি নিয়েছে। কারণ এই শিল্প আর এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত অজস্র পরিবারকে বাঁচাতে হবে। 'ক্ষুদ্রতম মানুষের জন্যে বৃহত্তম ব্যাঙ্ক' এই স্লোগানকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। মুস্কিল কেবল তাঁদের যাঁরা এখনও কোন সমিতির সভ্য হতে পারেন নি। যে সমস্ত অঞ্চলে মৃৎ শিল্পীদের ঘন বসতি, সেখানে সমিতি হয়েছে, সেখানে নিখিল ভারত হস্ত শিল্প সংস্থার প্রতিনিধিদের আসা যাওয়া আছে; কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে একটি কি দুটি পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, জামীর প্রয়োজন মেটাচ্ছেন তাঁরাই পড়েছেন বিপদে।

মৃৎশিল্প মূলত: গ্রামীণ শিল্প। এই শিল্পে স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন খুব বেশী নয়। প্রয়োজন কার্যকরী মূলধনের। সারা বছর কাজ করতে হবে। এর মধ্যে বড় পুজো তিনটি, দুর্গা পুজো, শ্যামা পুজো সরস্বতী পুজো। কাঁচা মালে যে টাকা আটকে থাকবে তা ঘুরে আসবে এক বছর পরে। শিল্পীর হাতে এই স্বল্প মেয়াদী মূলধন তুলে দিতে পারলেই তিনি খুশী। বুক বাজিয়ে কাজ করবেন। কাঁচা মালের বাজার তাঁর জানা। কাজের লোক, যোগাড় দেবার লোক তাঁর পরিবারেই রয়েছে। আর তৈরী জিনিষ বিক্রির সমস্যাও নেই। খরিদ্দার ঘরেই বাঁধা। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে ঋণ দেবার যে সমস্যা অর্থাৎ ব্যাঙ্ক কিম্বা শিল্পাধিকার ঋণ দেবার আগে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে চান যেমন শিল্পের কাঁচামাল আর বাজার, ঋণ গ্রহিতার ঋণ নেবার যোগ্যতা আছে কিনা, সময়ে ঋণ শোধ করতে পারবেন কিনা, এই শিল্পের ক্ষেত্রে সেই সমস্ত সংশয়ের অংশ, অনেক কম। শিল্পীরা বলছেন—'আমাদের হাতে কম সুদে কিছু মূলধন তুলে দিন, দেখুন আমাদের অবস্থার উন্নতি হয় কি না।'

কতটাকা লাগবে? শিল্পীকে সরাসরি এই প্রশ্ন করলে, সঠিক কোন উত্তর পাওয়া যাবেনা। যে কোন বড় পুজোর আগে শিল্পীর চোখে কয়েক রাত ঘুম থাকেনা। কেনা বেচার ধুমে কলকাতার কুমারটুলিতে ঢোকা যায়না। বাড়িতেও তখন কথা বলার ফুরসৎ নেই। এক একটি ঠাকুর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই ঠাকুরের ফুল, পোষাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র সাজাবার কাজে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। এই এত কেনাবেচা এত ব্যস্ততা, শিল্পীর হাতে কড়কড়ে টাকা; কিন্তু কত লাভ হল? শিল্পীর মুখে মৃদু হাসি। 'ঐ হল আর কি?' অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর, অনেক অনুমানের উপর নির্ভর করে এই শিল্পের অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে একটা ধারণা খাড়া করা যায়।

যে আটচালায় বসে কাজ করছেন, তৈরি করতে কত টাকা খরচ হয়েছিল? পূর্বপুরুষের তৈরি, তা ধরুন এখনকার বাজার দর হিসেবে হাজার তিনেক টাকা। কিন্তু জমিটাতো ভাড়া করা মাসে ৮৫ টাকা দিতে হয়। ঐসব ফার্নিচার ইত্যাদি। ওর আর কত দাম হবে, ধরুন ২০০ টাকা। আমাদের যন্ত্রপাতি আর কি লাগে বলুন। হাতই তো আমাদের যন্ত্র তবে ঐ ছুরি, কাঁচি, বাটালি, হাতুড়ি, কর্ণিক ইত্যাদি, ১৫০ টাকাই ধরুন। ঠাকুরের মুখ তৈরির কিছু ছাঁচ আছে, তা দুশো পিস হবে। ছাঁচের দাম আছে, হাজার দুয়েক টাকা হবে। তাহলে এই কাজের জন্য পাঁচ হাজারের কিছু বেশী টাকা আটকে আছে? শিল্পী সুনিশ্চিত নন।

আপনার কাঁচামাল কি লাগে? কাঁচ মালের মধ্যে প্রধান ধরুন মাটি। য তা মাটিতে তো কাজ হবে না, সেই কালো কুচকুচে এঁটেল মাটি। সারা বছরের মাটি কিনে তৈরি করে রাখতে হয়। ঐ দেখুন রাখা আছে কোনে চৌকো চৌকো করে। কতটা মাটি লাগে। সে গাড়ী হিসেবে। আচ্ছা, টাকার হিসেবে ধরুন প্রায় ছশো টাকা। ঐ মাটিতে মোট কটা

ঠাকুর তৈরি হবে? তা আপনার ৮৫টি কালী ঠাকুর, ৫৫টি লক্ষ্মী ঠাকুর, ১৫টি বিশ্বকর্মা, ৩০টি দুর্গা। কাঁচামালের মধ্যে আর কি কি লাগছে। লাগছে কাঠ, কাঠামো বাঁধতে হবে। লাগছে পেরেক, দড়ি, বাঁশ। তুঁষ, ছেঁড়া কাপড়, খড়। খড় দিয়ে হয় মূর্তির কাঠামো তৈরি; কিন্তু ঐ তুঁষ আর ছেঁড়া কাপড়? মাটিকে তৈরি না করলে, মাটি তো খসে খসে পড়ে যাবে। তাই মাটির সঙ্গে ঐসব জাতীয় জিনিষ মেশাতে হবে। তুঁষ আর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মাটি মেখে নিতে হবে। এরপর নানা রকমের রঙ লাগছে, লাগছে চুল, জরি, রাংতা, নানা টুকিটাকি জিনিষ। তেঁতুল বিচির আঠা, এরারুট, গর্জন তেল। প্রতিমার মুখ তবেই না উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মনে হবে মা যেন হাসছেন।

শিল্পীর চুল চেরা বিশ্লেষণে দেখ যেখানে যেন কিছু কাঠ, কাঠামো, খড়, মাটি রঙ, জরি। শিল্পী যখন একটি মা দুর্গার হিসেব দিতে বসলেন তখন ঐ কথাই মনে হল। শিল্পীর বুক পকেট থেকে বেরোলো কাগজের টুকরো, সোজা, সহজ হিসেবের লেখা জোখা :-

মাটি ৯ টাকা, পেরেক, বাঁশ, কাঠ ২০ টাকা, খড় ৬ টাকা, দড়ি ৫ টাকা, ছেঁড়া কাপড় ২ টাকা, রঙ ৩০ টাকা, জরি ইত্যাদি ৩৫ টাকা, মোট—১০৭·২৫ পয়সা।

কাঁচামাল	১০৭·২৫ পয়সা
মজুরী	৫৬·০০ টাকা
মোট	১৬৩·২৫ পয়সা
বিক্রী	২০০·০০ টাকা
লাভ	৩৬ টাকা ৭৫ পয়সা

এই ঘরে দুর্গা ঠাকুর তৈরি হয় ৩০টি। দুর্গার পরেই মা লক্ষ্মী আসবেন, পেঁচায় চড়ে। একটি লক্ষ্মী ঠাকুরের হিসেব: কাঁচামাল সাড়ে আট টাকা আর মজুরী ছয় টাকা নিয়ে মোট খরচ সাড়ে চোদ্দ টাকা। বিক্রি হবে ২০ টাকায়। মোট লাভ থাকবে সাড়ে পাঁচ টাকার মত। মা লক্ষ্মী তৈরি হবে বছরে মোট ৫৫টি। এইভাবে শিল্পী দিলেন মাকালী আর বিশ্বকর্মার হিসেব। কালী ঠাকুরে খরচ পড়ছে মোট প্রায় ৩৬ টাকা। বিক্রী হবে ৪৫ টাকায়। মোট লাভ নয় টাকা। বছরে মোট ৮৫টি ঠাকুর তৈরি হয়। দেশের শিল্পায়ন পরোক্ষভাবে শিল্পীকে সাহায্য করছে। শিল্প সংস্থা যত বাড়ছে বিশ্বকর্মার চাহিদাও বাড়ছে তত। শহর অঞ্চলে বিশ্বকর্মা পূজা একটি বড় পূজা। বিশ বছর আগেও বিশ্বকর্মা এত জনপ্রিয় ছিলেন না। শিল্পীর ঘরে মোট ১৫টি বিশ্বকর্মা ঠাকুর গড়া হয়। একটি ঠাকুর গড়তে খরচ পড়ছে ৩৯ টাকার মত। বিক্রী হবে ৫০ টাকায়। লাভ ১১ টাকা।

যা পাওয়া গেল

হিসেব করে দেখা গেল সব মিলিয়ে বছরে হাজার তিনেক টাকার মত লাভ থাকে? জমির ভাড়া আর বিদ্যুতের খরচ বাবদ মাসিক ৮৫ টাকা আর ৮ টাকা বাদ দিলে লাভ থাকছে ১৮৮৪ টাকার মত। কিন্তু সারা বছরে এই কাজ তোলার জন্যে কাঁচা মাল কেনার খরচ দাঁড়াচ্ছে ৫৩৮০ টাকা। এই টাকার জন্যে আগে হাত পাততে হত মহাজনের কাছে? এখন এগিয়ে এসেছে ব্যাঙ্ক, রাজ্যের কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পবিভাগ।

সারা ভারতবর্ষে গ্রামীণ শিল্পের এই বিভাগে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের কর্ম সংস্থান হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় কারুশিল্প খাতে ব্যয় হয়েছিল ১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৯ কোটি টাকা, খরচ হয়েছিল ৫ কোটি। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও তাই। ১৯৬৬-৬৯ বার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল ৫ কোটি, পুরোটাই খরচ হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৯৬৯-৭০, ১৯৭৩-৭৪ লক্ষ্য মাত্রা নির্দিষ্ট হয়েছে ১৩ কোটি টাকা।

শিল্পী এসব খবর রাখেন না। তিনি মূর্তি গড়ার ব্যস্ত। জনবর্জিত গ্রামের নয়, আর পরিবারের সংখ্যা নিয়ে তিনি বিব্রত। এদিকে পূজা মণ্ডপে উৎসব মুখর পরিবেশে সমবেত নরনারী রোশনাই আর মূর্তি দেখেই মুগ্ধ। কে কার খবর রাখে। নদি পুজোর ঢাক বাজছে। মূর্তি গড়ার কারিগর এখনও ছুটি পায়নি। মা লক্ষ্মী, পেঁচা বাসে ভরে দেবার পর শিল্পী একটু জিরোবেন। চারিদিক ঝোঁচকানো ঐ পারিবারিক জামাটি গায়ে দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে অনুভব করবেন, শীত এসে গেল। আলোর বৃত্তে সাদা পোকা উড়ছে। এ যেন এক অন্য জগৎ।

তারাশঙ্কর

১০ পৃষ্ঠার পর

থাকে একজন একান্ত দরদী, অনুভূতিপ্রবণ মানুষকে আমরা হারিয়েছি। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি নিজের সংগ্রামী জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে ভালবাসতেন। আরও বেশী ভালবাসতেন তাঁর ধ্যানের ভারত মূর্তিটি সমকালীন শ্রোতৃবর্গের কাছে ব্যাখ্যা করতে। গ্রামীণ ভারতের কোটি কোটি মানুষ আবহমানকাল ধরে যে নীতিবোধ, ধর্মচেতনা নিয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছে তাঁরই প্রাণরূপ গাঁয়ের বটতলায়, বুড়ো শিবের থানে, চণ্ডীমণ্ডপে, গাজনের মেলায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সরল, ধর্মনিষ্ঠ, নিরক্ষর ও দারিদ্র্য লাঞ্ছিত ভারতের লক্ষকোটি অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে ভারত-আত্মা আজও বেঁচে আছে তারাশঙ্কর তারই কথক হতে চেয়েছিলেন। দূরও তাঁর কাছে বসলে সেই সংস্কৃতির উত্তাপে নিজেকে সঞ্জীবিত করে নেওয়া যেত। যাঁরা সেই ব্যক্তি তারাশঙ্করের সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের অভাববোধ আর পূরণ হবার নয়। ভাবীকালের পাঠকের কাছে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর নিশ্চয়ই বেঁচে রইলেন, কিন্তু এই দরদী অগ্রজ ঋষির একান্ত আপন জনকে তাঁরা কোনওদিনই জানবার সুযোগ পাবেন না,—যদি না যোগ্য কোনও জীবনীকার মানুষ তারাশঙ্করকে অমর করে রেখে যান। তারাশঙ্করের জীবনী লেখকরূপে সেই 'বসওয়েলে'র প্রত্যাশা কি নিতান্তই দুরাশা থেকে যাবে।

সবার থেকে ভালো

সেদিন রাজধানীর কমস্তানি মুখরিত একটি অনুষ্ঠানের মাঝে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রী ফাকরুদ্দিন আলী আহ্‌মেদ মহাশয় ১৯৬৯-৭০ সালে গ্রামোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য মহীশূরের শ্রী কে এম মাসন্তি এবং বিহার রাজ্যের শ্রীমতী সুমিত্রা সিন্‌হাকে মানপত্র প্রদান করে সম্মানিত করেন। মানপত্রের সঙ্গে নগদ এক হাজার পাঁচশত টাকা এবং একটি করে সাইকেলও তাদের উপহার দেওয়া হয়। শ্রী মাসন্তি এবং শ্রীমতি সিন্‌হা ছাড়াও কেন্দ্র শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে পণ্ডিচেরীর শ্রী টি. ত্যাগরাজন এবং মণিপুরের শ্রীমতী লহিসারাম আনন্দি দেবীও যথাক্রমে এ বৎসরের যোগ্যতম গ্রাম সেবক ও সেবিকা রূপে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হন।

দেশের নিরক্ষর চাষী মজুরদের মধ্য উন্নত প্রথায় চাষ-বাস করে পর্যাপ্ত ফলন তোলার প্রেরণা জাগান, সেই সাথে গ্রামোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করে তোলার মূলে গ্রাম সেবক ও গ্রাম সেবিকার দান অসামান্য। তাই পরিশ্রমী ও কর্তব্যপরায়ণ সমাজ সেবীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করায় সমগ্র দেশবাসীই আজ আনন্দিত। এইসব কর্মীবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলে, কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের কিছু কথা আমরা জানতে পারি।

মহীশূরের শ্রী কে. এম. মাসন্তি বেশ কয়েক বছর হলো গ্রাম সেবকের পদে কাজ করে আসছেন। গত দু'বছর যাবৎ তিনি বেলগাঁও জেলার গোকাক ব্লকের গ্রাম সেবক। গ্রামের উন্নতির জন্য শ্রী মাসন্তির চেষ্টার আর অন্ত নেই। প্রায় ৪০ বর্গ মাইল জুড়ে এখানে ৭১২টি পরিবারের বসতি। শ্রী মাসন্তির অপরিসীম পরিশ্রমের ফলে আজ সেখানে উচ্চফলনশীল বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর চাষ যোগ্য জমির এক শতাংশে শুরু হয়েছে দুই বা ততোধিক ফসলের চাষ। পচা সার তৈরী এবং নানা রকম তরি তরকারী চাষ করতেও চাষীরা সেখানে যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলটিতে প্রায় সর্বত্র সমবায় সমিতি গড়ে ওঠা ছাড়াও আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর হলো প্রায় ২৩,২০০ টাকা ব্যয়ে এখানে যে জল সরবরাহ কার্যসূচীটি গৃহীত হয়েছে, তাকে ত্বরান্বিত করতে এখানের অল্প বিত্ত গ্রামবাসীরা নিজেরাই চাঁদা করে প্রায় ১৭০০ টাকা তুলে দিয়েছে। সুতরাং এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, গোকাক ব্লক বেশ উন্নত হয়ে উঠেছে এবং তার জন্য শ্রী মাসন্তির মত গ্রাম সেবককে যে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা বলা বাহুল্য।

বিহারের ঝিগা ব্লকের উন্নতির জন্য গ্রাম সেবিকা শ্রীমতী সুমিত্রা সিন্‌হাকেও কম খাটতে হয়নি। নারী হিসেবে গৃহ উন্নয়ন এবং নারী প্রগতির দিকটাই তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখেছেন। তার ফলে গ্রামের মহিলাদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার সুবিধাগুলি তিনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, আর বাড়ীগুলিকে স্বাস্থ্যকর করে তোলার জন্য হয়েছেন সচেষ্ট। ফলে প্রত্যেক বাড়ীতে বাতাস যাওয়া চলাচলের জন্য অন্তত; একটি করে জানলা বা দেওয়ালে একটি বড় গর্ত করা হয় তার জন্য গৃহস্থকে উৎসাহিত করে তুলেছেন। তাছাড়া শ্রীমতী সিন্‌হার একাগ্র চেষ্টার ফলে ঝিগা ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৪১০টি পয়ঃপ্রণালী এবং ১৫০টি ধূমহীন চুল্লী তৈরী হয়েছে আর মহিলাদের হাতের কাজ শেখানোর জন্য খোলা হয়েছে অন্তত: ৫টি সেলাই স্কুল আর ২০টি মহিলা মণ্ডল। আর শতাধিক মহিলা ও পুরুষকে কৃষি কর্মে শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। অতএব শ্রেষ্ঠ গ্রামসেবিকা হিসাবে শ্রীমতী সিন্‌হাকে যোগ্য সম্মানই প্রদর্শন করা হয়েছে।

পণ্ডিচেরীর শ্রী টি. ত্যাগরাজনও একজন সুযোগ্য গ্রামসেবক। প্রায় দশটি গ্রামে শ্রী ত্যাগরাজনকে কাজ করতে হয়। প্রতিটি গ্রামেই তিনি উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, একাধিক ফসল চাষ, সমবায় সমিতি গঠন এবং শিশু কল্যাণ সমিতি স্থাপন জনপ্রিয় করে তুলে গ্রামগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছেন।

মণিপুরের শ্রীমতী লাইসারাম আনন্দি দেবীও একজন সফল গ্রামসেবিকা। প্রায় ১৬টি গ্রামের উন্নয়ন সম্বন্ধে তাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তাঁর আন্তরিক চেষ্টার ফলে মণিপুরের থাউবাল ব্লকের অন্তর্গত গ্রামগুলির গৃহাঙ্গনে আজ শাকসব্জীর চাষ, সার তৈরী প্রভৃতি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বস্ত্রশিল্পে নবীনতম সংযোজন

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

জন্য প্রচুর মূলধন ও জমির দরকার হয়। এ দুটির কোনটাই কৃষক সম্প্রদায়ের আয়ত্বাধীন নয়। অন্য দিকে র‍্যামী চাষ স্বল্প মূলধনে স্বল্প জমিতে হতে পারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে র‍্যামী সুতো ও বস্ত্র তৈরীর কল কারখানা স্থাপিত হলে, একদিকে যেমন উত্তর বাঙলার ভূমিহীন আদিবাসী কৃষকদের ও বেকার মধ্যবিত্ত যুবকদের একটা বৃহৎ অংশের কর্ম সংস্থান হবে। অন্য দিকে বস্ত্র শিল্পের বাজার নতুন জাতের বাকল বস্ত্র চালু করে, বাঙলা দেশ তার অতীত কালের বিখ্যাত বাকল বস্ত্র দুকূলের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করে, বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে তার গৌরবময় ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা দুরাশা হবে না বলেই মনে হয়।

আখের শত্রু চোষি পোকা দমন করুন

মাটির বুক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রস সঞ্চারে ফুলের বুকে জমে সুধা, ফল হয়ে ওঠে স্বাদু, শস্যের দানা লাভ করে পুষ্টি আর আখের নরম দেহের শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হয় রসের মধুর ধারা। আখের সেই দেহ থেকে আবার সংগৃহিত হয় রস, আর তার সাহায্যে চিনি, গুড় তৈরী হয়ে পূর্ণ করে মানব শরীরের চাহিদা, তুষ্ট করে তার রসনা; বাণিজ্যের পণ্য হিসাবে গণ্যও হয় প্রথম সারিতে।

সুতরাং বহু গুণ সম্পন্ন সরস এই ফসলটির চাহিদা যে দিন দিন বেড়েই চলবে তাতে আর সন্দেহ কি। তাই চাষীরাও আজ আখের পর্যাপ্ত ফলন তুলে লাভের মাত্রা বাড়াতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সযত্ন বর্দ্ধিত এই ফসলটি রোগ পোকার আক্রমণে প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়, আর তার ফলে চাষীর লাভের আশা ও উদ্যমের পরিশ্রম দুইই হয় নষ্ট। সুতরাং রোগ পোকার হাত থেকে নামী ও দামী এই ফসলটিকে রক্ষা করা চাষীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেখা গেছে, আখের নানা রোগ পোকার মধ্যে আখের পাতার চোষি পোকার আক্রমণ বিশেষ ক্ষতিকর। কারণ চোষি-পোকার আক্রমণে আখের ফলন যায় কমে, আর ফসল যা পাওয়া যায় তার মানও হয় অনুন্নত। ফলন কম হওয়ার দরুণ রসের পরিমাণ যায় কমে, ফলে চাষী হয় ক্ষতিগ্রস্ত। এছাড়া, চোষি আক্রান্ত আখের রস দিয়ে গুড়ের ভেলী তৈরী করাও হয় মুশকিল

এ বিষয়ে তাই অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে, শরৎকালে রোয়া আখচারাগুলিতে অথবা মুড়ি আখের নতুন অঙ্কুরিত পল্লবগুলিই চোষি পোকা সাধারণত ডিম পাড়ার জন্য বেছে নেয়। ডিম পাড়ার ৬ থেকে ১০ দিনের মধ্যেই সেই ডিমগুলি ফুটে ছোট ছোট পোকা বেরিয়ে এসে আখের ক্ষতি করা শুরু করে দেয়। তবে মে-জুনের খর উত্তাপে ঐ শিশু চোষি পোকাগুলি বেশী দিন বাঁচে না, কারণ সাধারণ উত্তাপ সম্পন্ন আর্দ্র আবহাওয়াই চোষি পোকা বেড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল। তবু প্রতিকূল অবস্থাতেও যে পোকাগুলি বেঁচে থাকে, সেগুলি আবার জুলাই মাসের আর্দ্র আবহাওয়ায় দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে বসন্তে রোয়া আখের ক্ষেত আক্রমণ করে। দেখা গেছে আগষ্ট থেকে নভেম্বর মাসেই আখের ক্ষেতে চোষি পোকার আক্রমণ বেশী হয়।

প্রথম আক্রমণেই চোষি পোকারা আখের পাতা থেকে সমস্ত রস টেনে নিয়ে গাছগুলিকে দুর্বল করে ফেলে। আর পাতা থেকে রস শুষে নেওয়ার পর চোষি পোকার শরীর থেকে একরকম আঠা মত জলীয় পদার্থ বেরিয়ে আখের পাতাগুলি ঢেকে ফেলে; আর তার ফলে পাতাগুলির ওপর একরকম কালো রং-এর ছত্রাকের সৃষ্টি হয়ে সেগুলি নষ্ট করে দেয়, আর তারই ফলে আখের ফলন কমে যায় আর তার মানও হয় নীচু।

এবিষয়ে আরও দেখা যায়, যেসব আখক্ষেতে উচ্চ মাত্রায় রাসায়নিক সার দেওয়া হয় এবং যে আখের পাতাগুলি ঢলানো ও চওড়া মাপের হয়, সেসব জায়গায়ই চোষি পোকা বেশী আক্রমণ করে। অবশ্য তার জন্য আখে রাসায়নিক সারের মাত্রা কমানো উচিত নয়, বরং এসব ক্ষেত্রে রাসায়নিক প্রয়োগে চোষি পোকার আক্রমণ একেবারে দমন করার চেষ্টা করা উচিত।

আখের ফসলকে রক্ষা করে পর্যাপ্ত ফলন তোলার জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে আখের শত্রু চোষি পোকার আক্রমণ রোধ করা যায়:—

১। অঙ্কুরিত আখের নতুন পল্লব থেকে চোষি পোকার ডিম সংগ্রহ করে তা নষ্ট করে ফেলা উচিত।

২। শতকরা দশভাগ শক্তি সম্পন্ন বি. এচ. সি গুঁড়ো বর্ষার আগে ২০ থেকে ২৫ কেজি হারে, আর আগষ্ট থেকে অক্টোবর মাসে ৪০—৫০ কেজি পরিমাণে আখক্ষেতে ভালোমত ছড়ানো দরকার।

৩। ভোর বেলায় গাছের পাতা শিশিরে ভেজা থাকে বলে সে সময় ওষুধের গুঁড়ো ক্ষেতে ছড়ালে তা নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে না।

৪। বি এচ. সির অভাবে শতকরা ২০ ভাগ শক্তিসম্পন্ন ১ লিটার ইমালসিফায়েবল এনড্রিন দ্রবণ ১,০০০ লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রতি হেক্টর আখক্ষেতে হাত অথবা পাওয়ার স্প্রে দিয়ে বর্ষার আগে এবং পরে স্প্রে করা দরকার। আর যেখানে আখের ব্যাপক চাষ হয় সেখানে এনড্রিন ইমালশন অথবা ম্যালাথিয়ন ইউ. এল. ভি আকাশ থেকেই ক্ষেতে ক্ষেতে স্প্রে করা বেশী সুবিধাজনক।

'বেল' এর নতুন কীর্ত্তি

ব্যাঙ্গালোর স্থিত ভারত ইলেক্ট্রনিকস্ লিমিটেড আকাশ বাণীর দিল্লী কেন্দ্রের জন্য একটি ১০ কিলোওয়াটের ট্রান্সমিটার তৈরী করেছে। ভারতীয় উদ্যোগে এজাতীয় প্রচেষ্টার এটি প্রথম পদক্ষেপ। 'বেল' এ ধরণের আটটি ট্রান্সমিটার তৈরীর অর্ডার পেয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য, "বেল" আকাশবাণীর জন্য ১০০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন একটি ট্রান্সমিটার তৈরীর কাজেও এগিয়েছে। নতুন ট্রান্সমিটারটি সামনের বছরের প্রথম দুই।তিন মাসের মধ্যেই চালু করার সম্ভাবনা আছে।

গৌহাটিতে ট্রাক্টর কারখানা

সম্প্রতি আসাম সরকার পশ্চিম জার্মেনির সহযোগিতায় গৌহাটিতে একটি ট্রাক্টর কারখানা খোলার অনুমতি পত্র পেয়েছেন। কারখানাটি খুলতে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় হবে। কারখানার বাৎসরিক উৎপাদন হবে ৬০০০টি ট্রাক্টর এবং আশা করা হচ্ছে এর ফলে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। এক একটি ট্রাক্টরের বিক্রী দাম ধার্য করা হয়েছে ৮০০০ টাকা।

অনুন্নত অঞ্চলের জন্য আরও বেশী ঋণ

অনুন্নত অঞ্চলে কর্মোদ্যম বাড়িয়ে তাদের সামগ্রিক প্রগতির সঠিক করে তোলার প্রতিষ্ঠানগত ঋণের দান অসাধারণ। সহজ ও সুবিধাজনক শর্তে দীর্ঘ ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে শিল্প বিনিয়োগ সংস্থা ১৯৭১ এর জুন মাস পর্যন্ত হিসেব অনুযায়ী ৫৭টি বিশেষভাবে চিহ্নিত অনুন্নত জেলার ১০২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ৭৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ দানে সম্মত হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে এই মেয়াদী ঋণ উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োজিত সামগ্রিক ঋণের ২০ শতাংশের মত।

ঔষধ শিল্পের অগ্রগতি

এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ এবং তৈরীর মূল উপাদান উৎপাদনে লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে। প্রায় ২৩০০টি ঔষধ তৈরীর কোম্পানীর বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য দাড়িয়েছে ২৬৫ কোটি টাকা। স্বাধীনতার পূর্বে ঔষধ কোম্পানীদের মোট উৎপাদনের দাম ছিল ১০-১৫ কোটি টাকা।

কাণ্ডলা বন্দর উন্নয়ন

ভারত সরকার কাণ্ডলা বন্দর উন্নতি প্রকল্পে ক্যানেডির সরকারের উন্নয়নমূলক ঋণ গ্রহণে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ক্যানাডা ভারতে কাণ্ডলা বন্দরে আমদানি করা সার খালাস করার কাজে ব্যবহৃত কতগুলি ভারী যন্ত্রপাতি কেনা ও তা বসানোর কাজে সাহায্য করবে। আশা করা যায় এর ফলে যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো সম্ভব হবে, কেননা পূর্বে সার কেনা হোত প্যাক করা অবস্থায়। স্বয়ংক্রিয় বহুল পরিমাণ মাল খালাসী যন্ত্র বসানোর পর খোলা সার কেনার ব্যাপারে আরও বেশী দর কষাকষি করা সম্ভব হবে এবং তাতেই মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

সত্তর লক্ষ বা প্রায় এক মিলিয়ান ক্যানেডিয়ান ডলারের এই ঋণে সুদ দিতে হবে না এবং তা দীর্ঘ মেয়াদে ৫০ বছরে শোধ করা যাবে। অবস্থা বুঝে ঋণ শোধের মেয়াদ আরও দশ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

REGD. NO. D-23

ধন ধান্যে

পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে, তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য। এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যথার্থ রূপ তুলে ধরা 'ধনধান্যে'র অন্যতম উদ্দেশ্য।

নিয়মাবলী

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়।

দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাদের নিজস্ব।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃ প্রকাশকালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা করা এবং কোনোও রচনার প্রাপ্তি স্বীকৃতি জানানো সম্ভব নয়।

নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ে, এই ঠিকানায় পাঠাবেন—

"যোজনা"
যোজনা ভবন
পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট,
নিউ দিল্লী—১

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ-
বিজনেস ম্যানেজার, পাব্লিকেশন্স্ ডিভিশন,
পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১,
এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ভিরেন্দ্র প্রিন্টার্স, করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধন ধান্যে
তৃতীয় বর্ষ ঃ ১০
১৭ই অক্টোবর, ১৯৭১
২৫ পয়সা

ধনধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

তৃতীয় বর্ষ ১০ম সংখ্যা

১৭ই অক্টোবর ১৯৭১ : ২৫শে আশ্বিন ১৮৯৩

Vol III : No : 10 : Oct. 17, 1971

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
দ্বারকা নাথ মুন্সী

সহ সম্পাদক
গগন ঘোষ

সংবাদদাতা (কলিকাতা)
সুভাষ বসু

সংবাদদাতা (মাদ্রাজ)
এস ভি রাঘবন

সংবাদদাতা (শিলং)
বীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

সংবাদদাতা (ত্রিবান্দ্রাম)
রসকটি কৃষ্ণ পিল্লে

সংবাদদাতা (বোম্বাই)
অবিনাশ গোড়বোলে

ফোটো অফিসার
টি. এস. নাগরাজন

প্রচ্ছদপট
বলরাম মণ্ডল

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী ১

টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ ৩৮৫৪৮১/৪০২

টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী

চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী ১

চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

বাহুবল না হউক বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালা অচিরে পৃথিবীর মধ্যে যশস্বী হইবে, তাহার সময় আসিতেছে।

—বঙ্কিমচন্দ্র

এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

গর্ব করবার মতন

শিপিং কর্পোরেশনের সাফল্যে দেশবাসী সত্যিই গর্ব বোধ করতে পারেন এবং সেটা খুবই ন্যায়সঙ্গত। ১৯৭০-৭১ সালে ২৩৪৪ লক্ষ টাকার বিনিয়োজিত মূলধনের উপর কর্পোরেশন ৬৯১ লক্ষ টাকার রেকর্ড মুনাফা অর্জন করে। ফলে শতকরা ৬ ভাগ ডিভিডেণ্ড দেবার সুযোগ পাওয়া যায়। মাত্র এক দশক আগে ২ লক্ষ ডি. ডব্লু. টি সম্পন্ন ১৯টি জাহাজ নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে, কর্পোরেশন আজ ১৩ লক্ষ ডি. ডব্লু. টি সম্পন্ন ৭৮টি জাহাজের অধিকারী। গত বছরের মোট আয় ৫৩৭৬ লক্ষ টাকার তুলনায় এ বছর এর মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৬৫৮৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ২২ ভাগেরও বেশী আর্থিক উন্নতি।

১৯৬১ সালে, ওয়েষ্টার্ন শিপিং কর্পোরেশন এবং ইষ্টার্ন শিপিং কর্পোরেশন নামে দুটি সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জাহাজী কোম্পানীর মিলনের ফলে প্রতিষ্ঠিত, এস. সি. আই এই অক্টোবরে তার দশম বর্ষ পূর্তি করল। এর প্রতিষ্ঠার সময় ভারতবর্ষে জাহাজী মালিকনায় বেশী অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু আজ এস. সি. আই তার ২১টি লাইনার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঁচটি মহাদেশের ৫৮টি দেশে সরাসরি জাহাজ চলাচলের বন্দোবস্ত ক'রে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম জাহাজী কোম্পানীতে পরিণত হয়েছে। আজ ভারতীয় জাহাজী পরিবহন ক্ষমতার শতকরা ৩৫ ভাগই এর এবং মোট পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ এস. সি. আই এর। সরকারী তত্ত্বাবধানে সর্বোৎকৃষ্টভাবে পরিচালিত কোম্পানী গুলির অন্যতম—শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া, তার কাজকর্মের ধারা প্রতি বছরই যথেষ্ট পরিমাণে মুনাফা ক'রে একটা গৌরবময় রেকর্ড স্থাপন করেছে। যদিও এর যোগাড় করা মূলধন ২৩৪৫ লক্ষ টাকাই রয়ে গেছে গত দশ বছরে এই কোম্পানী ৩৪৭৪ লক্ষ টাকার মুনাফা অর্জন করেছে। কর্পোরেশনের হাতে থাকা অর্থ এবং উদ্বৃত্ত মিলিয়ে এখন ৩০৯৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এই উঁচু মানের কাজকর্মের ফলে এস. সি. আই তার আভ্যন্তরীণ আর্থিক সঙ্গতিকে কাজে লাগিয়েই একটা বিরাট প্রসারণ পরিকল্পনার অর্থের যোগান দিতে পেরেছে। ১৯৭১ সালের মার্চের শেষে, এস. সি. আই এর ১১৫ কোটি টাকার মোট মূলধনের মধ্যে ৬৫ কোটি টাকা তার নিজেরই সৃষ্ট। কিন্তু এত উল্লেখযোগ্য সাফল্য এর পিছনে থাকা সত্ত্বেও কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের মতে এর ভবিষ্যৎ খুব সুনিশ্চিত নয়। জাহাজগুলি চালানোর ক্রমবর্দ্ধমান খরচা গত তিন বছর ধরে বা শতকরা ১০০ ভাগেরও বেশী অনিয়মিত বাজার দর হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক অর্থ সঙ্কটের ফলে একটা বাড়তি প্রবণতা, বেতন বিলের ঊর্দ্ধগামী প্রবণতা, মেরামতী কাজের জন্য বেশী খরচা, নিয়োগপত্র ও সঙ্কট করা বাবদ খরচা ইত্যাদি কারণে গত কয়েক বছরে মোট আয়ের সম্ভাবনা ক্রমশ: কমে যাচ্ছে। ক্রমবর্দ্ধমান জাহাজ চালানোর খরচা, উপার্জনের অক্ষমতা এবং কয়েকটি সরকারী নীতিমূলক সিদ্ধান্ত চেয়ারম্যানের মতে, শিপিং কর্পোরেশনের কাজকর্মকে এবং সাধারণভাবে দেশের জাহাজী শিল্পের ওপর রেখাপাত কোরবে। গত বাজেট অবধি সু-সংগঠিত শিল্পের জন্য দেওয়া উন্নয়ন-ছাড় প্রত্যাহারের বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন সরকারী ও বে-সরকারী ভাবে পরিচালিত জাহাজ মালিকগণ। এর ওপর রয়েছে জাহাজী ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি, শতকরা ৩ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা সাড়ে চার ভাগ। শিপিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সুনিশ্চিত ভাবেই এই সমস্ত নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন। আর বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি জানিয়েছে যে, এই সব সিদ্ধান্তের ফলে ভবিষ্যতে আর কোন সম্প্রসারণ সম্ভব হবে না। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্তত শতকরা ৬০ ভাগ যদি আমাদের নিজস্ব জাহাজগুলির মারফৎ পরিবহনের ব্যবস্থা কোরতে হয়, যা আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য, তাহলে বাজেট সিদ্ধান্তগুলির পুন: বিবেচনা প্রয়োজন। মূলধন বাজারে এবং নতুন মূলধন সৃষ্টিতে অন্যে যে অপচয় প্রবণতা দেখা যাচ্ছে জাহাজী শিল্পের বেলায় কিন্তু সে কথা বলা যায় না। এই সংক্রান্তে কয়েক ক্ষেত্রে প্রস্তাব করা হয়েছে যে এ যাবৎ পাওয়া উন্নয়ন ছাড় এবং কর বর্জিত সমস্ত এর সুবিধাগুলি যৌথ সংস্থাগুলির জন্য দেবার [illegible] জন্য তা সীমাবদ্ধ করার প্রস্তাবটি সমীচীন বলেই মনে হয়।

শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার পক্ষে মূলধন সৃষ্টির উৎসাহের প্রত্যাহার শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, কঠোরও বটে। বিশেষ করে যখন এই সংস্থা ৮৪.৩৫ কোটি টাকার প্রসারণ পরিকল্পনায় হাত দেবার জন্য তৈরী হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে জাহাজী শিল্প, উন্নত হওয়া সত্বেও এখনও শৈশবাবস্থাই পড়ে আছে। আন্তর্জাতিক অর্থ সঙ্কটের দিনে জাহাজী শিল্পের যা অবস্থা, তাতে আবার কর্পোরেশন, সাধারণভাবে যে সমস্ত সংস্থা থেকে সাহায্য পেয়ে থাকেন, তাদের কাছ থেকে কিছু বাধা বিপত্তি আসতে সুরু করেছে। এটা মনে রাখা দরকার যে সমস্ত উন্নত বা অনুন্নত দেশই, তাদের জাহাজী শিল্পকে অর্থ সাহায্য এবং নানা রকমের নিরাপত্তামূলক উপায় অবলম্বন করে সাহায্য করে, ভারতবর্ষেও শিপিং কর্পোরেশন যে সব রুটে জাহাজ চালাচ্ছে স্পষ্টভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে অলাভজনক, সেইসব রুটে জাহাজ চলাচলের সুবিধাজনক বন্দোবস্ত ক'রে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যকে সক্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য করছে। এ সময়ে কর্পোরেশনকে বিপর্যস্ত করা মোটেই সমীচীন নয়।

ভারতের বৃহত্তম সার উৎপাদন কেন্দ্র

গুজরাটের কলোল ও কান্ডলায় যে বিরাট সার তৈরীর কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে তার দ্বারা দেশের খাদ্যোৎপাদন আরও ২২ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাবে।

ভারতীয় কৃষকগণের সার সমবায় লিঃ এর বিরাট সার তৈরীর কারখানা নির্মাণ এবং সমবায় উন্নয়ন দশক একই যোগে শুরু হচ্ছে। ভারতে সার তৈরীর ক্ষেত্রে এটি হবে একক বৃহত্তর প্রচেষ্টা। ভারতের মাটির উপযোগী নানা রকমের প্রায় ৮ লক্ষ টন সার প্রতি বছর এখানে তৈরী হবে। এর দ্বারা ২২ লক্ষ টন খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৪০ হাজারেরও বেশী সমবায় সমিতি হাত মিলিয়ে ভারতীয় কৃষকগণের সার সমবায় লিঃ গঠন করেছে। এছাড়া এই সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি সমবায় সমিতি। যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি সমবায় প্রতিষ্ঠান একত্র হয়ে কো-অপরেটিভ ফারটিলাইসার ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি সংস্থা গঠন করেছে যাতে তারা এই প্রকল্পে সাহায্য কোরতে পারে। এই সংস্থা লাভের কোন অংশ গ্রহণ কোরবে না। ভারতীয় কৃষকগণের সার সমবায় লিমিটেডকে এই সংস্থা ১ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৭৫ লক্ষ টাকা দান কোরেছে।

কারখানাগুলি স্থাপনের জন্যে যন্ত্রপাতি [illegible] যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে [illegible]।

এই পরিকল্পনার জন্যে মোট ২৬ কোটি টাকা ঋণ দানের উদ্দেশ্যে উক্ত দেশ সম্প্রতি এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বৃটিশ ঋণ হবে ১২.৬ কোটি টাকার এবং মার্কিণ ঋণ ১৩.৭৫ কোটি টাকার। ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই প্রথম বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র যুক্তভাবে একটি প্রকল্পে সাহায্য কোরছে। ভারতীয় সমবায় অভিযানে এর আগে আর কখনো এত বড় একটি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়নি। সমবায়ের ক্ষেত্রে এটি বৃহত্তম আন্তর্জাতিক লেনদেনও বটে।

ভারতে তৈরী বহু যন্ত্রপাতি এই প্রকল্পে কাজে লাগানো হবে। উৎপাদনের প্রথম পর্য্যায়ের কাজ শুরু হবে কলোলে। এখানে একটি বিরাট কারখানায় স্থানীয় প্রাকৃতিক গ্যাসকে এ্যামোনিয়ায় পরিণত করা হবে। মার্কিণ অর্থে পাওয়া যন্ত্রপাতিগুলি প্রথমে এখানে বসানো হবে। যে পরিমাণ এ্যামোনিয়া তৈরী হবে তার অধিকাংশ সংশ্লিষ্ট কারখানায় ইউরিয়ায় পরিণত করা হবে। ইউরিয়া হোল নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ সার। বৃটেনের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে যে সব যন্ত্রপাতি পাওয়া যাবে তার অধিকাংশ ব্যবহৃত হবে, কলোল থেকে প্রায় ৪ শো কিলোমিটার দূরে কান্ডলা বন্দরের কাছে যে কারখানা স্থাপন করা হবে সেখানে।

[illegible] কান্ডলার প্রকল্প সামগ্রিক নির্ভর কোরবে দুটি সূত্রের ওপর—কলোলে তৈরী এ্যামোনিয়া এবং আমদানি করা ফসফোরিক এসিড ও পটাসের ওপর।

প্রথম পর্য্যায়ে পরিকল্পনা, নির্মাণ ও পরিচালনার দায়ীত্ব থাকবে কো-অপরেটিভ ফারটিলাইজার ইন্টারন্যাশনালের ওপর। ক্রয় বিক্রয় ও বণ্টনের ভার থাকবে ভারতীয় কৃষকগণের সার সমবায় লিঃ এর ওপর। ভারতের ফারটিলাইজার করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ কোরবে। শেষ পর্য্যন্ত সারা প্রকল্পের দায়ীত্ব ন্যস্ত হবে ভারতীয় কৃষকগণের সার সমবায় লিঃ এর ওপর।

আখ কিভাবে ভালোমত অঙ্কুরিত করা হয়

মহারাষ্ট্রের পাদগোন্ডিতে অবস্থিত এস. এস. বিদ্যাপীঠের একটি সংবাদে জানা গেছে যে, মহারাষ্ট্রে আখ বোনার জন্য ডিসেম্বর মাসই সবথেকে উপযুক্ত সময়। এ বিষয়ে আরও বলা হয়েছে যে, আখের নীচের দিক থেকে ০.৫ মীটার এবং পাতাগুলি বাদ দিয়ে আখের বীজন তৈরী করা [illegible]

বীজন বোনার সময় [illegible] প্রয়োগ করলে আখের শিকড় তাড়াতাড়ি গজায়। সংবাদে আরও বলা হয়েছে যে, আখের বীজন বোনার ১২ থেকে ২৪ ঘন্টা আগে ২০০ লিটার জলের মধ্যে আধ কেজি [illegible] মিশিয়ে তার মধ্যে বীজনগুলি ডুবিয়ে রাখলে আখ তাড়াতাড়ি ও ভালোমত অঙ্কুরিত হয়।

সিপিং করপোরেশনের সাফল্য

জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা-সিপিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া এবং রাজশাও জব্ লিমিটেড ১৯৭০-৭১ সালে সাফল্যজনক ফল দেখিয়েছে। চলতি বছরে উভয় সংস্থাই লাভ করেছে এবং তাদের মূলধনের শতকরা ৬ ভাগ হারে লভ্যাংশ দিচ্ছে। তাদের প্রসারণের জন্য এক বিরাট অঙ্কের টাকা মূলধন থেকে খরচ হওয়া সত্বেও, সংস্থা দুটি এই সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

সিপিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার ইতিহাস একটা একটানা উন্নতির ইতিহাস। এ বছরের ২রা অক্টোবর এই সংস্থার দশম বর্ষ পূর্ণ হলো। সিপিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার জাহাজের সংখ্যা ক্রমশ: বেড়েই চলেছে। চলতি বছরে করপোরেশন, এর বাহিনীতে প্রায় তিন লক্ষ ডি. ডবলু. টি বাড়িয়েছে। বছরের শেষে সিপিং করপোরেশনের ৭৮টি জাহাজ নিয়ে শক্তি দাঁড়িয়েছে ১৩.৬৮ লক্ষ ডি. ডবলু. টিতে। এর মানে জাহাজের সংখ্যার চার গুণ এবং পরিবহন ক্ষমতার ছয় গুণ বৃদ্ধি। ১৯৬২ সালে করপোরেশনের ১৯টি জাহাজ নিয়ে মোট শক্তি ছিল ১.৯৪ লক্ষ ডি.ডবলু.টি; আজ মোট ভারতীয় জাহাজী পরিবহন ক্ষমতার শতকরা ৩৫ ভাগ সিপিং করপোরেশনের। বাকী অংশটুকু বহন করে অন্য ৩৪টি কোম্পানী। ৩২টি জাহাজ নিয়ে ১১ লক্ষ ডি. ডবলু. টি ক্ষমতা সম্পন্ন সিপিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া, ১৯৭৪ সালের জন্য ২০ লক্ষ টনের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে তা অতিক্রম করার কথা করপোরেশন বেশ গভীর ভাবেই চিন্তা করছে। ১৯৭৬ সাল নাগাদ এস. সি. আই তার পরিবহন ক্ষমতা আরও ১৯ লক্ষ টন বাড়িয়ে দিতে পারবে।

এস. সি. আই এর আভ্যন্তরীন বসদ থেকে নিজের প্রসারণের বিরাট দায়িত্ব বহন করার বিষয়টি-এর উচ্চমানের ক্রিয়াকলাপেরই পরিচয়। ১৭৫.১৯ কোটি টাকার মোট বিনিয়োগের প্রায় ৬৫.৪২ কোটি টাকা এস. সি. আই এর নিজের তৈরী কাজ থেকেই এসেছে।

বিরাট বিস্তার

এর শুরু থেকেই এস. সি. আই-এর চেষ্টা ছিল ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ মালিকদের জন্য উপযুক্ত অংশ নেওয়া। এই লক্ষ্য নিয়ে সে ক্রমশই তার কাজকর্মের জাল বিস্তার ক'রে চলেছে। ১৯৬১-৬২ সালে এস সি. আই-এর জাহাজগুলি মাত্র ৮টি নৌ-পথে যাতায়াত করত। আর আজ তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১ এ, যার দ্বারা তারা পাঁচটি মহাদেশের ৫৮টি দেশে সোজাসুজি জাহাজ চলাচলের বন্দোবস্ত ক'রতে পেরেছে। ভারতবর্ষে এইটিই একমাত্র জাহাজী সংস্থা—যা অষ্ট্রেলিয়া, জাপানের মত দেশ অবধি সোজাসুজি চলাচল করে। ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যকে উন্নত করার উদ্দেশ্য নিয়েই এস. সি. আই নতুন রাস্তা (রুট) বার করার কাজে হাত দিয়েছে। এই রকম দু'টি সার্ভিস পশ্চিম-এশিয়া, মরিসাস, অষ্ট্রেলিয়া এবং পূর্ব-আফ্রিকা অবধি চলাচল করছে। লাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, বরং এস. সি. আই নতুন রাস্তা খোলার জন্যে প্রাথমিক ক্ষতি স্বীকার করতেও রাজী আছে যদি এক সময়ে না এক সময়ে এই পথ লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা দেখায়। সেই লক্ষ্যের কথা মনে রেখেই, বর্তমানে ল্যাটিন আমেরিকা অবধি একটা সোজাসুজি রাস্তা স্থির করার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

উপার্জন

গত বছরের উপার্জন ৫৫.৭৬ কোটি টাকার সঙ্গে তুলনা ক'রে ১৯৭০-৭১ সালে এস. সি. আই-এর উপার্জন দাঁড়িয়েছে ৬৫.৮৪ কোটি টাকা। মোট লাভের অঙ্কও চলতি বছরে ৫.৫১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৬.৯১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। গত বছরের শতকরা ৫ ভাগ হারের লভ্যাংশের তুলনায় এবছর এস. সি. আই শতকরা ৬ ভাগ হারে লভ্যাংশ দিচ্ছে। বস্তুতপক্ষে, এর জন্ম থেকেই এস. সি. আই প্রতি বছরই লভ্যাংশ দিয়ে আসছে। লাভের অঙ্ক এবং অতিরিক্ত অঙ্কের অবস্থাও বেশ ভাল, যদিও ২৩.৪৫ কোটি টাকার যোগাড় করা মূলধন গত দশ বছর ধরে একই আছে। লাভের অঙ্ক এবং অতিরিক্ত অঙ্ক ১৯৬১ সালের ১.২৭ লক্ষ টাকা থেকে ক্রমশ বেড়ে ১৯৭১ সালে ৩০.৯৫ কোটি টাকা হয়েছে।

এত অল্প সময়ে এতটা উন্নতি ক'রতে এস. সি. আই সক্ষম হয়েছে কারণ এই সংস্থা, ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের রূপ পরিবর্তন করতে বরাবরই সতর্ক ছিল। করপোরেশন, তার জাহাজী শক্তির উপাদান এবং প্রকৃতিতে উন্নত ভঙ্গীতে ক্রমশই বিভিন্নতা আনছে। আজ করপোরেশনের কার্গো লাইনার, বাল্ক ক্যারিয়ার, ট্যাঙ্কার, কলিয়ার, আকরিক লৌহ, তেল, কাঠ এবং পণ্যবাহী জাহাজ, যাত্রী এবং মালবাহী জাহাজ, ড্রেজার এবং একটা

লাইট-হাউস ভেসেল বিভিন্ন প্রকারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬২ সালে মালবাহী জাহাজ ছিল মোট জাহাজী শক্তির শতকরা ৮২ ভাগ—কার্গো লাইনারের সংখ্যার সম্প্রসারণ হওয়া সত্ত্বেও আজ এটা মাত্র শতকরা ৪৪ ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগামী দিনগুলি

এখনও পর্যন্ত যদিও জাহাজ চলাচলের কাজটা নির্বঞ্ঝাটেই কেটেছে, তবু এর ভবিষ্যৎ খুব একটা সুনিশ্চিত নয়। সারা পৃথিবীর জাহাজ শিল্প বর্তমানে নানা অসুবিধার সম্মুখীন—কি লাইনার সার্ভিসেস, কি ট্রাম্প অপারেশনে। একদিকে যেমন জাহাজের দাম বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি পরিচালন-ব্যয় যোগ্য বাড়ের দিকে। তাছাড়া অনিয়মিত বাজারের গতি নীচের দিকে এবং ভাড়া বাবদ আয়ের গতিও নিম্নমুখী, বর্তমান অর্থ-সঙ্কটের প্রতিক্রিয়া আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের উপরও পড়বে। বোম্বাই, পূর্ব-আফ্রিকা এবং মাদ্রাজ-সিঙ্গাপুর রুটে যাত্রী চলাচল ক্রমশই কমে যাওয়ায় ক্ষতি হচ্ছে।

এর সঙ্গে ১৯৭৪ এর পর উন্নয়ন-ছাড় এবং সিপিং ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড থেকে সিপিং লাইনস গুলিকে দেওয়া ঋণের উপর সুদ শতকরা ৩ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ৪.৫ ভাগ হওয়াটাও এস. সি. আইকে প্রভাবিত করতে চলেছে। এই সুখের দিন পার হবার আগেই জাহাজী শিল্প ইতিমধ্যেই একটা খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছে।

মাজ গাওঁ ডকের সর্বকালিন রেকর্ড

জাহাজী ক্ষেত্রে আর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা মাজ গাঁও ডক্ লিমিটেডের বার্ষিক বিবরণও একই রকম উৎসাহব্যঞ্জক। উৎপাদন এবং কাজকর্মে উক্ত সংস্থার বার্ষিক বিবরণী সব সময়ের জন্যে একটা উচ্চমান দেখিয়েছে। এই বছরের উৎপাদন লক্ষ্য ছিল ১৫ কোটি টাকার কিন্তু কার্যতপক্ষে উৎপাদন হয়েছে ১৬ কোটি টাকার ওপর। এই অঙ্কটা দেখাচ্ছে গত বছরের উৎপাদন ১৩ কোটি টাকার উপর শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি। কোম্পানি গত বছরের ৬০.১৬ লক্ষ টাকার তুলনায় এবছর ৭২.৮৭ লক্ষ টাকার মোট মুনাফা করেছে। ৩.৩০ কোটি টাকার বর্দ্ধিত মূলধনের উপর গত বছরের শতকরা ৫ ভাগের তুলনায় কোম্পানী শতকরা ৬ ভাগ লভ্যাংশ দিচ্ছে।

১৯৬০ সালে মাজগাঁও ডক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর থেকে জাহাজ নির্মাণের সুযোগ সুবিধা ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং আজ কোম্পানী আধুনিক ধরণের যুদ্ধ জাহাজ, বাণিজ্য জাহাজ তৈরী ছাড়াও সবরকমের জাহাজী মেরামত করার একটা অবস্থায় পৌঁছেছে। গত বছরের তুলনায় ১৯৭০-৭১ সালে জাহাজ মেরামতের ব্যাপারে একটা সব সময়ের রেকর্ড—৪৫২ ৮৮ টাকার অর্থাৎ শতকরা ১৭ ভাগ বাড়ের বিবরণ। মেরামতী কাজ থেকে এই সংস্থা ১৮৬ ১০ লক্ষ টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। 'সী-সেল' এবং 'নাসাউ বে'-এর মত জাহাজে সাফল্যজনক মেরামতী কাজ ক'রে কোম্পানী বেশ সুনামও অর্জন করেছে। পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর ও জাপানের সিপইয়ার্ডগুলির সঙ্গে কড়া প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েও এই সংস্থা এই অর্ডারগুলি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

জাহাজ নির্ম্মাণ

১৯৭০-৭১ সালে কোম্পানী এর দ্বিতীয় মাইন-সুইপারটির এবং দুটি 'এ্যাডক্যাফট' ট্যাঙ্কারের কাজ শেষ ক'রে ভারতীয় নৌবহরকে, এবং বোম্বাই ট্রাষ্টকে ট্রেলিং সাক্সন হপার ড্রেজার এবং পশ্চিম উপকূল কমান্ডারিয়ারের জন্যে তৈরী ৯টি ফিসিং ট্রলার যোগান দিয়েছে। দ্বিতীয় লীণ্ডার ক্লাস ফ্রীগেট 'আই. এন. এস. 'হিমগিরি' এই বছর যাত্রা সুরু করেছে। মহারাষ্ট্র সরকারের ড্রেজারের কাঠামোর কাজ সুরু হয় ১৯৭০ সালের ২৯শে জুন এবং নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী জাহাজটি ১৯৭১ সালের ১৪ই জুন যাত্রা সুরু করে। জাহাজটিতে এখন সাজ-সরঞ্জামের কাজ চলছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে যথাসময়ে এটাকে যোগান দেওয়া যাবে। তৃতীয় লীণ্ডার ক্লাস ফ্রীগেট উৎপাদনের কাজও এবছর সুরু হয়েছে এবং এই জাহাজের বিভিন্ন শাখার নির্মাণের কাজও সাফল্যজনক ভাবেই এগিয়ে চলেছে। আশা করা যাচ্ছে যে ১৯৭২ সালের মার্চ মাস নাগাদ এটা যাত্রা সুরু করবে। কোম্পানী বিভিন্ন ধরণের জাহাজ যেমন ডেষ্ট্রয়ার, ফ্রীগেট, যাত্রী এবং মালবাহী জাহাজ, ড্রেজার, টাগ, বজরা, ট্রলার, লঞ্চ, ভাসমান ক্রেন, ফ্লোটিং ডক, বিশেষ ধরণের পনটুন এবং এ্যাসল্ট বোট তৈরী ক'রতে সক্ষম। ভারতবর্ষে এই প্রথম একটা কোম্পানী আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী দুটি প্রমোদ-জাহাজের পরিকল্পনা এবং নির্মাণের কাজ হাতে নিল। এই দুটি জাহাজ 'ষ্টেট অফ বোম্বে' এবং 'ষ্টেট অফ মাদ্রাস'এর স্থলাভিষিক্ত হবে।

গোয়া সিপ ইয়ার্ড লিমিটেড

মাজ গাঁও ডকের অধীন একটা সংস্থা, গোয়া সিপ-ইয়ার্ড লিমিটেড ও চলতি বছরে ভাল ফল দেখিয়েছে। মেরামতী কাজ, নতুন নির্মাণের কাজ এবং সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজ থেকে মোট উৎপাদন-আয় হয়েছে ৯৮.৩৭ লক্ষ টাকা। গত বছরের তুলনায় শতকরা ২৮.৫ ভাগ বৃদ্ধি। গতবছরের শতকরা ৫ ভাগের তুলনায়, ইয়ার্ড ৬০.০৭ লক্ষ টাকা মূলধনের উপর শতকরা ৬ ভাগ লভ্যাংশ দিচ্ছে।

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

কলকারখানা বাড়িয়ে বেকারী দূর করতে পুঁজি লাগবে কত?

অজিত কুমার বসু

ভারতে ১৫-১৬ বছর বয়সের বেকারের সংখ্যা ১০।১২ কোটি। আংশিক বেকারদের আনুপাতিক হার ধরে এবং সারা বছর ধরে যারা কাজ পায় না তাদের নিয়ে আনুমানিক পূর্ণ-বেকারের সংখ্যা। এই বিপুল সংখ্যক বেকারদের কাজের সংস্থান কি করে করা হবে? সাধারণভাবে বলা হয়, শিল্প তথা কলকারখানা বসিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। পরিকল্পনার সার কথাও তাই। কিন্তু তা কি সম্ভব?

সরকারী ও বেসরকারী সব রকম কল কারখানায় (খনি বা 'মাইনিং' ও 'কয়ারিং' বাদে) ১৯৫১ সালে নিযুক্ত ছিল ২৯ ১৩ লক্ষ লোক। দুটি পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার পর ১৯৬১ সালে সে সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৩ ৮৯ লক্ষ ও ৪৫ ২৯ লক্ষ। ৭০ সালে তা হয়ে থাকতে পারে বড় জোর ৪৬ লক্ষ। অর্থাৎ, তিন তিনটি পঞ্চ বার্ষিক ও ৪টি বার্ষিক পরিকল্পনা কাবার করে কলকারখানার কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বেড়েছে ১৮.৮৭ লক্ষ। কলকারখানায় নিযুক্ত লোক দেশের মোট লোক সংখ্যার শতকরা মাত্র .৮৫ জন বা প্রতি হাজারে ৮ ৫ জন। খনি আদিতে নিযুক্ত ছিল ৫১ সালে ৫.৫০ লক্ষ ও ৬৬ সালে ৭ লক্ষ।

সরকারী হিসাব মতে ১৯৬৫ সালে সব কলকারখানায় ৬৩০০ কোটি টাকা উৎপাদনের কাজে খেটেছিল (প্রডাকটিভ্ ক্যাপিট্যাল) এবং লোক নিযুক্ত ছিল ৩৯.৫৩ লক্ষ। অর্থাৎ নিযুক্ত এক এক জনের জন্য মোট পুঁজি লেগেছে গড়ে প্রায় ১৬ হাজার টাকা। 'পাবলিক' ও 'প্রাইভেট' ছোট বড় 'লিমিটেড' কোম্পানীর শেয়ার বিক্রী করা পুঁজি তথা 'পেড আপ ক্যাপিট্যাল' ১৯৬৫-৬৬ সালে ছিল প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা। লিমিটেড কোম্পানী ছাড়াও কলকারখানা কিছু আছে। কিন্তু সে ছেড়ে দেয়া যাক। তার হিসাবও দুর্লভ। সুতরাং এক এক জনের পিছনে 'পেড আপ ক্যাপিট্যাল' লেগেছে ৭৬০০ কোটি টাকা। বিভিন্ন সরকারী হিসাবে পাওয়া যায়, উৎপাদনে নিযুক্ত সমগ্র টাকার তথা 'প্রডাকটিভ ক্যাপিট্যাল' এর শতকরা ৪৬।৪৮ ভাগ মাত্র শেয়ার বা 'পেড আপ ক্যাপিট্যাল'।

তিনটি পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় কলকারখানা বাবদ সরকারী ও বেসরকারী ভাবে পুঁজি নিযুক্ত হয়েছে (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট) ৪০০০ কোটি টাকা। পরবর্তী ৪টি বার্ষিক পরিকল্পনাতেও আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকা নিযুক্ত হয়েছে ধরলে সর্বমোট ৪৫০০ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনা কালে নিযুক্ত লোকসংখ্যা বেড়েছে ১৬.৮৭ লক্ষ। এই হিসাবে পরিকল্পনায় মাথা প্রতি পুঁজি নিযুক্ত হয়েছে ২৬,৬৭৪ টাকা। মৌল শিল্প তথা 'বেসিক ইণ্ডাষ্ট্রি'র জন্য পুঁজি লাগে অনেক বেশী। তাছাড়া, পরিকল্পনার আগের পুরাতন কলকারখানাতেও কিছু টাকা নিযুক্ত হয়েছে সম্প্রসারণের জন্য (রিপ্লেসমেন্ট ও মডার্নাইজেসন তথা মেরামতী ও আধুনিকী করণের জন্য আরও ৪০৫ কোটি টাকা)। উৎপাদনের জন্য আরও অন্তত: সম পরিমাণ লেগেছে।

* সরকারী হিসাব মতে দেশের মোট জন সংখ্যার অনুপাতে, সব রকম কলকারখানায় নিযুক্ত ছিল, ১৯৬১ সালে শতকরা ০'৭৭ জন ও ৬৯ সালে ০ ৮৬ জন এবং চা কফি রবার আদি বাগিচা ও 'মাইনিং' ও কয়ারিং তথা খনি আদি বাদে অন্যান্য সকল কাজে নিযুক্ত ছিল যথাক্রমে শতকরা ১.৬৩ ও ১ ৯৯ জন। অর্থাৎ, কলকারখানায় নিযুক্ত গড় লোকসংখ্যার প্রায় ২ ২২ গুণ লোক এই সব 'অন্যান্য' কাজে নিযুক্ত। ১৯৬১ থেকে খনি আদিতে নিযুক্ত লোকসংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ কমেছে এবং বাগিচা শিল্পে বেড়েছিল বটে তবে কমে আসছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে সাধারণ খনি আদি ও বাগিচা শিল্পের সম্প্রসারণ অপেক্ষাকৃত দুঃসাধ্য।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কাজে নিযুক্ত লোক সংখ্যা বেড়েছে: কলকারখানায় শতকরা ৩৩ ৬৪ ভাগ, বিজলী ও স্বাস্থ্য রক্ষা (ইলেক্‌ট্রিক এণ্ড স্যানিটারি সার্ভিস) সংক্রান্ত কাজে ৫৫.৪৪ ভাগ, গৃহাদি নির্মাণ (কনস্ট্রাক্‌সন) কাজে ২৩ ভাগ, যোগাযোগ ও পরিবহন কাজে ২৬ ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য ও দোকানদারী (ট্রেড এণ্ড কমার্স) কাজে ১১৮ ভাগ এবং বাকী নানা কাজে (সার্ভিসেস্) ৫৬ ১০ ভাগ। ১৯৫১ সাল থেকে, অর্থাৎ ১ম ও ২য় পরিকল্পনার কালে ও বাজারে মন্দা দেখা দেবার আগে, এই সব ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার বেশী বলেই মনে হয়।

বাজারের মন্দা, ('রিসেসন'), চরম রূপ নিয়ে আর্থিক ও শিল্প সঙ্কটের সৃষ্টি হওয়াতেই ১৯৬৬ সালে ভারতীয় মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময়-মূল্য হ্রাস করা হয়েছিল। কিন্তু সে মন্দার সূত্রপাত ২য় পরিকল্পনার শেষের দিক বা ৩য় পরিকল্পনার প্রথম থেকেই। এই মন্দা না ঘটলে ব্যবসা-

বাণিজ্য ও দোকানদারী, গৃহ-নির্ম্মাণ, পরিবহন ও অন্যান্য সকল কাজই বহুলাংশে বৃদ্ধি পেতো এবং তারই ফলে শিল্পের উৎপাদন ও নিযুক্ত লোক সংখ্যাও বাড়তই, খনি আদি ও বাগিচা শিল্পেও বাড়তো। বাজারে বেচাকেনা বাড়লেই এগুলিও বাড়ে। সেই স্বাভাবিক অবস্থা কল্পনা করে নিয়েই ধরা যাক যে কলকারখানায় নিযুক্ত লোক সংখ্যার তিনগুণ এই সব কাজে নিযুক্ত হবে।—আরও অনেক বেশীই হবার কথা যদি জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে।

তাহলে ১০।১২ কোটি বেকারের মধ্যে আড়াই।তিন কোটি লোককে কলকারখানায় নিযুক্ত করতে হবে। তাদের জন্য মূলধন বা 'পেড আপ ক্যাপিটাল' লাগবে—প্রধানতঃ ভোগ্য-পণ্যের (কনজ্যুমার্স গুডস্) কারখানা করতে অন্ততঃ ৩০ হাজার কোটি টাকা এবং বেশী না হলেও আরও সমপরিমাণ টাকা তো লাগবেই উৎপাদনের জন্য। মৌল শিল্প তথা 'বেসিক ইণ্ডাষ্ট্রি' যদি করা হয় তাহলে লাগবে দেড় গুনো। আর, মৌলশিল্প না করলে ভোগ্য-পণ্য উৎপাদনের কলকব্জা আসবেই বা কোথা থেকে। তাছাড়া, বাকী ৮।৯ কোটি লোকের জন্য ঐ সব অন্যান্য কাজেও তো পুঁজি কম লাগবে না। শুধু তাই নয়। প্রতি বছর কাজের যোগ্য লোক বাড়ছে ক্রমবর্দ্ধিত হারে ৭৮।৮০ লক্ষ করে—১৯৫৬ সালে যে লোক সংখ্যা বেড়েছে তারাই কাজের যোগ্য হয়েছে। কেবল এদেরই নিয়োগ করতে পুঁজি লাগবে প্রতি বছর অন্ততঃ ১৫।২০ হাজার কোটি টাকা। কলকারখানায় এদের এক চতুর্থাংশ নিয়োগ করতে লাগবে অন্ততঃ ৪।৫ হাজার কোটি টাকা।

১০।১৫ বছরের মধ্যেও বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রতি বছর যে কাজের লোক বাড়ছে তাদের তো নিয়োগ করতেই হবে সেই সঙ্গে পিছনের তথা পুরাতন বেকারদেরও কিছু কিছু নিয়োগ করতে হবে। তাদের জন্য কলকারখানা করতে পুঁজি লাগবে প্রতি বছর অন্ততঃ ৬।৮ হাজার কোটি টাকা। আরও সমপরিমাণ লাগবে উৎপাদনের জন্য, 'ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল'। তাছাড়া, বাকী তিন চতুর্থাংশ লোকদের 'অন্যান্য' কাজের জন্যও লাগবে প্রচুর টাকা। তবে, প্রারম্ভিক পুঁজি প্রতি বছর ৬।৮ হাজার কোটি টাকা যে আর্থিক অবস্থায় সংগ্রহ করা সম্ভব হবে সে অবস্থায় উৎপাদন কাজের টাকা ও ঐ 'অন্যান্য' কাজের টাকারও অনেকাংশই সংগৃহীত হবে বলেই অনুমিত হয়। তা হবেই আসছে বরাবর। কিন্তু প্রতি বছর ঐ ৬।৮ হাজার কোটি টাকা কি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে?

ধরেই নেয়া যাক যে ঐ টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। তাহলেও গুরুতর মৌলিক সমস্যা আছে। প্রথমতঃ তদুপযোগী যন্ত্রপাতি তৈরীর ব্যবস্থা নেই এবং বিদেশ থেকে আমদানী করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রাও জুটবে না। এখনই বিদেশী মুদ্রার অভাবে অতি দরকারী যন্ত্রাংশ বা 'স্পেয়ার পার্টস্' ও 'মেনটেন্যান্স গুডস্' আনা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ, শুধু কলকব্জাই নয়, শিল্পের উপযোগী কাঁচা মালও আমদানী করতে হবে আরও। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে এখনই পর্য্যাপ্ত কাঁচা মাল আনা যাচ্ছে না বলে শিল্পকে পুরো কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না, উৎপাদন কম হচ্ছে। তৃতীয়তঃ, বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান হলেও এত অল্প কালের মধ্যে বছর বছর হাজার হাজার কোটি টাকার বিদেশী যন্ত্রপাতি-কলকব্জা পাওয়া যাবে কিনা বা, দেবে কিনা, সে বিষয়েও গভীর সন্দেহ আছে। চতুর্থতঃ, কৃষি কাজে যারা নিযুক্ত তারা বছরে ১২০ দিন (বর্তমানে আরও বেশী) অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ সময় সম্পূর্ণ বেকার থাকে, মজুরীর হার বা আয় তো কম আছেই। কিন্তু চাষের মরশুমে তাদের পুরো কাজ থাকেই শুধু নয়, কাজ শেষ করে উঠতে পারে না, যার জন্য যথা সময়ে ও যথাযথ ভাবে কাজই হয়ে ওঠে না। তাদের কলকারখানায় বা অকৃষি কাজে স্থানান্তরিত করলে কৃষির কাজ লোকাভাবে ব্যাহত হবে। তাহলে কৃষি-কাজে যন্ত্রের প্রবর্ত্তণ করতে হবে। তার জন্যও, আবার প্রচুর পুঁজিনির্ভর যন্ত্র শিল্পের ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে অথবা তা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে তাও সম্ভব নয়। সুতরাং, যে যার কাজ ক'রে হাতে অবসর সময়ে রোজগার করতে পারে তেমন কাজের সৃষ্টি করতে হবে।

সাধারণভাবে কুটীরশিল্প প্রবর্ত্তনের দ্বারা এদের অবসর সময়ের কাজের ব্যবস্থার কথা বলা হয়। কিন্তু দীর্ঘ ২৩।২৪ বছরে এবং সবিশেষ পরিকল্পনার কালে বহু বহু কোটি টাকা ব্যয় ক'রে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে গতানুগতিক বা প্রচলিত তথা 'ট্র্যাডিসন্যাল' কু[illegible] দ্বারা এ সমস্যার সমাধান একটুও সম্ভব নয়। এই সব কুটীর শিল্পেরই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা।

উপরোক্ত বাধা গুলি দূর ক'রে দ্রুত শিল্প-সমৃদ্ধি যদি সম্ভবও হয় তা হলেও গুরুতর সমস্যা আছে; এবং এটাই সব চেয়ে বড় ও মূল সমস্যা। কলকারখানা বসিয়ে উৎপাদন বাড়াতে দীর্ঘ সময় লাগবে। শিল্প হিসাবে ৩।৪।৬ বছর লাগবে। অথচ তার জন্য অনুৎপাদনের কাজেই হাজার হাজার কোটি টাকার পুঁজির অধিকাংশটা বছর বছর খরচ হবে। তাতে মুদ্রাস্ফীতি, দুষ্প্রাপ্যতা ও মূল্যবৃদ্ধি এবং তজ্জনিত মজুরী-বেতন বৃদ্ধি ও পরিকল্পনার ব্যয়-বৃদ্ধি হতে থাকবে। অর্থাৎ, মজুরী-বৃদ্ধি ও মূল্য-বৃদ্ধি, দর বৃদ্ধি ও বেতনবৃদ্ধি এই দুই পাকচক্রের আবর্ত্তন বাড়বে, যা ভিমটা

(৮ পৃষ্ঠার দেখুন)

পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করা কি সম্ভবপর?

পশ্চিম বঙ্গে রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা-আভ্যন্তরীণ অভাব এবং ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার দরুণ ভারতের অন্য রাজ্যের লোকেরা ঐ রাজ্যের লোকদের ভাল চোখে দেখেন না। সেখানকার ছাত্রদের এবং যুবক সমাজকে কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখা হয়। অন্য রাজ্যের লোকেদের ধারণা যে বাঙালী যুবকদের অধিকাংশই কম্যুনিষ্ট বা নক্সাল পন্থী। তাই পশ্চিম বঙ্গকে ভারতের সম্পদ রূপে গণ্য না করে দেশের অন্যান্য অংশের ওপর অযথা বোঝা রূপে মনে করা হয়। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে গেলে দেশের গঠনমূলক কার্যে পশ্চিমবঙ্গের সত্যিই কি কোন অবদান নেই?

দেশের শতকরা ১৫ ভাগের ওপর উদ্যোগমূলক প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং সমগ্র দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা ২১ ভাগ এই রাজ্য থেকেই আসে। সমগ্র ভারতের মোট কয়লা উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ পশ্চিম বঙ্গ যুগিয়ে থাকে। পাট শিল্প এবং পাট উৎপাদনের ব্যাপারে এই রাজ্যের একচেটিয়া অধিকার। পাট বস্ত্র ভারতের কৃষি এবং উদ্যোগিক উৎপাদন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য উৎপাদনেও পশ্চিমবঙ্গের অবদান কম নয়। তাছাড়া রাসায়নিক দ্রব্য এবং ভেষজ ঔষধ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই রাজ্য অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্রেও সামগ্রিক নিয়োগের এক তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গেই করা হয়েছে। ১৯৬৭ সালে ঐ রাজ্যে ৬১৯ কোটি টাকা তপশীল ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ স্বরূপ নিয়োগ করা হয়েছে, যা সামগ্রিক জাতীয় ঋণের (২৭৩৪ কোটি টাকা) শতকরা ২২ ৫ ভাগ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ আজ এক বিরাট সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটের ভিতর দিয়ে কেন চলেছে?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি এবং শিল্পোদ্যোগের দিকে একটু দৃষ্টি ফেরাতে হবে। ঐ রাজ্যের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১২৮০ লক্ষ একর এবং তন্মধ্যে ৪ লক্ষ একর জমি চাষীদের মধ্যে পুনর্বন্টনের জন্যে উদ্বৃত্ত হয়েছে।

বাণী গুপ্ত

সোনারপুর—আরাপাচে পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনা অনুসারে ১০৫ বর্গমাইল পরিমিত এলাকা শক্তিশালী পাম্পের সাহায্যে জল নিষ্কাশন করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হবে। এই জাতীয় পরিকল্পনা ভারতে এই প্রথম। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায়ে ২৩,১৬০ একর জমি ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে, এবং এই উদ্ধার—করা জমি থেকে ২১ হাজার মণ ধান উৎপন্ন হয়েছে।

এ ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গে বিকাশ পরিকল্পনার অন্তর্গত দুটি পরিকল্পনা করা হয়েছে, যথা—(১) গঙ্গা ব্যারেজ পরিকল্পনা (এটা ফরাক্কা ব্যারেজ পরিকল্পনা বলেও পরিচিত) এবং (২) জল ঢাকা জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনা।

গঙ্গা ব্যারেজ পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যে উন্নতি হবে তা হোল: (১) কলকাতা বন্দরের উন্নতি বিধান, (২) রাজ্যের উত্তর এবং দক্ষিণ অংশের সঙ্গে সরাসরি রেল এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, (৩) এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় এলাকার ভিতর দিয়ে কলকাতা থেকে বিহার, উত্তর প্রদেশ ও আসাম পর্য্যন্ত জল পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা।

রাজ্যের জল বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জলঢাকা জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তর বঙ্গের জল ঢাকা নদীর জলশক্তি থেকে ২৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দার্জিলিঙএর রামাম্মন জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনাও রাজ্যের বিদ্যুৎ শক্তি বৃদ্ধি করবে। বলা বাহুল্য যে রাজ্যের শিল্প এবং উদ্যোগ সম্প্রসারণের জন্য সস্তায় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের বিশেষ প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের ঔদ্যোগিক ব্যবস্থার অন্তর্গত পাট, চা, তুলা, বস্ত্র শিল্প, কাগজ উৎপাদন, রবার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী উৎপাদন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের রেজিষ্টীকৃত কারখানার সংখ্যা ৬,১১১ এবং মোট কর্মচারীর সংখ্যা ৮,৬৫,৯২৭। তন্মধ্যে পাট কলের সংখ্যা-৮১ এবং কাপড়ের মিলের সংখ্যা ৪১। রাজ্যে চা'য়ের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৯০০ লক্ষ পাউণ্ড। কয়লার খনির সংখ্যা ২২৮ এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ-১৬.১০ লক্ষ টন।

পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য খাদ্য এবং কর্ম সংস্থানের প্রথমে প্রয়োজন। নতুন কর্মসংস্থানের জন্য

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্পাদকের দপ্তর—

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আমি একজন কারুশিল্প শিক্ষক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারুশিল্প উন্নয়ন শাখার সঙ্গে জড়িত। আমার শিক্ষার সূচীর মধ্যে আছে ম্যাকড়ার পুতুল। সরকারী গ্রন্থাগারে "ধনধান্যের" সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে অনেক দিন। প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই ভেবেছিলাম ধনধান্যের বাংলা সংস্করণ এই রাজ্যের একটি অভাব পূর্ণ করবে এবং তাই করেছেও। কারুশিল্পী হিসাবে ধনধান্যের প্রচ্ছদ, ছাপা, সম্পাদনা এবং কারুশিল্প বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ ভাল লেগেছে। সম্প্রতি "পৌত্তলিকের" লেখা আমার বিষয় বস্তুর উপর একটি সচিত্র প্রবন্ধ অত্যন্ত ভাল লেগেছে। এর আগে শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধও ভীষণ ভাল লেগেছে। ভাল লেগেছে সংবাদ পরিক্রমা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও শিল্প সংক্রান্ত প্রবন্ধ।

নমস্কারান্তে

মমতা চক্রবর্তী

বাঁশদ্রোণী গভর্ণমেন্ট কলোনী

২৪ পরগণা

বেকারী দূর কোরতে পুঁজি কত লাগবে

৬ পৃষ্ঠার পর

পাঁচ বার্ষিক ও চারটি বার্ষিক পরিকল্পনায় ক্রমাগত হয়ে এসেছে। তাছাড়া, উৎপাদন হলেই নিস্তার নেই। সবই তো ভোগ্য পণ্যের শিল্প হবে না। এমন শিল্পও হবে যাতে উৎপাদন হলেও ভোগ্য পণ্য না হয়ে মুদ্রাস্ফীতি বাড়াবে বৈ কমাবে না। উল্লেখযোগ্য যে, ভোগ্যপণ্য-শিল্পের জন্য এই সব যৌগ শিল্পই আগে দরকার এবং তা বসাতেও সময় বেশী লাগে এবং পুঁজিও অনেক অনেক বেশী লাগে। যেমন, মজুর প্রতি পুঁজি লাগে বয়ন শিল্পে ৫০৮০ টাকা, বিবিধ খাদ্য সামগ্রী শিল্পে ৬৯০০ টাকা, ইত্যাদি এবং লোহা ইস্পাত, বিদ্যুৎ ও গ্যাস, 'মেসিনারি' প্রভৃতি বাবদ যথাক্রমে ৩৬,৫০০,৬৯,১০০ ও ১২,০০০,১৬,৭০০ টাকা। সর্বোপরি, মূল্য ও বেতনের এই পাকচক্রের ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমবে ও দুর্দশা বাড়বে বা শিল্পের মূলে আঘাত করবে।

পরিকল্পনায় শিল্পে নিযুক্ত (কোটি টাকা) মূলধন

শিল্প	১ম	২য়	৩য়	মোট
মেটালারজিক্যাল	৬১.০০	৭৭০ ০০	৪৭৮.৪০	১৩০৯.৪০
এঞ্জিনিয়ারিং	৪৬.০০	১৭৫.০০	৫২৫.২০	৭৪৬.২০
রাসায়নিক—ভারি, সার, ওষুধ, কোল কারবনাইজেশন, রং ও প্লাস্টিক	২৭.০০	১৪০.০০	৪৪৬.০০	৬১৩.০০
সিমেন্ট, বিদ্যুৎ, পরসেলিন ও রিফ্রাকটারি	১৭.৫০	৬০.০০	৮৫.০০	১৬২.৫০
পেট্রোলিয়াম রিফাইনিং	৪৫.০০	৩০.০০	৭৩.৫০	১৪৮.৫০
কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, সিকিউরিটি পেপার	১২.০০	৪০.০০	১০৫.৫০	১৫৭.৫০
চিনি	৫.০০	৫৬.০০	১০০.০০	১৬১.০০
টেকসটাইল (রেয়ন ও ষ্টেপল্ ফাইবার বাদ)	২০.০০	৫০.০০	৩৪.৫০	১০৪.৫০
রেয়ন ও ষ্টেপল্ ফাইবার	৮.০০	৩৪.০০	৭৫.০০	১১৭.০০
অন্যান্য	৫১.৫০	১১৫.০০	২৬১.৯০	৪২৮.৪০
	২৯৩.০০	১৪৭০.০০	২১৮৫.০০	৩৯৪৮.০০
মেরামতী ও আধুনিকীকরণ	১০৫.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	৪০৫.০০
	৩৯৮.০০	১৬২০.০০	২৩৩৫.০০	৪৩৫৩.০০
পাবলিক বা সরকারী	৬০.০০	৭৭০.০০	১০৬০.০০	২১৬০.০০
প্রাইভেট বা বে-সরকারী	৩৩৮.০০	৮৫০.০০	১২৭৫.০০	২৪৬৩.০০

*ইণ্ডিয়া—পকেট বুক অব ইকনমিক ইনফরমেশন থেকে গৃহীত।

(অন্য তালিকার জন্যে তৃতীয় প্রচ্ছদপট দ্রষ্টব্য)

বৈষয়িক সমস্যা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

অমর নাথ দত্ত

তিনটি পঞ্চবার্ষিকী ও তিনটি বাৎসরিক পরিকল্পনার কাল-ক্রম অতিক্রম করে আমাদের জাতীয় অর্থব্যবস্থা বর্তমানে চতুর্থ পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে বিবিধ ঘাত প্রতিঘাতে ও ঘটনা প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। পরিকল্পনাগুলির প্রত্যেক স্তরে সমস্যার রূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নানাপ্রকার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কখনও বা খাদ্য সমস্যা, কখনও বা ভারী শিল্পের প্রসার, কখনও বা রাজনৈতিক যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির জন্য প্রতিরক্ষার আয়োজন, কখনও বা আন্তর্জাতিক বৈষয়িক ব্যবস্থার টানাপোড়েনে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য-বিধানের প্রয়াস, আবার বিশেষ বিশেষ বছরগুলিতে এই সমস্ত সমস্যা অতিক্রম করে বন্যা বা খরার প্রবল প্রকোপ সামলাতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাত্রাপথ ব্যাহত হয়নি একটি অনুন্নত দেশ কিভাবে স্বয়ংক্রিয় পর্যায়গুলির মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ উন্নততর পর্যায়ে আসতে পারে আমাদের পরিকল্পিত বৈষয়িক ব্যবস্থার প্রসার তার যথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। বিগত ষাটের দশক থেকে যে চারটি প্রধান সমস্যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেগুলি সংক্ষেপে হল :

(১) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও বেকার সমস্যা (২) খাদ্য সমস্যা, (৩) মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা ও (৪) বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। এগুলির মধ্যেও কতকগুলি সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্টের মধ্যে প্রধান হল মুদ্রাস্ফীতি দমন ও বেকার সমস্যার প্রতিরোধ। আলোচ্য দুটি সমস্যাই কিন্তু এক সাধারণ সমাধান সূত্রের উপর নির্ভরশীল, আর তা হ'ল ব্যাপকভাবে শিল্পপ্রসার ও ব্যাপকতার কাজে উৎপাদনবৃদ্ধি। কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তরগুলি থেকে তা নানাভাবে ব্যাহত হতে থাকে। প্রধান সমস্যা দেখা যায় অনুন্নত দেশের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে, কারণ মুদ্রাস্ফীতির প্রসার রোধ করা ক্রমশ: দুরূহ হয়ে পড়ে। কাজেই বর্তমান প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর একটা বৃহত্তর অংশে উন্নয়ন কার্যক্রমের তাগিদে মুদ্রাস্ফীতির গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

কৃষিপ্রধান অনুন্নত দেশগুলির মৌল সমস্যা এই যে সেখানে কৃষিব্যবস্থা শিল্পকে যোগান না দিয়ে সমগ্র দেশের জীবনযাত্রার এক বিরাট অংশ দখল করে বসে আছে। সনাতন এই কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা বিগত কয়েক শতাব্দীর এক-রকম দুঃস্বপ্ন হয়েই রয়েছে। জরাজীর্ণ ও ক্রমবর্ধিত কৃষির পক্ষে পুনরায় উৎপাদনশক্তি ব্যবহার করে আয় ও বাড়তি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি বা প্রচলিত ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা আর কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কাজেই উন্নয়নের তাগিদে শিল্প সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে; কারণ তাছাড়া কোনক্রমেই আয় ও বিনিয়োগ-বৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই মূল সমস্যা দাঁড়াচ্ছে একটা দ্রুত বিনি-য়োগের কার্যক্রম ও পদ্ধতি নিয়ে। আলোচ্য ব্যবস্থাকেই ত্বরান্বিত করতে হলে দেশের মধ্যে ঘাটতি ব্যয়ের সীমা বাড়িয়ে অথবা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণের পরিধি সম্প্রসারণ করে অর্থ-সংস্থান হয়। কিন্তু কতখানি বাড়তি অর্থসংস্থানে দেশের কাযকরী বিনিয়োগ ঘটবে অথবা যথাযথভাবে উৎপাদনের সদ্ব্যবহার ঘটবে তা নির্ণয় করা রীতিমত কষ্টসাধ্য। মুদ্রার প্রসার ঘটলেই দাম বাড়বে। অবশ্য কতখানি বাড়বে তা নির্ভর করবে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অর্থসংক্রান্ত অভ্যাস ও আভ্যন্তরীণ উৎপাদন সংক্রান্ত লেনদেনের উপরে, কিন্তু তা একবার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই ক্রমশঃই বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না এক প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই "মাত্রার" সীমারেখা যে কোথায় টানা হবে তা নিয়ে সঠিক কেউ কোন কথা বলতে পারে না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর তা অনেকাংশে নির্ভর করে বলে দেশের বৈষয়িক কর্তৃপক্ষ সেদিকে একটা আন্দাজ করতে পারেন। ১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অধীনে নিয়োজিত বার্নস্টাইন মিশনও এই রকম একটা মন্তব্য করেছিলেন।

মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্য অনেকটা পরিহার করা যেতে পারে যদি দেশে ব্যাপক মাত্রায় শিল্প এবং কৃষি-উৎপাদন চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে বাড়তে থাকে। কিন্তু এখানে আবার এসেছে সেই সমস্যা অন্যভাবে যেটিকে আমরা দুই নম্বর সমস্যা বলে অভিহিত করতে পারি। উৎপাদন বৃদ্ধির এই জটিলতায় মুদ্রাস্ফীতি জনিত নতুন সমস্যাটির কোন সমাধান আপাতভাবে সম্ভব বলে মনে হয় না। অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশে বাড়তি অর্থসংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে উৎ-পাদনের উৎপাদনগুলি অধিকতর সহজ লভ্য হয়ে উঠে বলে উৎপাদন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু অনুন্নত দেশে নানাবিধ বাধাবিপত্তি ও বিশেষ অবরোধ (technical bottlenecks) এভাবে কায়েমী হয়ে বসে যে উৎপাদন প্রসারের পথ প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে আসে। তাই, আন্তর্জাতিক কার্যবলীর এক অর্থনৈতিক সমীক্ষার পর রাষ্ট্রসংঘ (UNO report, 1954) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলির দ্রুত উন্ন-য়ন ঘটাতে গিয়ে তড়িঘড়ি মুদ্রাস্ফীতির যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাতে করে আর একটি নতুন সমস্যার সংযোজন ঘটেছে মাত্র, মৌলিক সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। নতুন সমস্যাটি হল যে জিনিষপত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে যাবার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সর-কারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে দড়ি টানাটানির এক প্রতিযোগিতা শুরু

হয়ে গিয়েছে। জাতীয় আয়ের কে কতখানি নেবে এই হ'ল কথা। এরই জন্য বিভিন্ন অংশে মজুরি বৃদ্ধির দাবী, বোনাস বৃদ্ধির দাবী, উৎপাদনের লভ্যাংশে বৃদ্ধির দাবী এবং এত দাবী পূরণ করতে অসমর্থ অনুন্নত দেশের পক্ষে আরও মুদ্রা সৃষ্টি করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না

বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলাফল

উন্নয়ণ কর্মকাণ্ডে যাঁরা অর্থের ভূমিকার উপর জোর দিয়ে থাকেন তাঁদের মতে বিনিয়োগের তথা মোট খরচের বহর বাড়াতে পারলেই দেশের সবই নিরসন হবে, এরকম একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তদনুযায়ী পরিকল্পনাশ্রিত অর্থব্যবস্থায় সরকার প্রতি ধাপে ধাপে ব্যয়বরাদ্দের মাত্রা বৃদ্ধি করে গেছেন। প্রথম যোজনায় সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১,৫৬০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় যোজনায় সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘটে ৩,৬৫০ কোটি টাকা, তৃতীয় যোজনায় সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ৬,৩০০ কোটি টাকার এলেও মোট ব্যয়বরাদ্দ ৮,৫৩০ কোটি টাকার হিসাবকে অনায়াসেই অতিক্রম করে যায়। এ পর্যন্ত যা হিসাব করা হয়েছে তাতে চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের ব্যয়-বরাদ্দ হ'ল ১৪,৮৮২ কোটি টাকা, আর বেসরকারী ব্যয়ের প্রস্তাবিত পরিমাণ হ'ল ৮,৯৮০ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত লক্ষ্যণীয় যে উন্নয়ণ পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের ব্যয়ের অংশ আপেক্ষিকভাবে বৃদ্ধির পথে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তা ছিল ৮'৭ শতাংশ আর তৃতীয় পরিকল্পনায় তা হয়েছে ১৮·৩ শতাংশ। স্বভাবতঃই চতুর্থ পরিকল্পনায় যে আলোচ্য হিসাব বিস্তৃত হয়েছে তাতে বিতর্কের অবকাশ নেই। অবশ্য ব্যয়ের নীট দাদনের হিসেবে একটু অন্য রকমের আঁচ পাওয়া যায়। যেমন তৃতীয় যোজনায় সরকারী ক্ষেত্রে ৬১ শতাংশ ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ৭৭ শতাংশ দাদন দেওয়া হলেও অর্থসংস্থানের প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে ১,২৫০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় করার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে অব্যবহৃত সংরক্ষিত অর্থ সরকারী ক্ষেত্রে সঞ্চালন করা হয়েছে।

কিন্তু বিনিয়োগের এই প্রসারিত কার্যক্রমে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সঞ্চরিত প্রবণতা ধীরে ধীরে কাজ করে যেতে থাকে আর এজন্যই এদিক থেকে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলি ক্রমশঃই মুদ্রাস্ফীতির শিকার হতে থাকে; এধরনের প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রেই ব্যাপকতর বিনিয়োগ ঘটতে থাকে, কারণ রাস্তাঘাট, সড়ক ও পরিবহন, বিদ্যুৎ ও জলসরবরাহ, পোতাশ্রয়, গৃহনির্মাণ, ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করে যেমন একদিকে শিল্প-বুনিয়াদ (infra-structure) গড়ে তোলা হয়, তেমন অপরদিকে অসুবিধা হল এই যে উপরোক্ত বিনিয়োগসূচী থেকে অথবা সরকারী ক্ষেত্রের পরিচালনাধীনে কার্যরত ইস্পাত ও অন্যান্য ভারী শিল্পসূচী থেকে (যেমন ভারতে) অল্প সময়ে আশানুরূপ উৎপাদন লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে এই সব বিস্তৃত কর্মসূচির সম্পাদন ও রূপায়নের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ঘটে তার জন্য আভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা একান্ত দুঃসাধ্য বিবেচিত হওয়ায় কৃত্রিম উপায়ে অর্থ সংস্থান করা হয়ে থাকে। কার্যতঃ প্রকৃত সঞ্চয় ও সৃষ্ট অর্থের মধ্যে এই যে বিরাট ফারাক দেখা যায় একে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিত ব্যয় ব্যবধান" বা inflationary spending gap বলা হয়ে থাকে। ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে আন্তর্জাতিক অর্থসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের যে সমীক্ষা করা হয় তাতে বলা হয়েছে যে 'মুদ্রাস্ফীতি প্রপীড়িত অনুন্নত দেশগুলিতে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ এত অধিক পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আশ্চর্যবোধ করবার কিছুই নাই। ভারতবর্ষে প্রথম পরিকল্পনা সুরু করবার আগে মোট অর্থ সরবরাহের পরিমাণ ছিল ১৮০০ কোটি টাকা। তা থেকে ২২০ কোটি টাকা বেড়ে গিয়ে ১৯৫০-৫১ সালে সামগ্রিক অর্থ সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,০২০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্থ সরবরাহে মোট বৃদ্ধি ঘটে ৬৫০ কোটি টাকার কাছাকাছি আর তৃতীয় পরিকল্পনায় তা ১৬৬০ কোটি টাকার মতন বেড়ে যায়। ১৯৬৬-৬৭ সালে, অর্থাৎ তৃতীয় যোজনার ঠিক পরের বছরই ৪৩০ কোটি টাকার মত অর্থ সরবরাহ বাড়ে। কাজেই মোট হিসেবে দেখা যায় যে মাত্র তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচটি বছরে ও তার অব্যবহিত পরবর্তী বৎসরে, অর্থাৎ সাকুল্যে ছয় বৎসরে জনসাধারণের কাছে সরবরাহকৃত অর্থের পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগ বেড়েছে। তাই এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমীক্ষার সেই একই প্রতিবিধান শোনা যায় যে সামগ্রিক উৎপাদনের তুলনায় সেই সব ক্ষেত্রেই বা দেশেই মোট অর্থের সরবরাহ বর্ধিত হারে বাড়তে থাকে যেখানে এইরকম ঋণের প্ররোচনাই ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ইন্ধন জুগিয়ে থাকে।

আলোচ্য ঘটনাপ্রবাহের সম্মিলিত প্রভাব বর্ধিত চাহিদার সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, একটি দেশের মূল্যস্তরের উপর যে সকল কারণ পরম্পরা চাহিদাজনিত চাপের সৃষ্টি করে থাকে তার মধ্যে জনসংখ্যা নিয়োগ ও বৃদ্ধির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে, কারণ তা থেকে জাতীয় অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্যে আরও জোয়ার এসেছে। ১৯৬৬ সালে খাদ্য সম্পর্কিত তদন্তকারী কমিটি তাঁদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন যে জাতীয় অর্থনীতিতে ২.৫ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, ফলে সেইসঙ্গে (অবিশ্যি সমানুপাতে না হলেও) আয়ও নিয়োগ বেড়েছে। সরকারী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোজনাতে শতকরা ৭ ভাগ হারে যেমন বেড়েছে তেমন এদিকে আবার মোট আয় (মজুরি ও মাসিক বেতনের হিসেবে) তদনুযায়ী বৃদ্ধি পেয়েছে। হিসেবে দেখা গিয়েছে যে প্রথম দুটি পরিকল্পনায় আয় বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৪.৮ ও ৭.৭ শতাংশ হলেও তৃতীয় পরিকল্পনায় তা ১৫ শতাংশের মত বেড়েছে, আর বড় কথা হ'ল এই যে আলোচ্য আয় বৃদ্ধির একটা মোটা অংশই দেশবাসীর এমন অংশের হাতে চলে এসেছে যাদের ভোগপ্রবণতা মাত্রাতিরিক্ত বেশি। ফলে ভোগ্যপণ্য, বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রীর উপরে বিশেষ চাহিদা সৃষ্ট হয়ে চাপ ক্রমশঃই ঘনীভূত হচ্ছে। এখানে যদি আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির যৌথ প্রভাব বিশ্লেষণ করে তা অঙ্কের হিসেবে

দেখানো হয় তাহলে বোঝা যাবে যে প্রথম পরিকল্পনায় মোট চাহিদাগত যে বৃদ্ধি ঘটেছে তা হ'ল শতকরা ৬৮ ভাগ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তা বেড়ে শতকরা ৮২ ভাগ আর তৃতীয় যোজনাকালে তা কিন্তু হয়েছে শতকরা ১০০ ভাগের অনেকটাই অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছে। এখন আর বৃদ্ধির যে হিসাব মেলে তা হ'ল প্রথম যোজনায় ২৫.৬ ভাগ, দ্বিতীয় যোজনায় তা হ'ল শতকরা ৪৪ ভাগ আর তৃতীয় যোজনায় তা ১০০ ভাগের কিছু বেশি (অবিশ্যি ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস অবধি যে হিসেব মিলেছে তার ভিত্তিতে)। উপরোক্ত তথ্যাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে প্রত্যেক যোজনার ধাপে ধাপে আর্থিক চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধির পথে এবং যেহেতু মূল্যস্তরও সমানেই বেড়ে চলেছে এজন্য উপরোক্ত দুটি ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা বোধ হয় কষ্ট কল্পনা নয়, বিশেষতঃ যখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন ও সরবরাহের সঙ্গে যোগানের একটা বিশেষ ধরনের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

মুদ্রাস্ফীতির

বর্তমান পর্যায়ে চক্রবৃদ্ধি হারে যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে তার গতি প্রকৃতি পূর্বাপেক্ষা ইতর বিশেষ হলেও আসলে উৎস তার একই সূত্র থেকে উদ্ভূত। প্রথমতঃ জনসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়ছে, আর ওদিকে সবুজ বিপ্লব ও উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগে কৃষির ফলন বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণ বেড়েছে। এ বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, মজুরী বৃদ্ধির চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে মাহিনা ও মজুরীর অঙ্কে স্ফীতিজনক এক বৃদ্ধি ঘটেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারী দাক্ষিণ্যের পুষ্টধারা (ব্যাঙ্ক, লাইফ ইন্সিওরেন্স ও সরকারী উৎপাদন ক্ষেত্র) এবং পাশাপাশি সরকারী ব্যয়ের একটা মোটা অঙ্ক মুদ্রাস্ফীতিকে বিপদজনক পর্যায়ে এনে ফেলেছে। অথচ মজুরী বাড়লেও উৎপাদন সমহারে বাড়েনি বরং অবস্থা গতিকে খুব বিশৃঙ্খলার জন্য কোথাও কোথাও তা হ্রাস পেয়েছে। ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে অপরদিকে তেমন মূল্য মজুরী চক্র অনুসরণ করে মূল্যস্তর ক্রমশঃই ঊর্ধ্বগতি লাভ করেছে।

১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ ৪১৫ কোটি টাকা বেড়েছে, ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মুদ্রা সরবরাহের বৃদ্ধির পরিমাণ ৫৩৫ কোটি টাকা এবং পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত তা ৮৪৩ কোটি টাকা বেড়েছে। জাতীয় ফলিত অর্থ গবেষণা পরিষদের মতে ১৯৬৭-৭০ সালের মধ্যে মুদ্রা সরবরাহের এই ২২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পরবর্তীকালের মূল্যস্তরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ এবং এবিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নেই। পরিষদের মতে মূল্যস্তর যে আরও বাড়েনি এটাই আশ্চর্য বলতে হবে। বর্তমান বৎসরের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে যে—সকল কারণে পূর্ব-পূর্ব বৎসরে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে সেগুলি যদি জোর করে অপসারিত না করা যায় তাহলে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি অটুট থাকবে। আর তাড়াতাড়ি করে যেমন সহসা মুদ্রা সরবরাহ কঠোর ভাবে হ্রাস করা যায় না বা সম্ভবও নয়, তেমনই সত্বর নব চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে মূল্যস্তরের সমতা বজায় রাখা। অতএব উৎপাদন বৃদ্ধি করে প্রয়োজন সাপেক্ষ কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়তি আমদানী করে বাজারে পণ্যের সরবরাহ বজায় রাখতে হবে যাতে বাড়তি চাহিদা মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি না করে।"

বাজেট পেশ করার প্রাক্কালে অর্থনীতির উন্নতির যে বিবরণ দেওয়া হয় তাতে একটা উজ্জ্বল চিত্র কিন্তু লক্ষ্য করা যায়নি। "৫.৫ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক সংবৃদ্ধির মূল কারণ হ'ল ৫.৫ শতাংশ হারে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, যদিও চাল, কার্পাস তুলো ও তৈলবীজের ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের পদসঞ্চার ঘটেনি অন্ততঃ এ পর্যন্ত। প্রকৃতির উপর নির্ভরতা এবং অনিশ্চিত বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির জন্য বৈষয়িক ক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে উৎসাহে বিশেষ ভাটা পড়ছে। উৎপাদনের এই সমস্ত বাধা বিপত্তি যখন বর্তমান রয়েছে তখন ১৯৬৯-৭০ সালেই অর্থ সরবরাহের পরিমাণে ১১ শতাংশ বৃদ্ধি ১৯৭০-৭১ সালে মূল্যস্তরকে আরও ৫.৬ শতাংশ পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য সামান্য সুযোগ সুবিধার সমন্বয়ে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি ঘটে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি কমিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সমীক্ষার মতে তা আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজারের ঘাটতিকেই প্রকট করে তুলেছে। অর্থাৎ পরবর্তী বছরে যখন আমাদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং বৈদেশিক পণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হবে তখন উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া সমস্যা সমাধানের কোন পথই খোলা থাকবে না।" বর্তমানে শুধু মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির জন্যেই নয়, ক্রমবর্ধমান ঘাটতি ব্যয়, উচ্চতর পণ্য উৎপাদন, শুল্ক এবং ক্রমাগত মজুরী বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় এমন কতকগুলি বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে যার ফলে মুদ্রাস্ফীতির ক্রমপ্রসার কিছুতেই অসম্ভব নয়। পরিকল্পনাকালে মোট ঘাটতি ব্যয়ের হিসেব ধরা হয়েছে ৮৫০ কোটি টাকার মত। কিন্তু এই হিসেব আরও বেড়ে যেতে পারে যদি সরকারী উৎপাদন ক্ষেত্রের প্রদেয় অংশ ২০২৯ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় অংশ থেকে ১৫৩৪ কোটি টাকা আর রাজ্যগুলির অংশে ৪৯৫ কোটি টাকা) সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে কেন্দ্রের ভাগে ২১০০ কোটি টাকা আর রাজ্যগুলির ভাগে ১০৯৮ কোটি টাকা, মোট ৩১৯৮ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করতে হবে। প্রত্যক্ষ করের উপরে (অথবা বর্তমান কর ব্যবস্থার পরিবর্তন সাপেক্ষে) চাপ দিয়ে এই বাড়তি আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু এরই মধ্যে প্রত্যেক সামগ্রীর উপরে কমবেশি ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ পরোক্ষ উৎপাদন কর বসানো আছে। বাড়তি কর বসানো মানেই

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

'নরেন্দ্রপুর অন্ধ শিক্ষায়তন' —একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত

কোন এক শীতের বিকেলে আপনি যদি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত 'দি ব্লাইণ্ড বয় একাডেমী'র মাঠে যান, দেখতে পাবেন একদল ছেলে ক্রিকেট খেলছে। কাছে গেলেই বুঝতে পারবেন যে এরা কেউই চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু অন্যান্য স্বাভাবিক ছেলেদের মতই এরা স্বাভাবিক ভাবে খেলাধুলা করছে।

এই সে দিনও অন্ধত্বকে বিধাতার অভিশাপ স্বরূপ ধরে নেওয়া হোত। সারা জীবন পর নির্ভর হয়েই বেঁচে থাকতে হত এদের। কিন্তু অন্ধদের প্রতিকূলতা কাটিয়ে এরাও যে অন্যান্য সাধারণ লোকদের মত সমাজের নানা কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে এই প্রতিষ্ঠানটিতে গেলেই সেটা বোঝা যায়।

অন্ধরা যাতে সমাজের বোঝা না হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে তার জন্য পরলোকগত শ্রী বি পি চন্দ ১৯৫৭ সালে আটজন ছেলেকে নিয়ে এই 'ব্লাইণ্ড বয় একাডেমী' স্থাপন করেন। উনি নিজেও অন্ধ ছিলেন এবং এই স্কুলের প্রথম প্রিন্সিপাল হন।

বর্তমানে এই শিক্ষায়তনে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১০০ জনের মত। কর্তৃপক্ষ এই শিক্ষায়তনকে আরও বড় করবার চেষ্টা করছেন যাতে আরও অনেকেই এখানে শিক্ষা লাভ করতে পারে।

এখানে ভর্তি হওয়ার পর সবাইকেই আবশ্যিক ভাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যান্ত পড়াশুনা করতে হয়। এর পর মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে ও পরে আরও উন্নততর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আর অন্যান্যরা যাতে কারিগরী শিল্পে ও বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্পে শিক্ষালাভ ক'রে স্বয়ং নির্ভর হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। এই কারিগরি শিল্প ও কুটির শিল্প শেখবার ব্যবস্থা এই শিক্ষায়তনের ভিতরেই রয়েছে এবং আস্তে আস্তে এরাও অন্যান্য স্বাভাবিক কারিগরদের মত লেদ্, ক্যাপস্টান ড্রিল ও অন্যান্য বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রে কাজ করতে শেখে ও দক্ষতা লাভ করে। এবং এদের কাজও অন্যান্য দক্ষ শ্রমিকদের তুলনায় কোনও অংশেই খারাপ নয়।

—মানিক ব্যানার্জী

এই শিক্ষায়তনে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয় ব্রেইলে পদ্ধতিতে। এখানে ব্রেইলে পদ্ধতির এক অতি সুন্দর লাইব্রেরীও আছে। এতে বই আছে প্রায় ছয় হাজারের মত ও 'টকিং টেপ' রয়েছে তিনশ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই ধরণের লাইব্রেরীর মধ্যে নরেন্দ্রপুরের এই লাইব্রেরী ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম।

এই শিক্ষায়তনে শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এরা কারো সাহায্য ছাড়াই স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা ও সব কাজ করতে শেখে। বিভিন্ন রকম বাইরের খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদেও অংশ গ্রহণ করে। এরা যখন ফুটবল, ক্রিকেট বা অন্যান্য খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করে দূর থেকে দেখলে তখন মনেই হবে না যে এরা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার দৃষ্টি শক্তি থেকেও বঞ্চিত। এই শিক্ষায়তন থেকে কারিগরি শিক্ষা লাভ করে অনেকেই বিভিন্ন কোম্পানীতে কাজ করছে।

এই শিক্ষায়তনেই রয়েছে একটি ছোট ওয়ার্কশপ্। বিভিন্ন বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সাব্ কনট্রাক্ট্ নিয়ে এখানে কাজ করা হয়। এখানে প্রধানতঃ তারাই কাজ করে যারা সবে এই শিক্ষায়তন থেকে কারিগরী শিক্ষা শেষ করেছে অথচ কোথাও কাজ পায়নি ও কোনও কারণে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যে সব অন্ধ কারিগর বেকার হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বেশ কয়েকজন এখানে কাজ ক'রে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে।

যারা দৃষ্টিহীন—মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ থেকে বঞ্চিত—তাদের জীবন যাতে স্বাভাবিক হয়—যাতে বেঁচে থাকার জন্য তাদের অন্য কারও বোঝা না হয়ে থাকতে হয়, আর পাঁচ জনের মতই যাতে জীবনের আনন্দকে উপভোগ করতে পারে তার জন্য নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত 'দি ব্লাইণ্ড বয় একাডেমী' সত্যিই একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

সিপিং করপোরেশনের সাফল্য

৪ পৃষ্ঠার পর

১৯৭০-৭১ সালে ইয়ার্ড দুটি ৫০০ টনী 'ওর বজরা' (লৌহ আকরবাহী) এবং তিনটি ফিসিং ট্রলার নির্মাণ করেছে। বছরের শেষে আরও দুটি বজরা এবং একটি ফিসিং ট্রলার যোগান দেওয়া হয়েছে। বোম্বাই পোর্ট ট্রাস্টের জন্য দুটি টাগ এবং দুটি ৫০০ টনী আকরিক লৌহ বাহী বজরার কাজ এগিয়ে চলেছে, আরও ১৭টি বজরার অর্ডার হাতে রয়েছে। ইয়ার্ডটির প্রসারণের একটা আশাব্যঞ্জক পরিকল্পনা আছে এবং এপর্য্যন্ত এই সংস্থা যা উন্নতি করেছে, তা থেকে আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে এটি পশ্চিম উপকূলে একটি বড় জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামত কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

সংবাদ পরিক্রমা

'প্রতিবেদক'

হাওড়া

হাওড়ার নিকাশনী ব্যবস্থার উন্নতি-কল্পে সাঁতরাগাছি অঞ্চলে ৫০ একরেরও বেশী জায়গা জুড়ে একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসাবার কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ে খরচ পড়বে ৮৫ লক্ষ টাকা। বৃহত্তর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা হাওড়া উন্নয়ন সংস্থাকে এই টাকার বেশ একটা বড় অংশ মঞ্জুর করেছেন। ১৯৭৫ সালের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে হাওড়া সহরে উন্নততর যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নিকাশনী ব্যবস্থা সম্ভব হবে এবং এ ক্ষেত্রে বর্তমানে যেসব অসুবিধা আছে সেগুলিও দূর হবে।

এ ছাড়া কলিকাতা মেট্রোপলিটান উন্নয়ন সংস্থা হাওড়ার বাকল্যাণ্ড সেতুটি পুনঃনির্মাণের জন্যে ৪ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। এর মধ্যে রেল মন্ত্রালয় দেবেন ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। হাওড়া উন্নয়ন সংস্থা ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা এবং বাকিটা কলিকাতা মেট্রোপলিটান উন্নয়ন সংস্থা। শেষোক্ত সংস্থার হয়ে হাওড়া উন্নয়ন সংস্থা প্রকল্পটি রূপায়িত করবেন।

প্রস্তাবিত সেতুটি বর্তমান সেতুর থেকে সাড়ে তিনশ ফুট পশ্চিমে নির্মিত হবে এবং হাওড়া শহরের দুই অংশকে যুক্ত করবে।

* * *

হাওড়ার দাশনগরে সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত ইন্দো—জাপানিজ প্রোটোটাইপ উৎপাদন এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় শিল্প উন্নয়ন মন্ত্রালয় বেকার ইঞ্জিনীয়ার বা কারিগরি শিক্ষায় ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের জন্যে তিনমাস ব্যাপী একটি স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রশিক্ষণ শেষে এই সব বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের আত্মসংস্থানের জন্যে ছোট ছোট শিল্প-কেন্দ্র খুলতে যথোপযুক্ত সাহায্য করা হবে। যে সব বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তার মধ্যে শিল্প পরিচালনা এবং উৎপাদনের কায়দা কৌশল প্রযুক্তি বিদ্যা অন্যতম।

আসাম

ত্রিরিশ কোটি টাকা ব্যয়ে গৌহাটিতে একটি অ্যামোনিয়া সংরক্ষণ কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। রূপায়িত হলে এটি ভারতের বৃহত্তম অ্যামোনিয়া সংরক্ষণ কারখানা হবে এবং প্রধানতঃ রপ্তানির জন্যই এখানে অ্যামোনিয়া সংরক্ষিত হবে। আশা করা যায় যে কারখানাটি বছরে দুই কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং কয়েকটি ভারতীয় অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করবে বলে জানা গেছে।

মণিপুর

তিন বছর পর্যন্ত বয়সের ৫৯ হাজার শিশুর পুষ্টিকল্পে মণিপুর সরকার দ্রুত রূপায়ণ-যোগ্য কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। এর জন্যে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কর্মসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অতিরিক্ত পুষ্টিকর শিশুখাদ্য ঐ শিশুদের বিতরণ করা হবে।

ইতিমধ্যে ইম্ফলে একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই কেন্দ্র থেকে কমপক্ষে তিনশ' শিশুকে শিশুখাদ্য বিতরণ করা হবে। এর মধ্যে সদরাঞ্চলে দুটি ছাড়া বাকি সবকটি কেন্দ্রই গ্রাম এবং পার্বত্য অঞ্চলে খোলা হবে। সদরের কেন্দ্র দুটির প্রতিটিই ২০০ জন শিশু এবং পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিটি কেন্দ্র ১০০ জন শিশুকে এই খাদ্য বিতরণ করবে।

ইম্ফল থেকে ২২ কিলোমিটার দক্ষিণে এক লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে এক হাজার মেট্রিক টন সংরক্ষণ ক্ষমতা রাখে এমন একটি গুদাম সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। ইম্ফল এবং তার সন্নিহিত অঞ্চল থেকে ধান সংগৃহীত করে এই গুদামে রাখা হবে।

সম্প্রতি ইম্ফলে একটি পঞ্চায়েতীরাজ ও সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আগে এখানে ভারত সেবক সমাজের উদ্যোগে পঞ্চায়েতীরাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। আর মণিপুর সরকারের সমবায় দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত একটি কেন্দ্র থেকে সমবায় সম্বন্ধে প্রশিক্ষণও দেওয়া হত। ১৯৫৬ সালে স্থাপিত এই কেন্দ্র আজ পর্যন্ত ৭২৪ জনকে সমবায় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

বেল বড় ধরণের বিদ্যুৎ উৎপাদক তৈরী করবে

রাষ্ট্রায়ত্ত ভারত হেভী ইলেকট্রি-ক্যালস্ লিমিটেড পূর্বাঞ্চল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উত্তর প্রদেশের, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট রাজ্যের জন্য সাতটি ২০০ মেগা-ওয়াটের টার্বো জেনারেটর সেট তৈরীর অর্ডার পেয়েছে।

এই বৃহৎ প্রকল্প কার্যকর করতে ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস্ লিমিটেড রাশিয়ার "প্রোমাস" রপ্তানি কারখানার সাথে সহ-যোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য ধাতু যেমন বিশেষ ধরণের মিশ্র ইস্পাত, সিলিকন যুক্ত ইস্পাত এবং বিশেষ ধরণের ইনসুলেটিং দ্রব্যাদি ও মিশ্র ইস্পাতের ভারী ছাঁচ, ছাঁচের যন্ত্রপাতি সহ-যোগী রাশিয়ান কারখানা পর্যায়ক্রমে যোগান দেবে।

স্বদেশী চেতনা

ডাঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য

বৃটিশ শাসনের আমলে যে স্বদেশী চেতনা সারা ভারতের জনগণের মনে যে দাগ এঁকেছিল, আজ বস্তুতঃ এবং মূলতঃ, তার অভাব দেখা যাচ্ছে। যে জাতীয়তা-বাদের অনুপ্রেরণায় নিরস্ত্র ভারতবাসী বিদেশী শাসকবর্গের সঙ্গীন ও বুলেটের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েছিলেন, আজ সেই প্রেরণার চিহ্ন নেই। গান্ধীবাদী অর্থনীতি-বিদ শ্রীমন নারায়ণের মতে "আজকের দিনে আমাদের জাতীয় জীবন যাত্রায় আমরা স্বদেশী চেতনার অভাব খুবই বোধ করি, এটা দুর্ভাগ্য। সুপরিকল্পিত অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের ফলস্বরূপ, জনগণ রাষ্ট্রের কাছে সব বিষয়ে সাহায্য আশা করেন এবং তাতে নিজেদের উদ্যোগকে তাঁরা ক্রমশ নষ্ট ক'রে দেন। আমাদের অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনাগুলির জন্যে সীমিত পরিমাণে, বিশেষ ক'রে অভিজ্ঞতা ও কারিগরী কৌশলের ক্ষেত্রে বিদেশী সহা-য়তা গ্রহণে ক্ষতি নেই, কিন্তু তাই ব'লে বিদেশী সাহায্যের ওপর অতি নির্ভর-শীলতা, এককালে আমাদের শক্তিকে দমিয়ে দেবে, আত্মনির্ভরশীলতার মূল স্পৃহা আমরা হারাব।"

বিদেশী ঋণের বোঝা

বিদেশী ঋণের যে বিরাট বোঝা ভারত বইছে, সেটা আমাদের দেশের প্রগতির পথে শুধু প্রতিবন্ধকই নয়। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও তা আমাদের সমগ্র অর্থ-নীতির পক্ষে একটা বিরাট অন্তরায়। যে-সব দেশ থেকে এই বিরাট ঋণ নেওয়া হয়, তাদের দিক থেকে ঋণ গ্রাহক দেশের পররাষ্ট্রনীতির ওপর সুনিশ্চিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য; এমন কি ঋণদাতা দেশের পক্ষ থেকে এই সাহায্য বাবদ যদি কোনো রাজনৈতিক চাপ না-ও দেওয়া হয়, তাহ'লেও কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে, এর সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া একটা আছেই। কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে, যেসব দেশ থেকে ভারত সহায়তা অথবা সাহায্য পাচ্ছে, এক ভাবে না একভাবে ভারত তাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে; যদি প্রত্যক্ষভাবে না ও হয়, ভারতের অর্থনৈতিক নীতির ওপর পরোক্ষ-ভাবে তার প্রভাব সুনিশ্চিত। এমন কি তারা যদি প্রভাবিত না ও করে, তাহ'লেও একটা স্বাধীন দেশের উচিত, সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে যেভাবেই হোক্ নিজের সমস্ত সম্পদ আহরণ ক'রে নিজের উপায় নিজে ঠিক ক'রে নেওয়া। এশিয়ার নব-জাগ্রত দেশগুলির ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে এবং অন্যান্য দেশেও দেখা গেছে, সেখানের জনগণ বিরাট আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে তাঁদের অর্থনীতি গড়ে তুলেছেন এবং আজকে তাঁদের সেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা সার্থক ক'রে তার সুফল ভোগ করছেন। উদা-হরণ স্বরূপ সোভিয়েত অর্থনীতির দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাশিয়া যথেষ্ট অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে, এমন কী অনাহার ও দুর্ভিক্ষের মোকাবিলাও রাশি-য়াকে ক'রতে হয়েছে; কিন্তু বিদেশের কাছ থেকে এক কানাকড়ি না নেওয়ার যে দৃঢ়সংকল্প ছিল, তার ফলে, আত্মত্যাগের মাধ্যমে, কমিউনিষ্ট নেতৃ-বর্গের পরিকল্পনায় প্রাণান্ত পরিশ্রমে আজ সোভিয়েত রাশিয়া কেমনভাবে তাঁদের দেশকে গড়ে তুলেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ, সাম্যবাদী সংগ্রামে যেভাবে সবকিছু বিসর্জন দিয়ে-ছিলেন, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

চীনের লৌহযবনীকার অন্তরালে কীভাবে প্রগতি এসেছে সে বিষয়ে যথেষ্ট জানা না গেলেও, এটা ধারণা করা যেতে পারে যে, চীনের জনগণও তাঁদের দেশের অর্থনীতি পুনরায় গড়ে তোলার কাজে খুব সামান্য বিদেশের ওপর নির্ভর করেছেন।

আমরা বিদেশ থেকে যে সাহায্য ও সহায়তা বর্তমানে পাচ্ছি, তা' হল—

(১) কারিগরী বিশেষজ্ঞ

(২) বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা

(৩) মঞ্জুরী হিসাবে আর্থিক সাহায্য এবং

(৪) উচু দরের সুদে ঋণ।

আজ ভারতের ওপর রয়েছে সাতশ' কোটি টাকারও বেশী এক বিরাট সুদের বোঝা। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে সুদে আসলে আমাদের এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। "ভারত সাহায্য সংস্থার" সদস্য দেশগুলি এই উন্নতিশীল অর্থনীতির জন্য যতটা পারা যায় সাহায্য দেবার জন্যও সচেষ্ট। কিন্তু, এর শেষ কোথায়? আমাদের এই অর্থনীতিকে আমরা কোথায় নিয়ে চলেছি? এই ঋণের বোঝা কে পরিশোধ করবে? এই ঋণভার পরিশোধের দায়িত্ব পড়েছে ৫৫ কোটি ভারতীয়ের ওপর। তাঁদের রক্ত জল ক'রে, অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এই ঋণ

পরিশোধ করতে হবে। এর কী কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আমরা বার করতে পারিনা? আমরা কী আমাদের দেশের জনগণকে উৎসাহিত করতে এবং এই পরিবেশের সংশোধন করতে পারিনা, যাতে লক্ষ লক্ষ দেশবাসী বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার না করার শপথ নিতে পারেন? এই যুগে বিদেশী আমদানী দ্রব্য অবিলম্বে পরিহার করা সম্ভব নয়। তবে, ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে হঠাৎ একটি দেশ তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো নতুন ক'রে গড়ে তুলেছে। এই দৃষ্টান্ত আমাদের খুব নিকট প্রতিবেশী এশীয় দেশগুলির মধ্যেই রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ জাপানের কথা উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপানের বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠিত হয়েছে এবং জাপানবাসীর একান্ত কঠোর পরিশ্রমে, বিদেশী সহায়তা নামমাত্র নিয়ে তা নতুন ক'রে গড়ে উঠেছে।

উন্নত অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সম্পদ হল জাতীয়তাবাদের মহান চেতনা। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজ সংস্কারক অথবা রাজনীতিবিদগণ কিম্বা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের জননেতাবৃন্দ, দেশের বিরাট প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক সম্পদের সহায়তায়, এই মহান জাতীয়তাবাদের চেতনা পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে বাতাবরণ সৃষ্টি করার কাজে যথেষ্ট অবদান সুনিশ্চিতভাবে যোগাতে পারেন। আমাদের এখন স্বদেশী চেতনার প্রয়োজন হয়েছে।

কারিগরী জ্ঞান লাভের অজুহাতে সামান্যতম কাজেও সব সময়ে বিদেশের মুখাপেক্ষী হওয়াটা একটা বাজে ধারণা। আমরা যদি আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা পাঠের জন্য সামান্য সময় ব্যয় করি, তাহ'লে পল্লীপুনর্গঠন ব্যাপক হারে কর্মের সংস্থান এবং জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার মত বিরাট বিরাট সমস্যার সমাধান আমরা ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজে পাব। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গল্পের ছলে বলেছিলেন, একটি লোক দেশলাইয়ের কাঠি চাইতে রাতরাতে তার প্রতিবেশীর বাড়ী গিয়েছিল। সেটা শীতের রাত ছিল স্বভাবতঃই প্রতিবেশী বিরক্ত বোধ ক'রছিল। এই লোকটি ব'লল যে, তার নেশার সময় হওয়াতে প্রতিবেশীকে বিরক্ত করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। লোকটি গাঁজা খেত। প্রতিবেশী তাকে দেখে নিয়ে একটু হেসে বললো 'তোমার মধ্যে যখন আগুন রয়েছে, তখন আমার কাছে তা' ধার করতে এলে কেন?' বলা দরকার যে লোকটির হাতে একটি লণ্ঠন ছিল। সেইরকমভাবে আমি বেশ দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি যে, আমাদের মধ্যেও আগুন রয়েছে, আছে একটা সুপ্রাচীন ও সুসমৃদ্ধ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র—যার দ্বারা আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাদির সমাধান সম্ভব তাহ'লে, কেন আমরা বিদেশীর কাছে হাত পাতবো? নিজেদের জন্য কেন বিদেশের শরণাপন্ন হব? তাই জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমাদের স্বদেশী প্রেরণার প্রধান অবলম্বন ক'রতে হবে।

ভারতের মত একটি দেশের, মরীচিকার পেছনে ছোটা এবং চিরস্থায়ী উপযোগিতার কথা চিন্তা না-করে একটি সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা চিন্তা করাটা প্রকৃতই দুঃখের বিষয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিজ্ঞরা যদি ইতিহাসের পৃষ্ঠার দিকে মনোযোগ দেন এবং আমাদের দেশের মাটির মহান নেতা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বক্তব্যের মধ্যে এর সমাধান অনুসন্ধান করেন, তাহ'লে যথেষ্ট অবদান রাখানো হবে। পল্লী পুনর্গঠন আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে গড়ে তোলে। আজ আমাদের বিদেশীদের কারিগরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ওপর যতখানি নির্ভর করতে হচ্ছে, ততখানি নির্ভরশীলতা আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের নিজেদের কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আত্মনির্ভরশীল এক অর্থনীতি গড়ে তুলতে বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি একজন সন্ন্যাসী হয়েও জমি চাষ এবং মাটি খননকে গীতা পাঠের চেয়ে প্রাধান্য দিতেন। তিনি বলেছিলেন মোক্ষলাভের জন্য ছুটোছুটি না ক'রে ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন যোগানো অনেক মহৎ কাজ।

রবীন্দ্রনাথ, তিলক, গান্ধীজী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ চন্দ্র বোস এবং জহওরলাল নেহেরু প্রমুখ দেশপূজ্য নেতারা যে পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা দিয়ে গেছেন তা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত নির্দেশক নীতি হিসাবে কাজ করবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও পল্লীভারত

যে ক'জন আধ্যাত্মিক তথা সমাজ সংস্কারক, পল্লীভারতের উন্নয়নের জন্য আহ্বান জানিয়ে ছিলেন, যাঁরা দরিদ্র কৃষক ও মাঠের মজুরের জন্য ভাবতেন, যাদের জন্য যাঁদের হৃদয় কেঁদে উঠেছিল, তাঁদের পুরোধা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এমনকি আধ্যাত্মিক জগতের মহান গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণ, যিনি বেদান্তের দর্শনকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তাঁর শিষ্য হয়েও স্বামী বিবেকানন্দ, নিজের মোক্ষলাভের চেয়ে পল্লী ভারতের জনগণের দারিদ্র সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

স্বামীজী, গ্রামে ও শহরের চিরাচরিত জাতিপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করলেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন দলিত শোষিত জনসমাজের ভাগ্যের উন্নতি করতে

হবে। এই জন্য, দেশবাসীকে তিনি গীতার প্রতি সমস্ত মনোযোগ বিনিয়োগ না ক'রে জমি চাষের দিকে অধিক মনোনিবেশের আহ্বান জানালেন।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি আমাদের দুটি পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। প্রথমত: সমস্ত ধর্মের ঊর্দ্ধে দেশকেই একমাত্র পূজ্য ব'লে গ্রহণ করতে। তিনি ব'লেছেন, আগামী অর্দ্ধশতাব্দী ধরে আমাদের মহিমময়ী জন্মভূমি ভারতবর্ষকেই আমাদের একমাত্র পূজ্য দেবতা হিসাবে গণ্য ক'রতে হবে। আমাদের অন্য সমস্ত দেবতাকে আপাততঃ ভুলে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত: আমাদের শক্তি অর্জন করতে হবে—দৈহিক এবং মানসিক। মানসিক শক্তি, চারিত্রিক শক্তি ও দৃঢ় কৃতসংকল্পতা ভিন্ন একটি দুর্বল জাতি কিছুতেই উন্নতি লাভ করতে পারে না। তিনি বলেছেন, কাজে লেগে থাক, কিন্তু কাজের ক্রীতদাস হ'য়ো না। যতই প্রিয় হোক না কেন, যতই আকাঙ্খা থাকুক না কেন, যতই ছেড়ে আসার বেদনায় মন জর্জরিত হয়ে উঠুক না কেন, কোনো কিছু থেকে নিজেকে ইচ্ছামত সরিয়ে আনার ক্ষমতা রাখতে হবে। যখনই প্রয়োজন বোধ করবে তখনই সরে আসবে। এই দুনিয়াতে দুর্বলের কোথাও স্থান নেই। দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত ক'রে। দুর্বলতাই সমস্ত জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার কারণ। দুর্বলতাই মৃত্যু। সর্বপ্রকার দুঃখ কি শারীরিক কি মানসিক সবেরই মূল কারণ দুর্বলতা।

মধ্য প্রদেশে তামার সন্ধান

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষণ দলের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী মধ্য প্রদেশের বালাঘাট জেলার মালিখণ্ড অঞ্চলে উত্তম খনি ও সমৃদ্ধ তামার খনির সন্ধান পাওয়া গেছে।

হলদিয়া এলাকার উন্নয়ন

হলদিয়া এলাকার উন্নয়নের জন্যে নানা প্রকারের কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথে (পাঁশকুড়া থেকে হলদিয়া) দুর্গাচক পর্যন্ত লাইন বসানোর কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকে এই লাইন ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনার জন্যে মোট ব্যয় হবে ৭.৭০ কোটি টাকা। আর একটি রেলপথ বসিয়ে শিল্পাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ডক্ এলাকা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে মেন লাইনের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। ৩.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এক জাতীয় রাজপথ নির্মাণ করা হচ্ছে যা মেচেদা ও হলদিয়াকে সংযুক্ত কোরবে। এর ৪০ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এই এলাকায় অবস্থিত রাস্তাঘাটগুলি মেরামতির জন্যে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। দুর্গাচক তৈল শোধনাগার এবং ডক এলাকার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি নতুন রাস্তা তৈরী হচ্ছে।

কোলাঘাট থেকে হলদিয়া পর্যন্ত ৫০ কিলোমিটারের ওপর ট্রান্সমিশন লাইন বসানোর কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখান থেকে দুর্গাচক এবং হলদিয়ার বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। হলদিয়ার একটি সাব্-ষ্টেশন তৈরীর জন্যে ১২ একরের একটি প্লট দখল করা হয়েছে। হলদিয়ার প্রধান প্রধান ব্যবহারকারীদের ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়ে গেছে।

আশা করা যায় ১৯৭২ সালের শেষাশেষি নাগাদ ১০ মেগাওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাবে।

শিল্পাঞ্চলে বাসস্থান নির্মাণের জন্যে প্রায় ৪৫.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। একটি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রায় ২০ একর জমি দখল করা হয়েছে।

সুতাহাটার পুলিশ ষ্টেশনের পশ্চিমে এক হাজার একর জমি পৃথক করে রাখা হয়েছে জনপদ গঠনের জন্যে। হলদিয়ার জল সরবরাহের জন্যে একটি নতুন পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত মাটির নীচে থেকে এবং গভীর কূপের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়।

৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে হলদিয়া বন্দর এবং ৬৭.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈল শোধনাগার নির্মাণের কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। বন্দরে তৈল জেটিতে কাজ শুরু হয়ে গেছে। হলদিয়া ও বারাউনির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে ৫২২.৩ কিলোমিটার পাইপ লাইন বসানোর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর আবার একটি শাখা লাইন আছে রাজবাঁধ থেকে মৌরীগ্রাম। দূরত্ব ৫৮.২ কিলোমিটার।

পাঠক-পাঠিকা সমীপেষু—

ধনধান্যে-র উত্তরোত্তর উন্নতির জন্যে আপনাদের সক্রিয় সহযোগীতা অপরিহার্য। লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে ও বন্ধুমহলে ধনধান্যে-কে পরিচিত করিয়ে আমাদের উৎসাহিত করুন।

ক্যাপটেন ও তার দুধের ডেইরী

"জীবন মানেই যুদ্ধ। সে যুদ্ধ শুধু রণক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, জীবন-যাপনের জন্য জীবিকা নির্বাহ করাও যুদ্ধেরই নামান্তর।" বলেছিলেন ভারতীয় সেনাদলের প্রাক্তন ক্যাপটেন শ্রী সুরেন্দ্র এস. দেশমুখ। সেনা বাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর ব্যবসার মাধ্যমেই শ্রী দেশমুখ উপার্জনের পথ বেছে নেওয়া ঠিক করলেন। আর আশ্চর্যের কথা, দুধের ডেইরী ফার্ম নির্মাণ করে শুরু করলেন তাঁর ব্যবসা। আর সেই ব্যবসা ক্ষেত্র হিসেবে নিজের গ্রাম আনবালকেই (মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর কাছে) বেছে নিয়ে সেখানে ৭৪ একর জায়গা জুড়ে স্থাপন করলেন এক মস্তবড় দুধের ডেইরী ফার্ম। অমরাবতীতে চাহিদা মত দুধের যোগান না থাকায়, সেখানে তাঁর নবনির্মিত ফার্মের উৎপাদিত দুধ থেকে যে বেশ দু'পয়সা আয় করা যাবে, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সুতরাং লাভের মাত্রা বেড়ে ব্যবসাটির উন্নতি হতে বেশী দেরী হয় না। অবশ্য এই ডেইরী ফার্মটি স্থাপন করে চালু করতে শ্রী দেশমুখকে যেমন পরিশ্রম করতে হয়েছিল, তেমনি হতে হয়েছে যথেষ্ট দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন। অবশ্য এ বিষয়ে তিনি ডেইরী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ওপরই নির্ভর করেছেন বেশী আর, তার সাথে সাথে ডেইরী-ফার্ম সম্বন্ধে নানা রকম পত্র-পত্রিকা পড়ে নিজের জ্ঞান বাড়াতেও অবহেলা করেন নি। সুতরাং ডেইরী ফার্মটির সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে তিনি নিজেই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছেন। প্রথমেই তিনি মেসনা জাতের ২৯টি দুধেল মহিষ কিনে ডেইরী-ফার্মটি চালু করলেন। প্রাক্তন ক্যাপটেনের মতে মহিষ-এর দুধ লাভজনক হলেও এরা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই মহিষদের দেখাশোনার জন্য তাঁর ফার্মে পশু-স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী নিযুক্ত করা আছে। তাছাড়া একজন অভিজ্ঞ ম্যানেজার এই ফার্মটির সর্বাঙ্গীন দেখাশোনা করেন। আর ফার্মের জিপটির জন্য আছেন একজন দক্ষ চালক। ডেইরী-ফার্মটি আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত হওয়ার ফলে এখানে কাজ করাও বেশ সুবিধাজনক। শ্রী দেশমুখ ঠিক করেছেন আরও ৩০টি মহিষ কিনে ফার্মটিকে আরও বাড়িয়ে তুলবেন।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে এতবড় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মূলধন তিনি পেলেন কোথায়? তবে এ প্রশ্নের উত্তর বেশ সহজ। কারণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তাঁকে ১,২০,০০০ টাকা ঋণ দান করে তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সাহায্য করেছেন। অবশ্য তার জন্য শ্রী দেশমুখকে কাজের খরচ পত্রের হিসাব নিকাশ ব্যাঙ্কের কাছে নিয়মিত পেশ করতে হয়। আর তাতে তিনি অবশ্য বেশ খুশী। কারণ তিনি বলেন, 'এর ফলে ফার্মের খরচ-পত্র সম্বন্ধে আমারও বেশ একটা স্পষ্ট ধারণা থাকে।' তিনি আরও বলেন যে, আগামী ১৫ বছরের মধ্যে আমি সমস্ত ঋণই পরিশোধ করে ফেলতে পারব বলে আশা করি। কারণ এখনই আমার দিন প্রতি নীট লাভের অঙ্ক প্রায় ১২৫ টাকা।' সুতরাং ঋণ শোধ করতে তাঁর বেশী সময় লাগার কথা নয়।

শ্রী দেশমুখের ডেইরীতে উৎপন্ন দুধ, মাখন, ক্রিম এর চাহিদা যথেষ্ট। সুতরাং চাহিদার যোগান দেওয়ার জন্য তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। তাই তিনি প্রায়ই বলে থাকেন, "সামরিক বাহিনীর মত ডেইরী ম্যানেজারকেও ২৪ ঘন্টা নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়।"

আমরা শ্রী দেশমুখের দুধের ডেইরীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

দেশ গঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্ম তৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। হ্যাঁ, আপনিও প্রবন্ধ পাঠাতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক দুরবস্থা

(৭ পৃষ্ঠার পর)

রাজ্যের কৃষিভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের পুর্ণবিন্যাস করা দরকার। তারপর শিক্ষার এবং কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রেও পুরাতন পাঠ্য তালিকার আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন অর্থাৎ কার্যকারী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। পুরোনো-দিনের বাঙালী ভদ্রলোক সমাজ গঠন করে কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভবপর নয়। জনমত গঠন করে তোলার জন্য এবং সাধারণ লোককে রাজ্যের অর্থনৈতিক সমস্যার তীব্রতা সম্বন্ধে সজাগ করার জন্য রাজ্যের অভ্যন্তরে গ্রামে গ্রামে ব্যাপক প্রচার কার্য চালাতে হবে শুধু মাত্র ফাঁকা বক্তৃতা দিয়ে বা আন্দোলন করে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যায় না—এই কথাটা সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দিতে হবে। রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করতে হলে কাজ করতে হবে এবং কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।

পশ্চিম বঙ্গের প্রচণ্ড বেকার সমস্যা নিরসনের জন্য গ্রামীন বিকাশ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পোদ্যোগের সম্প্রসারণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ শক্তি সম্প্রসারণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। রাজ্য সরকারের হাতে যে সমস্ত উন্নতিমূলক পরিকল্পনা রয়েছে—সেগুলির দ্রুত পরিসমাপ্তি করা প্রয়োজন। সার উৎপাদন কারখানা, পেট্রো-কেমিক্যাল কারখানা এবং হলদিয়া বন্দর উন্নয়ন প্রভৃতি পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুত প্রতিষ্ঠার এবং সম্পাদনের জন্য রাজ্য সরকারকে তৎপর হতে হবে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজ্য সরকারের ১০,০০০ গ্রামের বৈদ্যুতিকরণ করার কথা এবং অবশিষ্ট গ্রামগুলির বৈদ্যুতিকরণ সময় সাপেক্ষ তাই ইতিমধ্যে নিকটবর্তী অন্যান্য রাজ্য হ'তে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা দরকার যাতে উন্নয়নমূলক কার্য বিদ্যুৎ শক্তির অভাবে ব্যাহত না হয়।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৬৬ এবং ১৯৬৯ সালে পশ্চিম বঙ্গে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী মাথা পিছু ৩৮ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে সর্ব ভারতীয় ব্যয় (মাথা পিছু) হচ্ছে ৬১ টাকা। কাজেই দেখা যাচ্ছে দেশের সকল রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ সব চাইতে কম। বর্তমান ফারাক্কা ব্যারেজ এবং হলদিয়া বন্দর উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিসমাপ্তির পর রাজ্যে তার উন্নতিমূলক আর কোন উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা হাতে থাকবে না। যদি কোন নতুন পরিকল্পনা তৈরী করা না হয় এবং কোন উন্নয়নমূলক কার্য হাতে না নেওয়া হয়—তাহলে, এই বিরাট শূন্যতা রাজ্যের শিল্প বিকাশকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই বিরাট শরণার্থী সমস্যাতে পশ্চিমবঙ্গ একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে আবার বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আগমনে রাজ্যের ভেঙে পড়া সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরও সঙ্গীন করে তুলেছে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারকে এখন অধিকতর তৎপর এবং সজাগ হতে হবে নতুবা এই রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

আজ রাজ্যের অসুস্থ অর্থনীতিকে সবল ও সুস্থ ক'রে তুলতে হলে বলিষ্ঠ নীতি অনুসরণ করতে হবে গঠনমূলক পরিকল্পনা হাতে নিয়ে সমস্যার কেন্দ্রস্থলে পৌঁছতে হবে এবং সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

আমের ফলন বৃদ্ধি প্রকল্প

রোহিত রায়

শীতকালে যায় যায়ে আম গাছে মুকুল হয়ে অসংখ্য ভ্রমর ঝিঁ ঝিঁ শব্দে আমোদিত হয় চারদিক। কিন্তু শীতের পরেই আসে বসন্ত। বসন্তের বড়ো বাতাসে ঝরে যায় মুকুল। শেষ পর্যন্ত যে সব মুকুল থাকে তাতে গুটি ধরে এবং পরে পরিণত হয় ফলে। আসলে বড়ো বাতাসে মুকুল ঝরে যায় না। গলমিজ জাতীয় কীটের আক্রমণে মুকুলের এই অকাল বিনাশ ঘটে। গলমিজ মুকুলের ডাঁটায় গল অর্থাৎ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সৃষ্টি করে, সেখানে ছোটখাট আবের মতো। কীটগুলি আবে থেকে মুকুলের সব রস শুষে নেয়। রস না পেয়ে মুকুল শুকিয়ে ঝরে পড়ে, ফল আর ফলতে পারে না।

ভারত সরকার আমের মুকুলের অকাল ঝরা রোধ করে গলমিজ কীট নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমের ফলন বৃদ্ধির এক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্প খাতে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা বৈদেশিক আর্থিক অনুদান পাওয়া গেছে।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমের ফলন বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও অনুশীলন কেন্দ্র আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের ডক্টর এস. এন. প্রসাদ এই প্রকল্পের গবেষকপ্রধান। গবেষকেরা ভারতের যে সব স্থানে আম ফলে সে সব স্থানে ব্যাপক নিবিড় সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে কোথায় কি পরিমাণ গলমিজ কীট আছে, তার জীবনচক্র এবং কীট আমের মুকুলের কতটা ক্ষতি করে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ ও সেগুলি সংরক্ষণের কাজ শেষ হয়েছে।

গবেষণার ফলে কী ভাবে এই কীট নিয়ন্ত্রণ বা রোধ করা যায় তারও পথ উদ্ভাবিত হয়েছে। গবেষণার ফলাফল দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এই কীট নিয়ন্ত্রিত হলেই দেশে আমের ফলন বৃদ্ধি পাবে—এ বিষয়ে গবেষকেরা নিঃসন্দেহ।

কুটীর শিল্পের অগ্রগতি

১৯৬৫-৬৬ সালে কুটীর শিল্পে ৫৮ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান ছিল। আর সেখানে ৬৫ লক্ষ ব্যক্তি কুটীর শিল্পের মাধ্যমে নিজেদের অন্ন সংস্থান করছেন। তেমনি ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের শেষে, শিল্প-অধিকর্তার অনুমোদন পাওয়া কুটিরশিল্প কেন্দ্রের সংখ্যা এসে পৌঁছয় ১৯০,১২৭ এ। ১৯৬৯-৭০ সালে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কর্মসূচীর অন্তর্গত বিভিন্ন ধরণের কেন্দ্রগুলির মোট উৎপাদন সামগ্রীর মূল্য হবে প্রায় ৩৬৭০ কোটি টাকার মতন।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সব প্রদেশেই প্রায় রাজ্যজুড়ে গড়িয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের মোট ২৮৫টি কর্মরত শিল্পাঞ্চলের মধ্যে ১৩১টি শহর এলাকায়, ৯২টি আধা-শহর এলাকায় (যেখানে প্রায় ৫০,০০০ লোকের বসবাস) এবং ৬২টি গ্রামাঞ্চলে। ভারত সরকারও তার গ্রামীণ-শিল্প পরিকল্পনা কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করেছেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী ৩৪ হাজার গ্রামে ১ লক্ষ ১৬ হাজার লোকের সহায়তায় ৪৯টি পরিকল্পনার কাজ চলছে।

পাঠকদের প্রতি

পরিকল্পনার রূপ ও রূপায়ণ, দেশের উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা এবং উন্নয়নমূলক কর্মোদ্যম দেখানো আমাদের লক্ষ্য।

এই পত্রিকাটিতে যেমন জাতীয় প্রচেষ্টার খবর দেওয়া হবে তেমনি সেই প্রচেষ্টার অংশীদার হিসেবে পশ্চিমবাংলা, জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টায় কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পেরেছে তাও দেখান হবে।

এই বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে মৌলিক রচনা পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। রচনা অনধিক ১৫০০ শব্দের মধ্যে হলেই ভাল। প্রকাশিত রচনার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

বৈষয়িক সমস্যা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

১১ পৃষ্ঠার পর

বাড়তি মূল্যস্তর অবশ্য যদি না ইতিমধ্যে উৎপাদনের আশু উন্নতিবিধান সম্ভব না হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতবর্ষে যখন মূল্যস্তর ক্রমবৃদ্ধির পথে তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মূল্যস্তরের মাত্রার স্বাভাবিক অথবা অত্যন্ত মন্থর অগ্রগতি ঘটেছে। ১৯৬৩ কে ভিত্তিকাল ধরে হিসেব করলে ভারতের সামগ্রিক মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা যখন ১৯৬৯ সালে ছিল ১৬৪ তখন পশ্চিম জার্মানীতে তা ছিল ১০১, জাপানে ১০৮, কানাডায় ১১৫ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১১৩। ভারতের সঙ্গে অপরাপর দেশের জীবন যাত্রার মানের বিশেষ বৈষম্য রয়েছে, কাজেই এদেশে যদি এভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকে তা যে দারিদ্র ও সামাজিক অবক্ষয়ের সূচনা করবে, এবিষয়ে অনেকেই একমত।

ব্যাঙ্কের ভূমিকা

এবছরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ক্রেডিট বা ঋণগত কাঠামোর মধ্যে বেশ কিছুটা দৃঢ়ভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ একদিকে ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণ যেমন ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে অপরদিকে তাদের কোষাগারে জমার অঙ্ক ১৯৭১ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রায় হিসেবে ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে এখনের যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় যে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হ'ল ১২৫ কোটি টাকা আর সরকারী ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হ'ল ৮৮ কোটি টাকা।

বেকারী দূর কোরতে পূঁজি লাগবে কত

(৮ পৃষ্ঠার পর)

শিল্প	কল 'কারখানার' সংখ্যা	উৎপাদনে নিযুক্ত টাকা (কোটি)	শ্রমিক সংখ্যা (হাজার)	মোট শ্রমিকের শতকরা	শ্রমিক প্রতি টাকা
বস্ত্র শিল্প	১১৩০৮	৫৯৭	১১৭৫	২৯.৭২	৫,০৮০
লোহা ও ইস্পাত	৭১৪	১১০১	৩০১	৭.৬৬	৩৬,৫০০
বিদ্যুৎ (শক্তি ও আলো) ও গ্যাস	৩২৫	১৯১৪	২৭৭	৭.০২	৬৯,১০০
মেশিনারি (বিজলী সংক্রান্ত ছাড়া)	৮০৪	২৪৬	২০৫	৫ ১৯	১২,০০০
বিদ্যুত সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি	৪২৯	২৩৪	১৪০	৩ ৫৩	১৬,৭০০
বিবিধ রসায়ন দ্রব্য	৪০৪	১৬০	৮২	২ ০৯	১৯,৫০০
মৌলশিল্পের (বেসিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রাসায়নিক দ্রব্য)	২২৪	৩১০	৭১	১.৮১	৪৩,৭০০
বিবিধ খাদ্য সামগ্রী	১৪৯৭	১৮৬	২৪৬	৬ ২২	৬,৯০০
মটর যানবাহন	১৬০	১২৭	৮৪	২.১২	১৫,১০০
রেল পথের সরঞ্জাম	১১১	১২৩	২০০	৫.০৭	৬,২০০
চিনি ও গুড়	৩১৭	১৭২	১৩৪	৩ ৩৯	১২,৮০০
ধাতব দ্রব্য (যন্ত্রপাতি ও যানবাহন সরঞ্জাম বাদে)	৫৬১	৯০	৮৬	২.১৬	১০,৫০০
ধাতব দ্রব্য—নন-ফেরাস	১০৪	১২৮	৩১	০ ৭৭	৪১,৩০০
রবারজাত দ্রব্য	১১২	৫৯	৪৬	১.১৬	২২,৮০০
তামাক সংক্রান্ত	১৬৯	১৯	৯১	২.৩৫	৪,২০০
কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য	১৫৬	১২৭	৬০	১.৫১	২১,২০০
সিমেন্ট (হাইড্রলিক)	৩৭	৮৭	৩৩	০.৮২	২৬,৩০০
নন মেটালিক মিনারেল	২৯৫	২৯	৩৮	০.৯৬	৭,৬০০
পেট্রল শোধন (রিফাইনারি)	৯	১০৬	৭	০.১৭	১,৫১.৪০০
অন্যান্য	৪৯৮৫	৪৮১	৬৪২	১৬ ২৬	৭,৬০০
	১২,৯৬১	৬,৩০০	৩৯৫৩	১০০.০০	১৫,৯০০

* ৬৫ সালের হিসাব। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত পকেটবুক অফ ইকনমি ইনফরমেশন থেকে গৃহীত

REGD. NO. D-233

ইলেকট্রনিক টেবিল ক্যাল্‌কুলেটর

টাটা ইলেকট্রিক কোম্পানির গবেষণা ও উন্নয়ন শাখার সহযোগিতায় ন্যাশনাল রেডিও এণ্ড ইলেকট্রনিকস কোম্পানী লিমিটেড (নেল্‌কো) ১০টি সংখ্যাযুক্ত একটি ইলেকট্রনিক টেবিল ক্যালকুলেটর যন্ত্র তৈরী করেছে। এটি সম্পূর্ণরূপে ভারতেই তৈরী।

পূর্বের ক্যালকুলেটর থেকে এই ক্যাল্‌কুলেটরটি অনেক উন্নত, কারণ এতে 'সলিড স্টেট সারকিউটারি' পথা ব্যবহার করা হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত কর্মক্ষম এই যন্ত্রটিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং সর্বপ্রকার গণনার কাজ করা যায়। পূর্বের সংখ্যা অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ ইত্যাদির শেষ ফল ধরে রাখার জন্য নির্দ্ধারিত আছে একটি বিশেষ "স্মৃতি ভাণ্ডার" এবং বড় গুণ ভাগ করার সুবিধা।

সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশ অল্প সময়ে যাবতীয় অঙ্ক কষে যন্ত্রটি "কী বোর্ডের" উপরে একটি পর্দায় সুস্পষ্টভাবে আঙ্কিকের চোখের সামনে মেলে ধরবে। যন্ত্রটি ইলেকট্রনিকের হওয়ার দরুন সমস্ত কাজ করবে নিঃশব্দে। যাবতীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক শিল্প প্রতিষ্ঠান এটি অত্যন্ত মূল্যবান যন্ত্র বলে গণ্য হবে বলে আশা করা যায়।

—

ভারতে তৈরী প্রথম স্বয়ংক্রিয় অফ্‌সেট মুদ্রণ মেশিন

বোম্বাইএর একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান সুইফট্‌স প্রাইভেট লিমিটেড সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় একটি অফসেট মুদ্রণ মেশিন নির্মাণ করেছে। "সুইফট্‌-১০০" নামের এই মেশিনটি সম্পূর্ণ ভারতীয় যন্ত্র ও যন্ত্রবিদদের কলা কৌশলে তৈরী এবং ভারতে এ ধরণের প্রচেষ্টায় এটিই সর্ব প্রথম। সাড়ে তিন বছরের নিরলস অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতি এই যন্ত্রটির নির্মাণ ভারতীয় মুদ্রণ শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনরূপে পরিগণিত হবে।
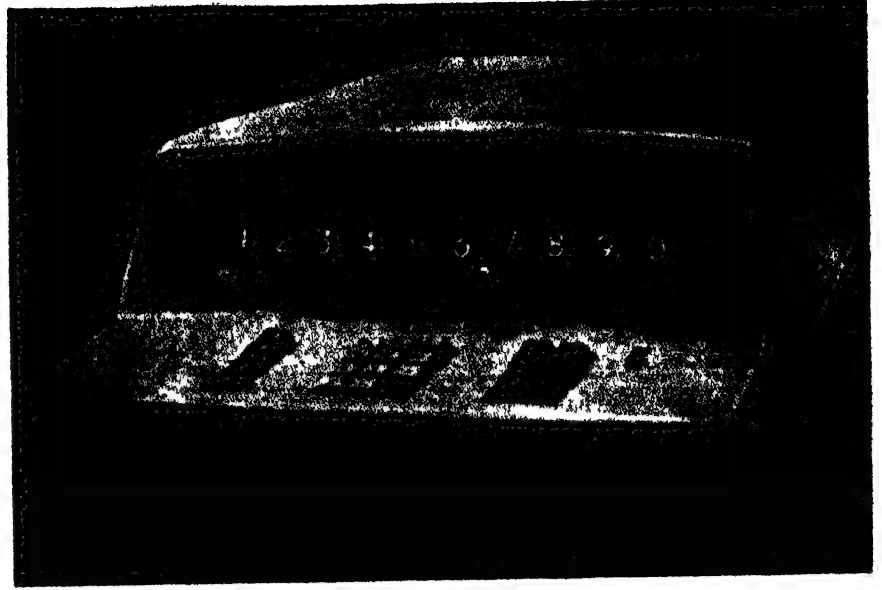
মুদ্রণের বিভিন্ন প্রথা প্রণালীতে অফ্‌সেট মুদ্রণ প্রথার কতগুলি বিশেষ সুবিধা

নিজের নাম ঠিকানা লেখা এবং উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগানো খাম সঙ্গে না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয়না।

আছে। এই প্রথায় একটি মাত্র প্লেটের সাহায্যে হাজার হাজার কপি ছাপা যায় এবং অত্যন্ত অমসৃণ কাগজেও ভাল ছাপা ওঠে। যন্ত্রটিকে কর্মক্ষম করতে খুব অল্প সময় লাগে এবং ছাপার কাজও হয় খুব দ্রুত। এছাড়া আর একটি বিশেষ সুবিধা হ'ল—এ যন্ত্রটিতে এ্যালুমিনিয়ামের প্লেট ব্যবহারের ফলে পড়তা খরচ কম—কারণ এ্যালুমিনিয়ামের দাম কম, আর ধাতুটি অত্যন্ত হাল্কা ও শীর্ণ হওয়ার দরুণ তা অল্প জায়গায় দীর্ঘকালের জন্য সঞ্চয় করে রাখা যায়।

অফ্‌সেট মেশিনে ব্যবহৃত বিশেষ ধরণের এ্যালুমিনিয়ামের প্লেট এদেশেই তৈরী হয়। অতএব স্বদেশেই সামগ্রিক সব শেষ অফ্‌সেট মেশিন প্রস্তুত হওয়ার ফলে স্বয়ম্ভরতার পথে হ'ল আর একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।

সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মুদ্রণ যন্ত্র সুইফ্‌ট-১০০কে মুদ্রণের বিভিন্ন কাজে লাগাতে কোন অসুবিধা নেই। এতে ২৫ ৪ বাই ৩৮ সেন্টিমিটার মাপের কাগজে ঘন্টায় ৩০০০ ৬০০০ মুদ্রিত কাগজ ছেপে বের হয়ে আসবে। যন্ত্রটির বাজার দর স্থির করা হয়েছে ২৭,০০০ টাকা। এ জাতীয় মুদ্রণ যন্ত্র বিদেশ থেকে আনাতে খরচ পড়ে ৪০,০০০ টাকা।
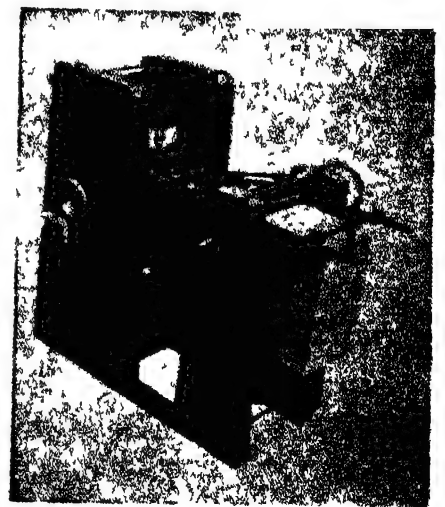
ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডিরেক্ট প্রিন্টার্স, করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধন ধান্যে

তৃতীয় বর্ষ ১১ ও ১২
৩১শে অক্টোবর ও ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭১

"আমাদের যাত্রা হল শুরু………"

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

তৃতীয় বর্ষ ১১ ও ১২শ সংখ্যা
১৪ই নভেম্বর ১৯৭১ : ২৩শে কার্তিক ১৮৯৩
Vol. III : No : 11, 12 : Nov 14, 1971

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রচ্ছদ পট—জীবনের যাত্রা শুরু

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী ১
টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০
৩৮৫৪৮১/৪০২
টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী
চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১
চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

যাহারা মারে এবং মরে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা মারিতে চায় না অথচ মরিতে প্রস্তুত তাহারা জগতের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাহারাই পৃথিবীর ভূষণ।

— মহাত্মা গান্ধী

এই সংখ্যায়

প্রাচুর্য্য এবং তার পরবর্ত্তী ব্যবস্থা

বিগত কৃষি বৎসরে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে ১০৭.৮১ মিলিয়ন টন। এটি এক রেকর্ড উৎপাদন। এরফলে দেশের খাদ্য সমস্যার যে বহুল পরিমাণে সুরাহা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু এরফলে আবার নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে— এই খাদ্য শস্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাবার এবং সেগুলি সংরক্ষণের। এ এক বিরাট সমস্যা। অতীতে খাদ্য শস্য প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হোত বিদেশ থেকে। সে কারণে মজুদ রাখার জায়গা করা হয়েছিল বন্দরগুলির কাছাকাছি। অচিরে খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধ হয়ে যাবে কারণ স্থির হয়েছে যে ১৯৭২ সালের জুন মাসে পি এল ৪৮০ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এ ধরণের আর কোন চুক্তি হবে না। সুতরাং শস্য মজুদ রাখার প্রয়োজন দেখা দেবে বন্দর এলাকা থেকে উৎপাদন ও কেনা-বেচার কেন্দ্রগুলিতে। বস্তুতঃ ইতিমধ্যেই যেসব জায়গায় সবুজ বিপ্লব দেখা গেছে সেইসব স্থানে উদ্বৃত্ত শস্য মজুদ করে রাখা এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। কেবল পাঞ্জাবের কথাই ধরা যাক্। এখানে সরকারী সংস্থাগুলি জন সাধারণের মধ্যে বন্টনের জন্যে সংগ্রহ করেছে তিন মিলিয়ন টনের ওপর খাদ্যশস্য, কিন্তু মজুদ রাখার স্থান রয়েছে মাত্র ১.৭ মিলিয়ন টনের। কৃষি ক্ষেত্রে এই আশাতীত সাফল্যের সঙ্গে যে সমস্যাটির কথা উল্লেখ করা হোল সেটাই কেবল একমাত্র সমস্যা নয়। অন্যগুলি হোল—পূর্ব ভারতে আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং উত্তর ও মধ্য ভারতের শস্য তোলার সময় প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বন্যার ফলে ঘাটতি আরও প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। মধ্যে মধ্যে এই যে সব বিপর্য্যয় দেখা দেয়, তা সে প্রাকৃতিক অথবা মানুষের সৃষ্টি যাই হোক না কেন, সাময়িকভাবে তার একটা সমাধান খুঁজে পাওয়াই যথেষ্ট নয়; বরঞ্চ এই সাফল্যকে স্থায়ী করার ব্যবস্থা কোরতে হবে। বহু বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এই সাফল্য এখন আমাদের হাতের মধ্যে এসেছে।

পরিকল্পনা কমিশনের একটি কমিটি জানিয়েছে যে উপস্থিত প্রয়োজন হোল দেশে শস্য মজুদ রাখার স্থান ৬.০৪ মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি করে ৯.১২ মিলিয়ন টন রাখার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থা কিন্তু কেবল সংগ্রহ ও বন্টনের উদ্দেশ্যে এবং তাও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অবশিষ্ট বৎসর গুলির জন্যে। সবুজ বিপ্লব যেমন দানা বেঁধে বসবে সেই সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাবে। খামার পর্য্যায়ে সমষ্টি ভিত্তিতে শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, তা সে সাময়িকভাবেই হোক, যাতে কৃষকগণ শস্য ঝাড়াই না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি নিরাপদে রাখতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ শস্য যখন বিক্রির পর্য্যায়ে আনা হয় তখন সেগুলি সাময়িকভাবে গুদামজাত করার জন্যে যেন ব্যবস্থা থাকে। তৃতীয়তঃ যে সব সংস্থা শস্যের দর স্থিতিশীল কোরতে চায় তাদের জন্যে বাজার এলাকায় শস্য মজুদের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অন্ততঃ যে পর্যন্ত না তা ব্যবহারকারীদের জন্যে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে না যাওয়া হয়।

কৃষকদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে রাজ্য সরকার কৃষি পুনঃ বিনিয়োগ করপোরেশনের তহবিল ব্যবহার কোরতে অনিচ্ছুক কারণ পরিকল্পনা সূচী অনুসারে প্রাপ্ত অর্থের তুলনায় এর অর্থ ফেরৎ দেওয়ার সময় অল্প এবং সুদের হারও বেশী। সমবায় সমিতিগুলি, তা সে ছোট হোক বা বড়ই হোক, তারা নিজেরা কৃষি পুনঃ বিনিয়োগ করপোরেশনের সর্ত্তাদি পূরণ কোরতে সক্ষম নয়। এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার জন্যে পরিকল্পনা কমিশনের স্টোরেজ সংক্রান্ত কমিটি সুপারিশ করেছে যে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন করপোরেশনের উচিৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং কৃষি পুনঃ বিনিয়োগ করপোরেশনের সাহায্যে অর্থ সরবরাহের জন্যে অনুরূপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন করপোরেশন স্থির করেছে যে কমিটির পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ হওয়া না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, এই সুপারিশ অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ থেকেই বোঝা যায় সমস্যাটি কত জরুরী।

খামার পর্য্যায়েই আবার বিশেষ করে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ইঁদুর, খরগোশ ইত্যাদির হাত থেকে শস্য বাঁচাবার জন্যে দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারগুলিতে প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে অনেক

কিছু বের করা হয়েছে বটে কিন্তু সে সব সম্বন্ধে দেশের সাধারণ কৃষকদের জানানোর প্রয়োজন রয়েছে। সারা দেশব্যাপী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্য্যের প্রয়োজন। পরিকল্পনা কমিশনের স্টোরেজ কমিটি সুপারিশ করেছে যে এই কাজের ভার ইন্ডিয়ান গ্রেণ-স্টোরেজ ইনস্টিটিউটের ওপর দেওয়া যেতে পারে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ সাফল্যের সঙ্গে যে ভাবে এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এই ইনস্টিটিউটও সেইভাবে কাজে অগ্রসর হতে পারে। কমিটি বলেছে যে সুসমন্বভাবে কাজে অগ্রসর হলে এবং আন্তঃ প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা থাকলে প্রচুর পরিমাণ শস্য বাঁচানো যায়। উপস্থিত খামার গুলিতে মাঝারীর আমলের সংরক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিয়ে নির্ব্বাচিত এলাকা-গুলিতে পর্যায়ক্রমে সংরক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের আশু প্রয়োজন রয়েছে।

সংগ্রহ সম্বন্ধে কমিটি বলেছে যে ভালভাবে বিবেচনা করে দেখে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে তার অন্যথা হলে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে। আর যদি কোন সরকারী সংস্থা এই অপরাধে অপরাধী হয় তাহলে সেই সংস্থার কাজকে অর্থহানিমূলক কার্য্য ছাড়া আর কি বলা যায়। আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ব্যবস্থায়, মরশুম অনুযায়ী কাজ করতে হলে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে আরো অনেক বেশী পরিমাণে সংগ্রহ অভিযান চালাতে হয়; আর এই ব্যবস্থাটিকে সব সময় পর্য্যালোচনা করে দেখে, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

সুচারুভাবে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে হলে এবং ভাল ফল পেতে হলে রাজ্য পর্যায় কমিটিগুলির মধ্যে এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রেলওয়েজ, ফুড করপোরেশন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ওয়েরার হাউসিং করপোরেশনের এবং সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধ ভাবে কাজ করা দরকার। বর্ত্তমানে রেলওয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্য নিয়ে যাবার বিষয়ে অধিকাংশ ভার বহন করে। সড়ক পথেও খাদ্য শস্য স্থানান্তরিত করা হয়। তবে রেল পথে পরিবহনে খরচ হয়ত একটু বেশী পড়ে। কিন্তু গন্তব্য স্থল যদি দূর হয় তাহলে রেল পথে পাঠানোই সুবিধাজনক, যদিও মাল বোঝাই ও মাল খালাসের জন্য কিছুটা বিলম্ব হয়। কাছাকাছি পাঠাতে হলে সড়ক পথেই পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ

এন. এস. ভাটনগর

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। সুতরাং তারা যাতে সুস্থ সবল দেহে সুষ্ঠু পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে উঠতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া যে কোন সভ্য জাতির প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আমাদের দেশে বিগত দু দশকে দেখা যায় সরকারী ও বে-সরকারী পর্যায়ে এদিকে বেশ নজর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটি বিপুল বিশাল। তাই সংবিধানে তাদের জন্যে রয়েছে রক্ষাকবচ যাতে নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে তাদের ওপর কোন অন্যায় অত্যাচার না হয়। রাষ্ট্রের নির্দেশ নামায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সমস্ত শিশুর জন্যে বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কোরতে হবে। কিন্তু এ সত্বেও অবস্থাটা ঠিক সন্তোষজনক নয়। আমরা অসংখ্য শিশু দেখতে পাই যারা ঠিকমত খেতে পায় না বা অনাহারেই রয়েছে, বা তাদের মধ্যে পুষ্টির অভাব রয়েছে, জামাকাপড় নোংরা শতছিন্ন। কেউ বা রাস্তায় রাস্তায় জুতো পালিশ করে বেড়াচ্ছে, কেউবা শ্রমিকের কাজ কোরছে কেউ আবার বাড়ীর চাকর হিসেবে কাজ কোরছে অথবা ছোটখাট হোটেলে বয়ের কাজ কোরছে অনেকে আবার ভিক্ষাবৃত্তি করে এবং অনেক অবৈধ কাজেও নিযুক্ত হয়। এসব যে তারা ইচ্ছে ক'রে করে তা নয়, তাদের অভিভাবকের স্বল্প আয়ে কিছু সাহায্য করার আর কোন উপায় নেই বলেই তারা এসব কাজ কোরতে বাধ্য হয়। আর এসবের সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হোল, অপরিণত শিশুমন স্বভাবতই অতি ক্ষতিকারক সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপের দিকে ধাবিত হয়।

সর্বপ্রথম শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া দরকার। মহিলা ডাক্তার শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন

সাধারণভাবে বলা যায় চারটি কারণে শিশুদের সুষ্ঠু উন্নয়ন সম্ভব হয় না। প্রথম, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা ও বিরাটাকার পরিবার; দ্বিতীয়, তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি যোগান দেওয়ার মত সম্পদের অভাব, তৃতীয়, শিক্ষা ব্যবস্থায় সুযোগের অভাব এবং চতুর্থ শিশু সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণা ও বিশ্লেষণ কার্য্যের সুযোগসুবিধার অপ্রতুলতা এবং শিশু কল্যাণমূলক কাজে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের জন্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অভাব।

স্বাধীনতা লাভের পর যে বিরাট অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে, তার অধিকাংশই খেয়ে গেছে বিরাট জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে। এই বিরাট জন সংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে সর্বত্র অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে সুখের বিষয়, দেশের সর্বত্র জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে ব্যাপক কার্য্যসূচী চালু করা হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় বেশ খানিকটা সাফল্য অর্জন করা গেছে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রেও বেশ খানিকটা করে সাফল্য দেখা গেছে যেমন সঞ্চয়ের পরিমাণ। এধারা শিশু কল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্পগুলির কাজ যে কার্য্যকরী করা সম্ভব হবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সম্পদের

অভাবে এই প্রকল্পগুলি এতদিন পড়েছিল।

শিশু সংক্রান্ত প্রধান সমস্যা হোল পুষ্টির অভাব। এ বিষয় পর্য্যালোচনা করে দেখা গেছে যে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র সম্প্রদায়ের শিশুরা যারা এখনও বিদ্যালয়ে যাইনি তাদের এবং সন্তান সম্ভবা মায়েদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশের মধ্যে সাংঘাতিক রকম পুষ্টির অভাব রয়েছে। এদের অধিকাংশই বস্তিতে বসবাস করে।

প্রসবের পূর্বে এবং পরে চিকিৎসার ব্যবস্থা কোরে শিশু মৃত্যুর হার যদিও বেশ খানিকটা কমানো গিয়েছে তাহলেও এখনও এর সংখ্যা ভয়াবহ—দেশের মোট মৃত্যু সংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। উন্নত দেশগুলিতে এই হার হোল মাত্র ৬ থেকে ৮ শতাংশের মধ্যে।

ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে কয়টি পর্য্যালোচনা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে এদের অধিকাংশের মধ্যে রয়েছে প্রোটিনের অভাব। বাচ্চারা যে তাড়াতাড়ি অন্ধ হয়ে যায় এটি তার অন্যতম প্রধান কারণ। এই অবস্থার বিহিত করার জন্যে সরকার ১৯৭০-৭১ সালের জন্যে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ের এক বিশেষ কার্য্যসূচী অনুমোদন করেছেন। এই সূচী কার্য্যকরী হবে বস্তি ও উপজাতীয় এলাকাগুলিতে এবং এর দ্বারা ১০ লক্ষ শিশু উপকৃত হবে। পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কল্যাণমূলক কেন্দ্রগুলি এবং প্রসূতি স্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্রগুলির মারফত শিশুদের পুষ্টি সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি কার্য্যকরী করা হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার পুষ্টি সংক্রান্ত কয়েকটি কার্য্যসূচী চালু করেছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের সাফল্য বিপুল ধরণের। ১৯৫০ সালে যে সংখ্যক শিশু শিক্ষালাভ কোরত এখন তার দ্বিগুণ সংখ্যক শিশু শিক্ষালাভ কোরছে। এ সংখ্যার শতকরা হিসেবের দিক থেকে বেশী এগোনো যায়নি। ১৯৬০-৬১ সালে, ৬ থেকে ১১ বৎসরের শিশুদের মধ্যে মাত্র ৬২ ৪ শতাংশ স্কুলে যেত। এই শতাংশ আরও হ্রাস পায় যদি আমরা এর উপরের বয়স্কদের ধরি। যেমন ১১ থেকে ১৪ বৎসর বয়স্কদের শতাংশ হোল ২২ ৪ এবং ১৪ থেকে ১৭ বৎসর বয়স্কদের শতাংশ হোল ১১ ১। ১৯৫১ সালের পর থেকে স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা দ্বিগুণ হলেও গত দশ বছরে স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা শতাংশ হিসেবে বেড়েছে বলে মনে হয়না।

শিশুদের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হোল পারিবারিক পরিবেশ। শিশু যখন বাড়তে থাকে তখন তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশের উপর। আর এতে মায়ের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও প্রধান অন্তরায় হোল মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষরতার উচ্চ হার। এই কারণে, শিশুর মনস্তাত্ত্বিক, দৈহিক এবং অন্যান্য প্রয়োজন মা সঠিকভাবে উপলব্ধি কোরতে পারেন না। তবে এই অসুবিধার খানিকটা দূর হয় শিশুর কল্যাণের

শিক্ষা ভিন্ন জাতীর ভবিষ্যৎ গড়ে উঠতে পারে না। শিশু শিক্ষার প্রসারের দিকে তাই বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে

লেগেছে খেলার ধুম

জন্যে মায়ের সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা। এছাড়া মাকে যে কঠোর জীবন এবং দুরূহ পরিস্থিতির মধ্যে জীবন যাপন কোরতে হয় তাতে শিশুর উপযুক্ত যত্নের জন্যে তিনি সময়ই পান না। তাঁর নিজেরই জীবন কাটে দারিদ্র, অজ্ঞতা, ভগ্নস্বাস্থ্য এবং পুষ্টির অভাবজনিত রোগ-ভোগের মধ্যে। ফলে শিশু বড় হয়ে ওঠে এক বিকৃত মানুষ হিসেবে। এবং তার ব্যক্তিত্বও খর্ব হয়ে যায়।

ঘরের বাইরে এমন পরিবেশ পাওয়া বেশ কঠিন যেখানে শিশুদের স্বাস্থ্যকর সুষম উন্নয়ন সম্ভব। পল্লী অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত খেলার জায়গা এবং অবসর বিনোদনের জন্যে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা খুব বেশী থাকে না। তবে শহরাঞ্চলে অবস্থা কিছু ভাল।

শিশুদের কল্যাণের জন্যে কোন কার্যকরী সূচী চালু কোরতে হলে, উপযুক্তভাবে শিক্ষিত ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন। এই বিষয় পারদর্শী হবার সুযোগ সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই দিতে পারে। কোন একটি সংস্থার পক্ষে এই বিরাট কার্যসূচী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অন্যান্য বে সরকারী সংস্থাগুলি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এবং সেগুলির বিশেষ গুরুত্বও রয়েছে। গবেষণামূলক কার্য্য কলাপের সুযোগ সুবিধা এবং গবেষণার জন্যে আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের কার্য্যকলাপের মধ্যে সংহতি সাধনের কাজে সরকার অগ্রণী হতে পারেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বে-সরকারী ও স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্যের জন্যে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই কেন্দ্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কোরতে পারে। শিশু কল্যাণ সূচীর একটি শোচনীয় দিক হোল শিশু কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কোন উৎসাহ দেওয়া হয় না বল্লেই হয়। অর্থের দিক থেকে অথবা পদের দিক থেকে আকর্ষণীয় কিছু তাঁরা পান না। শিশু কল্যাণের ক্ষেত্রে সমাজ ব্যবস্থা অনুশীলনের জন্যেও সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার।

রাষ্ট্র সঙ্ঘ শিশু কল্যাণ তহবিলের (UNICEF) নায় এক সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন যা বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থাগুলির মধ্যে প্রধান সমন্বয়-সাধক সংস্থা হিসেবে কাজ কোরবে। এ ধরণের একটি সংস্থা থাকলে শিশুদের সমস্যাগুলির মীমাংসা করা সহজসাধ্য হবে। এছাড়া,

চল্ ফিরে, ঘরের টানে

এর দ্বারা গবেষণামূলক কাজ কর্মের বিশেষ সুবিধে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে শিশু কল্যাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচীর কাজ, পরি-বার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কর্মীদের সাহায্যে কার্য্যকরী করা সমীচীন কারণ এই সব কর্মীর কার্য তালিকারই অন্তর্ভুক্ত হোল শিশু কল্যাণের বিষয়টি। বস্তুত: প্রসূতি ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রগুলি, কোন না কোন প্রকারে ইতিমধ্যে এই বিষয়টির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এর একটা প্রধান সুবিধে হোল, দেশের সর্বত্র এইসব কর্মী ছড়িয়ে রয়েছেন এমন কি অজ পল্লী গ্রামেও। সুতরাং সুদূর গ্রামাঞ্চলে গিয়ে এই কাজ শুরু কোরতে কোন অসুবিধেই হবে না। এঁরা সকলেই বিশেষভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত কর্মী, শিশু বিশারদও বলা চলে। সেই কারণে শিশু সমস্যা সংক্রান্ত যে কোন অসুবিধে দূর কোরতে তাঁদের বিশেষ কষ্ট পেতে হবে না। তবে এ সবের সাফল্য প্রধানত: নির্ভর কোরছে—কার্য্যসূচী প্রণয়নের জন্যে একটি সুস্পষ্ট নীতির ওপর এবং অনাগত দিনের নাগরিক গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত সেবক সেবিকাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার ওপর।

পড়ার সময়—গোল কোরো না

বেশ মজা

শিশুদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা

সমস্যা ও তার প্রতিকার

জ্যোৎস্না সাহা

অনেক সময় শিশু অপরাধী আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু একটা বিশেষ কারণ না থাকলে কোন শিশুই অপরাধী হয়ে ওঠেনা। সাধারণতঃ একটি শিশু অপরাধী হয়ে ওঠার পেছনে তার বাড়ীর এবং বাড়ীর বাইরের অনেকগুলো ঘটনা কাজ করে। বাড়ী সংক্রান্ত ঘটনাগুলো যেমন,—বাবা মার মধ্যে মনোমালিন্য, ঝগড়া-ঝাটি, অসুখকর পারিবারিক পরিবেশ, বাবা মার পরিচ্ছন্ন ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব, নানা রকম কুসংস্কারপূর্ণ বদ্ধমূল ধারণার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা, দারিদ্র ও নোংরা বস্তিতে বাস ইত্যাদি। সুনাগরিক হ'য়ে ওঠার প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি যখন বাড়ীর কোন কিছুর দ্বারাই মেটেনা, স্বভাবতই শিশু তখন বাইরের দিকে চায়—এবং কালক্রমে এমন সব ক্ষতিকারক অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ে যেখান থেকে ফেরার আর পথ পায় না এবং যার ফলে সে ঐ সমস্ত অপরাধের শিকার হয়ে ওঠে।

বাড়ীর বাইরের যে সব বিষয় একটি শিশুকে অপরাধী করে তোলে, তার মধ্যে আছে কুসঙ্গ, দুষ্কৃতকারীদের কুপ্রভাবে পড়া, উদাসীন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, খেলাধুলা ও অবসর বিনোদনের সুযোগ সুবিধার অভাব, স্কুল পালানো, উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে এলোমেলো ঘুরে বেড়ান, কুরুচিপূর্ণ সিনেমা, বিনা পরিশ্রমে পয়সা রোজগারের বাসনা ইত্যাদি। এইগুলোর যে কোন একটা বা একাধিক কারণ শিশুদের অপরাধের পথে টেনে নিয়ে যায়।

অপকর্মের তালিকা আকারে প্রকাশিত বাৎসরিক বিবরণ অনুযায়ী ভারতবর্ষে শিশু অপরাধের সংখ্যা স্পষ্টতই এখনও আশঙ্কাজনক নয়। তবু ও উন্নয়নশীল সমাজের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে একটা ক্রমবর্দ্ধমান সচেতনতা দেখা দিয়াছে এবং এর প্রতিকারের জন্য একটা সুপরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ উপলব্ধ হচ্ছে। মধ্যে মধ্যে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধানের ফলে শিশু অপরাধের সংখ্যা বেশ বেড়ে যায়। মোট পরিকল্পিত অপরাধ ও মোট পরিলক্ষিত শিশু অপরাধের একটা তুলনামূলক তালিকা পরে দেওয়া হল।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, ১৮৫০ সালে শিক্ষানবীশ আইন প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে শিশু অপরাধ নিবারণ প্রচেষ্টার সূচনা হয়। ১৮৭৬ সালের সংশোধনমূলক বিদ্যালয় আইন—যা পরে ১৮৯৭ সালে সংশোধিত হয়, এই প্রসঙ্গে সেটির উল্লেখ করা যেতে পারে। শিশু অপরাধীদের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের এই হল শুরু। এমনকি কোড অফ ক্রিমিন্যাল প্রোসিডিওর বা ফৌজদারী দণ্ড বিধিতেও স্থান পায়। এতে শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার সংস্থান রয়েছে, বিশেষ করে এর ৫৬২ নং ধারায় সুচরিত্র গঠনের জন্য পর্য্যবেক্ষণাধীনে রেখে শিশু অপরাধীদের মুক্তিদানের কথা বলা হয়েছে।

১৯১৯-২০ সালে ভারতীয় জেল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, তৎকালীন মাদ্রাজ, বাংলা ও বোম্বাই এর প্রাদেশিক সরকারগুলি যথাক্রমে ১৯২০, ১৯২২ ও ১৯২৪ সালে শিশু অপরাধীদের জন্য বিশেষ ধরণের বন্দোবস্ত করে শিশু আইনগুলি প্রণয়ন করেন। সাধারণভাবে এই আইনগুলির মূল উদ্দেশ্য হ'ল (১) শিশু অপরাধীদের বন্দী অবস্থায় রেখে বিচার ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা (২) শিশু ও অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েরা যাতে অসৎ পথে না যায়, তার ব্যবস্থা। কতকগুলি অঙ্গরাজ্যও এই ধরণের আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু শিশুদের জন্য বিশেষ ধরণের আইন প্রণয়নের ওপর সত্যিকারের ও যথেষ্ট গুরুত্ব একমাত্র দেশ স্বাধীন হবার পরই দেওয়া হয়েছে—যখন এটাকে রাজ্য তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হল। সৌরাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, হায়দরাবাদ, মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্য এই ব্যাপারে মনোযোগী হয়।

ভারত সরকারও ১৯৬০ সালে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য শিশু আইন প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে দরিদ্র এবং অপরাধী শিশুদের আলাদা করে বিবেচনা করার মত কতকগুলি নতুন ব্যবস্থা এই কেন্দ্রীয় আইনে আছে। ১৯৬৯ সালে আরও চারটি রাজ্য—আসাম, বিহার, মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থান এই ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করেন। কতকগুলি ব্যতিক্রম ছাড়া মোটামুটি ভাবে অনেক রাজ্যেই, শিশু ও একটা নির্দিষ্ট বয়স সীমার নীচের কিশোরদের ফৌজদারী আদালতের আওতা থেকে বাদ দেবার এবং সাধারণ কয়েদীখানায় না পাঠাবার নীতি স্বীকৃত হয়েছে।

বৎসর	মোট অপরাধ সংখ্যা	মোট শিশু অপরাধ সংখ্যা	শিশু অপরাধের শতকরা হিসাব
১৯৬৪	৭,৫৯,০১১	১৭,৯২৯	২.৩৬
১৯৬৫	৭,৫১,৬১৫	২০,৯৮৮	২.৭৯
১৯৬৬	৭,৯৪,৭১১	২২,০৭৭	২.৭৮
১৯৬৭	৮,৮১,৯৪১	২২,৮৫১	২.৫৯
১৯৬৮	৮,৬২,০১৬	২১,৩৮৫	২.৪৯
১৯৬৯	৮,৪৪,১৬৭	২১,৭০১	২.৫৭

শোচনীয় পরিস্থিতি

দুর্ভাগ্যক্রমে, শিশুদের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের সূচনার পঞ্চাশ বছর পরও উড়িষ্যা, জম্মু ও কাশ্মীরের মত কতকগুলি বড় রাজ্য এখনও এই ধরণের কোন আইন প্রণয়ন করে নি। তাছাড়া মাত্র এই সেদিন আসাম, মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানে শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এটা সত্যিই খুব দুঃখের বিষয় যে এখনও বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিতে ১৬ বছরের নীচে মোট প্রায় ১০,০০০ শিশু, বয়স্ক অপরাধীদের সঙ্গে কারাবাস করে চলেছে।

সমাজের দায়িত্ব কি ও কতটুকু ?

প্রত্যেকটি শিশু অপরাধীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কতকগুলো সম্পূর্ণ নতুনধরণের সমস্যা—যে গুলোকে শুধু তার নিজস্ব স্থানীয় পরিবেশ ও অবস্থার আলোতেই পর্যালোচনা করা সঙ্গত। পুলিশ, শিশু আদালত, মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণাগার, স্কুল এবং স্কুল ছাড়ার পরে যত্ন ও সাবধানতা নেওয়ার বন্দোবস্ত ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ের নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। তবুও অঘটন ঘটে যাওয়ার পরই কেবল তারা তাদের কর্তব্য সাধনে এগিয়ে আসে। কিন্তু এর প্রতিকার কি ?

বাড়ী, স্কুল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কর্মস্থল, অবসর বিনোদনের জায়গা ইত্যাদি নানাভাবে শিশু মনকে প্রভাবিত করে এবং তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত করে। শিশু অপরাধ নিবারণ কর্মসূচীর লক্ষ্য হবে দৃষ্টি ভঙ্গী উন্নত করা ও সেই অনুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে প্রত্যেক মানুষ পরিচ্ছন্নভাবে ও সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারে। সুতরাং এই সামাজিক কর্মসূচীর গোড়ার কথাই হবে একটা সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ, পারস্পারিক বোঝা পড়ার ভিত্তিতে গঠিত এক সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা, অবসর বিনোদন ও প্রশিক্ষণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা—যে সবের মধ্য দিয়ে আইনের মর্যাদা ও মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতার ভাব সৃষ্টি হবে। এই কর্মসূচী রূপায়নের প্রধান কর্মক্ষেত্র হ'ল গৃহ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও স্কুল।

শিশুকে অপরাধের অন্ধকার থেকে দূরে রাখতে হ'লে বাড়ীতে জীবন-যাত্রার মান অন্তত এমন হওয়া উচিত যাতে শিশু বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্য যা যা দরকার, তা যেন সে পায়। বাবা, মা এবং পরিবারের অন্যান্যদের স্নেহ ও যত্নের প্রতি উপযুক্ত মূল্যবোধ শিশুর মনে গড়ে ওঠা দরকার কারণ স্নেহ যত্নের অভাব ও একটানা অবহেলা শিশুর মনে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি করে। সেইরকম স্কুলেও প্রয়োজন বিশেষভাবে শিক্ষিত শিক্ষকের যাঁরা শুধু ক্লাসে শিক্ষাদান করেই তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন না। বরং তাঁরা শিশু মনের গভীরে প্রবেশ করেন যাতে তারা সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে শিশু অপরাধ, উদ্দেশ্য বিহীন-ভাবে ঘুরে বেড়ানো ও ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের যে গুরুত্ব রয়েছে তা এখনও পুরোপুরি বোধগম্য হয় নি। অশোভন ব্যবহার ও বাড়ীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের দ্বারা একটি শিশুকে অপরাধী হতে দেওয়ার পথে এগিয়ে দেওয়ার চেয়ে ভবিষ্যৎ সমস্যাগুলিকে সমূলে উৎপাটন করবার উদ্দেশ্যে বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থাগুলির কিছু রদ-বদল করা অনেক বেশী কল্যাণকর ও বাস্তবসম্মত। স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজই হবে একেবারে গোড়ার থেকে—অপরাধ প্রবণতাগুলি খুঁজে বার করা এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ-গুলি যাতে সামাজিক পথে মোড় নিয়ে শিশুদের সুস্থ-জীবন যাপনের উপযোগী করে তুলতে পারে তার চেষ্টা করা। বড় বড় শিল্পোন্নত নগরী যেখানে অবসর বিনোদনের সুযোগ সুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে এবং যেগুলো বস্তিতে ভর্তি, সেখানে প্রতিটি পাড়ায় একটা করে ক্লাব বা যুব সমাজ থাকা বাঞ্ছনীয়—যেগুলো (১) অপরাধ প্রবণতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন সব শিশুদের ঠিকপথে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে (২) উপযুক্ত ভাবে অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করবে। (৩) যারা স্কুল ছেড়ে দিয়েছে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করবে। (৪) স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় সমাজে শিশু অপরাধ নিবারণের বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

নিবারণ, নিয়ন্ত্রণ, এবং অপরাধী শিশুদের আবার সৎপথে ফিরিয়ে আনার যে কোন পরিকল্পনাকে সফল করতে হ'লে দরকার—বাড়ী, স্কুল, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, আদালত এবং সংশোধনী শিক্ষালয় ইত্যাদির নিবিড় ও পারস্পারিক সহ-যোগিতা। এই ধরণের সমন্বয় সাধন কমিটি গড়ে তুলতে হবে।

কয়েকটি মূল প্রশ্ন

রাজ্যভিত্তিক সমীক্ষা থেকে কতকগুলো মূল প্রশ্নের সন্ধান পাওয়া যায়—যেগুলো এই সমস্যার বিশেষ প্রকৃতির সঙ্গেই জড়িত। যেমন (১) মোটামুটিভাবে রাজ্য আইনগুলিতে শিশু বলতে সাধারণভাবে ১৬ বছরের নীচে ছেলেমেয়ে সবাইকেই ধরা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনে বয়সের ভিত্তিতে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। ১৬-১৮ বছর, এই বয়সের মেয়েদের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য কতটা কার্যকরী তা পরীক্ষাসাপেক্ষ। (২) যদিও সব রাজ্যগুলির শিশু আইনই অবহেলিত, দোষী ও দণ্ডিত শিশুদের নিয়ে—তবুও এই সবের জন্য শিশু আদালতই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান। দেখা গেছে অবহেলিত ও দোষী শিশুর মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা খুবই সামান্য। অবহেলিত শিশু সংখ্যার প্রায় তিন চতুর্থাংশ নিয়েই এই শিশু আদালতের কারবার। কেন্দ্রীয় শিশু আইনই সর্বপ্রথম কেবল অবহেলিত শিশুদের জন্য একটা আলাদা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। সেটা হচ্ছে শিশু কল্যাণ বোর্ড। এর ফলে শিশু আদালতের ওপর ভার থাকবে শুধু দোষী শিশুদের বিচার করা। যদিও শিশু কল্যাণ বোর্ডে একটা ধরাবাঁধা নিয়মের প্রতিষ্ঠান হওয়ার কথা নয়। তবুও কেন্দ্রশাসিত দিল্লী এলাকায় দেখা গেছে যে, এই প্রতিষ্ঠান কার্যতঃ সেই একই ধরাবাঁধা নিয়মে কাজ করে চলেছে—যার ফলে কোন

একটি শিশু মূলতঃ দরিদ্র না দোষী এটা ঠিক করার কাজ পুলিশকেই বেশীর ভাগ সময় করতে হয়। এর ফলে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে শিশুদের পর্যবেক্ষণের আগেই তাদের শ্রেণীবিভাজন করা হবে কি হবে না, এই দুই ধরণের শিশুদের বেলায়ই তাদের দোষের চেয়ে তাদের অসুবিধা বেশী কিনা এবং তাদের প্রতি কোমল ব্যবহার করা কিনা তা বিবেচনা করা দরকার। এখানে উল্লেখ্য যে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েকেই পুলিশ পর্যবেক্ষণ—অধিকারিক, কয়েদখানা, আদালত (শিশুদের জন্য অথবা বড়দের জন্য) শিশু কল্যাণবোর্ড ইত্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে কিনা? 'সমস্যা-পীড়িত' শিশু এই নামে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ইংলণ্ডের সরকারী পুস্তিকায় এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শিশুদের যতদূর সম্ভব আইন শৃঙ্খলা রক্ষক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে দূরে রাখতে হবে এবং ইতিমধ্যেই যারা আইনজালে জড়িত হয়ে পড়েছে তারা আবার যাতে ঠিক পথে ফিরে আসতে পারে, তার সহজতর কোন পন্থা বার করতে হবে। (৪) শিশু আদালতগুলিতে আইনজীবীদের কোন প্রবেশাধিকার নেই। তথাপি শিশুদের আইন সঙ্গতভাবে আত্মরক্ষার অধিকার আছে কিনা এবং সংবিধানে ব্যবস্থিত মৌলিক অধিকার ও মানবিক অধিকারগুলি সঠিক মর্যাদা পাচ্ছে কিনা এটা বিবেচনা করা দরকার। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্রে একটি দাবী উঠেছে যে, সমস্ত শিশু আদালতগুলিতেই শিশুদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারী প্রতিনিধি রাখতে হবে। (৫) শিশু আদালতের ও তার বিচারকগণের বেতনভুক বা অবৈতনিক যাহাই হউন—ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া দরকার। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকটা বা বড়দের আদালত ও শিশু আদালতের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দেয় এবং শিশু আদালতের বিচারকমণ্ডলীর জন্য যোগ্যতা স্বরূপ—শিশু সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক বলে নির্দিষ্ট করে দেয় তা এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। অন্যান্য দেশে শিশু আদালতের বিচারকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত আছে এবং তাদের জাতীয় ও স্থানীয় এ্যাসোসিয়েশন বা সঙ্ঘ আছে, যেগুলির কাজ এই সমস্ত প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করা ও সময়ে সময়ে নানাবিধ সংশোধনী কার্যসূচী রূপায়ন করা। প্রত্যেকটি রাজ্যে শিশু আদালতের বিচারকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করার ও তাদের সঙ্ঘ রচনার আশু প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশেও বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। শিশু আদালতের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধেও কতকগুলো মান নির্দিষ্ট করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। (৬) শিশু সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তাই পুলিশের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। মাত্র কয়েকটা শহরেই এই ধরণের বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিশু সহায়ক পুলিশ 'ইউনিট' আছে। মাউন্ট আবুর জাতীয় পুলিশ বিদ্যায়তনে যেমন শিশু অপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে, রাজ্য পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতেও সেই রকম বন্দোবস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। (৭) দেখা গেছে খুব অল্প সংখ্যক শিশু অপরাধীই আইনের খাঁড়া কলে পড়ে শিশু আদালতের শরণ হয়। ভিক্ষাবৃত্তি ও আরও নানা অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শিশুদের জড়িয়ে ফেলার ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা আছে বলেই, শিশুদের কোন অন্যায় অবিচারের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আজ আমরা বেশী করে উপলব্ধি করছি। ছেলে চুরি এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত করার জন্য তাদের বিকলাঙ্গ-করণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে ব্যাপক অন্বেষণ চালানো আজ দরকার হয়ে পড়েছে। (৮) শিশু আইনের আওতায় পড়ে বাঁধাধরা নিয়মের প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া আর যে সব প্রতিষ্ঠান যেমন সংশোধনী বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ বিদ্যালয়, বিশেষ ধরণের অনুমোদিত স্কুল ইত্যাদি এখনও ঠিক গড়ে ওঠেনি এবং এগুলির জন্য একটা ন্যূনতম মান নির্দিষ্ট করে না দিলে, সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এগুলি থেকে শিশুরা সামান্যই উপকৃত হবে। (৯) রাজ্য সরকারগুলির আইনানুগ দায়িত্বের একটা অত্যাবশ্যকীয় অংশই হ'ল বিপথে চালিত শিশুদের ঠিক পথে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের সুনাগরিক ক'রে তোলার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। এখনও পর্যন্ত এই দিকটা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি বললেই হয়। অধিকাংশ রাজ্য আইনগুলিতেই বিশেষ বন্দোবস্ত এর কোন স্থান নেই। যদি কোথাও বিশেষ বন্দোবস্তের ব্যবস্থা থাকে, সেখানে তা কাজে রূপায়িত করার কোন ব্যবস্থা নেই। ভারতীয় সমাজ কল্যাণ সঙ্ঘের সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে। (১০) বাস্তবিক, আমাদের দেশে শিশু অপরাধ নিবারণের এবং দরিদ্র ও অপরাধী শিশুদের সংশোধনের ব্যাপারে জনসহযোগীতা লাভের এবং সেগুলিকে সমন্বিত করার বিরাট সম্ভাবনা আছে। আপানে চতুর্থ জাতিপুঞ্জ সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে জাতিপুঞ্জের আশ্রয়ে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ করেকশনাল সার্ভিসেসের উদ্যোগে ভারতে এক ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চালানো হয়েছিল। এই অনুসন্ধানের রিপোর্টে দেখা গেছে যে গুজরাট মহারাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও জনগণের সহযোগিতা বেশ ভাল রকমই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যই এ ব্যাপারে এখনও দারুণ পিছিয়ে রয়েছে। উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করার জন্য এবং স্বেচ্ছামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ ও সংশোধন আধিকারিকের কাজ করার জন্য জনগণের থেকে যে সাড়া পাওয়া যায়—তা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো সত্যিই দরকার।

ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টের রিপোর্ট

অপরাধের জন্য দণ্ডিত শিশুর ১৯৬৮ সালে আমাদের দেশে সংখ্যা ছিল ২১,৩৮৫—সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৬৯ সালে ২১,৭০২৩ অর্থাৎ ১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি। ১৯৬৪—৬৮ এই পাঁচ বৎসরের গড়ের চেয়ে এই বৃদ্ধি হল ৩.১ শতাংশ এবং ১৯৬০

তৃতীয় কভারে দেখুন

স্টুডেন্ট ডে হোম

সুকমল ঘোষ

ছাত্রদের কল্যাণে যে সব প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে স্টুডেন্ট ডে হোমের নাম তার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করার মতো। এই হোম প্রতিষ্ঠার পেছনে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় স্বর্গত ডক্টর জ্ঞান চন্দ্র ঘোষের কথা। এই ছাত্র দরদী শিক্ষাবিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্ররা অকৃতকার্য্য হয় কেন, তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি সমীক্ষা করেন। এই সমীক্ষার ফলে জানা যায় যে অধিকাংশ ছাত্রই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের। তাদের জীবনে আছে নানান সমস্যা। এইসব সমস্যার অন্যতম হোল, নিরিবিলিতে শান্ত চিত্তে পড়াশুনা করবার এক টুকরো জায়গার অভাব। তাছাড়া তারা যা খায় তাও শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। এইসব সমস্যার কথা মনে রেখেই তিনি কলকাতা ও শহরতলিতে কতকগুলি দিবা ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন। তাঁর এই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্ট ডে হোম, দক্ষিণ কলকাতায় বাসন্তী দেবী কলেজের পাশে মেয়েদের জন্য একটি ডে-হোম, বাগবাজারের রামকৃষ্ণ দিবা ছাত্রাবাস ও রাজাবাজারে ঈশ্বরচন্দ্র পাঠভবন। রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্ট ডে হোমের পরিবেশ ছাত্রদের পড়াশুনা করবার খুবই উপযোগী। ছাত্রদের সুবিধার কথা মনে রেখেই ১৯৫৯ সনের মে মাসে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের জন্য একটি চীপ ক্যান্টিনও খোলা হয়েছিল। বর্তমানে এই ক্যান্টিন উঠে গেলেও সস্তায় মধ্যাহ্নকালীন আহার্য সরবরাহের প্রকল্পটি এখনও চালু আছে। এছাড়া ছাত্রদের সুবিধার জন্য এখানে আধুনিক ব্যবস্থা সমন্বিত স্নানাগার রয়েছে। এখানে যে সব ছাত্ররা পড়তে আসেন তারা স্নানাহার সেরে সরাসরি এখান থেকেই কলেজে চলে যেতে পারেন। হোমটি খোলা থাকে সকাল ৬টা থেকে রাত ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত। বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা এই তিন বিষয়ের বই হোমে প্রচুর পরিমাণেই রয়েছে।

স্টুডেন্ট ডে হোম অন্য শাখা

(রাসবিহারী এভিনিউ)

"এ কি শিখে কি কি হবে যত অমঙ্গলময়!" মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙলা দেশের মানুষের এই ধারণা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রচলিত ছিল। তারপর যুগের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তারও পরিবর্তন ঘটেছে। তাই মেয়েরা আজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও আজ তারা পিছিয়ে নেই।

এই সব সমস্যার কথা মনে রেখেই সরকারের তরফ থেকে ১৯৫৭ সনে বাসন্তী দেবী কলেজের পাশের বাড়ীটায় রাসবিহারী (রাসবিহারী এভিনিউতে) দিবাকালীন ছাত্রী নিবাসের কাজ শুরু করা হয়। বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা দলে দলে এসে এই হোমের সভ্যা হন। তারপর থেকে হোমের কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলছে। বর্তমানে এর সভ্যাসংখ্যা প্রায় ৬০০ মতো। সকালে ও বিকেলে দুটি শিফটের ব্যবস্থা আছে এখানে। বইয়ের সংখ্যা আনুমানিক ৯০০০ এর মতো। এখানকার তত্ত্বাবধায়িকা শ্রীমতী মানসী বসুর মতে যে সব ছাত্রীরা এখানে পড়তে আসেন তাদের মধ্যে শতকরা ৯১% জনই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন।

এই স্টুডেন্ট ডে হোমগুলি এক মহান ব্রত নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে এই ব্রতকে বাস্তবে রূপ দেবার মতো অনুকূল অবস্থা আজ অনেক ডে-হোমেই নেই। এর কারণ সমসাময়িক ছাত্র বিক্ষোভ। ছাত্ররা এই মহান পরিকল্পনাকে ঠিক নিজেদের মনে গ্রহণ করতে পারছে না। তাই হোমগুলির অনেক বইয়ের পাতা কাটা যায়। বই খোয়া যাওয়া ও মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট করার ঘটনাও কম নয়। তাই ছাত্রবন্ধুদের আজ সজাগ থাকতে হবে। তারা যদি নিজেদের যথার্থ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চান তবে এই হোমগুলির নানান সুবিধাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। তারা যেন মনে রাখেন টালিগঞ্জ ও মেদিনীপুরের দুটি নূতন ছাত্রাবাস তৈরীর কাজ এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য সম্ভব হচ্ছেনা। সংশ্লিষ্ট কোন কোন মহল সরকারী অনুদানের অভাবকেই এই অচলাবস্থার মূল কারণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল সরকারী অনুদান হোমগুলির পক্ষে যথেষ্টই। প্রত্যেকটি ছাত্রাবাস কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গড়ে প্রায় এক লাখ টাকার মতো পেয়ে থাকেন। এই অনুদান অন্য কমি হোমগুলির পক্ষে খুব একটা কম নয়।

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য

কুমারেশ সেন

পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির পর থেকেই ভারত পরিকল্পিত পথায় দেশের অর্থনীতির দ্রুত প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। অর্থনীতির দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়নের বিভিন্ন দিকের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের রূপ পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। চা, পাট, কফি প্রভৃতি চিরাচরিত দ্রব্য ছাড়াও ভারতের রপ্তানী দ্রব্যের তালিকায় বহু নতুন জিনিষ স্থান পেতে শুরু করেছে। এজন্য ভারতের রপ্তানীর পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া ভারতের জাহাজী পরিবহণ শিল্পের প্রসার ঘটায় ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি এখন অতি সহজেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাজারে পৌঁছাচ্ছে। ভারতীয় রপ্তানী দ্রব্যের তালিকায় নতুন নতুন সামগ্রীর অন্তর্ভুক্তি এবং দেশীয় জাহাজী পরিবহন-শিল্পের প্রসারের ফলে ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে ভারতের মোট রপ্তানীর মূল্য ছিল ৪০৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬৮-৬৯ তা বেড়ে হয়েছে ১৩৬০ কোটি টাকা।

চিরাচরিত পণ্যের (পাট, চা, কফি ইত্যাদি) রপ্তানী হ্রাস পেয়েছে সত্য; সেই সঙ্গে অতি আধুনিক শিল্প দ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে, বাড়তি রপ্তানীর শতকরা ৬০ ভাগই এই আধুনিক শিল্প-দ্রব্যগুলি।

রপ্তানীর পরিমাণ হঠাৎ বৃদ্ধি পাবার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে— ভারত বিদেশ থেকে যে সব যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ পূর্বে আমদানি করত এখন সেই সব যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের অধিকাংশই ভারতে তৈরী হচ্ছে এবং ভারত তা রপ্তানি করছে বিদেশের বাজারে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারত ১৯৫ কোটি টাকা মূল্যের ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করেছিল। রপ্তানীকৃত ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির মধ্যে ডিজেল ইঞ্জিন, মোটর গাড়ী ও তার যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক পাখা, সাইকেল, ব্যাটারী, ইস্পাতের পাইপ, বৈদ্যুতিক তার, রেল, রেলগাড়ী নির্মাণের সামগ্রী ইত্যাদি ভারত আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রী করছে।

আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি, দূরপ্রাচ্য, আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে। পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি যথাক্রমে শতকরা ২৫ ভাগ এবং শতকরা ১৩ ভাগ বেড়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের মোট রপ্তানির মূল্য ছিল ১৪৮.৩ কোটি টাকা। আফ্রিকার ঘানা, লিবিয়া, টাঙ্গানাইকা, উগাণ্ডা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি বেড়েছে, কিন্তু সুদান, টিউনিসিয়া, জাম্বিয়া এবং নাইজেরিয়ায় রপ্তানির পরিমাণ কমেছে।

জুতো ও মাথার চুল রপ্তানী করে ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে চলেছে। গত বছরের গোড়ার দিকে ভারতীয় জাহাজ 'ইণ্ডিয়ান সাক্সেস' ৫,০২,০০০ জোড়া বাটার জুতো নিয়ে ইংলণ্ড ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাত্রা করে। তবে অন্যান্য বারের চেয়ে এবারের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এবার এক সঙ্গে এক জাহাজে যতগুলি জুতো রপ্তানী করা হয়েছে, ইতিপূর্বে একসঙ্গে তা হয়নি। ১৯৬৯ সালে রপ্তানী বাণিজ্যে বাটা কোম্পানীর আয় হয়েছিল ৪,৬৩,৬৫,০০০ টাকা। ১৯৬৫ সালে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ১,৭০,০০,০০০ টাকা।

সুদূর অতীতে শীতের প্রকোপ থেকে ফারাওদের টাক মাথাকে গরম রাখার জন্য পরচুলা ব্যবহার করা হোত। এই প্রাগৈতিহাসিক চুলই হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম পরচুলা। দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভারতীয় পরচুলা প্রস্তুতকারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন 'টেস ইণ্ডিয়া' গঠন করে। এর উদ্যোগে মাদ্রাজে একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। গত তিন বছরে আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে টেস ইণ্ডিয়ার রপ্তানীর মোট পরিমাণ দাঁড়ায় দেড় কোটি টাকা। স্মরণাতীত কাল থেকে দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র হিন্দু মন্দিরগুলিতে দেবতাদের কাছে চুল 'মানত' করার প্রথা প্রচলিত আছে। টেস ইণ্ডিয়া মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ঐ সব মানতের চুল সরেজমিনে সংগ্রহ করে থাকে।

আমেরিকায় ভারত থেকে ব্যাঙের ঠ্যাং রপ্তানীর পরিমাণ সাম্প্রতিককালে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

যথাক্রমে সরকারী বাণিজ্যিক সূত্রে খবর পাওয়া গেছে যে, ১৯৬৮ সালে ভারত আমেরিকায় ৬১২,০০০ পাউণ্ড ব্যাঙের ঠ্যাং এবং ৪৮০,০০০ পাউণ্ড গলদা চিংড়ি রপ্তানী করেছিল। আর ঐ বছরে ব্যাঙের ঠ্যাং ও গলদা চিংড়ি রপ্তানীবাবদে ভারতের

আয় হয়েছিল যথাক্রমে ২৯৬,০০০ ডলার ও ৫৯৭,০০০ ডলার। ১৯৬৯ সালে আমেরিকায় ব্যাঙের ঠ্যাং এবং গলদা রপ্তানী করে ভারতের আয় হয়েছে যথাক্রমে ৬৯৫,০০০ ডলার ও ১,৬৯৪,০০০ ডলার।

খবরে আরও প্রকাশ, ১৯৬৯ সালে ভারত বাগদা চিংড়ি বা অন্যান্য ছোট চিংড়ি রপ্তানী করেছে ২২,০৫৯,০০০ পাউণ্ড যার মূল্য ১২,২৫৪,০০০ ডলার। আর ১৯৬৯ সালে ভারত বাগদা চিংড়ি বা অন্যান্য ছোট চিংড়ি রপ্তানী করেছে ৩৪,৩৫৮,০০০ পাউণ্ড, যার মূল্য ২০,৬৯৫,০০০ ডলার।

ভারতীয় পাখীগুলিও দেশকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করে। ১৯৬৩ সালে যেখানে পাখী বিক্রয় করে ১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে ১৯৬৮ সালে পাওয়া গিয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা। এটি একটি রেকর্ড।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় করপোরেশন খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জামের বিদেশের বাজারে রপ্তানী উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই এক বিশেষ অভিযান সুরু করেছেন। তাই বিদেশে উন্নত মানের ফুটবল রপ্তানীর জন্য পশ্চিম জার্মানী থেকে ডানলপ টাইপ সেলাই-বিহীন ব্লাডার আমদানীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 'স্পোর্টস গুডস এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল' ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় স্পোর্টস দ্রব্যাদি রপ্তানীর নতুন বাজার সৃষ্টির দিকে নজর দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৯-৭০ সালে ভারত বিদেশে স্পোর্টস্ দ্রব্যাদি রপ্তানী করেছে ১,০০,০০,০০০ টাকার।

দিল্লী থেকে ১ শত মাইল দূরে সাহারানপুর কাঠশিল্পের জন্য বিখ্যাত। আমেরিকাতে সাহারানপুরের প্রসিদ্ধি কিন্তু কাঠ খোদাই কাজের জন্য। তামা, পিতল, কাঠের পার্টিশন, জামা কাপড় রাখবার সুন্দর স্ট্যাণ্ড, কলম, পেন্সিল বা টুকিটাকি জিনিষ রাখবার কাঠের বাক্স, গয়নার বাক্স, ওয়াল ব্র্যাকেট, চায়ের ও কফির ট্রে, ফ্রুট ট্রে, কাঠের পায়া, মোমবাতি রাখবার স্ট্যাণ্ড, বাতির স্ট্যাণ্ড প্রভৃতি সাহারানপুরে তৈরী হাজার রকমের কাঠের জিনিষ আমেরিকানদের ঘরে দেখা যায়। আমেরিকা বছরে প্রায় ২ কোটি টাকার কাঠের জিনিষ সাহারানপুর থেকে আমদানি করে।

জরি তৈরীই শুধু নয়, জরির নিখুঁত শিল্পকর্মের জন্য সুরাট আজ জগদ্বিখ্যাত—যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় এ সকল সামগ্রী রপ্তানী করে বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে ভারত। তাছাড়া সাপের চামড়ার তৈরী মহিলাদের হ্যাণ্ড ব্যাগ ভারতে তিন কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা এনেছে।

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড ও তার সহযোগী সংস্থাগুলি ১৯৫৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭০ সালের মার্চ পর্যন্ত সিগারেট রপ্তানীর মাধ্যমে ৬৬ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা আয় করেছেন।

রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেই উল্লসিত হবার কিছু নেই। রপ্তানীর পরিমাণ আজ হয়তো বৃদ্ধি পেতে পারে—কিন্তু চিরদিনই যে আমাদের দেশের জিনিষ আমদানীকারী দেশগুলি শুধু আমাদের কাছ থেকে জিনিষ আমদানিই করে যাবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই হঠাৎ যদি আমাদের রপ্তানী বাজার কোনো কোনো দেশে সঙ্কুচিত হয়, তার জন্য আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলে যাতে অবধা হাত না পড়ে, সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকার জন্য এখন উচিত আমদানির বিকল্প জিনিষ তৈরী করার ক্ষেত্রে আরও গুরুত্ব আরোপ করা।

রপ্তানীর মান [illegible] করার জন্যে 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেন ট্রেড' যে সব সুপারিশ করেছিলেন সরকার তার অধিকাংশই মেনে নিয়েছেন বলে [illegible]। তাছাড়া আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দেশের মধ্যে কোনো কোনো পণ্যের বিক্রি কমিয়ে তা' বিদেশে রপ্তানী করা হবে। আর যে সকল কলকারখানা পণ্য রপ্তানী করে থাকে তাদের কাঁচা মাল যোগানোর ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আশা করা যায়, এই সব ব্যবস্থার প্রার্থিত ফল পাওয়া যাবে, কিন্তু এই সঙ্গে যদি আমদানির পরিমাণ বাড়তে থাকে তবে তা নতুন আশঙ্কার কারণ হবে।

ভারতীয় যন্ত্রকুশলী প্রকল্পিত প্রথম ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র

সম্প্রতি হসপেটের কাছে টোরাংগলে ২০ লক্ষ টন উৎপাদনক্ষম বিজয়নগর ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে। হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড, হিন্দুস্থান ষ্টীল ওয়ার্কস্ কনস্ট্রাকশন লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাণ্ড ডিজাইন ব্যুরোর দ্বারা একান্তভাবে প্রকল্পিত ও স্থাপিত এই ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রটিই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয় প্রচেষ্টায় নির্মিত ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র।

আনুমানিক ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিজয়নগর ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রটি বছরে ২০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করার ক্ষমতা নিয়ে কাজ শুরু করবে কিন্তু ভবিষ্যতে ৪০ লক্ষ টন উৎপাদন করার জন্য সম্প্রসারণের বন্দোবস্তও এতে থাকবে। এই কেন্দ্রটির উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন চুল্লী কারখানায় কয়লা গুঁড়ো যোগান দেওয়ার জন্য হাই [illegible] হাই স্পীড [illegible] মত সব যান্ত্রিক [illegible] থাকবে।

পশ্চিম বাংলায় প্রান্তিক কৃষকদের সমস্যা

কৃষি জগতের ইদানীংকালের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকরা সামান্য কিছু উপকৃত অবশ্য হয়েছেন যা অনেকটা ঠিক উপরি পাওনার মতন বলা চলে। অথচ পল্লী জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ এরা। এদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের প্রস্তুতি পরিকল্পনা গ্রহণে তাদের কাছে একটা মস্তবড় সমস্যা।

এই সমীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের কাজকর্ম এবং বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট চিত্র তুলে ধরা এবং তাদের আয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি ও দ্রুত অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে সাহায্য করা। পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার ১৫টি গ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে এই সমীক্ষা। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রাম থেকে ৩টি ক্ষুদ্র কৃষক, ৬টি প্রান্তিক কৃষক এবং ৬টি কৃষি শ্রমিক পরিবার বেছে নেওয়া হয়। ক্ষুদ্র কৃষকদের এই সমীক্ষার এক্তিয়ারভুক্ত করার প্রধান প্রান্তিক কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের অবস্থার তুলনামূলক বিচার করে দেখা। যাদের কাছে ১ হেক্টরের কম জমি আছে তারা প্রান্তিক কৃষক। যাদের জোত এক হেক্টরের বেশী অথচ দুই হেক্টরের কম তারা ক্ষুদ্র কৃষক শ্রেণীর।

সারা হুগলী জেলার গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত খামারের কাজে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ কৃষক এবং ২৭ শতাংশ কৃষি শ্রমিক নামে অভিহিত। অন্য উৎপাদনী কাজে শতকরা মাত্র ৭ ভাগ শ্রমিক নিযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য এই জেলায় ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের বেশী প্রাধান্য। মোট জন সংখ্যার শতকরা ২৪ ভাগ এরা। গড়পড়তা প্রান্তিক কৃষকদের আবাদী জমির পরিমাণ ০.৬২৫ হেক্টর। ক্ষুদ্র কৃষকদের আবাদী জমির পরিমাণ ১.৬০০ হেক্টর।

চাষ আবাদ ছাড়া ও উপরি আয়ের উদ্দেশ্যে অন্য পেশার ওপর প্রান্তিক কৃষকরা যতটা নির্ভরশীল। ক্ষুদ্র কৃষকরা ততটা নয়। এর প্রধান কারণ প্রান্তিক কৃষকদের কাছে চাষ আবাদের উপযোগী যে জমি আছে, পুরোপুরি রোজগার অথবা পরিবার ভরণ পোষণের পক্ষে যথেষ্ট আয় তা থেকে হয় না। ফলে অতিরিক্ত রোজগারের ধান্দায় তাদের থাকতে হয়। দ্বিতীয় বা অতিরিক্ত পেশা গ্রহণকারী প্রান্তিক কৃষকদের সংখ্যা শতকরা ৫১ ভাগ। শতকরা ৩১ ভাগ হ'ল ক্ষুদ্র কৃষক। বৃত্তি কাঠামোর একেবারে সর্বনিম্ন ধাপে কৃষি শ্রমিকদের স্থান শেষ বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবেই শুধু এটা। কৃষি শ্রমিকদের জন্য আনুষঙ্গিক পেশার সংস্থান প্রায় নেই বললেই হয়।

জমির সদ্ব্যবহার এবং ফসল বোনার পদ্ধতির বেলাতে কিন্তু এই দুই শ্রেণীর কৃষকের মধ্যে পার্থক্য বলতে গেলে নেই। সীমিত হারে হলেও দুই শ্রেণীর কৃষকরাই উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ করে থাকে। তবে, আলু, পাট এবং অধিক ফলনের ধানের গড়পড়তা উৎপাদন প্রান্তিক কৃষকদের চেয়ে ক্ষুদ্র কৃষকরাই বেশী করে। কারণ, এইসব ফসল ফলাতে হলে সারের বন্দোবস্ত করতে এবং কীট নাশক ঔষধপত্র কিনতে বেশী অর্থের প্রয়োজন। প্রতি একর জমির জন্য প্রান্তিক কৃষকদের চেয়ে ক্ষুদ্র কৃষকদের ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৬০ শতাংশ বেশী।

সহায় সম্বলের অবস্থা

সহায় সম্বলের ব্যাপারে প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষেত্রে দু'টি চরম অবস্থা সচরাচর চোখে পড়ে। যেমন কখনও কখনও দেখা যায় বর্ষাকালীন গবাদি পশু, কৃষির সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির মতন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর অভাবে এই শ্রেণীর খামারগুলি খুবই অসুবিধা ভোগ করে। অনেক খামার আবার প্রাপ্তিযোগ্য সহায় সম্বলের যথোপযুক্ত ব্যবহার করতেই পারে না। প্রত্যেক প্রান্তিক কৃষি-খামারের জন্য একর পিছু (০.৪০৫ হেক্টর) যোগানো হয় যথাক্রমে ১২১ ও ৭৬ টাকার সরকারী যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম। ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য এর পরিমাণ যথাক্রমে ৩৮৯ এবং ৯৯ টাকা।

ক্ষুদ্র কৃষকদের মোট আয়ের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী আসে জমির চাষ আবাদ থেকে। প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষেত্রে কিন্তু তার পরিমাণ মাত্র ৫৪ শতাংশ। ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রতি পরিবার ও মাথাপিছু আয় হ'ল যথাক্রমে ৩৩৩৭ এবং ৪৭৫ টাকা। তার তুলনায় প্রান্তিক কৃষকদের প্রতি পরিবার ও মাথাপিছু আয় মাত্র ২৬১০ এবং ৩৮০ টাকা। আর কৃষি শ্রমিকদের প্রত্যেক পরিবার ও মাথাপিছু আয়ের হিসাব যথাক্রমে ১০৫৩ এবং ১৯৭ টাকা। জীবনযাত্রা নির্বাহের উপায় হিসেবে তাদের প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় নিজেদের শ্রমের ওপর।

শতকরা ৭০ জন প্রান্তিক কৃষককে ঋণ নিতে হয়। সে তুলনায় শতকরা ৪৫ জন ক্ষুদ্র কৃষক ঋণ নেয়। ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের শতকরা ৬৫টি পরিবারকেই ঋণ নিয়ে কাজ চালাতে হয় এবং সবটাই খরচ হয় শুধু খাওয়া-পরার জন্য। ক্ষুদ্র কৃষকরা ঋণ নেয় প্রধানতঃ চলতি মরসুমে চাষ বাসের প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটাবার উদ্দেশ্যে কিন্তু প্রান্তিক কৃষকরা, ভোগ্য পণ্য ক্রয় এবং চাষ আবাদের ব্যয়—দুই উদ্দেশ্যেই ঋণ নেয়। উভয় উদ্দেশ্যেই তাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। সমবায় ঋণদান সমিতি ও ব্লকের মত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে মোট ঋণের এক চতুর্থাংশ ক্ষুদ্র কৃষকরা এবং এক দশমাংশের কম প্রান্তিক কৃষকরা পায়। কৃষি শ্রমিকরা এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ঋণ পায় না।

বিশ্লেষণের ফলে দেখা যাচ্ছে কৃষি শিল্প ও বাস্তব অবস্থার দিক থেকে তুলনা-মূলক বিচারে ক্ষুদ্র কৃষকদের চেয়ে প্রান্তিক কৃষকদের অসুবিধা ও অভাব বেশী, অর্থাৎ অবস্থা বেশী শোচনীয়। অতএব প্রান্তিক কৃষকদের সমস্যার সুরাহা দুটি উপায়ে করা যেতে পারে। প্রথমতঃ জমির উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়িয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ পরিবারের কর্মরত সদস্যদের রুজি রোজগারের অন্য সুযোগ সুবিধা করে দিয়ে। ভূ-সম্পদের বিকাশ এবং উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো সম্ভব। বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি অবলম্বনে প্রধান বাধা খণ্ড খণ্ড জমির সংখ্যাধিক্য। একেই তো এদের ছোট ছোট জমি—তাও আবার ব্যাপক এলাকা জুড়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। তাছাড়া, এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে, তাদের জমির আকারে ও আয়তনে নূন্যতম যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহারের পক্ষে ও ছোট প্রতিপন্ন হওয়ায় উন্নত কৃষি পদ্ধতির জন্য অপরিহার্য্য ব্যবস্থা কূপ খনন। পাম্প বসানো অথবা সেগুলি বিদ্যুৎচালিত করা প্রভৃতির মতন কাজে বিনিয়োগও তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সমস্যা সমাধানের উপায় হ'ল বৃহৎ ব্লক অথবা কয়েকটি যুগযুক্ত ব্লকে জমিগুলিকে একত্রিত করা এবং সমবায় কৃষি সমিতি গঠনে উৎসাহ দেওয়া। জমিগুলি একত্রিত করা গেলে বৃহত্তর কৃষি ইউনিটগুলি, কারিগরী পদ্ধতির প্রবর্ত্তন, সুবিবেচনার সঙ্গে তার প্রয়োগ এবং হিসাব মত সহায় সম্বলের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে ভাল ফলাফল দেখাতে পারবে। অর্থাৎ বৃহত্তর কৃষি ইউনিটগুলির ভবিষ্যৎ সম্ভা-বনাময়। দ্বিতীয় সমস্যার বিহিত করে বাড়তি আয়ের সংস্থান করতে সমবায় ভিত্তিতে হাঁস মুরগী পালনে প্রান্তিক কৃষক-দের উৎসাহ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রান্তিক কৃষকদের চেয়ে ও কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ১৯৫১ সালে এই জেলায় কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৯৪,৫৮০। তা বৃদ্ধি পেয়ে এখন দাঁড়িয়েছে ১,৩৪,১৮৮,—অর্থাৎ শতকরা ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ত্তমান কৃষি অর্থনীতি তাদের সারা বছরের কর্মসংস্থানে অপারগ। বছরে ২৭০ দিন এদের কাজ কর্ম থাকে। কৃষি মরসুমের অবকাশ সময়ে কৃষি শ্রমিকরা বেকার হ'য়ে পড়ে। ওই সময়ে তাদের আয়ের ব্যবস্থা করার কর্ম-সূচী গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। এই জেলায় জমির ওপর চাপ এত বেশী যে, শেষ পর্যন্ত সম-স্যার সমাধান হিসেবে পল্লী অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক হারে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাহলেই কেবল আধা ও পুরো বেকার শ্রমিক শ্রেণীর কর্মসংস্থান সম্ভব।

খনিজ পদার্থের উৎপাদন

ভারতীয় খনি সংস্থার হিসেব অনুযায়ী এ বছরের জুন মাসে খনিজ পদার্থের উৎ-পাদন হয়েছে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা মূল্যের। এর আগের মাসে উৎপাদন হয় প্রায় সাড়ে ৩৬ কোটি টাকা মূল্যের। এর মধ্যে অবিশিষ্ট ছোট খাট খনিজ পদার্থের মূল্য ধরা হয়নি। কেবল খনিজ ইন্ধনের মূল্যই ছিল ২৭.৩ কোটি টাকা মূল্যের অর্থাৎ মোট উৎপাদন মূল্যের ৭৯ শতাংশ। ধাতব খনিজ পদার্থের মূল্য ছিল ৪.৭ কোটি টাকা অথবা ১৩ শতাংশ এবং ধাতুবর্জিত খনিজ পদার্থের মূল্য ছিল ২.৮ কোটি টাকা অথবা ৮ শতাংশ। ধাতব পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ আকর —এগুলির মূল্য ছিল যথাক্রমে ২.৬ কোটি টাকা এবং ৬০ লক্ষ টাকা। ধাতুবর্জিত খনিজ পদার্থের মধ্যে চুণাপাথর ছিল ১.৩ কোটি টাকার এবং অভ্র ১৪ লক্ষ টাকার।

খনিজ জ্বালানীর মধ্যে কয়লা উৎপাদন হয় ৫৭ লক্ষ টন এবং লিগ্নাইট উৎপন্ন হয় ৪ লক্ষ ১১ হাজার টন। আগের মাসের তুলনায় কয়লা উৎপাদন প্রায় সমানই ছিল তবে লিগ্নাইটের উৎপাদন ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অশোধিত পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয় ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার টন অর্থাৎ আগের মাসের তুলনায় ৪ শতাংশ কম। প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬ কোটি কিউবিক মিটারে।

পল্লী অঞ্চলে

সবুজ বিপ্লবের ঢেউ

ভারতের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি-নির্ভর। দেশের বেশীর ভাগ শ্রম-শক্তি কৃষির কাজে নিযুক্ত থাকে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কৃষির অবদান বেশ বড়ই। সম্প্রতি ভারতবর্ষ খাদ্যশস্য উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বৎসর আগেকার বন্যা ও খরাজনিত সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার পর ভারতের কৃষিক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব এবং অভাবনীয় সাফল্য দেখা গেছে। ভারতের অর্থনীতিবিদগণ এই সাফল্যকে "সবুজ বিপ্লবের" আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

বস্তুতঃ ১৯৭০-৭১ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা পর্যালোচনা করলে ভারতের সাম্প্রতিক খাদ্যশস্যের রেকর্ড পরিমাণ চোখে পড়ে। এই পরিমাণ উৎপাদন তথা সবুজ বিপ্লবের ঢেউ পশ্চিমবঙ্গের সুদূর পল্লী অঞ্চলেও এসে পৌঁছেছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, একটানা চার বছর খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭৪·২৩ মিলিয়ন টন — ১৯৬৭-৬৮তে ৯৫·০৫ মিলিয়ন টন, ১৯৬৮-৬৯তে ৯৪·০১ মিলিয়ন টন, আর ১৯৬৯-৭০ সালে ঐ উৎপাদন দাঁড়ায় ৯৯·৪০ মিলিয়ন টনে। ১৯৭০-৭১ সালে অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে অর্থাৎ খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রায় ১০৭·৫০ মিলিয়ন টনে এসে পৌঁছেছে। ভারতের কৃষি উন্নতির ইতিহাসে এই অভূতপূর্ব সাফল্য নিঃসন্দেহে দেশের মূল অর্থনীতির নবরূপ একক বোধ হিসেবেই বলা যায়। কৃষির উৎপাদনের হার ৫% এর অধিক হওয়ার দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়নে তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কৃষির অবদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেই চতুর্থ যোজনায় কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ যথার্থই হয়েছে।

শঙ্কর নাথ ঘোষ

ভারতের এই সবুজ বিপ্লবকে যে কয়টি রাজ্য শক্তিশালী ও মজবুত করতে পেরেছে, তাদের মধ্যে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার নাম আগে করতে হয়। উচ্চ ফলনশীল বীজ ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে কৃষির উৎপাদনের হার ঐ দুটি রাজ্যে যে পরিমাণ বাড়ান গেছে তার প্রভাব আজ ভারতের সমগ্র অর্থনীতির উপর পড়েছে।

শুধু পাঞ্জাব, হরিয়ানা বা উত্তর প্রদেশ নয়, আজ পশ্চিমবঙ্গও খাদ্যশস্য উৎপাদনে পিছিয়ে নেই। এ বছরের হিসাবে দেখা যায়, এই রাজ্যের চাউলের উৎপাদন সর্বাধিক হয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে চাউলের উৎপাদন প্রায় ৬১ লক্ষ ৪ হাজার টনে দাঁড়িয়েছে। এই পরিমাণ উৎপাদন অবশ্যই আশাব্যঞ্জক সন্দেহ নেই।

ভারতের সাম্প্রতিক কৃষিক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতির মূলে আছে, ভারত সরকারের কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভারত সরকার সর্বতোভাবে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হবার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। বিভিন্ন চাষযোগ্য জমিতে একফসলের পরিবর্তে বহু ফসল ফলাবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এরই অনিবার্য পরিণাম হিসেবে দেখা দিয়েছে—উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ ও চাষের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। এর সাহায্যে ভারতের কৃষি বিশেষজ্ঞগণ পল্লী অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে কাজ করে ভারতের কৃষি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে হাওড়া জেলার বাগনান ব্লক-১-এর অধীনে খাইনান অঞ্চলের কথা উল্লেখ করা যায়। এখানে চাষযোগ্য জমির বিস্তীর্ণ এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে, সরকারের ও স্থানীয় কৃষকদের সহযোগিতায়, অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং-সংক্রান্ত উন্নয়ন সংস্থা (EBDF) কয়েক মাস আগে গভীর নলকূপ স্থাপন করেছেন। উচ্চফলনশীল বীজ IR-8 রোপণ করে এই অতি বর্ষাতেও সবুজ ধানক্ষেত তৈরী করে সোনার ফসল ফলাবার প্রচেষ্টায় এই সংস্থা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই সংস্থার কৃষি বিশেষজ্ঞগণ স্থানীয় কৃষি-মজুরদের সাহায্যে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ ও ট্রাক্টরের সাহায্যে জমি চাষ করে এই অঞ্চলের কৃষকদের কাছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন। এতদিন পর্যন্ত এই অঞ্চলে কেবলমাত্র বৃষ্টি ও নদীর জলের উপর নির্ভর করে বর্ষা ঋতুতে একবার মাত্র ধানচাষের রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু এবার থেকে বছরের অন্যান্য সময়েও গভীর নলকূপের সাহায্যে জল তুলে, (এবং এইভাবে দেশের সেচ ব্যবস্থাকে উন্নত করে), সারি প্রথায় জমিতে চাষ করে আরও বেশী পরিমাণ ধান উৎপাদন করার স্বাদ এই অঞ্চলের কৃষকরা পাবেন। চাষ করার উন্নত-প্রণালী এবং সারের উপযুক্ত প্রয়োগে

৪র্থ কভারে দেখুন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর জাতির নবযৌবনের সৃষ্টি। বাঙালির জীবনে নবজাগরণের দ্বিতীয় তরঙ্গ নিয়ে এসেছিলেন তিনি। প্রথম তরঙ্গ আনেন রামমোহন। ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা নির্দিষ্ট ছিল—শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার, অর্থনৈতিক উদ্যম এবং সাহিত্য-নির্মাণ। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। সমাজ-সংস্কার, দয়া-দাক্ষিণ্য এবং তেজস্বিতায় তিনি ছিলেন বিশিষ্ট পুরুষ। কিন্তু এটাই তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। সমগ্র জাতির সত্তাকে তিনি নিজের সত্তার মধ্যে অনুভব করেছেন। এই অনুভূতি তাঁর মনুষ্যত্ববোধের ছোঁয়ায় পরিস্ফুট হতে পেরেছিল। অতএব ইংরেজ সাহেবের মুখের সামনে চটিজুতা-শুদ্ধ পা তুলে ধরা, চটি খুলে যাদুঘরে প্রবেশে আপত্তি এবং "এই চটিজুতা যে কোন রাজা মহারাজার মুখের উপর তুলে ধরতে পারি"—এই অদম্য তেজস্বিতায় নিজেকে জাতির সঙ্গে একাত্ম করে বোধ করবার ফল। জ্ঞান ও কর্মের, বোধ ও ব্যবহারের ঐক্য ও অভিন্নতা সেই পুরুষসিংহকে তাই নিজস্ব জীবনের ক্ষুদ্র সীমা থেকে বৃহত্তর সমাজ জীবনের অনন্ত পরিধির মধ্যে সেদিন টেনে এনেছিল।

বিদ্যাসাগরের জীবনকথা অল্প-বিস্তর সুপরিচিত।

কিন্তু সেই জীবনের উজ্জ্বলতর দিক হল তাঁর চরিত্র।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঠিক এমন একটি চরিত্রের মানুষ বিরল। স্বনামধন্য ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ ১৯০১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন: আমি যখন বহরমপুর কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতাম, তখন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেখানে অধ্যাপনা এবং ওকালতি করিতেন। আমি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁহার বাসায় যাইতাম। একদিন কথা-প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা উঠিল, তখন সারা বাংলা দেশে শুধু তাঁহারই নাম। গুরুদাস বলিলেন "বাংলা দেশে এমন মানুষ বলিতে এই একজনই আছে।" মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রাজীবলোচন রায় সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আরো অনেকেই ছিলেন। দেওয়ান সাহেব বলিলেন, "কেন, আপনারা কি সব অ-মানুষ?" গুরুদাস অল্প কথার লোক, কিন্তু যাহা বলিতেন তাহা অত্যন্ত দামী কথা। তিনি বলিলেন, "না, আমরাও মানুষ, তবে শুধু মানুষ, তার বেশি নয়। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় সবগুণে গুণান্বিত মানুষ। তিনি একাধারে মনুষ্যত্ব ও মানবত্বার অবতার।"

মণি বাগচি

ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ বর্ণিত এই ঘটনাটি প্রণিধানযোগ্য। তেমনি প্রণিধানযোগ্য গুরুদাসের উক্তি। কী ছিল সেই চটি-চাদরে বিভূষিত টুলো পণ্ডিতের মধ্যে, যার জন্য আজ তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসাবে স্বীকৃত ও সম্পূজিত? এর উত্তর এক কথায় বলা যায়—তাঁর চরিত্র। দেবদুর্লভ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন বিদ্যাসাগর। বাঙালী তাঁকে নানাভাবে দেখেছে—দুঃখীর দুঃখমোচন পীড়িতের সেবায়, আর্তের শুশ্রূষায়, দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষাবিধানে, অত্যাচারীর অত্যাচার দমনে, বন্ধুর বিপদে, বিধবার অশ্রুমোচনে। কিন্তু সব কিছুর উপরে হল তাঁহার চরিত্র—যা তার ব্যক্তিত্বের পাদপীঠ, তাঁর মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্য তাঁহারই কৃতকীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।... বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে অকিঞ্চিৎকর বঙ্গ সমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল।"

কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন থেকে তাঁর সেই চরিত্রের উত্তাপ আমরা কতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছি? তা' যদি পারতাম, তাহলে উন্মত্ত বিমূঢ়তায় বাঙালী কখনই তাঁর মূর্তিকে অমন নিষ্ঠুর আঘাত হানতে পারত না। বিদ্যাসাগরের মর্মর মূর্তিতে আঘাত মানেই, জাতির একটি সর্বোজ্জ্বল আদর্শকেই আঘাত—একটি পবিত্র স্মৃতিকে অপমান। তাই এই মহাপুরুষের চরিত্রের কথাটাই এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করব—যে চরিত্রবলে তিনি এক জীবনে বহু অসাধ্যসাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

॥ দুই ॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) চরিত্রে করুণা, দয়া, ন্যায়, মমতা

[illegible] তিনি যে বেতনভোগী এই কর্তৃপক্ষের অধিকারী ছিলেন তা নয়, প্রয়োজনবোধে তিনি ইস্পাতের মতো দৃঢ় ছিলেন। এই চারিত্রিক দৃঢ়তা কার্যক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে বহুবার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বহু বিষয়ে মতবিরোধ হওয়ার কারণস্বরূপ হয়েছে। যেখানে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে নিজের সুনির্বাচিত মতে আনতে পেরেছেন, সেখান আপোষ হয়েছে; যেখানে পারেন নি সেখানে অহেতুক তিক্ততার সৃষ্টি না করে নিজে সরে দাঁড়িয়েছেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকার তাঁর প্রতিকূলতা করেননি কারণ, তাঁরা এই মানুষটিকে সঠিকভাবে চিনতে পেরেছিলেন। তা যদি না হতো তাহলে মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে তিনি তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের পদ পেতেন না।

বিদ্যাসাগরের বাল্যকাল প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের যুগ।

রাজা রামমোহনের সময়ে শিক্ষার ধারা নিয়ে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষার ধারা প্রাচীন ব্যবস্থা অবলম্বন করে চলবে অথবা ইংরাজ তার সঙ্গে যে ভাষা নিয়ে এসেছে তার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন হবে। রামমোহন চেয়েছিলেন পশ্চিমের শিক্ষার দ্বার ভারতবাসীর কাছে উন্মুক্ত হোক। যে জ্ঞান সম্পদে প্রতীচ্য বলীয়ান প্রাচ্য তার অংশীদার হোক। রামমোহনের এই আশা-আকাঙ্খার ধারক ও বাহক ছিলেন বিদ্যাসাগর। বস্তুতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁকে রামমোহনের শিক্ষা-চিন্তার উত্তরসাধক বলা যেতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ সন্তান শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রথম সোপানেই ইংরাজী ভাষাকে সংস্কৃতের সমমর্যাদা দিয়ে [illegible] করেছিলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন—যে, ইংরাজ তার ভাষার মাধ্যমে যে বিপুল সম্পদ ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছে, সেটা গ্রহণ না করার মতো কোন যুক্তি নেই এবং এই ভাষাকে অবলম্বন করেই বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও বাংলা ভাষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। এইখানেই বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা এবং সাগর-চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম বলে মেনে নিলেও, মাতৃভাষা যে শিক্ষাব্যবস্থার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা-মাধ্যম এটা কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনদিনই বিস্মৃত হননি এবং সেই কারণেই তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা যে জনশিক্ষার বাহন হতে পারে না, এই মতে তিনি ছিলেন দৃঢ় এবং স্বয়ং হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কতখানি সাফল্য অর্জন করা যায়। বাংলাকে শিক্ষা মাধ্যম করার পেছনে তাঁর দান যে কী অপরিসীম, তা তাঁর একটি 'নোট' থেকে জানতে পারা যায়। এই 'নোট' তিনি কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়েছিলেন।

এর অবিসম্বাদী প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝলাম বিংশ শতাব্দীতে এসে। অথচ ইংরাজী ভাষাকেও তিনি গ্রহণ করতে পশ্চাদপদ হননি। তাঁর চরিত্রের এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবেই প্রণিধান-যোগ্য।

॥ তিন ॥

সাগর-চরিত্রের আর এক রূপ পরি-স্ফুটিত স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে তিনিই ছিলেন নারীজাতির একমাত্র সুহৃদ। বিদ্যাসাগরের পূর্বযুগ পর্যন্ত এই দেশে স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ প্রসার ছিল না। স্ত্রীজাতির মূল কর্মক্ষেত্র প্রকৃতপক্ষে সাংসারিক জীবনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগর এই বদ্ধ আবদ্ধ অবস্থার ভাঙ্গন ধরাতে চাইলেন। হ্যালিডে সাহেব তখন বাংলার ছোট লাট। বাংলাদেশের মেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে তার জন্য হ্যালিডে যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন এবং এই ব্যাপারে তিনি প্রায়ই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে সেই সময়ে বেথুন সাহেবের (ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন) উদ্যোগে একটি মহিলা বিদ্যালয় খোলার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, বিদ্যাসাগর ছিলেন সেই কমিটির সম্পাদক। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে তৎকালীন সরকারের মনোভাব অনুকূল মনে করেই বিদ্যাসাগর কোন রকম অনুমোদন না নিয়ে পঁয়ত্রিশটি বালিকা স্কুল স্থাপন করেছিলেন। বাংলাদেশে সেদিন এটাই ছিল তাঁর অক্ষয় কীর্তি। প্রত্যেকটি স্কুলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে স্থানীয় লোকদের মনে প্রেরণার সঞ্চার করতেন। আবার বহু স্থানে তাঁকে সংরক্ষণশীলদের প্রচণ্ড বিরোধীতারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বহু স্কুলের ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই কাজে ব্রতী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরই সম-কালীন আর একজনের নাম স্মরণীয়—তিনি বিদ্যাসাগরের সুহৃদ, স্বনামধন্য প্যারীচরণ সরকার। বাংলাদেশে বারাসতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় তিনিই স্থাপন করেছিলেন।

॥ চার ॥

কিন্তু সাগর-চরিত্রের সমগ্র রূপটা প্রকাশ পেয়েছিল সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে। তাঁর জীবনের বহুবিধ কর্মকীর্তির মধ্যে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন একটি। এই আন্দোলন সেদিন বাংলার সমাজ-জীবনে যে আলোড়ন এনেছিল তার তুলনা নেই। তাঁর পূর্বসূরী রামমোহনের সংস্কার-প্রচেষ্টার ছিন্ন সূত্র অবলম্বন করে তিনি এই মহাযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন। এ কাজে

২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

বন্যা বিধ্বস্ত নদীয়া

তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী ভয়াবহ বন্যায় এবছর নদীয়া জেলায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ বছর বর্ষা নেমেছিল আগে থেকেই। অতি বৃষ্টির ফলে জেলার নীচু জায়গা জলমগ্ন হয়ে যায় জুন মাসেই। জুলাই মাসের শেষে সুরু হয় নিরবচ্ছিন্ন প্রবল বৃষ্টিপাত। ফলে নদীয়া জেলার ভাগীরথী (গঙ্গা), জলঙ্গী (খোড়ে), চুর্ণী, মাথাভাঙ্গা এবং ইছামতী নদীতে জলস্ফীতি দেখা দেয়। ডি. ভি. সি. ও অন্যান্য বাঁধ থেকে ছাড়া বিপুল জলরাশি দামোদর ও অন্যান্য নদী বেয়ে নেমে এসে ভাগীরথীতে পড়ে বন্যার ব্যাপকতা বাড়িয়ে দেয়—তীর উপচে বিস্তীর্ণ এলাকা কমবেশি বন্যাপ্লাবিত বা জলমগ্ন হতে থাকে। তার-পরেই সুরু হয় ভূমিক্ষয়, পাড় ভেঙে নদী সর্বনাশা রূপ ধারণ করে। জেলার সর-কারী নথিপত্র দেখে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে এমন ব্যাপক বিধ্বংসী বন্যা গত একশো বছরে হয়নি। প্রাচীন লোক-দের মতে এবারের বন্যা আগেকার সব বন্যাকে ছাপিয়ে গেছে। শুধু ব্যাপকতা বা জলসীমার উচ্চতাতেই নয়, স্থায়িত্বের দিক দিয়েও এত দীর্ঘ দিন আগের কোন বন্যা স্থায়ী থাকেনি। প্রায় দুমাস নদীয়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যাকবলিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী চ্যবন নদীয়ার বন্যাঞ্চল আকাশথেকে পরিদর্শন করেছেন।

নদীয়া জেলার ১৪টি থানা আর ১৬টি ব্লকের মধ্যে একমাত্র হরিণঘাটার কিছু অংশ বাদ দিয়ে সবগুলি থানা ও ব্লকই নিদারুণভাবে বন্যাকবলিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। নদীয়া জেলার ১৫০৭ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ১১০৩ বর্গমাইল এলাকা বন্যার করাল গ্রাসে পতিত হয় এবং মোট জন-সংখ্যা ২২,২২,২৪৯ জনের মধ্যে প্রায় চৌদ্দ লক্ষ বন্যায় বিপন্ন হয়। জেলার মোট ১৪০০ গ্রামের মধ্যে ১২০০ গ্রাম প্লাবিত হয়। ছয়টি পৌরশহরেও জল প্রবেশ করেছিল। শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি ইতিহাসখ্যাত প্রাচীন তীর্থভূমি নবদ্বীপের সমগ্র পৌরএলাকা দেড়মাসাধিককাল জল-মগ্ন ছিল, শহরের একতলা বাড়িতে কোন লোক ছিল না। পথে চলত নৌকা। জল প্রায় পনের ফুট পর্যন্ত ছিল, ফলে

দিক্ দর্শক

নৌকা ছাড়া যাতায়াতের কোনও উপায়ই ছিল না। বন্যায় বহু প্রাচীন পুঁথি বিনষ্ট হয়েছে, প্রকৃতির প্রকোপে চলে গেল আমাদের অমূল্য সম্পদ। কৃষ্ণনগর ও পৌরএলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হয়েছিল। বন্যায় জীবনহানির সরকার সমর্থিত সংখ্যা ৩৬, বেসরকারী মতে মোট ৮১। গবাদি পশু মারা গেছে সাতশোর বেশি। গ্রাম এলাকায় ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে অগণি হাজার, পৌরএলাকাতেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এ বছর নদীয়ায় ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদী বিধ্বংসীরূপ ধারণ করে। ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর চরম বিপদসীমা হচ্ছে ৯.০৫ মিটার। গত ১৯০৬ ও ১৯০৯ সালের বন্যায় এই বিপদসীমা ছাড়িয়ে জল বেড়েছিল যথাক্রমে ১০.৫৮ ও ১০.৩৫ মিটারে। এবারে জল ১০.৬২ মিটার পর্যন্ত উঠে জলমাপার স্কেলটিকেই ডুবিয়ে দিয়েছিল।

জেলার প্রধান প্রধান সড়কগুলি এবং কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে যাবার একমাত্র পথ এবং জাতীয় সড়কের কয়েক জায়গা জলপ্লাবিত হওয়ায় জেলার প্রধান শহর কৃষ্ণনগরের সঙ্গে কলকাতার সড়ক যোগা-যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, অন্তঃজেলা ও আন্তর্জেলা সড়ক যোগা-যোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। বন্যা কব-লিত বিস্তীর্ণ এলাকার বিপন্ন মানুষেরা ফলে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে চরম কষ্টভোগ করে; করিমপুর, তেহট্ট ও চাপড়া এলাকায় কোন রেলপথ না থাকায় জেলা কর্তৃপক্ষ প্রায় তিন সপ্তাহ কোন খাদ্য ও ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করতে পারে নি শেষে করিমপুরে বিমানথেকে খাদ্য নিক্ষেপ করে ফেলা হয়। অনেক জায়গায় খাদ্যসম্ভার নামানোর উপযুক্ত শুকনো জায়গাই ছিলনা। ফলে জলবন্দী মানুষেরা বিশেষকরে বাংলাদেশের শরণার্থীরা চরম খাদ্যসঙ্কটের সম্মুখীন হয়।

অনেক জায়গায় জলের স্রোতের খুব টান ছিল, ফলে বেশী নৌকা ঠিকমত চলতে পারছিল না। কয়েকটি নৌকাডুবিও হয়, স্রোতের টানে ভেসে গিয়ে অনেকের ঘটে সলিল সমাধি। কয়েক স্থানে উদ্ধারকার্যে সেনাবাহিনী নিয়োজিত হয়।

বন্যার ফলে সামগ্রিকভাবে পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দেয়। জেলার পাঁচ হাজার নলকূপ ও ইঁদারা জলপ্লাবিত হয়ে অকেজো থাকে। ফলে বন্যাজনিত রোগ দেখা দেয়, বিশেষ করে কলেরা। নবদ্বীপে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়—অথচ হাসপাতালটি তখন ছিল জলমগ্ন। কৃষ্ণনগরে জেলা হাসপাতালে দেখা দেয় স্থানাভাব। জেলার ৩২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে ১৮টিই ছিল জলমগ্ন। নবদ্বীপে বাইরের মেডিক্যাল টিমের সাহায্যে একটি দোতলা বাড়ীতে ৩০ শয্যার অস্থায়ী হাস-পাতাল খোলা হয়। তবুও এবার বন্যায় কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল শতাধিক।

২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সংবাদ পরিক্রমা

প্রতিবেদক

সম্প্রতি বৃহত্তর কলকাতার কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য তিন হাজার মেট্রিক টন ইস্পাত বরাদ্দ করা হয়েছে। এগুলি এবং এছাড়া অন্য কতকগুলি প্রকল্প রূপায়ণে উপযুক্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেছেন বলে প্রকাশ। এই স্কীমগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে বসাবার জন্য বাঁকা ট্রামপথ, যান্ত্রিক নিকাশনী ব্যবস্থা, উন্নত যান্ত্রিক উপায়ে দ্রুত জঞ্জাল অপসারণ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য টালা—পলতা মেনের সংস্কার।

এছাড়া কলকাতা পৌর নিগমের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় শহরে পানীয় জল সরবরাহের উন্নতির জন্য মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার দুটি অতিরিক্ত বৃহৎ জলাধার নির্মাণের কাজ এবং ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কলকাতা পৌর নিগম এবং সি. এম পি ও.র যৌথ প্রচেষ্টায় কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে বস্তি সংস্কার ও উন্নয়নের কাজও দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে প্রায় ১০ লক্ষ লোক উপকৃত হবে। শহরের নিকাশনী ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, সংস্কার ও উন্নয়নের কাজও কম অগ্রসর হয়নি। এ বিষয়ে কাশীপুর থেকে নন্দন, টালীগঞ্জ থেকে গড়িয়া প্রায় পর্যন্ত এবং পার্কসার্কাস কসবার নিকাশনী স্কীমগুলি উল্লেখ্য। তাছাড়া, হাসপাতালগুলিতে শয্যা সংখ্যার বৃদ্ধি এবং সারা রাজ্যে প্রায় ১০০টি চিকিৎসালয় খোলার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য বাস্তব অধিকারের হাতে দেওয়া হয়েছে।

কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থা উন্নতির প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চলেছে। কলকাতা রাজ্য পরিবহন কর্পোরেশন এ ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক কর্মসূচীও গ্রহণ করেছেন। পর্যায়ক্রমে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং পুরাতন বাসগুলিকে মেরামত ও সংস্কার করিয়ে কর্পোরেশন কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট। ১৯৭০এ ৩১শে মার্চ কর্পোরেশনের শতকরা ৪৭.৩টি বাসই আট বছরের বেশী পুরোনো ছিল। এগুলির মধ্যে যেগুলি অতি পুরোনো তাদের জায়গায় নতুন বাস আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। কর্পোরেশনের কার্যসূচী অনুযায়ী ১৯৭০-৭১ সালে ২৫টি নতুন দোতলা বাস এবং ৭০টি নতুন একতলা বাস ছাড়াও ৬০টি পুরোনো দোতলা এবং আটটি পুরানো একতলা বাস সংস্কার করে চালু করার কথা ছিল। অবশ্য পুরানো বাসগুলির মেরামত ও সংস্কারের জন্যে বিদেশ থেকে কিছু কিছু যন্ত্রাংশ আমদানি করার প্রয়োজন।

বন্যাত্রাণ

সম্প্রতি একটি কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশে পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের সীমা সংশোধিত করে ২১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৭০-৭১ সালের জন্যে নির্ধারিত ১৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হয়েছে। বাকি তিন কোটি টাকা চলতি বছর (১৯৭১-৭২) এর জন্যে বরাদ্দ আছে। এই নির্ধারিত সীমার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্যাত্রাণের জন্যে বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

পশ্চিমবঙ্গের কোম্পানি নিবন্ধকের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে এই রাজ্যে ১৯৭১ সালের প্রথম চার মাসে মোট ৯১টি কোম্পানী নিবন্ধভুক্ত হয়। এদের মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৩৫ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এদের মধ্যে চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ছাড়া বাকি সবই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় পাঁচ কোটি টাকা।

হাওড়া : হাওড়াতেও ব্যাপক উন্নয়ন কার্য আরম্ভ হয়েছে। প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে হাওড়া শহরের উত্তর প্রান্তে পিলখানা বস্তির উন্নয়ন শুরু হয়েছে। এই কাজটি হাওড়া উন্নয়ন সংস্থা হাতে নিয়েছেন।

হাওড়া পৌর এলাকায় যে দারুণ জলকষ্ট দেখা দিয়েছিল, সে সম্বন্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। এই এলাকায় তিন হাজার নলকূপের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। হাওড়া পৌর সভা বৃহত্তর কলিকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে হাওড়া শহরে পানীয় জল সরবরাহের উন্নতির জন্যে ১২ লক্ষ টাকার একটি বিল পেশ করেন। এটি শেষোক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে। হাওড়া পৌর সভাও ইতিমধ্যে একশ'টি নলকূপের সংস্কার করে পানীয় জল সরবরাহের খানিকটা উন্নতি করেছেন।

হুগলীতে দ্বিতীয় সেতু

হুগলী নদীর উপর প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সেতুটির প্রান্তের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানা গেছে। এ প্রান্তটি শিবপুরের সন্নিকটে। কলকাতার প্রান্তটি হবে হেস্টিংসে। হাওড়া প্রান্তের কাজটি করবেন হাওড়া উন্নয়ন সংস্থা আর কলকাতার দিককার কাজের ভার দেওয়া হবে পানীয় উন্নয়ন সংস্থার উপর। নদীর উপরে সেতুটির প্রধান অংশটি নির্মাণ করবেন কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। তত্ত্বাবধান করবেন হুগলীর বিজ্ঞান ট্রাস্ট কমিশন। সেতুটি তিনটি পর্যায়ে নির্মিত হবে।

হাওড়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ বাবদ ৭৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

বর্দ্ধমান : রবি মরশুমে বর্দ্ধমান জেলায় তিন লক্ষ একরেরও বেশী জমিতে রবিশস্য চাষ করা হয়। এরমধ্যে একলক্ষ ৩০ হাজার একরে ধান, ৩৭ হাজার একরে আলু, এক লক্ষ একরে গম, ২০ হাজার একরে তৈলবীজ এবং ২৫ হাজার একরে অন্যান্য শাকসব্জীর চাষ হয়। ধান চাষের মোট জমির মধ্যে ৮০ হাজার একরে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের চাষ হয় এবং জেলা কর্তৃপক্ষ ধান্যোৎপাদনের যে লক্ষ্য মাত্রা স্থির করেন তার চেয়ে বেশী ধান উৎপাদিত হয় বলে প্রকাশ।

স্থানীয় কৃষিজীবিদের প্রায় ৫০ হাজার টন রাসায়নিক সার এবং ৫০ হাজার টাকা মূল্যের উন্নত ধানের বীজ সরবরাহ করা ছাড়াও জেলা কর্তৃপক্ষ সার কেনার জন্যে তাঁদের প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেন। সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষকদের এক কোটি টাকার মত স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন ৩৫ হাজার একর জমির সেচের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ জল ছাড়ছেন এবং জেলা কর্তৃপক্ষও নদী থেকে জল তুলে ১২ হাজার একরের মত জমির সেচের জন্যে ৫৩টি পাম্প ছাড়াও প্রায় ১৫০টি গভীর নলকূপ বসান।

দুর্গাপুরে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রটি শীঘ্রই চালু করা হবে বলে জানা গেছে। এই ডেয়ারীটির জন্যে প্রায় এক কোটি আশি লক্ষ টাকা খরচ হবে এবং প্রথম প্রথম দিনে প্রায় ৫০ হাজার লিটার দুধ এখান থেকে সরবরাহ করা হবে।

সারা পশ্চিমবঙ্গে ২১টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও তাদের প্রায় ৫০টি শাখা আছে। সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলার আসানসোলে বর্দ্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পঞ্চম শাখার উদ্বোধন করা হয়। অন্যান্য চারটি শাখা এই জেলারই মেমারী, দুর্গাপুর, গুসকরা এবং সেহারা বাজারে খোলা হয়। বর্দ্ধমান জেলা কৃষি ও শিল্প সম্পদে খুবই সমৃদ্ধ এবং এখানে সমবায় আন্দোলন জেলার সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম। তাছাড়া পূর্বে স্থানীয় কৃষিজীবিদের যে ঋণ দেওয়া হয়েছে তা আদায়ের জন্যেও ব্যাঙ্কের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বস্তুতঃ এ জেলায় অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ গত বছরে প্রায় ১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

মণিপুর :—চলতি আর্থিক বছরে যোজনা কমিশন মণিপুরের উন্নয়নের জন্যে ৫ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন বলে জানা গেছে। ১৯৭০-৭১ সালে ৫ কোটি ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। চলতি বছরে যোগাযোগ খাতে ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা এবং স্বাস্থ্য খাতে ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। লোক্‌টাক্‌ প্রকল্প থেকে জলসেচ ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখবার জন্য এবং প্রায় ৫ হাজার একর জমিতে জলসেচ করতে পারে এমন একটি প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে চালু করবার জন্যেও টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমান বছরে মণিপুরের উন্নয়ন কার্যসূচীর মধ্যে ঝপনু নদীতে বন্যা নিবারণ প্রকল্পটি অন্যতম।

মণিপুরে শিল্পোন্নয়নের প্রধান অন্তরায় বোধহয় বিদ্যুতের অপ্রতুল সরবরাহ। প্রায় ১০০টি পুণর্গঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু হতে পারছে না শুধুমাত্র বিদ্যুতের অভাবের জন্যে। এগুলি ছাড়াও ইম্ফল ও কাকচিং এর শিল্পবসতি আছে। এই সব কিছু ধরে চতুর্থ পরিকল্পনাকালের শেষভাগে মণিপুরে বিদ্যুতের চাহিদা ৯০০০ কিলোওয়াট দাঁড়াবে বলে অনুমান।

এই চাহিদা পূরণের জন্যে মণিপুরের নব গঠিত বিদ্যুৎ পর্ষৎ একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার পুর্ণবিন্যাস করার চেষ্টা চলেছে। লোক্‌টাক প্রকল্প থেকে বিদ্যুতের সদ্ব্যবহার এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রগুলি যোগ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করায় আজ মণিপুরের বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

লাম্ফেলপাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রটি সম্প্রতি চালু হবার পর মণিপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতির যথেষ্ট হ্রাস হয়েছে। কেন্দ্রটি ২০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম এবং ডিজেল চালিত। সারা মণিপুরে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হত এই কেন্দ্রটি ততখানি বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। কেন্দ্রটি চালু হওয়ায় মণিপুরের শিল্পোন্নয়নে এক নবদিগন্তের উন্মোচন হল। বিদ্যুৎ সরবরাহে যথেষ্ট ঘাটতি থাকায় যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান এতদিন মণিপুরে গড়ে উঠতে পারেনি, এখন তাদের স্থাপন ও প্রসারে নতুন সম্ভাবনার সঞ্চার হয়েছে। তাছাড়া বহুলোকও এখন ঘরের কাজে বিদ্যুতের সুবিধা পাবে।

বর্তমানে মণিপুরের ১৮৬১টি গ্রামের মধ্যে ১৩৭টি গ্রামে বিদ্যুৎ গেছে। তৃতীয় যোজনাকালে মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্যুতিকরণের কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় এবং এখন উখরুল, চূড়াচাঁদপুরের মত জায়গায় নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রথম পাঁচ বার্ষিক পরিকল্পনার আগে মণিপুরের মাত্র নয়টি জায়গায় বিদ্যুতের সুবিধা ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালের শেষভাগে ২৮টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয় এবং তৃতীয় যোজনাকালে এই সংখ্যা বেড়ে ১৫০ এ দাঁড়ায়।

১৯৭১ এর প্রাথমিক লোক গণনায়

২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

যোজনা এবং কুজনেৎস

মোহিত রায়

অধ্যাপক—কুজনেৎস

ভারতে যোজনার অন্যতম পরামর্শদাতা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক সাইমন কুজনেৎস এ বছর (১৯৭১) অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। অধ্যাপক কুজনেৎস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। সুইডিশ আকাদমী অব সায়েন্স্ অধ্যাপক কুজনেৎসকে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কৃত করে স্টকহোম থেকে ঘোষণা করেছেন যে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরীক্ষামূলক ব্যাখ্যা করে উদ্ঘাটন করেছেন নতুন দিগন্ত। বর্তমান শতকে অধ্যাপক কুজনেৎস অর্থনীতিতে এক উজ্জ্বল নাম। জাতীয় আয় গণনা ও পর্যালোচনায় কুজনেৎসের অবদান অবিস্মরণীয়। এছাড়া অর্থনীতির তত্ত্বগত বিষয়েও তিনি কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। ভারত সরকার যোজনা রচনার প্রয়োজনে পরামর্শ নেবার জন্য কুজনেৎসকে আহ্বান জানান এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনাকালে কুজনেৎস ভারতে এসে অবস্থান করে ভারত সরকারের যোজনা কমিশনকে ভারতের জাতীয় আয় গণনার ব্যাপারে পরামর্শদান করেন। ভারতের যোজনা রচনায় তাঁর অবদান অপরিসীম।

১৯০১ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় কুজনেৎসের জন্ম হয়। ছোট বেলাতেই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন এবং শিক্ষা লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই তিনি মাত্র ২৬ বছর বয়সে নিউইয়র্কের সরকারী অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্রে নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সাল থেকে শুরু হয় তাঁর অধ্যাপনার জীবন। তিনি পেনসিলভানিয়া এবং জন্স হপ্‌কিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেছেন।

কুজনেৎসের রচিত গ্রন্থ অর্থনীতির অমূল্য সম্পদ এবং আকর। জাতীয় আয়ের উপর রচিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাণ্ড ক্যাপিটাল।' তাঁর সম্পাদিত 'ইকনমিক গ্রোথ' গ্রন্থে ভারতের অর্থনীতি পর্যালোচিত হয়েছে। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'ইকনমিক চেঞ্জ', কমোডিটি ফ্লো অ্যাণ্ড ন্যাশনাল ইনকাম এবং 'ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাণ্ড ইট্‌স্ কমপোজিশন' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অর্থনীতি বিষয়ক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো-ছিটানো আছে, তাঁর মূল্যবান রচনা এবং বিভিন্ন সভা-আলোচনা চক্রে প্রদত্ত তাঁর অভিভাষণ। বিভিন্ন ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে তাঁর রচনা। অনগ্রসর উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে কুজনেৎসের ভূমিকা উল্লেখ্য। তাঁর গবেষণালব্ধ প্রদর্শিত পথেই দেশে দেশে জাতীয় আয়-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করা হয়। চীনেও যোজনা রচনায় তাঁর পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।

মানব কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ ভারতবন্ধু অর্থনীতি বিজ্ঞানী অধ্যাপক কুজনেৎস এ বছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় ভারতবাসী গর্বিত এবং আনন্দিত।

স্মরণ করা যেতে পারে যে ইতিপূর্বে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নরওয়ের ডক্টর র‍্যাগনার ফ্রিশ এবং হল্যাণ্ডের ডক্টর টিনবারজেনও ভারতের পরিকল্পনা রচনায় পরামর্শ দিয়ে যোজনা কমিশনকে সহায়তা করেছেন। ভারতের যোজনা সম্পর্কে ডক্টর ফ্রিশের অমূল্য গ্রন্থ 'প্ল্যানিং ফর ইণ্ডিয়া,' ভারতেই প্রকাশিত হয়েছে।

বোনার আগে তামাকের বীজ শোধন

ভালো অঙ্কুরোদ্গম

তামিল নাড়ুর ভেদাসান্দুর-এ অবস্থিত সিগারেট ও চুরুট অনুসন্ধান কেন্দ্রে পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, তামাকের সুপ্ত বীজ (অর্থাৎ যে জাতীয় বীজে অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা সুপ্ত থাকে) যদি অসুপ্ত বীজের (অর্থাৎ যে জাতীয় বীজে অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা প্রথম থেকেই সক্রিয় থাকে) নির্য্যাসে শোধন করে নেওয়া যায়, তবে সুপ্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গম শতকরা ৪২.৫ ভাগ বেশী হয়।

এক গ্রাম অসুপ্ত তামাক বীজের সঙ্গে ১০ মিলিলিটার জলে মিশিয়ে এই নির্য্যাস তৈরী করা হয়।

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে
ভেবে দেখুন
যেটি আছে তাকে ঠিক মতো
লালন-পালন করতে
পারছেন কি না
আপনার মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ'ক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুলতে। কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়?
সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হ'ল, সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে প্রিয়, রবারের জন্মনিরোধক। নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে জন্মনিরোধের জন্যে বহুকাল ধরে লোকে নিরোধ ব্যবহার ক'রে আসছেন। আপনিও নিরোধ ব্যবহার করুন না?
সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায়

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন
নিরোধ
NIRODH
লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ রবারের জন্মনিরোধক
মনোহারী দোকান, মুদির দোকান, কেমিষ্টের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায়

পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য সম্পদ

বংশী মান্না

পশ্চিম বঙ্গকে সাধারণতঃ শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র শিল্প সম্পদের দিক থেকেই নয় প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকেও এই রাজ্য সমৃদ্ধ এবং সমৃদ্ধতর হ'তে চেষ্টা করে চলেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে এমন সব বস্তু বা পদার্থকে বোঝায় যেগুলি মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে পায় ও সোজাসুজি ব্যবহারে লাগায়। এগুলি কলে বা কারখানায় উৎপাদিত হয়ে মানুষের কাছে আসে না।

পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের সম্পদের মধ্যে বনজ সম্পদ অর্থাৎ অরণ্যাঞ্চল থেকে যে সব বস্তু পাওয়া যায় এবং মানুষের 'ভোগে' অথবা ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে লাগে, এমন সব জিনিস।

ভৌগোলিক আয়তনের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন মোট ৮৭,৬৭৬ বর্গকিলো মিটার। এর মধ্যে বনাঞ্চল প্রায় ১২ হাজার বর্গকিলো মিটার। এই অরণ্য অঞ্চল কিন্তু একসঙ্গে বা একই অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য উত্তর অংশের লাল মাটির দেশে এবং দক্ষিণ বঙ্গের সমতল ও সুন্দরবন অঞ্চলে এই তিন অংশে ছড়িয়ে আছে। মাটির উপাদান, গঠনগত বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক জলবায়ু এবং অবস্থান এই সমস্ত দিকের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি অরণ্য অঞ্চল পরস্পরের থেকে পৃথক। তেমনি উৎপাদনের দিক থেকেও এরা ভিন্ন ধরণের। পশ্চিম বঙ্গে উৎপন্ন অরণ্য সম্পদ থেকে এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন-বিভাগ প্রতি বছরে প্রায় আড়াই কোটি টাকা পেয়ে থাকেন। মাত্র বছর দশেক আগে এই আয় ছিল দেড় কোটি টাকার মতো। প্রতি বছরই বনবিভাগের আয় বেড়ে চলেছে।

উত্তর বাংলার অরণ্য সম্ভার

বনাঞ্চলের বনজ ও উৎপাদিত সম্পদের দাম এই দিক থেকে বিচার করলে অরণ্য প্রধান অঞ্চল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হয়। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার এই তিনটি জেলাতেই বন বন আছে। এখানে বৃষ্টিপাত হয় বেশী, গাছ বাড়ে—লম্বায় এবং পরিধিতে দুদিকেই। নানা রকমের গাছ জন্মায় এখানকার বনে, যার মধ্যে প্রধান হোল শাল। অন্যান্য গাছের মধ্যে আছে সেগুন, ধুপী, চাঁপ, শিশু, শিমুল ইত্যাদি। এখানকার শালগাছগুলি খুব বড় ও মোটা ধরণের—এর থেকে রেলের স্লিপার তৈরী করে বিক্রি করা হয়। এটি বনবিভাগের প্রধান আয়ের পথ। বামন পোখরী অঞ্চলে প্রায় একশ বছর আগে লাগানো সেগুন গাছগুলি থেকে ভালো জাতের টিক্ কাঠ পাওয়া যায়—অনেকে সেগুলিকে প্রথম শ্রেণীর বার্মাটিকের সমান মনে করেন। এর থেকে আসবাবপত্র তৈরী হয়। বামন পোখরীর সেগুন ছাড়া অন্য অরণ্য অঞ্চল থেকেও সেগুন কাঠ পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের চা শিল্প বিশ্ব বিখ্যাত। এই চা পাঠাবোর জন্যে দরকার হয় প্রচুর কাঠের বাক্স। বাক্স তৈরীর জন্যে দরকার প্লাইউড। চাঁপ, কদম, বহেড়া, চিকরাশি, আর এই সব গাছের কাঠ থেকে প্লাইউড তৈরী করা হয়।

ধুপী গাছ দেখতে ঝাউ গাছের মতো। প্রায় চল্লিশ বছর আগে জাপান থেকে এই গাছ এনে দার্জিলিং অঞ্চলে লাগানো হয়েছিল। এখন দার্জিলিং এর আশেপাশে বড় ঝাউ ধরণের বা মুঁচোলো পাতার গাছ দেখা যায় সবই এই ধুপী, যার অপর নাম ক্রিপ্টোমেরিয়া জ্যাপোনিকা। এর কাঠ থেকে কাগজ কলে মণ্ড বা পাল্‌প্ তৈরী হয়। শিশু, চাঁপ ইত্যাদি গাছের কাঠ, প্লাইউড, আসবাবপত্র তৈরী প্রভৃতি নানা কাজে লাগে। শিমুলের কাঠ থেকে দেশলাইয়ের কাঠি তৈরী হয়। কলে দেশলাই তৈরীর কারখানায় শিমুল কাঠের চাহিদা প্রচুর।

এখনও পর্যন্ত উত্তর বঙ্গের বনজ সম্পদের সবটা মানুষের কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না কারণ পাহাড়িয়া অঞ্চলে অবস্থিত এখানকার বন অত্যন্ত দুর্গম। বহু গভীর বনের ভিতর এখনো যথেষ্ট রাস্তা ঘাট নেই বলে কাঠ কেটে বের করে আনা সম্ভব হয়না। সেখানে যুগ যুগ ধরে অরণ্য সম্পদ অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে। পুরানো গাছগুলি কেটে ফেলে নূতন গাছগুলির বেড়ে

ওঠার পথ পরিষ্কার করা সম্ভব হয়না। রাস্তা তৈরী করা অসম্ভব এমন অনেক অরণ্য অঞ্চলে বনবিভাগ রজ্জুপথ বা রোপওয়ে তৈরী করেছেন এবং ভবিষ্যতেও কয়েকটি করবেন। এছাড়া, বন-সম্পদের সরবরাহ বাড়ানোর জন্যে বনাঞ্চলে নূতন নূতন রাস্তাও তৈরী করা হচ্ছে।

এখানে মোটামুটি সবশুদ্ধ ধরণের বনাঞ্চলে আরেকটি গাছ হয়—যা বিক্রি করে বন বিভাগ আয় করেন। গাছটি খয়ের ধরের। বাবলা জাতের ছোট ধরণের গাছ। এগুলি নিলাম করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিক্রি করা হয়। তাঁরা এর ডাল, পাতা, ছাল ইত্যাদি ছাড়িয়ে কাঠটিকে জলে সেদ্ধ করে যে রূপ পান, তাই খোল খয়ের—যা আমরা পানের সঙ্গে খাই এবং সেটি অন্য কাজেও লাগে।

আমাদের দেশে কাগজের চাহিদা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে মণ্ড তৈরীর নোপা কাঠের চাহিদা। বিদেশে পাইন গাছের কাঠ থেকে উঁচু জাতের মণ্ড তৈরী করা হয়। সেই অনুপ্রেরণায়, বনবিভাগ উত্তর বঙ্গে উচ্চ হারে বাড়ে এমন পাইন গাছের বনসৃষ্টি করার জন্যে বিদেশ থেকে পাইন বীজ আমদানী করে গবেষণা সুরু করেছেন। তাঁরা আশা করেন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এমন একটি জাতের পাইন খুঁজে পাওয়া যাবে যা ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটাতে পারবে।

পশ্চিম অংশের অরণ্য

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক জুড়ে বীরভূম, বর্দ্ধমানের একাংশ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অংশে একটি বিশেষ ধরণের মাটি দিয়ে ভূপ্রকৃতি গঠিত হয়েছে। এই মাটির রং গৈরিক—হলুদে ও লাল রংয়ের মাঝামাঝি, জল ধরে রাখার ক্ষমতা কম, কাঁকর বালির ভাগ বেশী। শুকনো অবস্থায় এই মাটি অত্যন্ত শক্ত। সাধারণতঃ এই মাটির উর্বরা শক্তি অল্প থাকে। এইসব অঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত রুক্ষ, শুকনো ধরণের বাতাসে জলীয় বাষ্প সাধারণতঃ কম থাকে, এখানে বৃষ্টি সাধারণতঃ কম হয়।

পশ্চিমবাংলায় মোট প্রায় দশ লক্ষ একর পতিত জমি আছে, এর অধিকাংশই এই লাল-মাটির দেশে অবস্থিত। পতিত জমি বাদ দিয়ে এখানে যে অরণ্য অঞ্চল আছে তাতে শাল, পিয়াশাল, সেগুন, আকাশমণি, শিশু প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। এই শাল বা সেগুন কিন্তু উত্তর বাংলার শাল সেগুন ইত্যাদির মত বড় বা মোটা ধরণের হয় না কারণ এখানে গাছ বাড়ে কম। ফলে এগুলি প্রধানতঃ বাড়ী তৈরীর কাজে, জ্বালানী হিসাবে এবং কাগজ কলে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর চাহিদার কাছে সরবরাহ যথেষ্ট নয়। এর উপর আবার কাগজ কলে কাঠের চাহিদা আরও বাড়ছে।

বন বিভাগ স্থির করেছেন পতিত জমিগুলিতে বন সৃষ্টি করে কাগজকল গুলির ও জ্বালানীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবেন। এই উদ্দেশ্যে রচিত পরিকল্পনায় স্থির হয়েছে :—

১। তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এমন গাছ লাগাতে হবে।

২। শিল্পগত ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য বেশী দামে বিক্রি করা যায় এমন গাছ লাগাতে হবে।

৩। জ্বালানী কাঠের সরবরাহ বাড়ানোর জন্যে খামার-বনাঞ্চল সৃষ্টি করতে হবে।

৪। বিনষ্ট-প্রায় বনাঞ্চলগুলিকে পুনর্জীবিত করতে হবে।

দ্রুত বেড়ে ওঠে এমন গাছের বনাঞ্চল সৃষ্টির কাজের প্রথম পর্বে এগিয়ে এসে বন বিভাগকে সাহায্য করতে এলো একটি বিদেশী গাছ যার নাম ইউক্যালিপটাস। এ গাছের আদি বাসস্থান অষ্ট্রেলিয়া। অনেক রকমের ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। সেগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে মহীশূরে এক ধরণের বর্ণসঙ্কর ইউক্যালিপটাস উদ্ভূত হ'ল যার নাম দেওয়া হ'ল ইউক্যালিপটাস্ হাইব্রিড্। এই গাছ এ দেশের মাটির উপযোগী, বাড়েও খুব তাড়াতাড়ি। লাল-মাটির দেশের পাথরে রুক্ষ জমিতে, প্রচণ্ড রোদের খরার মধ্যেও এই গাছগুলি দিব্যি বেড়ে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে চারটি কাগজের কল আছে। এখন এই কলগুলি কাঁচা মালের জন্যে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উপর বেশীর ভাগ নির্ভর করে থাকে। এই অবস্থা বেশীদিন ধরে চলা উচিত নয়। আবার প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও কাঁচা মালের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে কাগজের উৎ-পাদন আরও বাড়ানোর দরকার দেখা দিয়েছে। ফলে, এই সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্যে এই বিদেশী গাছ গুলিই একমাত্র ভরসা—এরাই হয়তো কালে পশ্চিমবঙ্গের কাগজের কলগুলিকে কাঁচা মাল সরবরাহ করে বাঁচিয়ে রাখবে।

এখন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় ল্যাটা-রাইট মৃত্তিকা-অঞ্চলে দেখা যাবে অনেক পতিত জমিতে জেগে উঠেছে লম্বা লম্বা ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের ঘন বন। কোথাও কোথাও মহুয়া, আকাশ-মণি, শিমুল, সেগুন, শাল, বাঁশ ইত্যাদি পাঁচ-সাত রকমের গাছের নূতন তৈরী বন দেখা যাবে এমন সব

জায়গায়, যেখানে আগে শালের বন ছিল। এই শাল বনগুলি মাটির অনুর্বরতা, অনিয়ন্ত্রিত গবাদি পশু চারণ, বে-আইনী গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি নানা রকম কারণে নষ্ট হ'য়ে ঝোপ-ঝাড়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এই সব বন থেকে মাত্র একফুট পরিধির শাল গাছও পাওয়া যেত না। তাই এই পুরানো শাল বনগুলিকে ট্র্যাক্টারের সাহায্যে একেবারে তুলে ফেলে মাটিতে চাষ দিয়ে নূতন বনের পত্তন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই নূতন বনগুলি পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য সম্পদের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই অঞ্চলে এবং উত্তর বঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে এই নূতন তৈরী বন ভূমির মাটিকে যথাযথ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এক অভূতপূর্ব পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। শাল, সেগুন ইত্যাদি দামী কাঠের গাছগুলি বেশ কয়েক ফুট ফাঁকাতে লাগানো হয়, অর্থাৎ একটি গাছ থেকে আরেকটি গাছের মধ্যে বেশ খানিকটা জমি পড়ে থাকে। এখন ওই পড়ে থাকা জমিটিতে গম, ভুট্টা কুমড়ো, ঝিঙে, রসুন, আদা এইসব চাষ করা হচ্ছে। এতে মূল গাছগুলির কোনো ক্ষতি হচ্ছে না বরং দুটি গাছের মধ্যের মাটিটা উলট-পালট হওয়ার ফলে গাছগুলির উপকারই হচ্ছে এবং অতিরিক্ত ফসলও পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য মূল গাছগুলি পাঁচ-সাত বছর পরে যখন বেশ খানিকটা বেড়ে উঠবে তখন আর এই চাষের সুবিধা পাওয়া যাবে না। ততদিন পর্যন্ত এই 'ইন্টার-প্ল্যান্টিং' বেশ কিছু বাৎসরিক আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। বর্তমানে এই ব্যবস্থা উপযুক্ত বনাঞ্চলে চালু করা হ'য়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের অরণ্য সম্পদ

অবিভক্ত বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশে এক পৃথিবী বিখ্যাত অরণ্য অঞ্চল ছিল যার নাম সুন্দরবন। দেশ বিভাগের ফলে সুন্দরবনের অধিকাংশই পূর্ব বাংলায় পড়েছে। সামান্য কিছু অংশ পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব দক্ষিণ কোণে। এই অংশের পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলেও কিছু বনভূমি আছে। সেখানে ঝাউগাছের বন। সমুদ্রের ধারে কাছে বালিয়াড়ি থাকলে তাতে ঝাউ ছাড়া আর কোনো রকমের গাছ লাগিয়ে সুবিধে হবে না। ঝাউ একটি বিদেশী গাছ, এর ইংরাজী নাম ক্যাজুরিনা। গত একশ' বছর ধরে আমাদের দেশে ঝাউএর চাষ হচ্ছে। ঝাউ গাছ বাড়ে খুব তাড়াতাড়ি, এর কাঠ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া, সমুদ্রতীরের ঝাউবন সমুদ্র থেকে বাতাসের সঙ্গে উড়ে আসা বালি কণাগুলিকে ঠেকায় এবং সমুদ্রতীরের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তোলে। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ অংশে সমুদ্রতীরের কাছে যে সামান্য পতিত জমি আছে সেখানে বনবিভাগ ঝাউএর বন তৈরী করে চলেছেন। এখানকার ঝাউবন দৈর্ঘ্যে কয়েক মাইল হলেও প্রস্থে কয়েক শ' ফিট মাত্র। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার একর জমিতে ঝাউ লাগানো হয়েছিল কিন্তু সমুদ্র এর অধিকাংশই গ্রাস করে ফেলেছে। এই অঞ্চলে ঝাউবনের আয়তন খুবই সামান্য—তা হলেও প্রতি বছর এই ঝাউগাছ বিক্রী করে বনবিভাগ প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা পান।

সুন্দর বন কথাটি এসেছে সুন্দরী বা সুঁদুরী নামের এক ধরণের গাছ থেকে যা এই বনে প্রচুর পাওয়া যেত। পূর্ব-বাংলায় কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও এই গাছ দেখা যায় কারণ সেখানকার জলে নোনা কম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের জলে নুনের পরিমাণ বেশী হওয়ায় এখানে সুন্দরী গাছ খুব কম পাওয়া যায়। তবু সুন্দরবন নামটি রয়ে গেছে। এখানকার বন অবশ্য প্রচলিত অর্থের বন নয়। সমস্ত অঞ্চলটি নদী, নালা, খাল এবং জলাভূমি দিয়ে তৈরী। এখানে শক্ত মাটি নেই। বনাঞ্চল বড় জোয়ারের সময় প্রায়ই জলে ডুবে যায়। ভাটার সময় আবার ডাঙা জেগে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় ৪২ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এর অর্দ্ধেকের বেশী অংশ জুড়ে আছে অসংখ্য খাল, খাঁড়ি, নদী, মোহানা প্রভৃতি। বাকী অংশের মাটি নদী-বাহিত পলিমাটি দিয়ে তৈরী বলে খুব উর্বর। উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানে ঘন বন ছিল তারপর সুরু হয়েছে বন কেটে বসতি বসানোর ব্যাপক প্রয়াস। ফলে কোথাও কোথাও বনাঞ্চল সঙ্কুচিত হতে বাধ্য হয়েছে। এখানকার কাঠ বলতে গরাণ (গঁ'টি) বেশী, এ ছাড়া আছে খোটগোরান, কেওড়া, বাইন ইত্যাদি। গাছগুলি বেশী বড় হয় না, বেশী মোটাও হয় না। ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ জ্বালানী হিসাবে। এগুলি খুব বেশী দামে বিক্রী হয় না। গরাণ প্রভৃতি গাছে ছালে ট্যানিন্ বেশী থাকে বলে এর ছালও দামে বিক্রী হয়। চামড়া ট্যান্ করার কাজে এই ছাল লাগে।

সুন্দরবনে একটি বিচিত্র প্রাণী আছে যা থেকে বনবিভাগ বেশ কিছু টাকা পেয়ে থাকেন। সে প্রাণীটি হোলো মৌমাছি। এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সুন্দরবনে নানা রকমের ফুল ফোটে। হাজার হাজার বুনো মৌমাছি এই সব ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে বনের গাছে মৌচাক তৈরী করে। এখানকার

৩য় মলাটে দেখুন

সাগর সঙ্গীত

অপর্ণা দেবী

'মালা' গ্রন্থের পর ১৯১১ সালে কবি চিত্তরঞ্জন সাগর-সঙ্গীত লিখেছিলেন এবং ১৯১৩ সালে গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হয়।

শিবের যেমন হিমালয়ের ধ্যানে তাঁর ধ্যান মগ্ন হলেন তেমনি সীমাহীন সমুদ্রের রূপের প্রতিও তাঁর একটা আন্তরিক আকর্ষণ ছিল, তাই বারবার তিনি ছুটে গিয়েছেন সাগরের আহ্বানে। আদি অন্তহীন বিশাল নীলাম্বুর বিভিন্ন রূপের তরঙ্গ ভঙ্গী মুগ্ধ হয়ে সেই অসীম রূপকেই তিনি 'সাগর সঙ্গীত' ছন্দে বেঁধে রাখলেন। আদি অন্তহীন বিশাল জলধির সঙ্গে অনন্ত নীলাকাশের যে মিলন, সে মিলনে সাগরের উচ্ছল নৃত্য "তাঁর অন্তর স্পর্শ করলো। সেই মহান রূপকে বন্দনা করে তিনি বলেন :-

"হে আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ী—
দাঁড়াও ক্ষণেক। তোমা ছন্দে গেঁথে লই।
আজি শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্র করে
করিতেছে টলমল কিসে স্বপ্ন ভরে।
সত্যই এসেছ যদি হে রহস্যময়ী—
দাঁড়াও অন্তর মাঝে ছন্দে গেঁথে লই।'

তারপর কবিচিত্ত মগ্ন হয়ে গেল আদি অন্তহীন নীলাম্বুর সেই বিভিন্ন অসীম রূপের মধ্যে এবং সে রূপকেই তিনি বেঁধে রাখলেন "সাগর সঙ্গীত" ছন্দে। প্রকৃতির সেই মহান রূপকে তিনি লক্ষ্য করে বলেন,

"আজিকে পাতিয়া কান,
শুনেছি তোমার গান,
হে অমর আলো ভরা প্রভাতের মাঝে,
একি কথা। একি সুর।
প্রাণ মোর ভরপুর
বুঝিতে পারিনা তবু কি জানি কি বাজে—
তব গীত সুরভিত প্রভাতের মাঝে।

প্রভাতেই সাগর সঙ্গীতের আহ্লাদে পুলকিত অন্তরে মোহাবিষ্ট কবি গেয়ে চলেন :—

ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি ও গানে,
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।
কখনো বাজিছে ধীর,
কখনো গম্ভীরে,
কখনো করুণ স্মৃতি চোখে আনে জল
উদ্দাম উন্মাদ কভু করিছে পাগল।

তারপর সাগরের সৌন্দর্যে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলেন :-

গীত ভরা স্বর্ণালোকে ফুটে পুষ্পদল
তোমার চরণ বেড়ি করে টলমল।
তোমার সঙ্গীতে আজি বিহঙ্গের প্রায়
মাখি যে সোনার স্বপ্ন তার সর্ব গায়
উড়িয়া বেড়ায় মোর হৃদয় আকাশে
প্রেমের তরঙ্গে আর বসন্ত বাতাসে।

কিন্তু তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন রূপ বিন্যাসের সে ভাষায়, তাই দৈন্যতা স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করে বললেন :—

জানিনা কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস
জানিনা গানের সুর, তান লয় মান
আমার অন্তর তলে বুক চিদাকাশ
অনন্তের জ্ঞান ভরা আমার পরাণ।
সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলো মাঝে, সাঁঝের আঁধারে।
তাই আমি খুলিয়াছি হৃদয় দুয়ার,
তোমারি গানের মাঝে খুঁজি আপনারে।
অপূর্ব এ মিলনের গোটা কত গীতে
পরাণ ভরেছি আজ তব পায়ে দিতে।"

তাই কবি আপন সত্তাকে সাগরের কাছে বিলিয়ে দিলেন। চন্দ্র যেমন সূর্যের মহিমায় আলোকিত তেমনই কবি চিত্তরঞ্জন নিজেকে সাগরের হাতে সমর্পণ করেই যেন বলেন "কোথা তুমি নিয়ে যাবে চল।" এখানে কবি চিত্তরঞ্জন আত্ম সমর্পণের মহিমায় মহিমান্বিত।

কবি ভাবাবেগে বলে চলেন :—

তোমারি এ গীত প্রাণে সাড়া দিল যার
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ—
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী (অতএব) বাজাও
আমারে,
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে
বাজাও নির্জন তীরে, বিজন আকাশে
সকল তিমির ভেদ্যা আকুল বাতাসে,
রাত্রালোকে, ছায়ালোকে, তরুণ ঊষায়,
বাজাও বাসনা হীন উদাসী সন্ধ্যায়।
ওগো যন্ত্রী। আমি যন্ত্র বাজাও আমারে
তোমার অপূর্ব এই আলো অন্ধকারে।

প্রেম সাগরের এই আকুতি মহাসাগর বুঝি আর উপেক্ষা করতে পারল না, তাই কবি হৃদয়ের দুই কূল প্লাবিত মথিত করে মহাসাগরের আহ্বান এলো, অন্তরের পারাপার নিশ্চিহ্ন হয়ে 'একাকার' হয়ে গেল। মহাসাগরের বক্ষে কবি-মন লীন হয়ে গেল। অসীমের সঙ্গে মিলনের আকুলতা শান্ত হলে এল পরিপূর্ণ নির্ভরতা। কবি বলে উঠলেন :—

শব্দহীন মহাকাশ, শান্তিভরা সমুদায়
আজি বরষিছে সন্ধ্যা তোমার সকল গায়
মহাশান্তি নীরবতা। হে সাগর হে অপার
বাক্যহীন আজ তুমি স্তব্ধ শান্তি পারাবার।
নীরব সঙ্গীত তব-শান্তি ভরা অন্ধকারে
আনন্দে উজলি রাখে সর্বমাঝে আপনারে।
সে আনন্দে বিরাজিছে তোমার সকল দেহ
মগ্ন হয়ে গেছে তার সকল বিষাদ গেহ।
সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম হয়ে ভাসে জলে
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণ তলে।
আমার বক্ষের পরে যোগাসনে যোগীবর
নিবিড় নিঃশ্বাস হীন ধীরস্থির আঁখি কর
পেয়েছি আভাষ আমি, পাইনি সন্ধান তার
যুক্ত করে বসে আছি কর মোরে একাকার।

অন্তরে প্রেমাস্পদের আহ্বান শুনেও বহিঃ প্রকৃতিতে প্রাণের মনের আভাষ পেলেন মাত্র তাই কোন সাধনে সেই বহিঃ প্রকৃতির দ্বারাই তিনি অন্তরের নিমগ্নপ্রাপ্ত হবেন? তাই সাধনায় মগ্ন তিনি চাইলেন মহার্ণবের কাছে। করুণ আসনে তাকে বরণ করে বলেন :—

"আরতির শঙ্খ যেন উঠিল বাজিয়া
তোমার পূজার লাগি ধূপ-ধূনা দিয়া,—
পদ্য ধূয়ে সু-পবিত্র হৃদয় মন্দির,
উদাসী সঙ্গীত তব বাজিছে গম্ভীর।
হে পূজারী, আজি তুমি কোন পূজা কর?
পরাণ প্রদীপ মোর ঊর্দ্ধে তুমি ধর
কার প্রাণে কোন মন্ত্র করি উচ্চারণ?
কোন পূজা লাগি মম এত আয়োজন?
দীক্ষা দাও ওগো গুরু! মন্ত্র দাও মোরে
পূজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভরে।'

গুরুর কাছে দীক্ষা চেয়ে কবির প্রাণপদ্ম রূপ তার শতদল মেলে প্রস্ফুটিত হোল। তাই ভরা প্রাণে তিনি বল্লেন :—

"ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্
আজি কি সুর লেগেছে
হৃদয় কমল মাঝে কে যেন বেগেছে।"

কামনা করলেন তিনি যে অসীমের সাধন ভেনে অভাজন যেন বঞ্চিত না থাকে। চিরকাল যেন কবি, প্রকৃতির এই জয়গানে মুখরিত থাকেন তাই অনুনয় করে বল্লেন :—

হে সাধক, হে ভকত, কমহ কীর্ত্তন নব—
সঙ্গে যেন চিরকাল সাধন ভজনে তব ॥

অসীম পারাবারে অন্তর ভাসিয়ে দিয়েও তো কোন কূল পেলেন না। "অকূলেতে না পড়িলে কূলে কি গোবিন্দ মিলে" বৈষ্ণব সাধকের এই মহা ভাবে ভাবাবিষ্ট হয়ে মিলনের সম্পূর্ণতার আকাঙ্খায় ক্লান্ত কবি চিত্তরঞ্জন বল্লেন :—

"এপার ওপার করি পারি নাক আর
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার
পরাণ ভাসিয়া গেছে কূল নাহি পাই,
তোমার অকূল বিনা কোথা তার ঠাঁই।
আজি যে ঘিরিছে মোরে গাঢ় অন্ধকার।
সাড়া শব্দ নাহি পাই পরাণ মাঝার।
নীরব ক্রন্দনে ভরা চোখে নাহি জল
আজি যে তোমার তরে পরাণ পাগল।
খুঁজেছি তোমারে কত জনমের মাঝে
খুঁজেছি যেখানে তব গীত ধ্বনি বাজে।
তোমার অপূর্ব ওই আলো অন্ধকারে
প্রতিদিন প্রতিরাত্র খুঁজেছি তোমারে
হে মোর আজন্ম সখা! কাণ্ডারী আমার
আর মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।"

শিশুদের প্রকৃতির লীলা দিকেতেন অসীম সাগরের মধ্যে খুঁজে বেড়ালেন রবীন্দ্র নাথের চির আরাধ্য "জীবন দেবতা" কে। এই জীবন দেবতাকে খুঁজে বার করতে 'বালকের" ঈশ্বর বিদ্রোহী কবি 'বালার' ঈশ্বর সান্নিধ্যে এসে মহাসাগরের মহান ঐশ্বরিক গীতির রূপে ডুবে গেলেন।

বন্যা বিধ্বস্ত নদীয়া

১৮ পৃষ্ঠার পর

বন্যায় জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। ১০৭১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১১২টি উচ্চ বিদ্যালয় জলমগ্ন হয়, অনেক বিদ্যালয়-গৃহ বিধ্বস্ত হয়। যে বিদ্যালয়গুলি জলমগ্ন হয়নি তাতে বন্যার্তরা আশ্রয় নেয়।

বন্যায় নবদ্বীপের গুড়গুড়ি, চাপড়ার চুমকানি ও কালিগঞ্জের জগৎখালি বাঁধ ভেঙে যায়। এ ছাড়া, জেলার প্রচুর ছোটখাট বাঁধ, কালভার্ট ও সড়ক ভেঙে যায়। এ সবের ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকার কম হবে না।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ফসলের। নদীয়ায় এবার আউশ, আমন ও পাট এই তিন ফসলের সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। আউশ আর পাট বন্যায় কাটা গেল না, আমন ধানের সবুজ সতেজ চারাগুলি বিনষ্ট হল জলমগ্ন হয়ে। জেলার মোট ৭ লক্ষ ২১ হাজার একর আবাদী জমির মধ্যে ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার একর জমির ফসল বিনষ্ট হয়েছে। বাকী জমিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফসলের ক্ষতির পরিমাণ ১২ কোটি টাকার উপর। সরকারের কৃষিদপ্তর, জল নেমে যাওয়ার পর 'রোপণ' পদ্ধতিতে নতুন করে আমন ধান লাগাতে চাষীদের উৎসাহিত করেন। সরকারী সহযোগিতায় চাষীরা বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে জোরাজোরা করে ধান রোওয়া করেছে। যন্ত্র করে রবিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার দেবার ব্যবস্থাও হয়েছে। ফলে, কিছুটা খাদ্যসঙ্কট প্রতিরোধ করা যাবে।

নদীয়ার তাঁতশিল্প বিখ্যাত। নবদ্বীপ চন্দ্রাকৃদিয়া ফুলিয়া ও তেহট্ট অঞ্চলের ৫০ হাজার তাঁতীর ১৫ হাজার তাঁত জলমগ্ন হয়। সরকারের শিল্পদপ্তরের সাহায্যে এরা আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

নদীয়ায় বাংলাদেশের স্বপক্ষাধিক শরণার্থীর প্রায় আট লক্ষ জন ৩৮টি শিবিরে রয়েছে। বন্যায় অধিকাংশ শিবির জলমগ্ন হয়, সেপ্টেম্বরের ঘূর্ণী ঝড়ে তাঁর অনেকের উড়িয়ে নিয়ে যায়।

জেলাকর্তৃপক্ষ ত্রাণের জন্য অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী দাবী করেন। এ পর্যন্ত ৬০০০ মে: টন গম ও ৫০০০ ত্রিপল, জেলায় পৌঁছেছে। সরকার জি আর বন্টন করছেন। কোনও কোনও স্থানে টি.আর. চালু হয়েছে, আরও হবে। মাটির কাঁচা-বাড়ির ক্ষতির, তার বেশি। মেরামত ও পুণ গৃহ-নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে। ত্রিপল তাঁবু খাটিয়ে দিয়ে অস্থায়ী আশ্রয় ও বাসস্থান সরকার তৈরি করে দিচ্ছেন। পোষাক পরিচ্ছদ, দুধ বিশেষ-করে শিশুর খাদ্য বন্যাদুর্গত এলাকায় দেওয়া হয়েছে। গবাদি পশুর খাদ্য, পশুচিকিৎসা সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি বাবদে সরকার অর্থ ব্যয় করছেন। বীজ চারা ছাড়া কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে। সরকার এ বছর খাজনা মকুব করেছেন। বাস্তু-বিভাগ ত্রুত মেরামতি কার্যে নিয়োজিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত সমবায় সমিতিগুলির কাছ থেকে প্রাপ্য পাওনা অবলোপন করার জন্য সরকার ঋণ দিচ্ছেন। জন-স্বাস্থ্যকৃত্যক বন্যাপ্রপীড়িত অঞ্চলে নলকূপ বসাচ্ছেন ও প্রতিষেধক টিকা দিচ্ছেন। নতুন বিদ্যালয়-গৃহও নির্মিত হচ্ছে। বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও বন্যাত্রাণে সেবাকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন।

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৭ পৃষ্ঠার পর

তিনি যে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা সর্বজনবিদিত। শোনা যায় সাগর-জননী ভগবতী দেবীর একটি কথা থেকেই এই আন্দোলনের সূচনা। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে তাঁদের এক প্রতিবেশির আট বছরের একটি মেয়ের অকাল-বৈধব্যে মর্মাহত হয়ে ভগবতী দেবী একদিন তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে তোদের শাস্ত্রে এই রকম হতভাগিনী মেয়েদের এই রকম দুর্গতি দূর করার কোন বিধান নেই?" মায়ের এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট ছিল। পরবর্তী ইতিহাস সুপরিচিত। এই-আন্দোলন তাঁর কাছে কঠিন সত্যের রূপ নিয়েই এসেছিল। তাই তিনি তাঁর সমগ্র প্রতিভা ও অর্থসামর্থ্য দিয়ে একাকী এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।

"আমি বিধবার বিয়ে দেব। শাস্ত্রে এর সমর্থন আছে।" সেদিন তাঁর কথায় সত্যিই তদানীন্তন সমাজ ও স্বদেশবাসী ভয় পেয়েছিল। তারা দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে সহ্য করবার মতো ক্ষমতা আমাদের ছিল না, আজো নেই। কিন্তু সেদিন দেখেছিলাম সমুন্নত শাণিত শির নিয়ে জীবনের কণ্টকময় পথে সিংহ একাই চলে গেলেন। নির্বান্ধব নিঃসঙ্গ। বঙ্গ-বিধবার কত জন্ম-জন্মান্তরের শোকাশ্রু, যা দেখেছিলো অনেকে কিন্তু করেনি কিছুই, তা মোচন করলেন বিদ্যাসাগর।

॥ পাঁচ ॥

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নির্মাতার একক গৌরব বিদ্যাসাগরের।

এই ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল বিরাট তাতে আর কাউকেই মানায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার সাহিত্য ভাষার সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন।..বাংলা ভাষা বিধাহীন মুক্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে। এই ক্ষেত্রে তাঁর দান বাংলা ভাষার প্রাণ পদার্থের মধ্যে চিরকালের মতো মিশে গেছে।" এই ক্ষেত্রে তিনি যে কত বড়ো বিপ্লব এনেছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর হাতেই বাংলা ভাষার সংস্কার হয়েছিল; তিনিই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের জনক। যে বাংলা এখন আমরা পড়ি, লিখি, তার ভিত্তিস্থাপন করেন তিনিই। তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যিক অনুভূতি এসে মিশেছিল এবং এই কাজ—এই ভাষা সংস্কার এবং সাহিত্য নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল সেই জিনিস যা আধুনিক কালের প্রধান ধর্ম—মানবিকতাবাদ। বলা যেতে পারে যে, তিনিই প্রথম যিনি বাংলা ভাষাকে একটা পরিচ্ছন্ন রূপ প্রদান করেছিলেন। তাঁর 'সীতার বনবাস' ও 'শকুন্তলা' 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ' চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাজনারায়ণ বসু মিথ্যা বলেন নি: "বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ আছে।"

যতদিন বাংলা ভাষা ততদিন বিদ্যাসাগর।

ভাবতে অবাক লাগে যে সময়ে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবন ও সমাজ-জীবন বহু রকম ব্যভিচারে ক্লিষ্ট, চরিত্রে বৈশিষ্ট্যহীন, বাঙালী জাতি চরিত্রের প্রায় সমস্ত উপাদান হারিয়ে মেরুদণ্ডহীন অবস্থায় কেবলমাত্র দেশাচার ও ধর্মের অপব্যাখ্যাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে, তখন সেই জাতির মধ্যে হঠাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের মতো একজন উন্নতমনা, বুদ্ধিসম্পন্ন, অমিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেজস্বী মানুষের আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের কথায় এই রকম একটি চরিত্রসৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করে বলতে ইচ্ছা হয়: "মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চারি কোটি বাঙালী নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।" বাঙালীর জীবন প্রভাতের শুভ প্রেরণা তিনিই। মনুষ্যত্ব ও পৌরুষের এই জ্যোতির্ময় বিগ্রহকে প্রণাম।

সংবাদ পরিক্রমা

২০ পৃষ্ঠার পর

মণিপুরের মোট জনসংখ্যা ১০,৬৯,৫৫৫ বলে প্রকাশ, অর্থাৎ ১৯৬১ সালের লোক-সংখ্যার চেয়ে প্রায় তিন লক্ষ বেশী। গত দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৩৭.১২ শতাংশ। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ র মধ্যে এ হার ছিল ৩৫.০৪। মণিপুরে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৮৪ জন নারী। শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬১ তে মণিপুরে শতকরা ৩০.৪ জন শিক্ষিত ছিল। এ বছর তা বেড়ে হয়েছে ৩২ ৮। ইম্ফল পৌর এলাকায় শতকরা প্রায় ৫৭ জনই লেখাপড়া জানেন।

ত্রিপুরা: ত্রিপুরার লোকসংখ্যা এ বছরের আদম সুমারে দাঁড়িয়েছে ১৫ লক্ষ ৫৭ হাজার অর্থাৎ গত ১০ বছরে জনসংখ্যা ৩৬ শতাংশেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ, পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমন। ত্রিপুরার প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৪০। গত দশকে শিক্ষিতের সংখ্যা দশ শতাংশ বেড়েছে। বর্তমানে ১০০ জনের মধ্যে ৩১ জনই শিক্ষিত। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ১৫৯ জন লোকের বাস। ত্রিপুরার ছয়টি শহরের মধ্যে আগরতলারই জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী ৫৯,৭০০।

ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষ কার্যসূচী অনুমোদন করেছেন বলে প্রকাশ। এই কার্যসূচীর লক্ষ্য হল, রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে এক হাজার বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এই কার্যসূচী অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় বছরে ১২,০৫,০০০ টাকা খরচ করা হবে। ত্রিপুরায় এ ধরণের অন্যান্য পল্লী উন্নয়ন কার্যসূচী রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে রূপায়িত হচ্ছে।

শিশুদের অপরাধ প্রবণতা

(৯ পৃষ্ঠার পর)

সালের তুলনায় এই বৃদ্ধি হ'ল ৭.৬ শতাংশ। শিশু অপরাধীদের মাত্র শতকরা ২.৬ ভাগ (১৯৬৯ সালের মোট লক্ষিত অপরাধের তুলনায়) এর জন্য দায়ী।

প্রতি ১ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৯৬৯ সালে মাত্র ৪ জন শিশু অপরাধী ছিল। ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪.১ ভাগ। মোট জনসংখ্যার তুলনায় এই শিশু অপরাধ যদিও একটা সূচক নয়, তবুও যেহেতু মোট শিশু সংখ্যা আমাদের অজানা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি শিশু-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত, তাই ঐ সংখ্যা দেশের মোট অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু অপরাধ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দেয়।

মোট শিশু অপরাধের এই সংখ্যাকে বিশেষ বিশেষ অপরাধ অনুযায়ী ভাগ করলে দেখা যায় যে ১৯৬৯ সালে চুরির জন্য ধরা পড়া শিশুর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী এবং তা হ'ল ৯,৪৪৫। তারপরই হ'ল বাড়ী থেকে পালান শিশুর সংখ্যা ৩,৪১২। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৮ সালের হিসাবেও প্রায় একই ধরণের জিনিষই দেখা গিয়েছিল। ১৯৬৮ সালে ছিনতাই এর সংখ্যা হঠাৎ শতকরা ১৩.৫ ভাগ কমে গেলেও দাঙ্গা, ডাকাতি, চুরি, অপরাধমূলক বিশ্বাসঘাতকতা ও জালিয়াতির সংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। এ কথা ঠিক যে, ইণ্ডিয়ান পুলিশ কোড এর অন্তর্ভুক্ত অপরাধের সংখ্যা শতকরা ৫.২ ভাগ কমে গিয়েছিল।

সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শিশু (অপরাধী সন্দেহে) ধরা পড়ে মহারাষ্ট্রে-১৮,৪৪৮ তারপরই আসে তামিলনাড়ু-১৮,৩৩০ এবং এই সংখ্যা সবচেয়ে কম ছিল জম্মু ও কাশ্মীরে, ২২১। সমস্ত দেশে অপরাধের জন্য ধৃত শিশুদের মধ্যে শতকরা ৬৩ ভাগই হ'ল গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর।

১৯৬৯ সালে মোট ৭৪,৩০২ শিশুকে আদালতের হাজির হ'তে হয়, তার মধ্যে শতকরা ৭১.৪ জনের বিচার হয়। ২১,১৭৭ জনের বিচার বছরের শেষে অসমাপ্ত থেকে যায়। যে সব শিশুর বিচার হয়েছে, তার মধ্যে ৮,৫৫২ জন বেকসুর খালাস হয়ে বাড়ী ফিরে যায় এবং ১৩,৯৭২ জনকে জেলে পাঠাতে হয়।

১৯৬৯ সালে মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শিশুকে দণ্ড দেওয়া হয়-৪,৭২৩ এবং এই সংখ্যা সবচেয়ে কম ছিল কেরলে ১৫৪ জন। কয়েকটা বড় বড় শহরের শিশু অপরাধের সংখ্যা এমন কি কোন কোন 'রাজ্যের এই সংখ্যাকেও' ছাড়িয়ে যায়। সে বছর মাদ্রাজ ও দিল্লীতে শিশু অপরাধীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৭৯ ও ৮৬৩—এগুলো আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার বা হরিয়ানার শিশু অপরাধীর সংখ্যার চেয়েও বেশী। ১৯৬৮ সালে বিভিন্ন রাজ্যের শিশু অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি এলোমেলো ভাবে ঘটেছে। মাদ্রাজে শিশু অপরাধীর সংখ্যা শতকরা ৩৩.১ ভাগ বেড়ে গিয়েছিল, আবার মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে এই সংখ্যা শতকরা ৯.১ ভাগ ও ১৭.২ ভাগ কমেও গিয়েছিল।

অপরাধী সন্দেহে ধৃত মেয়ের সংখ্যা-বৃদ্ধির হার ধৃত ছেলের সংখ্যার চেয়ে বেশী অর্থাৎ ১৯৬০ সালের তুলনায় মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি শতকরা ১৩৩.৪ ভাগ অথচ ছেলেদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি ছিল শতকরা ৫৮ ভাগ। ১৯৬৯ সালে ধৃত শিশুদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা ছিল শতকরা ৬.১ ভাগ। ১৯৬০ ও ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে শতকরা ৪.৮ ও ৬.৫ ভাগ।

পশ্চিম বঙ্গের অরণ্য সম্পদ

২৫ পৃষ্ঠার পর

গাছগুলি বেশী উঁচু হয় না, তাই মৌমাছিরা গাছের ডালে উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়ে বাসা বাঁধে, বিশেষতঃ গরান গাছের ডালে। সুন্দরবনে মৌচাকের পরম শত্রু ভালুক, নেউল বা ভাম নেই এবং ঝাকড়া মাথা গাছের নীচু ডালে মৌচাক তৈরী হয় বলে পাখীরাও এগুলির ক্ষতি করতে পারে না। ফলে সুন্দরবনে প্রচুর মৌচাক হয়। এক শ্রেণীর স্থানীয় অধিবাসী, যাদের বলা হয় মৌলী, এই সব মৌচাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, বন বিভাগের অনুমতি নিয়ে। অনুমতির সর্ত এই যে সংগৃহীত মধুর একটা অংশ সংগ্রাহক বনবিভাগকে বাজার দরে বিক্রী করতে বাধ্য থাকবে। বাকীটা সংগ্রাহক ইচ্ছেমত বিক্রী বা ব্যবহার করতে পারে। বনবিভাগ এই মধু ছেঁকে, পরিষ্কার করে, পাস্তুর ক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করে নিয়ে বোতলে ভরে বাজারে বিক্রী করেন। এর থেকে বনবিভাগ বেশ কিছু আয় করে থাকেন।

বন-সম্পদের ভবিষ্যৎ

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উপযুক্ত গবেষণা, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বনপালন ও বনসৃজন করার ফলে এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে বনের সম্পদ বৃদ্ধিতে মানুষের চেষ্টায় এক অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। এই পথ অনুসরণ করে চললে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে অরণ্য সম্পদ এক বড় সহায় হয়ে উঠবে। এর জন্যে পরিকল্পনা মত অর্থ ব্যয় করে যেতে হবে, ফল হয়ত সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে না। কারণ গাছ বড় হতে, মানুষের কাজে লাগার যোগ্য হয়ে উঠতে কিছু সময় নেয়। কিন্তু পরিণামে সে সম্পদ বাড়ায়, আরও মানুষের কর্মসংস্থান করতে সমর্থ হয় এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করে।

REGD. NO D-233

‘পুষ্পপ্রেমিক মুনিস্বামী’

ফুলের দেশ বাঙ্গালোর। সত্যিই মন ভোলান রং-বেরং এর ফুল আর রকমারি পাতা বাহারের গাছ বাঙ্গালোর শহরের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে, বাড়িয়েছে সেখানে যাওয়ার আকর্ষণ। যদি আপনি কখনও বাঙ্গালোরে যান, তবে সেখানের দর্শনীয় স্থানগুলির সঙ্গে মন মাতানো ফুল গাছের নার্সারী গুলিও যেন দেখতে ভুলে যাবেন না, বিশেষ করে লালবাগ রোডের ওপর শ্রীএম আর মুনিস্বামীর বিশাল রামসান নার্সারীটি।

মুনিস্বামীর এই নার্সারীকে ভারতের সর্বাপেক্ষা পুরানো নার্সারী বললে মোটেই ভুল বলা হবে না। তাছাড়া নানা রকম দুর্লভ ফুলের সংগ্রহে ‘রামসন’ নার্সারীর খ্যাতি আজ চতুর্দিকে। ৫১ বছর বয়সের কর্মচঞ্চল মুনিস্বামীকে এই নার্সারীর মালিক না বলে পুষ্প প্রেমিক বললেই যেন বেশী খুশী হন তিনি।

আজ থেকে প্রায় ১২০ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৫০ সালে মুনিস্বামীর পিতামহ প্রথম শুরু করেন এই ফুলের ব্যবসা। তিনি অবশ্য সত্যিকার নার্সারীতে ফুলের চাষ না করে ফুল সমৃদ্ধ নার্সারী নিয়েই ব্যবসা করতেন বেশী, কিন্তু মুনিস্বামী এখন নিজেই ফুল চাষ করে নার্সারীর মালিক হয়েছেন। আর বংশ পরম্পরা সূত্রে মুনিস্বামীর বড় ছেলেও এই ফুল চাষ সম্পর্কে [illegible] আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

প্রায় এক যুগ আগে সারজাপুরা রোডের ওপর ১৬ একর জমির ওপর অঙ্কুরিত নার্সারী আজ বিশাল ‘রামসান’ নার্সারীতে পরিণত হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। শ্রী মুনিস্বামীর অনলস পরিশ্রম ও ফুল চাষের প্রতি অদম্য ভালোবাসার ফলে সারজাপুরের পাথুরে মাটিতেও পাতাবাহারের গাছগুলি আজ বড় হয়ে উঠেছে সুসজ্জিত, বর্ণ বহুল দুর্লভ ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্তে।

রামসান নার্সারীর রূপে রসে মুগ্ধ হয়ে অনেকের মনেই বিস্ময় জেগেছে যে, এত অল্প সময়ে এতবড় আর এত সুন্দর নার্সারী তৈরী হলো কেমন করে? কিন্তু মুনিস্বামীর ছোট্ট একটি উত্তর, “মাটিকে ভালোবাসলে, মাটি কাউকে কখনও নিরাশ করে না।” আর একথা সত্যি যে, রামসান নার্সারীকে উত্তরোত্তর সুন্দর ও সমৃদ্ধ শালী করে তুলতে শ্রী মুনিস্বামী যেমন পরিশ্রম করেছেন তেমনি তার উন্নতির জন্য ব্যয় করতেও কার্পণ্য করেন নি। এই বিশাল নার্সারীতে ফুল চাষের সুবিধার জন্য ৮টি টিউব ওয়েল স্থাপন করার ফলে সেখানে আজ আর জলাভাব নেই। তবে একথা ঠিক যে শ্রী মুনিস্বামী ফুলের জন্য [illegible] শুধু ব্যস্ত নয় নার্সারীর শ্রমিক ও চাষীদের সুখ সুবিধাগুলির প্রতিও তাঁর কড়া নজর।

রামসান নার্সারীতে দেশী বিদেশী কোন ফুলেরই আজ অভাব নেই। নানা রকম গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্য মুনিস্বামীর নার্সারী আজ নানা প্রকার পুরস্কারে ভূষিত হবার গৌরব লাভ করেছে। বিবাহ বাসরে সবত্রই রামসান নার্সারীর ফুলের চাহিদা সবাই চান মুনিস্বামীর বাগানের ফুলের এমন কি সুদূর লণ্ডনেও রামসান নার্সারী থেকে পাঠানো মালা প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। সবত্রই আজ এই নার্সারীটির জয় জয়কার।

সুতরাং ফুলের দেশ বাঙ্গালোরে, শ্রী মুনিস্বামীর ফুলের নার্সারী দেখবার মতই বটে।

সবুজ বিপ্লবের ঢেউ

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

জমির উৎপাদিকা শক্তি যে বহু গুণ বাড়ান যায় তা এই সংস্থাটির চাষ করা ধানক্ষেতটি দেখলেই বুঝা যায়। আমাদের এই পল্লীতেও যে সবুজ বিপ্লবের ঢেউ এসে পৌঁছেছে তা প্রত্যক্ষ করে আমাদের বুক গর্বে ভরে উঠে।

সবুজ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত ও দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে, আমাদের প্রাচীন প্রথার লাঙলের সাহায্যে চাষ করার রীতি একেবারেই পরিত্যাগ করতে হবে। সেই সঙ্গে উচ্চ ফলনশীল বীজ সুষ্ঠুভাবে বোনা করার পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং উপযুক্তভাবে সার প্রয়োগ করে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থাটি (I A R I) ১৯৬৯ সালের সমীক্ষায় দেখিয়েছেন দিল্লীর গ্রামাঞ্চলের ৩৮ ৪৬% কৃষক উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার করেন এবং শতকরা খুব কম কৃষকই ট্রাক্টরটানা বীজবোনা যন্ত্র ব্যবহার করেন। বর্তমানে এই কৃষি সংস্থাটি ‘একজোড়া বলদটানা নতুন একটি বীজবোনা যন্ত্র নিয়ে (যার মূল্য মাত্র ১০০ টাকা) দরিদ্র ও ছোট চাষীদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। এতে চাষীরা উন্নত প্রথার বীজবোনার কৌশল আয়ত্ব করতে পারবে এবং বহু ফসল ফলাবার সুযোগ সম্ভাবনা বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে—কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষি উৎপাদনের ক্রমবর্দ্ধমান হার বজায় রাখা সম্ভব হবে—সবুজ বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হবে।

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডিরেক্ট প্রিন্টার্স, করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধন ধান্যে

তৃতীয় বর্ষ ঃ ১৩
২৮শে নভেম্বর, ১৯৭১
২৫ পয়সা

আমাদের অভিযান মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক হয়েছে। আমাদের আর্থিক সম্পত্তির একটা বিরাট অংশ ব্যয় করে শুধু উদরপূর্তির জন্য খাদ্য আমদানি করা এবং প্রচুর ঘাটতির পাঁচ বছর আগেকার অবস্থা আর নেই। সেই অবস্থা থেকে আজ আমরা একটা বেশ সুখকর অবস্থায় পৌঁছেছি অর্থাৎ খাদ্যের ব্যাপারে আমরা স্বয়ং নির্ভর হয়েছি। অবিশ্যি এতে আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ নেই। বস্তুতঃ সমস্ত রাজ্যে যাতে ক্রমবর্ধমান হারে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে সেই চেষ্টাই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কি খাদ্যশস্য, কি পণ্য শস্য উৎপাদনের ব্যাপারে, বিভিন্ন রাজ্যের কার্যকলাপে বেশ তারতম্য দেখা যায়। সমস্ত রাজ্যে খাদ্য উৎপাদন কি করে বাড়ানো যায় এই প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব হবে অধিকতর সার প্রয়োগ, অধিক ফলনশীল শস্যের জন্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সেচ ব্যবস্থার প্রসার বিশেষ ক'রে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাগুলি। এই ব্যবস্থাগুলি বিশেষ করে এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ও কীট নাশক দ্রব্য প্রয়োগের ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে 'সবুজ বিপ্লব' আনা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের বৃহৎ সেচ প্রকল্পগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এইসব সেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে একটা ক্রমবর্ধমান ব্যয় প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এইগুলির রূপায়ণে ও পরিচালনার জন্য একটা বিরাট অঙ্ক অতিরিক্ত ব্যয় হয় এবং তাই ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু পরিকল্পনাগুলি যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রূপায়িত করা সম্ভব হয়, তা হ'লে এই ব্যয়ের একটা বিরাট অংশ বাঁচানো সম্ভব হবে। এই সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে—আছে এ থেকে পাওয়া সেচের সুবিধাগুলির উপযুক্ত ব্যবহার। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এই বিরাট অর্থব্যয়ে যে সেচ বিদ্যুতের সম্ভাবনাগুলি সৃষ্টি করা হয়—সেগুলি উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো হয় না, যার ফলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাই বিপর্যস্ত হয়। এখানে দু'রকমের সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। সেচ প্রকল্পগুলির অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলির উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন যার ফলে সেচের সম্ভাবনাগুলি পুরোপুরি কাজে লাগানো যায় এবং রূপায়ণ ব্যয় যথাসম্ভব পূর্ব নির্ধারিত ব্যয়ের সীমার মধ্যে রাখা যায়। সেই সঙ্গে এই যোজনায় শেষে যে সমস্ত বৃহৎ সেচ পরিকল্পনাগুলির কাজ শেষ হবার কথা—সেগুলির দ্বারা সেচের বর্ধিত সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগাবার জন্য পরিকল্পনার কিছু কাজ আগে ভাগেই করে রাখতে হবে।

যতদিন বাঙালী সৃষ্ট হইয়াছে ততদিন হইতেই এই বিশেষত্ব ভিতরে ভিতরে ফুটিয়াছে। এই বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া এই বিশেষত্বের মধ্যে যাহা সার্বজনীন তাহাকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহার দ্বারা ভারতের সাধারণ সাধনা ও জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি সাধন করাই বর্তমান যুগে বাংলার প্রধান কর্তব্য।

—বিপিনচন্দ্র পাল

পল্লী অঞ্চল বৈদ্যুতিকরণ সংস্থা

পাঁচ লক্ষ পাম্প-সেট বৈদ্যুতিকরণ পরিকল্পনা

১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকেই পর পর দু বছর এই সংস্থা লাভ দেখায়। ১৯৭০-৭১ সালের আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে এই সংস্থা ৫৩.০৩ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। শুধু তাই নয় ঐ সময় এর সব দিকেই যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

সব মিলিয়ে গত বছরে করপোরেশন ৯৬টি প্রকল্প মঞ্জুর করেছে যাতে খরচ পড়বে ৬৪.০৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১২'৮১ কোটি বরাদ্দ হয়েছে ৫টি আদর্শ প্রকল্পের জন্য। ১৯৭০-৭১ সালে এই সব কটি প্রকল্পেরই কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং বাকী ৫১'২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত ৯১ প্রকল্পের জন্য।

এই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হ'লে ৮৮২৫টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, কৃষিকার্যের জন্য ১,৫৭,৯৪২ গুলি পাম্প চালানো, ২৫.৬৭৩টি কৃষি-শিল্প সম্পর্কীয় সংযোগ ব্যবস্থা এবং ৩.৮৬.৪৫৮টি বাসগৃহ ও বাণিজ্যিক সংস্থার জন্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। করপোরেশন এই বছরে রাজ্য বিদ্যুৎ এবং গ্রাম বিদ্যুৎ সমবায় সমিতিগুলিকে মোট ২৬.০৯ কোটি টাকার প্রথম কিস্তি ঋণ মঞ্জুর করেছে।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎকে ঋণদানের স্বাভাবিক কাজকর্ম ছাড়াও করপোরেশন গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প উন্নয়নে ও তা কার্যকরী করতে সাহায্য করে। গ্রামীণ বিদ্যুৎ সমবায় সমিতিগুলির হিসাব রক্ষণের জন্য করপোরেশন একটি একীভূত বিশেষ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে এবং গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্মাণ সরঞ্জামগুলির ও পদ্ধতিগুলির মান নির্ধারণের কাজে অগ্রণী হয়েছে।

১৫টি বিভিন্ন রাজ্যের জন্য করপোরেশন ১৯৭০-৭১ সালে যে ৯১টি প্রকল্প মঞ্জুর করেছে, সেগুলির কাজ শেষ হলে মোট ১,৩০,৩৩৭টি খামার, ১৮,৪৪৫টি কলকারখানা, ৫,৬৭৫টি কৃষি সম্পর্কীয় শিল্প, ৩,৩৯,৬৪৩টি বাসগৃহ এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং ৭৪৬০৫টি রাস্তার আলোর জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারা যাবে। সব মিলিয়ে ৭,৮০,৫৩১ কিলো ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের লাইন স্থাপিত হবে। এই মোট বৈদ্যুতিক শক্তির শতকরা ৬৭ ভাগ পাম্প-সেট চালানোর জন্য, শতকরা ৫ ভাগ কৃষি সম্পর্কীয় শিল্পের জন্য, শতকরা ১৪ ভাগ কলকারখানার জন্য এবং বাকী শতকরা ১৪ ভাগ বাসগৃহ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাস্তা আলোকিত করার কাজে ব্যয় হবে। এর মধ্যে ৪০টি প্রকল্প, যেগুলির রূপায়ণে ২১'৬০ কোটি টাকার প্রয়োজন। এগুলি কার্যকরী হবে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, গুজরাট, হরিয়ানা, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অনুন্নত এলাকাগুলিতে।

করপোরেশনটি স্থাপিত হবার প্রথম ১৮ মাসের মধ্যেই সারা দেশের জন্যে মোট ১৩৭টি প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়। (এর মধ্যে ১৩৩টি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ এবং ৪টি বিদ্যুৎ সমবায় সমিতি. গুলির উদ্যোগে কার্যকরী হচ্ছে) এবং এগুলির রূপায়ণের জন্য মঞ্জুর হয়েছে ৮৮.৩৮ কোটি টাকা। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কৃষির উদ্দেশ্যে যে ৫ লক্ষ পাম্প সেট বৈদ্যুতিকরণের লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়েছিল, এইসব প্রকল্পের মাধ্যমে তার মধ্যে ২,১৪,৯১১টি পাম্প-সেট চালু হ'লে, করপোরেশন লক্ষ্যমাত্রার অর্দ্ধেকে পৌঁছে যাবে। এ পর্যন্ত যে ১৩৭টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কৃষি সম্পর্কীয় শিল্প সমেত ৩২,৪০৮টি গ্রামীণ শিল্প। এছাড়া আছে বহু বাসগৃহ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ১৬টি রাজ্যের ১০৮টি জেলা জুড়ে এই প্রকল্পগুলির কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ যে প্রকল্পগুলি অনুমোদন করেছে তার মধ্যে ৫৬টি অনুন্নত এলাকার জন্য এবং বাকী ৭৬টি অন্য এলাকার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৪১টি জেলায় ছোট এবং প্রান্তিক কৃষকদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে এবং খরা পীড়িত অঞ্চলগুলির জন্য গ্রামীণ পূর্তসূচী অনুযায়ী ২৪টি

জাতির গর্ব—দুলিয়াজান

ডি. এন. চক্রবর্ত্তী
(আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা)

আসামের পর্বতময় রুক্ষ মাটির নীচে যে অমূল্য সম্পদ লুকানো আছে, সেইটেই হ'ল আসামের সঙ্গে সারা বিশ্বের পরিচয়ের যোগসূত্র। ডিগবয়ের তৈলখনি এককালে এখানকার ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু আজকের জগতে তার সেই অতীত গৌরবের অস্তি সামান্যই অবশিষ্ট আছে। আজকের আসামে দুলিয়াজানের তৈলখনিই হয়ে উঠেছে সব ক্রিয়াকাণ্ডের নায়ক—ভারতবর্ষের তৈল জগতে এক উজ্জ্বল রূপ-রেখা। খনিজ তৈল, যা হল বিশ্বের যন্ত্র-নির্ভর শিল্পের প্রাণ—তার নিত্য নতুন আবিষ্কার আর এগিয়ে যাওয়ার রোমাঞ্চকর ইতিহাস আজ দুলিয়াজানেই তৈরী হচ্ছে।

১৯৫২ সাল অবধি খুব অল্প কয়েকজন লোকই, উত্তর আসামে দুলিয়াজানের কাছা-কাছির লোকেরাও এর বিশেষ একটা খবর রাখত না। আসামের অন্য অন্য অনেক জায়গার মত দুলিয়াজানও ছিল বন্য জীব-জন্তুতে ভরা, ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট মনুষ্য বস-বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত একটা জায়গা। ১৯৫২ সালের ২৬শে মে এখানকার প্রথম তৈলখনি খোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুলিয়াজানের এই ভৌগোলিক নির্জনতা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তিন বছর পরে এখান থেকে ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে মোরাণে তৈলখনি খোঁড়া হল। আরও আরও তেলের সন্ধানে তখন থেকেই শুরু হল মানুষ আর যন্ত্রে মিলে এখানকার মহা কর্মব্যস্ততার কাহিনী।

১৯৫৯ সালে ভারত ও বৃটিশ বীপপুঞ্জের যুগ্ম প্রচেষ্টায় গঠিত অয়েল ইণ্ডিয়া

নাহারকাটিয়ার তৈলকূপ

লিমিটেড। ভারতের বৃহত্তম তৈলখনি উদ্যোগ হিসাবে এটি দুলিয়াজানকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন করে তুলল। শুরুতে এটা ছিল, ভারত সরকারের এক তৃতীয়াংশ ও বৃটিশ অয়েল কর্পোরেশনের দুই তৃতীয়াংশ মালিকানায় গঠিত একটা প্রাইভেট কোম্পানী। উদ্দেশ্য ছিল, নাহরকাটিয়া এবং মোরাণের তৈলখনি থেকে অপরিশোধিত তেল তুলে বিহারে ও আসামে অবস্থিত সরকারী পরিশোধনা-গারগুলিতে চালান দেওয়া।

বৃটিশ অয়েল কর্পোরেশনের সঙ্গে ভারত সরকারের এক চুক্তি বলে "দি অয়েল ইণ্ডিয়া কোম্পানি" ক্রমে একটা পুরোপুরি সরকারী উদ্যোগ হয়ে উঠল।

বছরের পর বছর অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেড এমন সব বিরাট বিরাট সাফল্য অর্জন করতে লাগল—যার এদেশে কোন তুলনা মেলে না। শুরু থেকে অয়েল ইণ্ডিয়া এ পর্যন্ত মোট দশ লক্ষ মিটার মাটি খুঁড়ে তিনশোটি তেল-কূপ সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে দুশো ঊনত্রিশটি কূপেই দেখা গেছে খনিজ তেলের প্রাচুর্য। বাকী শতকরা ৯ ভাগ কূপে অবশ্য কিছু পাওয়া যায়নি। লক্ষ্য করার বিষয় হল, ১৮৮৯ সালে ডিগবয়ে প্রথম তৈলখনি খোঁড়ার সময় খোঁড়া শুরু থেকে ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে তেল তুলে আনতে সময় লেগেছিল ১৫ মাস। কিন্তু দুলিয়াজানের তৈলকূপের গভীরতা ডিগবয়ের দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও এই কাজে সময় লেগেছে মাত্র ৪৬৯ দিন। আগের মত কূপ-খনন আর এখন বহুদিনের কাজ নয়। দীর্ঘদিনের গবেষণা আর প্রচুর পরিমাণ কলকব্জার সুবিধা এই সময়ের দৈর্ঘ্যকে কমিয়ে দিয়েছে। 'অয়েল ইণ্ডিয়া' নাহরকাটিয়ায় ২,১৯৩ ফুট গভীর ১৮নং কূপটিকে মাত্র ৮ ঘণ্টায় খুঁড়ে পৃথিবীর তৈলকূপ খননের ইতিহাসে একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু এই সাফল্য অনায়াসে অর্জিত হয়নি। এর প্রত্যেকটা সাফল্যের পেছনে আছে সব রকমের প্রাকৃতিক ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবজনিত অসুবিধাগুলোকে দূর করবার দুর্জয় সঙ্কল্প এবং ও কাজে

স্থানান্তরিত করার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম। কূপ খোঁড়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতিগুলোর ওজন ২০০ টনের ওপর। এই ২০০ টন ওজনের যন্ত্রপাতি কূপ খোঁড়ার জন্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতে গোড়ার যুগে তিন চার মাস সময় লাগত। সময়ের এই দৈর্ঘ্যকে কমিয়ে দেওয়ার জন্য অয়েল ইণ্ডিয়াকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল এবং তার সাফল্যজনক পরিণতি হিসাবে আজ ডিজেল চালিত যন্ত্রপাতি ও বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতিগুলি এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় নিয়ে যেতে যথাক্রমে মাত্র ১২ দিন ও ৫ দিন সময় লাগে। যেখানে কূপ নং ৪৩ থেকে কূপ নং ৪৪এ যাবতীয় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে যেতে সময় লেগেছে মাত্র ৩৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। এটাও একটা রেকর্ড। অয়েল ইণ্ডিয়ার সাফল্যের তালিকায় আর একটা উল্লেখযোগ্য জিনিষ হল আধুনিক দ্বৈত খনন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় একই সঙ্গে দুটি কূপ থেকে তৈল নিষ্কাশন করা হয়। অয়েল ইণ্ডিয়া এ পর্যন্ত প্রায় ৩০টা এই ধরণের দ্বৈত-কূপ খুঁড়েছে।

নাহর কাটিয়া অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দিহিং নদী। এই নদী গর্ভের মাটির অনেক নীচে থেকে তেল তুলে আনা হ'ল আর একটা অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব সাফল্য। যে প্রক্রিয়ায় নদী গর্ভের মাটির নীচে থেকে তেল নিষ্কাশন করা যায়, তার নাম তির্যক খনন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় তেলের সম্ভাব্য অবস্থিতির জায়গার দিকে লক্ষ্য করে ঢালু পথে কূপ খোঁড়া হয়। ১৯৬৩ সালে খোঁড়া নাহরকাটিয়ার ১২২নং কূপটাই হ'ল ভারতের প্রথম তির্যক তৈল-কূপ, ১০,২৩৬ ফুট গভীর। নাহরকাটিয়া অঞ্চলে এখন এই রকম ২৭টা তির্যক-কূপ রয়েছে।

অয়েল ইণ্ডিয়ার বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ৩০ লক্ষ টন অপরিশোধিত তেল—যার অধিকাংশটাই পূর্ব-এশিয়ার বৃহত্তম পাইপ-লাইন দিয়ে গৌহাটী ও বারাউনির সরকারী তৈল শোধনাগারে চালান দেওয়া হয়। দুর্গম বনভূমি, সুগভীর, জলজঙ্গল, গিরিবর্তের মধ্যে দিয়ে

তৈলখনি খননের কাজ এগিয়ে চলেছে

অপরিশোধিত তেলকে 'কনডিশনিং' করার জন্য স্থাপিত সরঞ্জামের কেন্দ্রটি
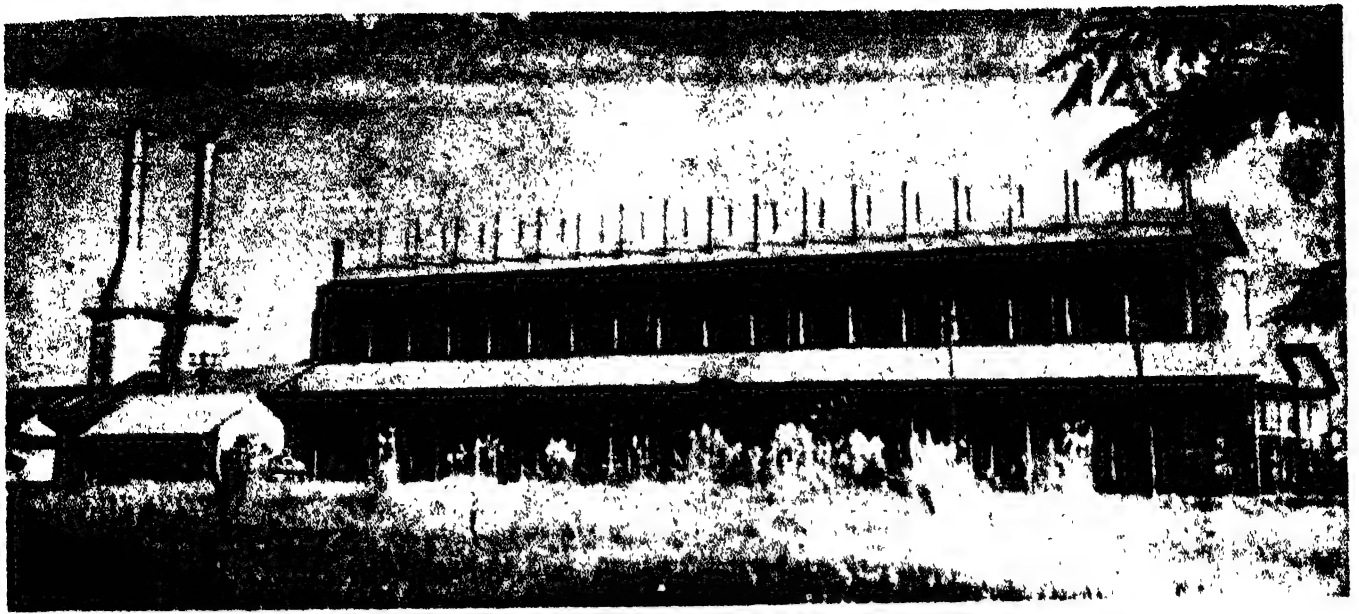
পাহাড় ডিঙিয়ে নদী পেরিয়ে চলেছে এই পাইপ-লাইন। এটা যে প্রযুক্তি বিদ্যার উৎকর্ষের একটা অপূর্ব নিদর্শন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে গেছে এই পাইপ-লাইন তাই এর মধ্যে দিয়ে তেলের চালান দেওয়া খুব সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। অপরিশোধিত তেল রাস্তায় যাতে কঠিন পদার্থে পরিণত না হতে পারে, তার জন্য দুটি তেল পরিবাহিকা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এর আগে এ ধরণের কোন কেন্দ্র পৃথিবীর আর কোথাও বসানো হয় নি। ১.৬৫

তেল-খনি থেকে পাওয়া অপরিশোধিত তেল পাইপ লাইনের মধ্যে দিয়ে পরিশোধনাগারে পাঠাবার আগে এই ট্যাঙ্কগুলিতে জমা করা হয়

১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

ভেবে দেখুন

সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায়

উৎপাদন ও উন্নয়ন

বিশ্বনাথ ঘোষ

গত অক্টোবর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লোকাল প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিলের সর্ব-ভারতীয় সম্মেলনে প্রেরিত এক বাণীতে আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন, মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসের পেছনে রয়েছে প্রযোকতি সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বাধিক ব্যবহার। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশ এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মোকাবিলা করতে আমাদের সকল প্রকার বিনিয়োগ থেকে প্রতিদান বৃদ্ধি করতে হবে—সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে হবে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশেই সামাজিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হল অধিকতর উৎপাদন। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত করার উপায় হল যথাসম্ভব উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করা।

উৎপাদনশীলতার মধ্যে সমাজের সকল শ্রেণী ও স্বার্থের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। জাতীর কাছে উৎপাদনশীলতার অর্থ হল বর্দ্ধিত জাতীয় আয় এবং উচ্চতর জীবন যাত্রার মান। একজন মার্কিন শ্রমিক একজন বৃটিশ শ্রমিকের তুলনায় তিনগুণ অধিক আয় করে তার কারণ তার উৎপাদনশীলতা বেশী। শিল্পের নিকট উৎপাদনশীলতার অর্থ হল উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, বাজার সম্প্রসারণ এবং অধিকতর মুনাফা। শ্রমিকের কাছে উৎপাদনশীলতা বলতে বোঝায় বর্দ্ধিত মজুরী এবং উন্নত কাজের পরিবেশ। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনশীলতা ব্যতীত শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানে প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। পরিশেষে, ব্যবহারকারীর কাছে উৎপাদনশীলতার অর্থ হল দাম হ্রাস, উচ্চতর জীবন যাত্রার মান এবং অধিকতর কল্যাণ।

১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিল ভারতে উৎপাদনশীলতার আন্দোলন সুরু করে। এই কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ৬০ এবং এটা শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। বিগত ১৪ বছরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জাতীয় প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিলের অবদান গর্ব করার মতো না হলেও কম নয়। ভারতের মত. বিশাল দেশে কোন একটি সংস্থার পক্ষে দেশের বিভিন্ন অংশের উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আঞ্চলিক ভিত্তিতে উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য লোকাল প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। জাতীয় প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিলের মত এগুলিও শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। বর্তমানে দেশে ৬টি আঞ্চলিক প্রোডাকটিভিটি ডাইরেকটরেট ও ৪৭টি লোকাল প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিল কাজ

কোন দেশের অর্থনীতির চেহারা ও চরিত্র কি হবে, সেটা নির্ভর করে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার উপর। দেশের অর্থনীতির চেহারা তিন রকম হতে পারে—প্রগতিশীল, গতিহীন এবং অধোগতিশীল। ভোগের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হলে অর্থনীতি হবে প্রগতিশীল, ভোগ ও উৎপাদন সমান হলে অর্থনীতি হবে গতিহীন আর ভোগের তুলনায় উৎপাদন কম হলে অর্থনীতিকে অধোগতিশীল বলা হবে।

মিশ্র অর্থনীতি, নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি অথবা অবাধ—উদ্যোগ অর্থ ব্যবস্থা, যে কোন ধরণেরই অর্থনীতির ভিত্তি, স্থিতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে উৎপাদন উপর। যে দেশে সম্পদের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে তার আত্মহত্যা অনিবার্য আর যে দেশে ভোগের তুলনায় উৎপাদন কম সে দেশ দ্রুত গতিতে অবধারিত মৃত্যুর পথে চলেছে।

অর্থনীতির ক্রমবর্দ্ধমান হার বজায় রাখতে হলে ভোগের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। উন্নত জীবনযাত্রার মান তথা অধিকতর ভোগ যদি আমাদের কাম্য হয় তাহলে উৎপাদনের হার অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে।

যে কোন মূল্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করা কঠিন নয়। মূল সমস্যা হল কম খরচে উৎপাদন বাড়ানো। অন্য ভাবে বলা যায় যে উৎপাদন বৃদ্ধি স্বয়ং, উন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন হল উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত ইউনিট প্রতি

উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা সহজেই বোঝান যায়। ধরা যাক কোন দেশ ১০০০ টাকা খরচ করে ১০০ ইউনিট সম্পদ উৎপাদন করে। আরও ধরা যাক, দেশটি ব্যাপকভাবে চেষ্টা করলে উৎপাদন দ্বিগুণ করতে পারে। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইউনিট প্রতি খরচ বাড়তে পারে, সমান থাকতে পারে অথবা কম হতে পারে। উৎপাদন দ্বিগুণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি খরচ বেড়ে ২০০০ টাকার বেশী হয় তাহলে সেটা অর্থনৈতিক দিক থেকে অকাম্য এবং সাধারণ অবস্থায় সমাজ এই ধরণের কাজ অনুমোদন করবে না। সে উদ্যোগ পরিত্যাক্ত হবে। যদি খরচ ২০০০ টাকা হয় তাহলে সমাজের কোন নীট লাভ হবে না। যদি খরচ বেড়ে ১৮০০ টাকা হয় তাহলে সমাজ ২০০ টাকা নীট লাভ পাবে। ২০০ টাকা মূল্যের সম্পদের যে সাশ্রয় হল সেটা এখন নতুন সম্পদ সৃষ্টির কাজে লাগবে। এটাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হবে এবং মূলধন গঠনের জন্য সম্পদ যোগাবে।

গতিশীল হারে মূলধন গঠনের জন্য জাতীয় ও ইউনিট উভয় পর্যায়েই উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে।

জাতীয় প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিলের মতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য তিন দিক থেকে প্রয়াস চালাতে হবে। প্রথমতঃ দেশে উৎপাদনশীলতার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ব্যবস্থাপনা (management) ও উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত উন্নতশিল্পকৌশলে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়তঃ প্রেরণামূলক প্রকল্প (incentive schemes) চালু করে বা অন্য কোন ভাবে শ্রমিকদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা লাভ করতে হবে।

উৎপাদনশীলতা জন্য বৃদ্ধির সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য প্রধানতঃ প্রচারের প্রয়োজন। পত্রপত্রিকা, সেমিনার ও অন্যান্য জনসংযোগকারী মাধ্যমের সাহায্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিবহাল করতে হবে। উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে প্রচার, এবং পরামর্শদান জাতীয় প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিলের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানকালে শিল্প ও কারবার পরিচালনা যুগপৎ একটি শিল্প ও বিজ্ঞান। সেদিন চলে গেছে যখন কোন ব্যক্তি নিজের সীমাবদ্ধ ও সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে কারবার পরিচালনা করত। বর্তমানের জটিল কারবার পরিচালনা একটি বিশেষ ধরণের শিল্প ও বিজ্ঞানের রূপ নিয়েছে, অপর সকল বিজ্ঞানের মত যার পঠন পাঠন হয়। উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের ম্যানেজার, সুপারভাইজার এবং শ্রমিকদের জন্য জাতীয় প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিল প্রশিক্ষণ, বিশেষ পাঠক্রম ও সেমিনারের ব্যবস্থা করেছে।

পরিশেষে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শ্রমিকদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা, শ্রমিক তার সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করবে এটাই আদর্শ অবস্থা। ডঃ আরজিরয়েলের (Dr. Argyroil) মতে গড়ে শ্রমিক তার মোট কর্মক্ষমতার এক তৃতীয়াংশ কাজে লাগায়, সুতরাং দেখা যাচ্ছে যদি শ্রমিকদের ঠিকভাবে অনুপ্রাণিত করা যায় তাহলে তার বাকী দুই তৃতীয়াংশ কর্মক্ষমতাও ব্যবহার করা যাবে। শিল্পের সাফল্যের জন্য মূলধন, জমি এবং সংগঠন প্রয়োজন কিন্তু সর্বশেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে শিল্পের সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে শ্রমিকদের উপর। শিল্পে শান্তি অক্ষুন্ন রাখতে হবে অন্যথায় উৎপাদন বৃদ্ধির সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। সুদক্ষ, প্রগতিবাদী এবং আলোকপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপকের লক্ষ্য হবে সঠিক শ্রমনীতি অনুসরণ করে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট রাখা এবং তাদের কর্মস্পৃহা সর্বাধিক করার উপযোগী প্রেরণামূলক প্রকল্প (incentive schemes) গ্রহণ করা। শ্রমিকদের মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টি করতে হবে যে শিল্পের মুনাফা অধিক হলে তাদেরও অবস্থার উন্নতি হবে এবং তারাও বর্ধিত উৎপাদনের সুফল ভোগ করবে।

কৃষি উৎপাদনসূচক (ভিত্তি বৎসর ১৯৫০) থেকে দেখা যায় যে বিগত ২০ বছরে মোট উৎপাদন ৬০ শতাংশ বেড়েছে কিন্তু ওই সময়ে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে মাত্র ২৬ শতাংশ। শিল্পের ক্ষেত্রে অবস্থা কৃষির তুলনায় ভালো। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল এই ২০ বছরে শিল্পোৎপাদন বেড়েছে ১০০ শতাংশ আর উৎপাদনশীলতা বেড়েছে ৪০ শতাংশ।

জাতি হিসাবে আমাদের প্রগতির পূর্ব সর্ত হল ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন হার। কৃষি ও শিল্পের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়।

পরিকল্পনা কমিশনের অফিসে বসান ইলেকট্রনিক কমপিউটার যন্ত্রটির প্রধান প্রসেসিং ইউনিটে একজন কর্মী কাজ করে চলেছেন

পরিকল্পনা রচনায় কম্পিউটার

যতই দিন যাচ্ছে, কম্পিউটার ততই আমাদের সেবায় এগিয়ে আসছে। হরেক রকমের কাজ পাওয়া যায় এই জটিল ধরণের যন্ত্রটির থেকে। ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে যে, এত সব জটিল কর্মকৌশল ভিত্তি করে আছে কেবলমাত্র সাধারণ যোগের নিয়মের ওপর। বিরাট বিরাট হিসাব একেবারে নির্ভুলভাবে অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত গতিতে এবং অত্যন্ত অল্প সময়ে করে ফেলে এই যন্ত্রটি। এর আবিষ্কারের পর থেকে ক্রমশ রূপ পালটাতে পালটাতে যন্ত্রটা আজ আধুনিক থেকে অতি-আধুনিকতর হ'তে চলেছে। এর নির্ভুলতা সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে এর স্রষ্টা বা আবিষ্কারকের চেয়েও এর ভুল করার সম্ভাবনা কম। এমন কম্পিউটারও আছে, যা কথা বলতে পারে এবং মহাশূন্যে মহাকাশচারীকে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই ধরণের নানান আশ্চর্যজনক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে একদিন হয়ত সম্ভব হবে যে, মানুষ নিজেই নিজের তৈরী যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারবে।

সে যাই হোক, মানুষের সমাজে আজ কম্পিউটারের নতুন নতুন কাজ করবার ক্ষমতা এই দুই এ মিলে দৈনন্দিন কাজ সম্বন্ধে মানুষের বর্তমান ধারণাকে যে এক সময় বদলে দেবে তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। আজ কি আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঘোষণায়, কি রোগ নির্ণয়ে, কি জনসংখ্যা ও খাদ্য শস্যের বৃদ্ধি হিসাব করার ব্যাপারে সব জায়গাতেই হাজির রয়েছে কম্পিউটার। নানান ধরণের অর্থনৈতিক তালিকা তৈরী করা যা পরিকল্পনা করার ব্যাপারে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এর গুরুত্ব প্রায় অপরিসীম।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এখন সব মিলিয়ে ১৩০টি বিভিন্ন ধরণের কম্পিউটার আছে। এর মধ্যে বোম্বাইয়েই সব চেয়ে বেশী, ৩৮টি আর তারপর কলকাতা দিল্লী, বাঙ্গালোর ও মাদ্রাজে যথাক্রমে—১৮, ১৭ ১০ ও ৭টি। বাকী গুলো দেশের অন্য সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনায়, উন্নয়নে এবং গবেষণার ক্ষেত্রে কম্পিউটার সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়াবার জন্যে পরিকল্পনা কমিশন রাজধানীতে একটা কম্পিউটার কেন্দ্র খুলেছেন।

এই কেন্দ্রটিতে আছে একটি মাঝারী ধরণের ইলেকট্রনিক কম্পিউটার (আই. বি এম ১৬২০ মডেল নং-২), তালিকা তৈরী করার জন্য ২টি ট্যাবুলেটর, ২টি সর্টার এবং তথ্যগুলি তুলনা করে দেখবার একটা যন্ত্র। তাছাড়া ১৩টি স্বয়ংক্রিয় কী পাঞ্চ ও তথ্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষার জন্য আছে ৭টি ভেরিফায়ার। কাজ সম্পূর্ণ করতে যাতে বিলম্ব না হয়, সেই লক্ষ্য নিয়ে কর্মসূচী মূল্যায়ন সংস্থার অধীনে এই ইউনিটটি স্বাধীনভাবে কাজ করে। এর পরিচালনার জন্য একটা আলাদা বাজেট আছে। এই কেন্দ্রটির কাজ হ'ল নানান ধরণের তথ্যপূর্ণ তালিকা তৈরী করা এবং তথ্যগুলিকে যথাযথভাবে শ্রেণীভুক্ত করা। এই দুটো কাজ ছাড়াও আছে নানা ধরণের তথ্য যাচাই করার কাজ। এই সব কাজের

মাধ্যমে, এই কেন্দ্রটি পরিকল্পনা রচনা, বিশ্লেষণ, কর্মসূচীর রচনা ও তার রূপায়ন ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব বহন করে। কেন্দ্রটিকে এ পর্য্যন্ত যে সব নানান রকমের খাদ্যে যোগাতে হয়েছে তাতে, এই কম্পিউটারের তৈরী বিভিন্ন ধরণের তালিকাগুলো খুব কাজে দিয়েছে যেমন, গণনা ও পরীক্ষার জন্য নানা তালিকা তৈরী ও তার বিশ্লেষণ, অর্থনৈতিক তথ্য বিশ্লেষণ, বন্টনের পরিকল্পনা করা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নানা রকমের হিসাব-পত্র করা।

মনিটার ব্যবস্থা সমেত কর্মসূচী-পাঠাগার ছাড়াও এই কেন্দ্রে, ফরট্রান-২ এবং এস পি. এস-২ নামে দুটি তথ্য ভাষার মাধ্যমে বিবিধ তথ্য গ্রহণ ও প্রকাশনের জন্য তিনটি বিভাগ আছে। ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটরের জন্য আছে ৪০,০০০ বিভিন্ন ধরণের চৌম্বকীয় পরিভাষা, দশমিক মানে প্রকাশক্ষম কিছু পরিভাষা সূচক (বি. সি ডি), পরিবর্তনশীল দৈর্ঘ্যের তথ্য, যোগান ও উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক তথ্য সম্মিলিত কিছু কার্ড এবং দ্রুত গতিতে পরিশিষ্টাংশ মুদ্রনের জন্য একটা মুদ্রন যন্ত্র। চালু করার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটির চুম্বক পাতগুলিতে (৩টি) তথ্যগুলি রেকর্ড হতে থাকে। এই রকম প্রত্যেকটা ধাতু পাতে ৮০টি লম্বা সারি বিশিষ্ট ২৫,০০০ কার্ডের তথ্য অর্থাৎ প্রায় ২০ লক্ষ তথ্যাংশ জমা করা যায়। প্রতি সেকেণ্ডে একটি ধাতু পাত থেকে অপর ধাতু পাতে ৭৭,০০০ তথ্যাংশের স্থান পরিবর্তন করানো যায়।

ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটরের সঙ্গে যে ছক তৈরীর যন্ত্রটা কাজ করে তাতে তথ্যগুলির বাছাই এবং যথাযথভাবে সংযোজনের কাজ হয়। এই ছক তৈরীর যন্ত্রটার একটা অংশ, বাছাইয়ের আগেই কার্ডগুলিকে শ্রেণী হিসাবে গণনার কাজ করে। তথ্যগুলিকে তুলনা করার যে যন্ত্রটা আছে, তাতে শূন্যস্থান পূরণ, তথ্যগুলি পরীক্ষা এবং সুবিধাজনক অথচ উপযুক্ত উপায়ে কর্মপ্রণালী বিশ্লেষণের কাজ করা হয়। এগুলির সঙ্গে পূর্বনির্বাচন যন্ত্র তার যা সাধারণ কাজ অর্থাৎ কার্ডগুলো থেকে তথ্য নিয়ে ঠিকমত সাজিয়ে দেবার এবং ছক থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্য-তালিকা তৈরীর কাজ নির্ভুলভাবে করে চলে।

ছক তৈরী ও কম্পিউটর বিভাগে যোগান দেওয়ার জন্য তালিকা তৈরী ও পরীক্ষার কাজ হয় 'মুদ্রণ ও পরীক্ষা' বিভাগে।

কেন্দ্রটি প্রধানত পরিকল্পনা কমিশনের জন্য তৈরী হলেও জাতীয় ফলিত অর্থনীতি গবেষণা পরিষদ, জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ, কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ আয়োগ, ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ও সরকারের অধীন বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার মত বিশেষ ধরণের অনেক প্রতিষ্ঠানেরই এই কেন্দ্রটি কাজ করে দেয়। এই সব প্রতিষ্ঠানের কোনটি বা কর্মসূচী রচনার মালমশলা এই কেন্দ্রকে যোগান দেয় আবার অনেক ক্ষেত্রে, কেন্দ্র নিজেই এ সব যোগাড় করে। "শূন্য লাভক্ষতি" ভিত্তিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেওয়া হয়।

এই কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্যতম হল পি. ই. ও অর্থাৎ কর্মসূচী মূল্যায়ন সংস্থা, যার কাজ বিভিন্ন পরিকল্পনার কার্যসূচীর মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর সরেজমিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালানো।

ভেরিফায়ার যন্ত্রে পাঞ্চ করা কার্ডগুলি পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনমত সংশোধনও করা হচ্ছে

সারা দেশ জুড়ে পি. ই. ও. এর যে ব্যাপক কর্মোদ্যোগ চলেছে তা প্রধানতঃ দু' রকমের—প্রথমতঃ চলতি অবস্থায় বিভিন্ন প্রকল্পের মূল্যায়ন করা আর দ্বিতীয়তঃ একটু বেশী সময় ধরে ব্যাপকভাবে গভীর অনুশীলন কার্য্য চালানো। প্রাপ্ত তথ্যাদি সময়মত পাওয়া গেলে এবং উপযুক্ত বিবেচিত হলেই মূল্যায়নের কাজ ঠিকভাবে চলতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন ধানের প্রশ্নাবলীর ওপর ভিত্তি করে চালিত পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি থেকে এবং অফিসের নথিপত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে যে সব তথ্য তৈরী হয় সেগুলির পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষ বিচার করাও এই কেন্দ্রের একটা কাজ।

কর্মসূচীর মূল্যায়নে কম্পিউটার প্রচুর সাহায্য করেছে :—

কম্পিউটার বসানোর আগে এই সব নথিপত্র তৈরী করায় পি. ই. ও এর প্রায়ই অনেক সময় লেগে যেত। তথ্য সঙ্কলনের জন্যে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রটির ব্যবহারের ফলে ১৯৬৪ সাল অবধি জমে যাওয়া প্রচুর কাজ শেষ করেও এই যন্ত্রটি খুবই অল্প সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকগুলো অনুশীলনের কাজ সমাধা করেছে এবং ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাপকতর ও গভীরতর ভাবে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেছে।

শুধু তাই নয়, এই কম্পিউটার যন্ত্রটা অনুসন্ধানের চিরাচরিত ধারায় একটা নতুনত্ব এনেছে এবং যান্ত্রিক উপায়ে তালিকা তৈরীর জন্য বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের বন্দোবস্তও করেছে।

এই কেন্দ্রে কাজের পরিমাণ এতই বেড়ে গেছে যে ১৯৬৮ সালের আগষ্ট মাস থেকে দু' সিফটের (মোট ১৩ ঘন্টা) কাজ চালাতে হচ্ছে। ১৯৭০-৭১ সালে ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার যন্ত্রটা দৈনিক ১৪ ঘন্টা করে মোট ৪,০০০ ঘন্টা কাজ করেছে।

১৯৬৪ সাল পর্যন্ত জমে যাওয়া কতকগুলো সমীক্ষার কাজ সেগুলো কম্পিউটার বসানোর ঠিক পরেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তার মধ্যে আছে—১৯৬২-৬৩ সালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাসায়নিক সারের ভূমিকা। এই সর্বভারতীয় সমীক্ষাটা, জমিতে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ, বন্টন এবং রাসায়নিক সারের প্রয়োগ সম্বন্ধে কৃষকদের ধারণা—এই বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনার ওপর ভিত্তি করে তৈরী। সেই রকমভাবে "১৯৬২-৬৩ সালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে শস্যচাষ রক্ষণ কর্মসূচী প্রসারের ফল"—নামে একটা সর্বভারতীয় সমীক্ষা করার জন্য প্রায় ৮০,০০০ তথ্য সম্বলিত কার্ড তৈরী ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

আর একটা ব্যাপক অনুসন্ধানের কাজ হল "১৯৬৩-৬৪ সালে সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের সমীক্ষা।" এই কাজে ৫৬টি বাছাই করা সমাজ উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত ২৮৬টি গ্রামের ১২,০০০টি বাড়ীতে অনুসন্ধান কার্য্য চালাতে হয়েছিল এবং মোট ১৪টি আলাদা আলাদা কর্মসূচী তৈরী করতে হয়েছিল। এই ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা ১০,০০০ কার্ডে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

১৯৬৮ সাল থেকে পি ই ও আরও যেসব গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষার কাজ চালায়—সে জন্যেও বিরাট বিরাট কর্মকান্ডের আয়োজন করতে হয়েছে যেমন (১) ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য অধিক ফলনশীল শস্য কর্মসূচী (২) ১৯৬৮-৬৯ সালে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী (৩) ১৯৬৯-৭০ সালে কৃষকদের অধিক ফলনশীল কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য অর্থের যোগান (৪) পি. ই ও এবং অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মিলিতভাবে অধিক ফলনশীল শস্য কর্মসূচীর গভীরতর বিশ্লেষণ (৫) ১৯৭০-৭১ সালে ভূগর্ভের জল কাজে লাগাবার ও নলকূপের সাহায্যে সেচ এবং (৬) ১৯৭০-৭১ সালে ব্যাপকভাবে গবাদি পশু পালন।

জাতির গর্ব—দুলিজান

৭ পৃষ্ঠার পর

কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দুলিয়াজানের প্রথম পরিবাহিকা-কেন্দ্রটি যা ১৯৬২ সালে প্রথম চালু হয়, এখন প্রতিদিন ৮,৩৬৪ কিলোলিটার তেল পাইপ-লাইনের মধ্যে দিয়ে পাঠাতে পারে। ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত দ্বিতীয় কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় মোরানে—এখন এটি প্রতিদিন ১,৮৯০ কিলো লিটার তেল পরিবহণ করে চলেছে।

১৯৬১ সালে অয়েল ইণ্ডিয়ার প্রথম গ্যাস টারবাইন পাওয়ার ষ্টেশনটি চালু করা হয় দুলিয়াজানে। অয়েল ইণ্ডিয়ার দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ৯০ কোটি ঘন মিটার।

তৈল-খনি উন্নয়নের কাজকর্মে যাতে একটা বেশ উঁচু মান বজায় থাকে, তার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার, সঞ্চয় করে রাখার ব্যবস্থা, অপরিশোধিত তেল শোধনের বিকল্প ব্যবস্থা এবং বন্ধ হ'য়ে যাওয়া টিউবকে পরিষ্কার করার আধুনিক প্রক্রিয়া প্রভৃতি পেট্রোল-কৌশল বিদ্যার সব রকমের আধুনিক যন্ত্রপাতি অয়েল ইণ্ডিয়া কাজে লাগায়।

আসামের সর্বাপেক্ষা সুপরিকল্পিত শহর হিসাবে দুলিয়াজান খ্যাতি লাভ করেছে। তাছাড়া দেশের সাধারণ লোকদের শিল্প সম্বন্ধে ধারণা করবার গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা, শ্রমিকদের জন্য লোভনীয় বোনাস, চিকিৎসার সুবিধা, অবসরকালীন ভাতা ইত্যাদির সুবিধা আছে, দুলিয়াজান তার অন্যতম।

কৃষি আয়কর—সুযোগ ও সম্ভাব্যতা

প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে সকল ক্ষেত্র থেকে উৎপাদন বা জাতীয় আয় উদ্ভূত হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে সরকার কর্ত্তৃক কর ধার্য্য করা হয়ে থাকে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও পেশা প্রভৃতি অংশে এই সূত্র অনুযায়ী কর-নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। উন্নত দেশগুলি নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ বৈষয়িক ব্যবস্থায় একটা সুষ্ঠু অথচ উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উন্নতশীল দেশগুলি তাদের আর্থব্যবস্থায় অনুরূপভাবে একটা সমতাপূর্ণ অথচ প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে প্রয়াসী। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি আয়কর সম্পর্কে কতকগুলি দিক আলোচনা করা যেতে পারে।

বিগত বাজেটে ৩৯৭ কোটি টাকার মত সাকুল্যে যে ঘাটতি হয়েছিল তা হ্রাস করার জন্য ১৭৭ কোটি টাকার মত বাড়তি কর ধার্য্য করা হয়। কিন্তু তাতেও ২২০ কোটি টাকার মত ঘাট্‌তি থেকে যায়। পরবর্ত্তীকালে পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধি পায় ও বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ব্যয়ের মাত্রা হিসাবের বাইরে চলে যাওয়ার সমগ্র ব্যবস্থাটি পুনরায় পর্যালোচনার আবশ্যকতা দেখা দেয়। আরও এই কারণে যে পাকিস্তানের বর্বরোচিত অত্যাচারের পীড়নে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী ভারতে চলে আসতে থাকে। বর্ত্তমানে এই ৯৫ লক্ষ শরণার্থীর জন্য জাতীয় অর্থনীতির উপর যে চাপ পড়েছে তা ভারতকে একাই বইতে হচ্ছে। কাজেই ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতির বোঝা কিছুটা কমাবার জন্য সাম্প্রতিক অতিরিক্ত করপ্রস্তাবে ৭০ কোটি টাকা কর ধার্য্য করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে কীভাবে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়। আলোচ্য পরিসরে কৃষি আয়করের সম্ভাব্যতা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে।

শ্রীঅমর নাথ দত্ত

কৃষি আয়কর প্রসঙ্গটি বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রধান দুটি অংশ—কৃষি ও শিল্পের স্বতন্ত্র অবদান বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে অনুন্নত দেশে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জাতীয় আয়-বৃদ্ধিতে কৃষিই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। 'মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ থেকে ৫১ ভাগ কৃষি থেকে আসে। 'বিগত কয়েক বছর ধরেই আমাদের অর্থ ব্যবস্থায় পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ শতাংশ হারে সমানভাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটছে এবং বলাই বাহুল্য যে তা মূলতঃ কৃষির অগ্রগতির জন্যই সম্ভব হচ্ছে। এহেন অবস্থায় অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টির ভূমিকায় কৃষিই যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করবে তাতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন হালফিল যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তাতে দেখা যায় যে ১৯৭০-৭১ সালে ভূমি রাজস্ব ও কৃষি আয়করের যুক্তভাবে সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ তা কৃষির নীট উৎপাদনের ১ শতাংশেরও কম। অথচ ঐ সময়ে অ-কৃষিগত আয়ের উপর (শিল্প, পেশা ও অন্যান্য) ধার্য্য কর সংগ্রহের পরিমাণ হল ৪৭৩ কোটি টাকা অর্থাৎ তা উক্ত ক্ষেত্রের নীট উৎপাদনের ২.৬১ শতাংশের মত। এর সঙ্গে যদি শিল্প ব্যবসায়ের উপর ধার্য্য করের পরিমাণ যোগ করা হয় তবে তার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে কৃষিজ কর সমষ্টির এক বিরাট বৈষম্য প্রকটিত হবে, অর্থাৎ সোজা কথায় বলা যায় যে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বোঝা অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম। তাই প্রধানতঃ এই প্রসঙ্গেই কৃষির উপর সুষ্ঠুভাবে এবং অধিকতর প্রগতিশীল ভিত্তিতে আয়কর প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

উক্ত প্রস্তাবের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে একটি নূতন বস্তু লক্ষ্য করা যায়। এটা সত্যি যে, আমাদের দেশে শতকরা ৭০ জনই কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র। কিন্তু সেই সঙ্গে এই বাস্তব ঘটনাকেও উপেক্ষা করা চলে না যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে যে 'সবুজ বিপ্লবের' উদ্ভব ও পরবর্ত্তীকালে তার সফল সম্প্রসারণ ঘটেছে তার জন্য গ্রামাঞ্চলে কৃষক সমাজের একটি বিশেষ অংশে সম্পত্তি আশাতীত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার থেকে তারা জলসেচ, উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক পদার্থ, ঋণ ও অন্যান্য বহু সুযোগ সুবিধা স্বল্পমূল্যে লাভ করছেন। ফলে একদিকে যেমন তাঁদের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তাঁদের নীট আয় চক্রবৃদ্ধিহারে স্ফীত হয়েছে। কিন্তু সঞ্চয়ের সুযোগ সীমিত থাকায় ভোগ বাহুল্যের পরিমাণ যেমন একদিকে বেড়েছে অপরদিকে আয়কর প্রদানের কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা দেশের অগ্রগতিতে কোন

রকম অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। নতুন যে সম্পদ এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা কোন-ক্রমেই আহরণ করা যায়নি। ফলে আমাদের সম্পদ সংগ্রহ প্রচেষ্টা যে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলেও নতুন ধনী ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যেকার ব্যবধান সম্প্রসারিত হয়েছে। আমাদের বৈষয়িক যোজনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল সামাজিক ন্যায় ও সমতা বিধান করা যা সর্বদাই বৈষয়িক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সহায়তা করে এসেছে। পাশাপাশি শহরাঞ্চলের কর-প্রদান ক্ষমতার একটা তুলনা যদি করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এখানে করের ভিত্তি ক্রমশ: সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে এবং বর্তমানে অতিরিক্ত কর ধার্যের কোনরকম সুবিধে সুযোগ আর নেই বললেই হয়। অথচ সেই হিসাবে গ্রামীন করের ভিত্তি অত্যন্ত ব্যাপক ও স্থিতিশাপক। কাজেই এদিক থেকে বিবেচনা করলেও কৃষি আয়করের যাথার্থ অনুভব করা যায়।

সম্প্রতি যোজনা কমিশনের আয়ত্বে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রীদের মধ্যে যে বৈঠক হয়ে গেল তাতে রাজ্যগুলির বেশীর ভাগই কেন্দ্র কর্তৃক কৃষির উপর কর প্রবর্তনের বিরোধিতা করেছেন। অবশ্য এর কারণ ততটা অর্থনৈতিক নয় যতটা রাজনৈতিক। অর্থ-নৈতিক যুক্তির পক্ষে প্রধান বিষয়বস্তু হল রাজ্যগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃষির কর ধার্যের সুযোগ কেন্দ্রের কাছে হাতছাড়া করতে চান না। তাছাড়া তাঁদের একটা এমন আশঙ্কা রয়েছে যে অনুরূপ কর প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানান অসুবিধা ও ঝামেলা বেড়ে যাবে। ফলে দুর্নীতির প্রসারও বাড়বে। কেন্দ্রের মূল প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, কৃষিক্ষেত্রের যাবতীয় আয় সংযুক্ত করে কৃষির আয়করের আওতার মধ্যে ধার্য করা হবে এবং যথাযথ-ভাবে তা রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। সামান্য কিছু জমি (ধরা যাক ৫ একরের মত) বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত জমির উপর মোটামুটি ধরন, আর ও রাজস্বের হিসেব থেকে প্রস্তাবিত আয়করের একটা হদিস পাওয়া যাবে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে নির্বাচন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কথা বিবেচনা করে রাজ্যগুলি এখনই এ প্রস্তাবে সম্মত হচ্ছেন না। তাই পারস্পরিক আলোচনার একটি কমিটি নিযুক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত কমিটি কৃষি আয়করের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁদের রিপোর্ট পেশ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

বস্তুতপক্ষে কৃষি আয়করের প্রস্তাবটিকে কোনমতেই এক অভিনব চিন্তা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আজ থেকে প্রায় ১৭ বছর আগে ১৯৫৩ সালে যখন অধ্যাপক কালডর (Kaldor) আয় ব্যবস্থার সংস্কারকল্পে তাঁর সুপারিশ প্রদান করেন সেই সময়েই কৃষিগত এবং অ-কৃষিগত আয়করসমূহের সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। তা কার্যকর হলে শুধু হিসাবেরই সুবিধা হত না, তাতে অনেক গণ্ডগোলও এড়ানো সম্ভব হত। সে যাই হোক, বর্তমানে পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধির জন্য অধিকতর সম্পদ আহরণের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি নতুন করে পুর্নবিবেচনা করতে হবে। কেন্দ্র থেকে যদি মোট হিসাবে কৃষির আয়কর সংগ্রহ করা হয় তবে তা সংগ্রহে অনেক অসুবিধা এড়ানো যাবে এবং কর প্রদানকারীর যদি দুই বা ততোধিক রাজ্যে জমি বা ব্যবসা থাকে তাহলে একই সঙ্গে তা যথাযোগ্যভাবে বাঁটিয়ে দেখা আরও সহজসাধ্য হবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে রাজ্যগুলি কি সহজে তাঁদের কর সংগ্রহের দাবী ছেড়ে দেবেন?

প্রশাসনিক অসুবিধা যে অনেকখানি বয়ে গিয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এটাকে বড় করে দেখে সমগ্র বিষয়টিতে উপেক্ষা করা যায় না। এখনই এই নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ শুরু করা যেতে পারে। আমাদের কর ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি এই যে কৃষিক্ষেত্রের আয়ের উপরে পারতপক্ষে এখনও কোন কর দিতে হয় না এবং সেইজন্যেই এই মুহূর্তে ধাপে ধাপে স্তরবিন্যাস করে (Graded System) একটা মৃদু আয়কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। কোন রাজ্যই কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। একটা কারণ এই হ'তে পারে যে, জমির ক্ষেত্রে উচ্চতম সীমা (প্রতি পরিবার পিছু ১৫ একর) বেঁধে দেওয়ার জন্য রাজস্ব কমে আসতে পারে। কিন্তু তা বলে এটাও অস্বীকার করা যায় না যে কৃষককুলের একটা বড় অংশ সরকারের কাছ থেকে যেমন স্বল্পমূল্যে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় বিবিধ উপকরণ পেয়ে এসেছেন তেমনই পরবর্তী প'াচ কি বছরেই মূল্যস্থিতি নীতির (Price Suport Policy) পুরো সুযোগ লাভ করেছেন। ফলে প্রতি বছরেই নীট উদ্বৃত্ত হচ্ছে অথচ সমৃদ্ধ কৃষকরা পুরোপুরি-ভাবেই কৃষি আয়করের হাত এড়িয়ে যাচ্ছেন। করের বোঝা তাঁদের কিছুই বহন করতে হয় না, অথচ ইদানীং মূল্য বৃদ্ধির সুযোগে কর দেবার সামর্থ্য তাঁদের অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে কৃষি আয়করের একটা নামমাত্র ব্যবস্থা থাকলেও তার আদায় অত্যন্ত কম। তাও সময়মত এবং ঠিকভাবে আদায় হয় না।

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

জনসংখ্যা ও নতুন শিক্ষাসূচী

এ. কে. চ্যাটার্জী

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ত মানুষ নিজেই। কথাটা শুনতে দার্শনিক লাগে বটে কিন্তু বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক ও সমাজ বিজ্ঞানীর মতে ব্যাপারটা আক্ষরিক অর্থে একদিন সত্যি হয়ে দাঁড়াবার খুবই সম্ভাবনা। এঁদের মতে, এমন একদিন আসতে পারে যেদিন ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপে সৃষ্ট সমস্যা মানব সমাজকে যদু বংশের মত পরস্পরের হানাহানির দিকে ঠেলে দেবে, কিংবা অতি স্ফীত মানব সমাজ নিজেদের সৃষ্ট ক্লেদ আর কলুষ দিয়ে আবহাওয়াকে মারাত্মক দূষিত করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

হয়ত এই আশঙ্কা কোনদিনই সত্যি হবে না, মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি নতুন পথে হয়ত এই সব সমস্যার মোকা'বলা করবে। তাহলেও ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা যে দেশে দেশে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, বিশেষ করে ভারতের ক্ষেত্রে এই সমস্যাকে অত্যন্ত গুরুতর বলে ধরা হচ্ছে। বর্ত্তমান হিসেবেই দেশের প্রতি বর্গ মাইলে বসতির ঘনত্ব হচ্ছে ৪৫২, এই শতাব্দীর শেষে সেটা দাঁড়াতে পারে ৯২৩ জনে, সমগ্র দেশে তখন জনসংখ্যা হবে ১০০ কোটিরও বেশী। উদ্বেগ প্রধানত: তিনটি কারণে—কোথায় পাওয়া যাবে প্রয়োজনীয় খাদ্য, উপযুক্ত বাসস্থান বা শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সামাজিক দায়িত্বই বা কিভাবে পালন করা যাবে। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির বৃদ্ধিহার যদি জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার থেকে বরাবরই কম থেকে যায় তাহলে উন্নত জীবনযাত্রার আদর্শ চিরকালই স্বপ্ন থেকে যাবে। তাছাড়া জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি মানে সামগ্রিক জনসংখ্যার মধ্যে বালক, কিশোর ও তরুণের হার হবে অনেক বেশী যারা দেশের বৈষয়িক উন্নতিতে সাহায্য করার মত কর্মক্ষম হবে না, অথচ যাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মত সামাজিক সুযোগ দেবার জন্যে বন্দোবস্ত রাখতেই হবে।

কাজেই আমাদের লক্ষ্য রাখতেই হবে যে, ভবিষ্যতে আমরা যতজনের সুখসুবিধার বন্দোবস্ত করতে পারবো তার চেয়ে বিপুল সংখ্যায় নতুন প্রাণ পৃথিবীতে এসে যেন অকারণে দুর্দশায় না পড়ে। পরিবার পরিকল্পনার কথা না জানে এমন লোক আজকাল বিরল। কিন্তু এই পরিকল্পনার মধ্যে জন্ম নিরোধের যে পদ্ধতিগুলি প্রচার করা হয়ে থাকে তাই দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে ভাবলে খুবই ভুল করা হবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে এই পদ্ধতিগুলি বার করা গেছে। আরো অনেক নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে, কালে হয়ত এরই মধ্যে কোনটি অব্যর্থ এবং আদর্শ জন্মনিরোধক বলে প্রমাণিত হবে। তবুও এই সমস্যা কেবলমাত্র জন্মনিরোধের জন্য বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের সমস্যা নয়। জনসংখ্যার সমস্যা মূলত: এবং প্রধানত: একটা সামাজিক সমস্যা—যার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক নানা সমস্যা।

আরো তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এই সামাজিক সমস্যা মূলত: একটা দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণবিধির সমস্যা—সাধারণ বিজ্ঞানের যেখানে প্রবেশাধিকার নেই। পরিবারের উর্দ্ধসীমা কোথায় টানা হবে এ নিয়ে যেমন কোন সাধারণ সূত্র বার করা চলে না, তেমনি ব্যক্তিগত শিক্ষা, রুচি, প্রয়োজন ও অনুভূতি থেকে সন্তানের জন্মদানের যে আকাঙ্খা তাকে কোন ধরাবাঁধা নিরিখে মাপা যায় না। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জনক ও জননীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, যেটা আবার গড়ে উঠেছে তাদের পরিবেশ, শিক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক মিলনে।

এই আলোকে দেখলে জনসংখ্যার সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সুষ্ঠু কল্যাণকর সমাধানের রাস্তা পাওয়া যাবে আজকের অধিবাসীদের আচরণবিধির ক্রমরূপান্তরের মধ্যে। রাতারাতি এ পরিবর্ত্তন আনতে চেষ্টা করা মানে চরম সামাজিক সঙ্ঘাতের সৃষ্টি করা। তার ওপর, যে বয়স্ক জনতা ইতিমধ্যেই তার আচরণবিধির মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, তাকে এই চক্রের বাইরে আনা সুকঠিন কাজ। কাজেই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী আর যুগোপযোগী আচরণবিধি গড়ে তুলতে গেলে এখন থেকেই দৃষ্টি দিতে হবে কিশোর শিক্ষার্থী মনের দিকে।

জনসংখ্যা সম্বন্ধে স্কুল কলেজের বিভিন্ন স্তরে উপযুক্ত শিক্ষাসূচীর কথা এই চিন্তা থেকেই এসেছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বন্ধ করার কোন কথা নেই, বরং তাকে আরো জোরদার করতে হবে, কিন্তু আমরা আশা করব যে আজকের যে সব কিশোর কালকে নতুন জীবন সৃষ্টি করার ক্ষমতা পাবে এবং বিবাহের কথা চিন্তা করবে, তাদের কাছে এই পরিকল্পনার সুবিধাগুলি আলাদা করে প্রচার করতে

হবে না। তারা নিজেরাই একটি সংসারে প্রবেশ করবে। ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ৫৫ কোটির মত, তার মধ্যে প্রায় ২৫ কোটির বয়স ১৫ বা তার নীচে। এরাই ভারতের ভবিষ্যৎ বয়স্ক জনতা। এরাই ঠিক করবে ভারতের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। এদেরই জন্যে প্রয়োজন জনসংখ্যা সম্বন্ধে শিক্ষাসূচী।

দেশের চিন্তাবিদদের মধ্যে এতদূর পর্যন্ত কোন বিরোধ নেই, প্রত্যেকেই এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। এর লক্ষ্য সম্বন্ধেও বিশেষ দ্বিমত নেই—এই বিশেষ শিক্ষাসূচীর লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থী কিশোর কিশোরীদের বোঝান যে ছোট পরিবারের আদর্শের মধ্যে নিহিত আছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ, উন্নত জীবনযাপনের অন্যতম প্রাথমিক সর্ত হল সীমিত পরিবার। কিন্তু কিভাবে তাদের এটা উপলব্ধি করান যাবে সেটা নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে। যদি জনসংখ্যা সম্বন্ধে কোন শিক্ষাসূচী তৈরী করতে হয় তাহলে তার উপাদান কি হবে, ঠিক কি কি বিষয় পড়ান হবে, কোন পর্যায়ে কতটুকু পড়ান হবে এ সব ব্যাপারে এখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি।

এ নিয়ে প্রস্তুতি চলেছে অবশ্য প্রায় তিন বছর ধরে। ১৯৬৯ সালে বোম্বাইতে আহূত হয়েছিল একটি জাতীয় আলোচনাচক্র যাতে দেশের বহু চিন্তাবিদ যোগ দিয়েছিলেন। এই আলোচনাচক্রের মধ্যে দিয়ে দুটি পরিকল্পনা নীতি সম্বন্ধে ঐকমত্য পাওয়া যায়। এর একটি হল জনসংখ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের সর্বস্তরে উপযুক্তভাবে ধীরে ধীরে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। আর একটি: জনসংখ্যা সম্বন্ধে আলাদা কোন শিক্ষণীয় সূচী তৈরী না করে, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, সাহিত্য ইত্যাদি সাধারণ বিষয়ের মধ্যে জনসংখ্যা সম্বন্ধে শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে প্রয়োজন অনুসারে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে।

শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা শিক্ষাবিদদের আছে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কার্য-কারণ, তার ফলাফল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে তথ্য ও তার বিশ্লেষণ এবং মানুষের জন্ম প্রক্রিয়া ও পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য—এগুলির বিশদ ব্যাখ্যার মধ্যে এখনই না গেলেও চলবে, কিন্তু সাধারণভাবে বিষয়টি নিয়ে খুবই মত পার্থক্যের অবকাশ থেকে গেছে। এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে বিষয়টি সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা এবং সংস্কারের বাধা। ঐ জাতীয় আলোচনাচক্রের অন্তিম ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের তদানীন্তন মন্ত্রী ডা: চন্দ্র শেখর এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দেন। তিনি বলেছিলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে শিক্ষাসূচীকে যদি কেউ যৌন-বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা বলে মনে করেন তাহলে খুবই ভুল হবে। এটা পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেও তৈরী হবে না। এই শিক্ষার লক্ষ্য হবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল সম্পর্কে তরুণ শিক্ষার্থীদের অবহিত করে তোলা এবং সুখ স্বচ্ছন্দ্য উন্নত জীবনযাত্রার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বুঝিয়ে দেওয়া। জনসংখ্যা বৃদ্ধি যাতে দ্রুত হারে না হয় সে সম্বন্ধে কি নীতি বা উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে সেটা শিক্ষার্থীদের শেখাবার দরকার নেই, নিজেদের বুদ্ধি দিয়েই তারা তাদের সিদ্ধান্ত তৈরী করে নেবে।

শিক্ষাসূচী নিয়ে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা প্রাথমিক কাজ শেষ করেছেন। গত বছর জুন মাসে জনসংখ্যা শিক্ষাসূচী সম্পর্কে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের একটি ছোট দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা ইন্সটিটিউট এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোও এ নিয়ে ভাবছেন। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি আলোচনা চক্র এই বিষয়ে হয়ে গেছে। এর মধ্যে দুটি আন্তর্জাতিক চক্রের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশগুলি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আগষ্ট মাসের ২৩ তারিখ থেকে সেপ্টেম্বরের চার তারিখ পর্যন্ত দিল্লীতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ভারত সরকারের উদ্যোগে একটি কর্ম শিবির স্থাপিত হয়েছিল। বহু বিশেষজ্ঞ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা এতে সমবেত হয়েছিলেন। সাধারণ ভাবে এঁরা জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যাপারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার পর্যালোচনা করে একটা মোটামুটি পাঠ্যসূচী তৈরী করার চেষ্টা করেন। এই কর্ম শিবির সুপারিশ করে ছিলেন যে, ছয় থেকে এগারো বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হবে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, পরিবেশ পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা, ছোঁয়াচে রোগ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও বৃদ্ধি হার, স্বাস্থ্যকর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন সম্বন্ধে জ্ঞান এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে জ্ঞান।

পরের স্তরে ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের জন্যে পাঠ্য বিষয়ে এই গুলিকে আরো ভালভাবে বিশ্লেষণ করবে। এছাড়া থাকবে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জাতীয় সম্পদ ও সামাজিক সুবিধার সম্পর্ক, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, শরীর-বিজ্ঞান, এবং এই বিশেষ বয়সে শরীরের বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে প্রচলিত সুবিধাগুলি তার সুযোগ নেওয়া সম্পর্কে ধারণা।

আরো পরে অর্থাৎ ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সীরা এই সব বিষয়ই আরো গভীরভাবে ও বিস্তৃতভাবে পড়বে। এক ব্যাপারে সবাই একমত হন যে শরীরতত্ব ও জন্ম সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান শিক্ষার্থীদের থাকা উচিত।

গত অক্টোবর মাসে এন. সি ই. আর. টি'র উদ্যোগে নিউ দিল্লীতে একটি আলোচনাচক্র বসেছিল—সেখানেও এই বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও মত বিনিময় হয়। এই সংস্থার উদ্যোগেও একটি পাঠ্যক্রম তৈরী হয়েছে, যাতে উদ্দেশ্য ও উপায় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু এই আলোচনা চক্রেও একটি ব্যাপার খুব পরিষ্কার হয়ে যায় যে বিষয়টি নিয়ে এখনও যথেষ্ট ভাববার আছে।

প্রথমত: সব কটি রাজ্য এটি চালু করার মত প্রস্তুতি গড়ে তুলতে তো পারেই নি বরং অন্য অনেক সমস্যাও ধীরে ধীরে সামনে আসছে। শুধু পাঠ্যপুস্তক হলেই তো হবে না, সেগুলি পড়াবার দায়িত্ব কারা নেবেন—শিক্ষকদের অনেকেরই এখনো এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নেই। তাই কেউ বলেন আগে শিক্ষকদের তৈরী করে তবে এটা হাতে নেওয়া উচিত, কেউ বলেন এ ব্যাপারে আর দেরী করা চলে না। শিক্ষক ও ছাত্র দু দলকে শেখানোর কাজই এক-সঙ্গে চলুক।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে পড়াবার মত শিক্ষা পেয়েছেন এ পর্যন্ত ৩০০ জন শিক্ষক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে শিক্ষার বিষয় বি. এড. পাঠ্যসূচীতে সবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খাদ্য ও জনসংখ্যা সম্পর্কে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করার কাজ এখনো হাতেই নেওয়া হয় নি।

শেষ পর্যন্ত জাতীয় স্তরে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, এই রকম বিতর্ক মূলক একটি বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে যে কিছু করা যাবে না, সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। জনসংখ্যার সঙ্গে যে সব জিনিসের সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রুচি, প্রয়োজনবোধ, শিক্ষার স্তর এগুলি কোন বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে পড়ে না তার ওপর আমাদের দেশে রাজ্যভেদে অঞ্চলভেদে এ সবের এতই বৈষম্য যে সব ক্ষেত্রে এক মানদণ্ডে বিষয়টিকে বিচার করা যাবে না। তবুও প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে।

এতক্ষণ শিক্ষার্থী কিশোরদের নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল—কিন্তু শুধু তাদের কথা ভাবলে সমস্যার সমাধান কোনকালে হবে না। স্কুল কলেজের পড়ুয়াদের বাইরে যে অগণিত কিশোর কিশোরী রয়েছে—মোট তরুণ সমাজের তারাই বৃহত্তর অংশ তাদের ভাগ্যের হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাই সমস্যাটিকে পুরোপুরি ভাবে সমাধান করতে গেলে এই কোটি কোটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক তরুণ নাগরিকদের মনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে। এরা যখন প্রথাগত শিক্ষাসূচীর বাইরে রয়ে যাচ্ছে, তখন এদের শিক্ষার জন্য সরাসরি কোন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভাবা নিষ্ফল হবে। জন শিক্ষার অন্যান্য মাধ্যম অর্থাৎ খবরের কাগজ, রেডিও, সিনেমা, টেলি-ভিশন, প্রদর্শনী এই সব কিছুকে যথাযোগ্য ভাবে কাজে লাগিয়ে এই ধরণের শিক্ষার কথা চিন্তা করতে হবে। এর জন্যে চাই বিরাট এক জাতীয় প্রচেষ্টা।

কৃষি আয়কর

১৫ পৃষ্ঠার পর

পশ্চিমবঙ্গ প্রমুখ ২।৩টি রাজ্যে রাজস্ব ও কৃষি আয়করের পরিমাণ ক্রমশ:ই নিম্নাভি-মুখী। বর্তমানে সারা দেশে কৃষিক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ হল ১০ কোটি টাকার মত। এটা শুধু দুঃখের কথা নয় দুর্ভাবনারও কথা। যেহেতু দেশের শহরাঞ্চলেই শুধুমাত্র করের বোঝা ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পাবে আর কৃষি-প্রধান গ্রামাঞ্চল তার থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত থাকবে এটা অর্থনৈতিক ন্যায় ব্যবস্থার ঘোর পরিপন্থী।

সাম্প্রতিককালে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা ক্রমশ:ই গুরুতর আকার ধারণ করছে। বর্তমান কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে শিল্পাঞ্চলে করের বোঝা আরও বৃদ্ধি করা মানে মুদ্রাস্ফীতির পথ সুগম করে দেওয়া। অন্যদিকে ঘাটতি ব্যয়ের পরি-সর বাড়িয়ে অর্থের পরিমাণ ক্রমশ: বৃদ্ধি করার বিপদ ও এক বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ—শরণার্থীর জন্য যে বিপুল পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে তা কোথা থেকে মেটানো হবে? অথচ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি কোনভাবেই ব্যাহত হতে পারে না। রাজ্যগুলি তাঁদের পরিকল্পনা বহির্ভূত খরচের পরিমাণ কমাতে প্রতিশ্রুত। অনাদায়ী করের পরিমানও হ্রাস করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। কিন্তু এত করেও কোন উপায় আর থাকছে না। কাজেই অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ও উন্নত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র কৃষির আয়কেই করব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ এবং এখনই এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা একদিকে যেমন শিল্পে করের চাপ হ্রাস করবে অপরদিকে কৃষক সমাজকে অর্থব্যবস্থার প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পর্কে আরও সচেতন করে তুলবে। ফলে সর্বতোভাবে সম্পদ সংগ্রহ প্রচেষ্টার একটা সুষ্ঠু ভারসাম্য পরিলক্ষিত হবে।

সেচের ভূমিকা

ভারতের জল সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১৮৭৭ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার (১৩৬ কোটি একর ফুট) যার মধ্যে ৫৫৫ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার (৪৫ কোটি একর ফুট) সেচের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর অতিরিক্ত, হিসেব করে দেখা গেছে যে, ৩৫০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার (২৮ কোটি ৫০ লক্ষ একর ফুট) জল মাটির নীচে, অর্থাৎ ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে।

দেশের মোট ভৌগোলিক এলাকার আয়তন ৩২ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টর। কৃষি উপযোগী মোট ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ হেক্টরের মধ্যে ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ আবাদ হয়। নীট ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল বোনা হয়। আরও হিসাব করে দেখা গেছে শেষ পর্যন্ত ৮ কোটি ২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে মাটির ওপর এবং নীচের জলের সাহায্যে সেচ সম্ভব হবে।

১৯৫১ সালে অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়। সেই সময় প্রায় ৯৭ ৩ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার (৭ কোটি ৬০ লক্ষ একর ফুট) জল ২২ ৭ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় সেচের কাজে লাগানো হয়। এই পরিমাণ হল ব্যবহারের উপযোগী জল সম্পদের শতকরা ১৭ ভাগ মাত্র। আশা করা গিয়েছিল তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে প্রায় ১৮৫ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার (১৫ কোটি একর ফুট) অর্থাৎ ব্যবহার যোগ্য জল সম্পদের ৩৩ শতাংশ উপকারে আসবে। আর চতুর্থ যোজনার শেষের দিকে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৪৫ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষাশেষি সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত এলাকার পরিমাণ ৩ কোটি ৫০ লক্ষ হেক্টর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বাড়তির হার ছিল বার্ষিক প্রায় ০.৮ মিলিয়ন হেক্টর। খুব সম্ভবতঃ আর কোনো দেশে একই সময়ে এত বেশী হারে বৃদ্ধির রেকর্ড আর নেই। যদিও সারা বিশ্বের তুলনায় এ দেশেই সব চেয়ে বেশী এলাকায় জল সেচ হয়, তথাপি তা কৃষি যোগ্য জমির মাত্র ১৮ শতাংশ। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বৃহৎ, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র জলসেচ কার্যসূচী অনুযায়ী মোট ২৫ ৫ মিলিয়ন হেক্টর মিটার অথবা প্রাপ্তিযোগ্য জল প্রবাহের শতকরা ৪৬ ভাগ কাজে লাগিয়ে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ হেক্টর মিটার জল সম্পদের সদ্ব্যবহারের প্রস্তাব রয়েছে। অতএব, দেশে জল সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা এখনও উজ্জ্বল।

সেচ প্রকল্পকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) বড় ও মাঝারি সেচ-প্রকল্প এবং (২) ছোট সেচ কার্যসূচী। যেসব প্রকল্প রূপায়ণের ব্যয় প্রায় ৫ কোটি টাকা সেগুলি বৃহৎ শ্রেণীভুক্ত। ১০ লক্ষ থেকে ৫ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্পগুলি মাঝারী এবং ১০ লক্ষ বা তার চেয়েও কম খরচের প্রকল্প ক্ষুদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত। দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফলের দিক থেকে বড় ও মাঝারী প্রকল্পের মাধ্যমে বিরাট ও ব্যাপক এলাকার উপকার হয়। কারণ, বৃষ্টি না হ'লে এই ব্যবস্থা তখন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। তবে এ ধরণের প্রকল্প স্বভাবতঃই অধিক ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ছোট ছোট পুকুর ও জলাশয়, নলকূপ, সাধারণ উন্মুক্ত কূপ এবং ছোট ছোট নদীর জলধারা প্রবাহের উন্নতি প্রভৃতির ব্যবস্থা। দেশের জল সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধান সুফল

ছোট ছোট জল-সেচ কার্যসূচীর সুবিধা অনেক। অল্প সময়ে স্থানীয় সহায় সম্বলের সাহায্যে বেশী সুফল পাওয়া যায়। এ ধরণের কাজে কর্মসংস্থানের সুযোগও অনেক বেশী। এছাড়া ছোট ছোট সেচ কার্যসূচীর রূপায়ণের দায়িত্ব কৃষকরা নিজেরাই নিতে পারে—যার ফলে একটা মানসিক সন্তুষ্টি বজায় থাকে। আর উৎস বা উৎপত্তি স্থলেই সাধারণতঃ এই জলের ব্যবহার সীমিত থাকায়; বর্ষাকালে অপচয় হয় খুব সামান্য।

তবে, ছোট ছোট সেচ কার্যসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল নতুন প্রকল্পের সম্ভাবনার বিষয়ে উপযুক্ত অনুসন্ধান কার্যের অভাব। কখনও কখনও যথেষ্ট সময় নষ্ট করা হয় শুধু বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যসূচীর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা এবং প্রস্তুতির জন্য। সেচ ও কৃষি উন্নয়ন কার্যের মধ্যে সমন্বয় না থাকার জন্য সমস্যা দেখা দেয়। ফসল কাটা এবং মাড়াই ঝাড়াই করার বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তন হলে সেচের কাজে জলের চাহিদার পরিমাণ ও সরবরাহের সময়েরও পরিবর্তন আপনা থেকেই হবে। প্রায়ই দেখা যায় চাহিদা এবং সরবরাহের সময়ের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। সেচের উন্নয়ন নির্ভর করে ফসল তোলা এবং (মাড়াই-ঝাড়াই করার) মাড়াই পদ্ধতির ওপর। কিন্তু এ দুটি ক্ষেত্রে কাজ ঠিক সেই ভাবে চলছে না।

ক্ষুদ্রায়তন সেচ প্রকল্পগুলিকে ভাগ

ভাবে চালু রাখা বিশেষ দরকার। কারণ, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দারুণ ক্ষতি হয়। দেখা যায় কিছুদিন পরে জলাধারের সঞ্চয় ক্ষমতা কমে আসে। পলি মাটি পড়ে বা অন্য নানা কারণে এটা হয়। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না হ'লে সরবরাহের নীট পরিমাণ স্বভাবতঃই কম হবে—সেক্ষেত্রে নতুন প্রকল্প থেকে লাভবান হওয়া যাবে বেশী। অপচয়ের ফলে কতটা ক্ষতি হচ্ছে তার সঠিক হিসাব নিরূপণ করা অবশ্য মুস্কিল। কারণ, কার্য্যসূচী ও এলাকা বিশেষে এই অপচয়ের পরিমাণ ভিন্ন। এ ব্যাপারে রাজ্যগুলির কাছ থেকেও কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

অতীতে বড় ও ছোট সেচ কার্যসূচীর মধ্যে সংহতির অভাব লক্ষ্য করা গেছে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা, বৃহৎ সেচ প্রকল্পের পরিপূরক হওয়া উচিত—প্রতিদ্বন্দ্বী নয়;—এমন কি বন্যারী সেচ ক্ষেত্রেও নয়।

ছোট ছোট সেচের কাজে আর একটি সমস্যা হল পরিসংখ্যান ও রেকর্ড সংগ্রহ করা। এর জন্য কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। অনেক রাজ্যেই তথ্য সংগ্রহ ও রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য কোনো সংস্থা রাখা হয় নি।

কাজের সংহতি

উপরে উল্লিখিত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই সুপারিশগুলি বিবেচ্য।

প্রথমতঃ সব রাজ্যের সেচ ও কৃষি উন্নয়ন ব্যবস্থার মধ্যে সংহতি সাধন অতি আবশ্যক। আধুনিক কৃষি-খামারের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সেইভাবে উন্নত সেচ-প্রকল্প প্রণয়ন করা উচিত। অর্থাৎ কোনো অঞ্চলের কৃষি-খামারের প্রয়োজন ভিত্তিক হওয়া দরকার সেচ কার্যসূচীগুলি।

দ্বিতীয়তঃ প্রধান প্রধান সেচের জলের নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা থাকা উচিত। নতুন কার্যসূচীর সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং অনুসন্ধান চালানো একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থার পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধানে দক্ষতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। যথেষ্ট সংখ্যক কারিগরী বিষয়ক কর্মচারী নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। এঁদের নিয়ে একটি কারিগর মণ্ডলী গঠন করলে আরও ভাল হয়। মণ্ডলীর কর্মচারীদের ওপর ন্যস্ত থাকবে সেচ-কার্যের তদারকী ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। সুষ্ঠুভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে ছোট ছোট সেচ প্রকল্পের কাজ চালানো নির্ভর করে উদ্যোগী সংস্থা এবং কারিগরী বিষয়ে অনুমতিদানকারী পক্ষের মধ্যে সহযোগিতার ওপর।

চতুর্থতঃ ক্ষুদ্রায়তন সেচ প্রকল্পের নির্মাণকার্য্য ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া উচিত পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতির মতন স্থানীয় সংস্থাগুলির ওপর। এই উদ্দেশ্যে ব্লক পর্য্যায়ে কাজের জন্য উপযুক্ত কারিগরী কর্মচারী তৈরী করা খুবই প্রয়োজন।

পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলি এখনও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণের কাজে তেমন ভাল রেকর্ড দেখাতে পারেনি। তবে, সেচ সমবায়গুলি এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শক হতে পারে। মহারাষ্ট্রে লিফ্‌ট সেচ সমবায় ব্যবস্থা উদাহরণ উৎসাহ ব্যঞ্জক। যদি সেচ সমবায়গুলির উন্নয়ন ব্যাপক হারে এবং যোগ্যতা ও সাফল্যের সঙ্গে করা যায়, সবুজ বিপ্লবকে আরও জোরদার ও সার্থক করা সম্ভব হবে।

কারবারিল ইনজেকশান নারকুলে পোকা দমন করে

কেরালার কায়ামকুলম-এ অবস্থিত কেন্দ্রীয় নারকোল গবেষণা সংস্থার একটি সংবাদে জানা গেছে যে, নারকোল গুঁড়ির চারপাশে কারবারিল ইনজেকশান দিলে সহজেই নারকুলে পোকা দমন করা যায়।

শতকরা ৪০ ভাগ কারবারিল-এর ২০ থেকে ৩০ গ্রাম জলীয় দ্রবণ ১০০০ থেকে ১৫০০০ সি. সি. জলের সঙ্গে মিশিয়ে গাছের আক্রান্ত স্থানগুলিতে ইনজেকশান দিতে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতি ইনজেকশানের জন্য গড়ে খরচ পড়ে মাত্র ২০ থেকে ৪০ পয়সা।

পরীক্ষায় আরও জানা গেছে যে, কারবারিল মানবদেহের পক্ষেও বিষাক্ত নয় আবার নারকোল জাতীয় গাছের পক্ষেও উপকারী।

—

অন্ধ্রপ্রদেশে তুলো চাষের জমি চারিদিকে বেড়ে চলেছে

অন্ধ্রপ্রদেশে নাগার্জুন সাগর প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত তুলো চাষের জমির পরিমাণ ১৯৬৯-৭০ সালে ছিল মাত্র ৫৮ হেক্টর, কিন্তু এই বছর জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬,০০০ হেক্টরে। এই অঞ্চলে তুলো চাষে বিস্তার লাভ করেছে তার কারণ প্রথমতঃ গত বছরের ভাল ফলন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ভাল বিক্রয় মূল্য, দ্বিতীয়তঃ তুলো চাষের উন্নয়নের জন্য সরকারী উদ্যোগ। এই সমস্ত অঞ্চল জুড়ে এখন মোট পাঁচ জাতের অতিদীর্ঘ আঁশের তুলো চাষ হচ্ছে, কারণ চাষীদের মতে যে সব জমিতে বরাবর তামাকের চাষ হ'য়ে আসছে সেই সব জমিতে এই জাতের তুলো চাষ করাই

পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা

পুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যাটি কিছু দিন হোল বিশেষজ্ঞ এবং পরিকল্পনাকারীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিছু দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের মেসাচুসেটসের কেমব্রিজ শহরে এ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসে। ৩০টি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্যে। সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীঅশোক মিত্র। এ বিষয়ে ভারতের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে শ্রী মিত্র বলেন যে সারা বিশ্বের জন্যে এক অভিন্ন সমাধান সম্ভব নয়। ভারত তার অভিজ্ঞতা থেকে এটা উপলব্ধি করেছে যে এক দেশে পুষ্টির অভাব দূর করার জন্যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব অপর দেশের পক্ষে সে ব্যবস্থা সম্ভব নয় বরং একেবারেই ভিন্ন ধরণের। যেমন আফ্রিকায় প্রধান খাদ্য হোল কাসাভা ও কলা, আর এটাও স্বীকৃত যে এ দুটির মধ্যে প্রোটিন তেমন নেই। আবার ভারতে প্রধান খাদ্য হোল দানা শস্য এবং তার সঙ্গে থাকে ডালের একটি সংমিশ্রণ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ সম্প্রতি সুপারিশ করেছেন যে ভারতের এই খাদ্যের মধ্যে থেকেই সব বয়সের ব্যক্তির জন্যে প্রয়োজনীয় প্রোটিন পাওয়া যেতে পারে যদি প্রয়োজনীয় মাত্রায় এই খাদ্য গ্রহণ করা হয়। তবে ভারতের এই খাদ্যে কিছু ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের গুণের কিছুটা অভাব থেকে যায় যা আবার খাদ্যের কিছু রদ বদল বা রকমফের করে এই গুণাভাব দূর করা যায়। এই কারণে ভারতের পরিকল্পনাকারীগণের পক্ষে জনসাধারণের জন্যে পুষ্টিকর খাদ্য খুঁজে বার করা সহজ সাধ্য হয়ে পড়ে। খাদ্য গুণের এই অভাবটা আস্তে আস্তে দূর কোরতে হবে কারণ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য বের করার বিষয়টি ব্যয় সাপেক্ষ এবং এর জন্যে তাড়াহুড়ো করারও বেশী প্রয়োজন নেই। খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি কোরতে পারলেই পুষ্টির অভাবও বেশ খানিকটা কমে যাবে।

কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করে বিগত কয়েক বছরে আমরা এদিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছি। এখন সকলের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে। এটা সম্ভব হয়েছে 'সবুজ বিপ্লবের' ফলে—একই জমিতে বার বার ফসল ফলিয়ে, উচ্চ ফলনশীল নানা জাতের বীজ ব্যবহার করে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ সেচের ব্যবস্থা করে। তবে এটাও ঠিক যে এই অগ্রগতি যদি অব্যাহত রাখা না যায় তাহলে এই সবুজ বিপ্লবের কোন অর্থই হবে না। আর সেই সঙ্গে প্রাণীজ প্রোটিন যা দুধ ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায়—তার উৎপাদনও বৃদ্ধি কোরতে হবে। সুখের কথা, কৃষকগণ এখন বুঝতে পেরেছেন যে চাষ বাসের সঙ্গে সঙ্গে পশু পালন, হাঁস মুরগী ইত্যাদির চাষও বেশ লাভজনক।

নেপালের অগ্রগতির জন্য বিদ্যুৎ প্রকল্প

নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুর ১১০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে ত্রিশূলি জল বিদ্যুৎ প্রকল্প-ভারত-নেপাল সহযোগিতার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কেরও এক উজ্জ্বল প্রতীক। ১৭ই নভেম্বর নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকীর্তিনিধি বিষ্টা এই প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন। নেপালে এ ধরণের প্রকল্পগুলির মধ্যে এটি বৃহত্তম। এর মধ্যে রয়েছে ৭টি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট এবং এর প্রত্যেকটি ৩০০০ কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। এই প্রকল্পের দ্বারা নেপালের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের আশু প্রয়োজন মেটানো যাবে। কাঠমণ্ডু উপত্যকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের এটি হোল প্রধান উৎস, এ ছাড়া এখান থেকে ভারত সীমান্তে অবস্থিত নেপালের হিতাউরা এবং বীরগঞ্জেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলগুলিতে এখন নানা রকম শিল্প গড়ে উঠছে। কাঠমণ্ডু উপত্যকা এবং হিতাউরায় ইতিমধ্যেই তিনটি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও বহু শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে নেপালের জনগণের জন্যে কর্মসংস্থানের অবকাশ এখন অনেক বেশী।

ভারতীয় সহযোগিতা সূচী অনুসারে ভারতের আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যপুষ্ট এই প্রকল্পটির জন্যে ব্যয় হয়েছে ১১ কোটি টাকা। দুটি পর্যায়ে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ এই কাজ সমাধা করেন। প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯৬৬ সালে। সেই সময় সাতটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিটের মধ্যে তিনটির কাজ সম্পন্ন হয়। কাঠমণ্ডু উপত্যকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে প্রয়োজনীয় তার বসানোর কাজও সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হয় ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। দুর্গম গিরিপথ দিয়ে তার নিয়ে যাওয়ার কঠিন কাজ সম্পন্ন করা হয় প্রায় ৫ বছরে। সেই সময়েই শেষ ইউনিটের কাজ চালু করা হয়। নেপাল সরকারের অনুরোধে ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি ইউনিটের কাজ চালু করা হয় অতিরিক্ত চাহিদা মেটাবার জন্যে।

REGD. NO. D-233

একটি আদর্শ খামার

হরিয়াণা রাজ্যের কর্ণাল জেলার লাডওয়া ব্লকে শ্রী হরপ্রকাশের 'স্বতন্ত্র ফার্ম' নামের খামারটি যদি দেখেন, তবে এক কথায় তাকে আদর্শ খামার আখ্যা দিতে আপনার মোটেই দ্বিধা হবে না, কারণ ৬৪ একর জুড়ে এই খামারটি কি ফসলের পরিমাণের দিক থেকে, কি শস্যের গুণগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে, সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

স্বতন্ত্র মডেল ফার্মে এ বেশীর ভাগই উচ্চ ফলনশীল সংকর—শস্য চাষ হয়ে থাকে। এখানে প্রায় ১০ থেকে ১৫ একর জুড়ে কো—৯৭৬ এবং কো—৯৭৫ জাতের আখ চাষ হয় আর একর প্রতি ফসলের পরিমাণ হয় ৩৮ টনের, সে তুলনায় অন্যান্য কৃষকরা প্রতি একরে মাত্র ১৪ টনের আখের ফসল তোলেন। গত চার বছর যাবৎ কল্যাণ ২২৭ গম চাষে প্রতি হেক্টারে তিনি প্রায় ৪৫ থেকে ৬০ কুইন্টাল ফসল তুলছেন।

৮ থেকে ১০ একর জমিতে বাসমতী ও আই, আর-৮ ধানের একর প্রতি ফলন হয় প্রায় ১,৫০০ থেকে ১,৮০০ কেজি। এচ. বি. ১ বাজরা ২ একরে চাষ হয় যার একর প্রতি ফলন প্রায় ১,০০০ কেজি আর খরিফ মৌসুমে ২৫ একর জুড়ে গঙ্গা নং ৫ এবং কম্পোজিট-ভুট্টার একর প্রতি ফলন হয় প্রায় ১৫ থেকে ২০ কুইন্টাল।

গোখাদ্যের এবং সবুজ সারের জন্য শ্রী হরপ্রকাশ গ্রীষ্মকালে এখানে জোয়ার এবং লোবিয়া পালাক্রমে চাষ করেন।

স্বতন্ত্র মডেল ফার্মের বাকি ৬০ একর জমিতে উচ্চফলনশীল কল্যাণ ২২৭, সোনালিকা-৩০৮, এস—২২৭ এবং ছি পল ডোয়ার্ফ গম রবিখন্দে চাষ হয়ে থাকে। এই ভাবে শ্রী হরপ্রকাশ বছরে দুটি থেকে তিনটি ফসল তুলে থাকেন। জমির মাটি পরীক্ষার পর শ্রীহরপ্রকাশ শস্যের প্রয়োজন অনুসারে সবুজ সার, খামার সার, কম্পোজিট সার এবং বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার প্রয়োগ করেন। সেচের অসুবিধা দূর করার জন্য খামারে পাঁচটি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক নল কূপ বসানো হয়েছে।

খামারটি আধুনিক প্রথায় নির্মিত বলে এখানে নানা রকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ বাস করার সুবিধা আছে। এখানে ট্রাক্টর, কালটিভেটর, বিদাবই, রোলার লেভেলার ধান মাড়াই ও ঝাড়াই কল, ড্রিল প্রভৃতি নানা রকম যান্ত্রিক সুবিধা সুলভ।

শস্য খামার ছাড়াও শ্রী হরপ্রকাশের ৭ একর জমির ওপর একটি ফলের বাগান আছে। এই বাগানে, আম, আঙুর, কমলালেবু, লোকাট, আমলকী প্রভৃতির চাষ হয়।

শ্রী হরপ্রকাশের স্বতন্ত্র মডেল-ফার্মটি শুধু আধুনিকই নয়, আদর্শও বটে। আশে পাশের খামার থেকে প্রায়ই চাষী ভাইরা এখানে এসে শ্রী হরপ্রকাশের কাছ থেকে চাষ বাস সম্বন্ধে নানা রকম উপদেশ গ্রহণ করে। গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্য শ্রীহর-প্রকাশের খামারটি সত্যই অন্যান্য খামার থেকে স্বতন্ত্র।
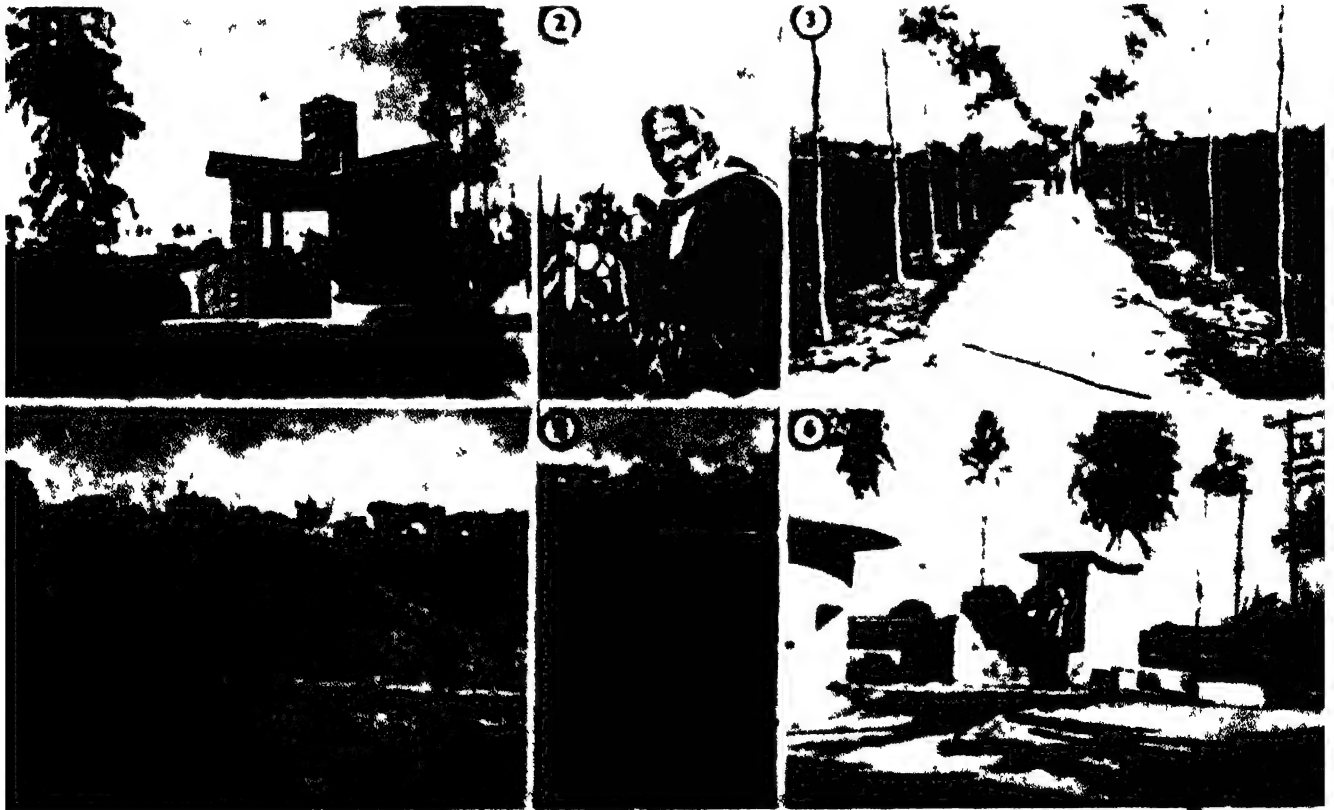
১। 'স্বতন্ত্র মডেল ফার্মের' প্রধান দরজা ২। গমক্ষেতে শ্রীহরপ্রকাশ ৩। খামারের একটি কুয়ো ৪। ট্রাক্টর টানা চাষের যন্ত্র ৫। এস-২২৭ গমের ক্ষেত ৬। ইলেকট্রিক মোটর সম্বলিত কুয়ো।

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ভিরেন্দ্র প্রিন্টার্স, করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।

★ প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি
★ বিজ্ঞান জগৎ

★ কলুষিত পৃথিবী
★ নতুন কর ব্যবস্থা

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

তৃতীয় বর্ষ ১৪শ সংখ্যা
১২ই ডিসেম্বর ১৯৭১ : ২১ অগ্রহায়ণ ১৮৯৩
Vol. III : No : 14 : Dec. 12, 1971

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রচ্ছদ পট— [illegible]

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নিউ দিল্লী ১
টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮৭০২৬, ৩৮৭৯১০, ৩৮৫৪৮১/৪০২
টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী
চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী ১
চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

ভুলি নাই

তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্বদেশ মূর্তি গ্রহণ করুক। তোমাদের প্রত্যেক স্বদেশবাসী ভ্রাতার জন্য তোমরা দায়ী, ইহা অনুভব কর, কার্যত প্রমাণ কর। তোমরা এমন জীবন যাপন কর, যেন তোমাদের মধ্য দিয়াই লোকে তোমার স্বদেশকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।

—ম্যাৎসিনি

এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়

দেশের ডাক

অন্ততঃ একবারের জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর কথা রেখেছেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি দশ দিনের মধ্যে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন। যেহেতু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সময়ের সীমা শেষ হয়ে আসছিল, তাই তিনি পূর্বাপর বিবেচনা না করেই একটা আগ্রাসী বিমান আক্রমণ চাপিয়ে দিলেন আমাদের ওপর। ৩রা ডিসেম্বর কাশ্মীর থেকে রাজস্থান—এই বিরাট পশ্চিম সীমান্ত বরাবর আমাদের সমস্ত বিমান ঘাঁটির ওপর পাকিস্তান অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। কিন্তু এই আক্রমণ শত্রুকে নিছক হতাশাই এনে দিয়েছে—কারণ আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আহত, করা দূরে থাকুক, এই আক্রমণে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোন আঁচড় পড়েনি বললেই হয়। বাংলাদেশে মুক্তি বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ফলে স্বদেশে জেঃ ইয়াহিয়া খানের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই ক্রমশঃ একটা শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রকম একজন হতাশ হয়ে পড়া রাষ্ট্র প্রধানের কাছ থেকে যে কোন মুহূর্তেই আক্রমণ আসতে পারে—এটা আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। বিমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশীয় ভূ-খণ্ডের নানা জায়গায় কামানের গোলা নিক্ষেপ এবং পাকিস্তান কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার ফলে আমাদের দেশ ও জনগণের কাছে একটা সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য পার্লামেন্ট "ভারত রক্ষা আইন" এবং "জরুরী অবস্থা" বলবৎ করেছেন।

আক্রমণের পরেই প্রধান মন্ত্রী এক মধ্য রাত্রিকালীন ঘোষণায় বলেছেন "আমরা যে কোন অবস্থার জন্যই তৈরী আছি এবং একটি দেশকে তার স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য যা কিছু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তা করতে আমরা প্রস্তুত আছি। সত্যি ক'রে বলতে কি, আজ আমরা শুধু মাত্র আমাদের ভৌমিক অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্যই লড়াই করছি না। আমরা লড়াই করছি সেই সমস্ত আদর্শের জন্য যা হ'ল আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি এবং যার ওপর ভিত্তি ক'রেই কেবলমাত্র আমরা এক সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারব। এই আক্রমণকে আমরা নিশ্চয়ই রুখব এবং সাহস, দৃঢ়তা, নিয়মনিষ্ঠা ও ঐক্য দিয়ে আমরা, ভারতীয় জনগণ এই আক্রমণের মোকাবিলা করবো।" আবার সমগ্র ভারতীয় জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের চিরশত্রু এই জঙ্গীচক্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে প্রধান মন্ত্রীর ভাষণে এই দৃঢ়তা ও সঙ্কল্পের কথাই ঘোষিত হয়েছে।

জাতি আজ এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এবং তার সঙ্গে একটা বিরাট সম্ভাবনাও রয়েছে আমাদের সামনে। কি এই চ্যালেঞ্জ আর কি বা এই সম্ভাবনা? এই চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের এক পর নির্ভরশীল সামরিক শক্তি যার মাথায় রয়েছে ক্ষমতালিপ্সু কিছু সংখ্যক সেনাপতি, যাঁরা তাদের গত কয়েক মাসের নির্বুদ্ধিতা প্রসূত কাজকর্মের ফলাফল দেখে এতই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছেন, যে এখন তাঁদের নিজেদের দেশ ও জাতির, যাদের নামে কপটভাবে তাঁরা এই যুদ্ধে নেমেছিলেন, তাদেরই কিসে ভাল বা কিসে মন্দ হয়—তা বোঝাবার ক্ষমতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। আর এইটাই হ'ল সবচেয়ে বড় সুযোগ—যখন বীর বিক্রমে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের সামনে যে কোন চ্যালেঞ্জই আসুক না যত দীর্ঘস্থায়ীই তা হোক তার মোকাবিলা করতে পূর্ণ গৌরবে আমরা আমাদের আপন শক্তি প্রদর্শন করতে পারব। জয়লক্ষ্মীর শুভ আশীর্বাদ ইতিমধ্যেই আমাদের উপর বর্ষিত হ'তে শুরু করেছে।

মানব সেবায় বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ক্ষেত্রে দেশের সর্ববিধ ক্রিয়াকলাপ এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ভূমিকা সংক্রান্ত সর্বপ্রকার ব্যাপারে সহায়তা এবং পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থা হিসাবে জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী কমিটি গঠনের এক সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। একাধিক কারণে, এই সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। এই প্রসংগে প্রথমেই যে কথাটি বলা দরকার তা হ'ল এই কমিটির সদস্যদের সকলেই সরকারী কাজকর্মের আওতায় এই প্রথম প্রবেশ করলেন। যেহেতু তাঁরা এ পর্যন্ত সরকারী ক্ষেত্রের বাইরে ছিলেন সে কারণে এই কমিটিতে যোগদানের আগে তাঁদের মধ্যে কোন বিভাগীয় দৃষ্টিভংগী ছিল না এবং আমরা আশাকরি যে একদিকে যেমন তাঁরা জাতীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতি ও সামাজিক ইত্যাদি প্রতিটি দৃষ্টিকোন থেকে বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীর বিভিন্ন বিষয়ের বিচার বিবেচনা করবেন তেমনি অন্যদিকে তাঁরা দেশের কল্যাণ ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকেও লক্ষ্য রাখবেন। এরা শুধু কর্মজীবনে তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রেই স্বনামধন্য ব্যক্তি নন—তার চেয়েও বড় কথা হ'ল এই যে সদস্যগণ এখনও বিভিন্ন গবেষণামূলক সংস্থার সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িত আছেন। এঁরাই যে কেবল দেশের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদ এ কথা মেনে না নিলেও এইটুকু অন্তত বলা যেতে পারে যে, তাঁরা দেশের বর্তমান তরুণ বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদ সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন। কোন দেশের কোন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটি এ পর্যন্ত তা করেন নি।

এর লক্ষ্য ও নিয়মাবলীর বিবরণে এ কথা স্পষ্ট করে বলা আছে যে, যন্ত্রবিধ কর্তব্য এর দায়িত্বের আওতায় থাকলেও এর প্রধান কাজ হবে আমাদের জাতীয় পরিকল্পনার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হিসাবে দেশের যন্ত্রবিদ্যা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা রচনা করা। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য বস্তু হবে, কি করে জাতির জন্য বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক জ্ঞানসম্পদ আরও বেশী পরিমাণে আহরণ করা যায় এবং নিয়োজন, যোগাযোগ ও যানবাহন, প্রতিরক্ষা ও যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য রচিত পরিকল্পনা ও কর্মসূচীগুলিতে এই জ্ঞানসম্পদকে কি করে প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগান যায়। প্রকৃত পক্ষে, যে কোন ব্যাপারে নীতি নির্ধারণের আগে জাতি এবং সরকারের সামনে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় সেগুলির অধিকাংশই, কি বিষয়বস্তুতে কি সমাধানে সবদিক দিয়েই বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ধরনের। কৃষি, শিল্প, বা প্রতিরক্ষা উৎপাদন ছাড়াও শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য সমাজ উন্নয়ন বস্তু, পক্ষে আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত ক্ষেত্রেই, যেখানেই আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা মধ্যমনির ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সমাজের বৃহত্তর অংশের জন্য কল্যাণাভিমুখী মানব প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছে—সেখানেই ছড়ানো রয়েছে এই বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক দানের এক বিরাট কাণ্ডকারখানা।

২৫ বছর আগে স্বাধীনতার ঠিক শুরু থেকে, এইটাই ছিল পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর চরম লক্ষ্য—যার ফলে আমরা আজ দেশে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার যে অসীম সম্ভাবনা রয়েছে, সে সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠেছি। সর্বক্ষেত্রেই তিনি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ওপর এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যা কেবল একজন ভাবুক বিজ্ঞানীর কাছ থেকেই আশা করা যেত। এই ভাবেই একটা অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং যন্ত্রবিদ্যার প্রয়োগের ভিত্তি রচিত হয়েছিল—যার দেশজোড়া কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত বহুসংখ্যক গবেষণাগার এবং মানব সেবায় নিয়োজিত পারমানবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় যোজনার শুরু থেকেই বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার ভিত্তি দেশে এতদূর প্রসারিত হয়েছে যে আজ বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার বিভিন্ন শাখাগুলিকে সমন্বিত করার ও মানব সেবায় পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবার সম্যক্ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ক্যাবিনেটের বিজ্ঞান উপদেষ্টা কমিটির সৃষ্টি বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় পরামর্শকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নির্ধারণের এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসাবে গণ্য করার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সরকারী দৃঢ়তার পরিচয় বহন করে।

সম্প্রতি ভারত সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক কাজকর্ম বেশ বেড়ে গেছে। ক্যাবিনেটের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশগুলির ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে ক্যাবিনেটের বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় কমিটিকে একটি

রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে তৈরী করা হয়েছে। গত কয়েক বছরের কাজকর্মের অভিজ্ঞতা থেকে রাজনৈতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির প্রয়োগ ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা দেখবার জন্য একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। সেই অনুযায়ী ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে বিজ্ঞান ও কারীগরী বিভাগও স্থাপন করা হয়েছে। এই বিভাগটির কাজ-কর্মের ক্ষেত্র স্বভাবতই নির্দিষ্ট ধরনের কাজকে ঘিরে—যেমন এই বিষয়ে মূলনীতি রচনা, নীতিগুলির ঠিকভাবে রূপায়ণ, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপের সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার শাখাগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য অনেক বিষয়।

জাতীয় বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিধ সম্বন্ধীয় কমিটি, গত ১৬ই নভেম্বর থেকে কাজ শুরু করেছেন। এই কমিটি বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় বিভাগের অধীনে কাজ করবেন এবং বিবিধ পরিকল্পনার রচনায় ও রূপায়নে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবেন। আশাকরা যাচ্ছে যে এই কমিটি দেশের বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও সৃজনী প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে সবদা যোগাযোগ রেখে চলবেন এবং আমাদের প্রচলিত গোঁড়া ধ্যান-ধারনায় পরিবর্তন আনতে পারবেন। বিজ্ঞানকে জাতীয় উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার যে মহান দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে, তা পালনের জন্য জাতীয় প্রচেষ্টার সর্ববিধ ক্ষেত্রে তারা অনুসন্ধান চালিয়ে যাবেন। গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করতে এবং ক্রিয়াকলাপের তীব্রতা বৃদ্ধি করতে যা কিছু সাহায্য প্রয়োজন তা—আর্থিক, সংগঠনমূলক, ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় যাই হোক না কেন এই কমিটি সে সাহায্য দেবেন। সেই সঙ্গে কমিটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টার ক্রম প্রসারমাণ ক্ষেত্রগুলির সবেতেই আমাদের জাতীয় চরিত্র এবং সক্ষমতার তুলনায় এমন সব বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক পরিকল্পনাগুলির রচনা করার জন্য পরিকল্পনা রচয়িতাদের ও প্রশাসকদের সহায়তা করবেন।

উন্নতির যে পর্যায়ে আজ এসে পৌঁছেছি, এই পর্যায়ে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যাকে আমাদের সেবায় পুরোপুরি কাজে লাগান সম্ভব হতে পারে শুধু যদি আজকের দিনে আমরা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চাহিদাগুলির পুর্নমূল্যায়নের চেষ্টা করে চলতে পারি। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুধু তখনই সম্ভব হবে যখন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন আসবে। কমিটির কাজ সবচেয়ে সফল ও প্রশংসনীয় বলে আমরা তখনই মনে করতে পারব যখন একটি মোটামুটি ভাবে স্বল্পকালের মধ্যে কমিটি দেশের অগণিত জনসাধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার প্রয়োগে সর্বপ্রথম ব্রতী হবেন। এই দায়িত্বগুলির কথাই পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রী সী সুব্রহ্মনিয়ম ও মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরির জাতীয় কমিটির উদ্বোধনকালীন ভাষণে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

"আমাদের পৃথিবী নানাদিক দিয়ে উন্নতি লাভ করেছে সত্য। কিন্তু যত বড়ো গলা করেই সে আজ বলুক না কেন যে সে মানুষকে ভালবাসে, একথা অস্বীকার করার জো নেই যে আজকার পৃথিবীর ভিত্তিই হল ঘৃণার উপর, হিংসার উপর—প্রেমের উপর নয়। সুখের বিষয় ভারতের লোক ঘৃণা পুষে রাখতে চায় না, অপরের ভালটা সহজেই গ্রহণ নিতে চায়।'

—জওহরলাল নেহরু

প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি ও তার আর্থিক দিক

নৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় একটা অপচয় ছাড়া কিছু নয় কারণ দেশের সমস্ত সম্পদকে উন্নয়নের কাজে না লাগিয়ে, তার একটা বিরাট অংশকে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এই ব্যয় নিঃসন্দেহে আবশ্যিক। জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতবর্ষ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ এবং সামরিক দিক থেকেও এই দেশের অবস্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আমাদের রয়েছে সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এবং এক স্বতন্ত্র জীবন ধারা ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, ঐগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা, উন্নয়ন এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এমন একটা সুসম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা দরকার যা কেবলমাত্র দেশের নিরাপত্তাই সুনিশ্চিত করে তুলবে, তানয় পরন্তু কারিগরী কুশলতার ক্ষেত্রেও দেশে একটা আত্মনির্ভরতার ভাব আনবে যার ফলে দেশে শিল্প প্রসারের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

গত দশ বছর ধরে প্রতিরক্ষাখাতে আমাদের ব্যয় ক্রমশ: বেড়েই চলেছে। কিন্তু এই ব্যয় কতখানি যুক্তি সঙ্গত তা ভেবে দেখা দরকার। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন দক্ষ কর্মী, কাঁচামাল, উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা এবং আর্থিক সঙ্গতি—যেগুলো অন্যথায় নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের কাজে লাগানো যেত। পক্ষান্তরে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিরক্ষার বন্দোবস্তও অত্যাবশ্যক।

বিগত ২৪ বছরে চারবার আমাদের বৈদেশিক আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়েছে। শুধু শেষবার ছাড়া প্রত্যেক বারই আমরা কোন না কোন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। এই সমস্ত অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে অপর্যাপ্ত প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিই বহিআক্রমণের কারণ। অপর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি এবং আক্রান্ত হলে রক্ষা করবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আত্মপ্রত্যয় সম্ভাব্য শত্রুকে সংযত করে। তা না হলে এই রক্ষী বাহিনী এবং প্রতিরক্ষাখাতের সমস্ত ব্যয় বরাদ্দে একটা শেষ রেখা টেনে দিয়ে সমস্ত সম্পদ উন্নয়নের কাজে লাগানো যেত—কিন্তু এই ধরণের কার্য্য কখনই বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক হবে না।

বাস্তবিক পক্ষে যে বিষয়গুলি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে সেগুলো হোল আসন্ন অথবা সুদূর ভবিষ্যতে জাতীয় নিরাপত্তার উপর কি কি সম্ভাব্য বিপদ আসতে পারে? সম্ভাব্য বিপদগুলোর মোকাবিলা করবার জন্য আমাদের কি কি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিতে হবে? দেশীয় সম্পদের উপর অন্যান্য সম্পদের চাহিদার পরিপেক্ষিতে প্রতিরক্ষাখাতে সর্ব্বোচ্চ ব্যয় কত করা যেতে পারে? সর্ব্বোচ্চ নিরাপত্তার ঝুঁকি কতখানি নেওয়া সমীচীন হবে এবং সেই সঙ্গে প্রতিরক্ষাখাতে নূন্যতম কি পরিমাণ ব্যয় করতেই হবে এবং সৈন্য বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার পরিমাণ ও আকার কত খানি হওয়া প্রয়োজন।

অতএব প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় নির্ভর করছে দুটো জিনিষের উপর প্রথমত: সামরিক দিক দিয়ে কি কি আসন্ন বা ভবিষ্যত ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে এবং দ্বিতীয়ত: ফৌজের আকার, গঠন, তাদের কত দামের বা কি ধরণের অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন এবং তার বিকল্প ব্যবস্থা ইত্যাদি। সেনা দলের আকার ও গঠন সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত উপরোক্ত ঐ দুই বিষয়ের উপরেই নির্ভরশীল।

এমনকি ড: হেনরী কিসিংগারের মত বিখ্যাত সমরবিদও এক সময় বলেছিলেন যে আজকের জগতে সমর নীতির উপর আর্থিক ও যান্ত্রিক প্রভাব জঙ্গী প্রভাবকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দেশীয় সম্পদ ও কর্মকুশলতার দ্বারা যে সমর নীতির রূপায়ন সম্ভব নয় সে সমর নীতি মূল্যহীন। সেই রকমভাবে আর্থিক দিক থেকে ব্যয় সংকোচ ক'রে যে সমর নীতি প্রণয়ন কোরতে হয় এবং যা প্রায় কোন নিরাপত্তাই সুনিশ্চিত করে না তাও মূল্যহীন। বস্তুত বলিষ্ঠ সমর নীতি ও বলিষ্ঠ অর্থনীতির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অর্থনীতিবিদদের ও সমরবিদদের উভয়ের সামনেই এক সমস্যা অর্থাৎ সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যয় সীমা।

অপর পক্ষে সেনা বাহিনীর শক্তি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বেছে নিতে হবে মূল্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকি সামলিয়ে আর্থিক দিক থেকে কোন সমাধানটি সবচেয়ে সুবিধাজনক।

আর্থিক দিক থেকে সামরিক প্রস্তুতি সংক্রান্ত যে সব বিষয়ের ওপর বিচার বিবেচনা করতে হবে সেগুলো হ'ল (১) ভবিষ্যৎ সঙ্কটের গুরুত্ব বিচার এবং সেই সঙ্কটের মোকাবিলার জন্য দেশ কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন কোরবে। (২) সম্ভাব্য আসন্ন বিপদের মোকাবিলা করার জন্য কি কি আশু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের বন্দোবস্ত এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় কিছু সংশোধন। (৩) আসন্ন বিপদের মোকাবিলার জন্য জরুরী কর্মসূচী গ্রহণ। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধন কোন একটি দেশের ক্ষমতার মধ্যে নয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে কোন দেশের নিরাপত্তার ঝুঁকির প্রকৃতি ও আকার পরিবর্তিত হয়। তা সত্বেও যদি এই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাগুলিকে বস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে বিচার করা হয় এবং এই মূল্যায়ন যদি নিয়মিতভাবে ও সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়, তা হ'লে এই সব দীর্ঘ মেয়াদী নিরাপত্তামূলক পরিকল্পনাগুলির মাঝে মাঝে পর্যালোচনা করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

সম্ভাব্য বিপদের মোকাবিলা করার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী নিরাপত্তামূলক পরিকল্পনাগুলি, জাতীয় লক্ষ্য, ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্খা এবং আন্তর্জাতিক বা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের রাজনীতিতে দেশ কোন্ ভূমিকা গ্রহণ কোরতে চায় ইত্যাদি অনুযায়ী পরিবর্তিত করতে বাধ্য হতে হয়। এই বিষয়গুলিকে ভৌগলিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা কোরে দেখতে হয়।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষের ভৌগলিক অবস্থান বিশেষ করে সামরিক দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের রয়েছে এক সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একটি নিজস্ব জীবনযাত্রা পদ্ধতি এবং কতকগুলি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান—যে গুলিকে রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। তাছাড়া আমাদের আছে বিপুল সম্পদ।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে শিল্প বুনিয়াদ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমাদের কর্মীদের দক্ষতার মান আরও উন্নত করার জন্যে অবিরাম চেষ্টা চলেছে এবং কয়েক ক্ষেত্রে ভাল ফলও পাওয়া গেছে তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে উন্নতির পরিমাণ আশানুরূপ হয়নি। যদি আমরা যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা চালিয়ে যাই, স্বনির্ভর ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে আসতে বাধ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে এই চেষ্টার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়।

বিপুল সম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের মত একটি দেশকে বিশ্বসভায় অবশ্যই একটি উন্নত আসন গ্রহণ করতে হবে। এটা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন দেশ তার বিরাট ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এমন সামরিক শক্তির অধিকারী হবে। যদি এ দিকে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তা হলে আঞ্চলিক এবং বিশ্বশক্তিগুলি তাদের কার্য্যকলাপের ধরণ স্বাভাবিকভাবেই এমন করবে যাতে আমরা একটা শক্তিশালী ও স্বনির্ভর জাতি হয়ে উঠতে না পারি অন্তত এই আশার বাস্তব রূপায়নে তারা বাধা দেবে। চীন, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের বর্তমান কালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, চীন যত দিন দুর্বল ছিল এবং অন্তর্কলহে বিক্ষিপ্ত ছিল, ততদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ছিল চীনকে একঘরে করে রাখা। কিন্তু যে মুহূর্তে চীন একটা বিশ্বশক্তি হয়ে ওঠার সংকল্প গ্রহণ করল এবং তার রূপায়নে সতর্কভাবে আগুয়ান হ'ল আমেরিকা ধীরে ধীরে একটা বোঝাপড়ায় আসতে শুরু করল এবং এশিয়ায় তথা পৃথিবীতে চীনের যে গুরুত্ব তা, স্বীকার ক'রে নিতে শুরু করল।

বৃহৎ ও আগ্রাসী আঞ্চলিক শক্তিগুলি আমাদের শান্তি ও অনাক্রমণের নীতিকে তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বেশ কাজে লাগাতে শুরু করেছে। বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন করার সম্ভাবনাকে জিইয়ে রাখবার জন্য পাকিস্তানকে বরাবর অস্ত্র সাহায্য দিয়ে চলেছে এবং আমাদের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। এর ফলে এটা বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যতদিন আমরা আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বিদেশী শক্তিগুলির উপর নির্ভর করব, ততদিন আমাদের জাতীয় নীতিকে বহিঃশক্তিগুলির পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। বর্তমানে আমাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যা তাতে কিছুকাল সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাবার পর, আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা যান্ত্রিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠব এবং আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত শিল্পগুলিতে আমরা স্বয়ম্ভরতা লাভ করব এবং তার ফলে বহিঃশক্তিগুলির চাপ থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারব।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় স্বনির্ভরতাই যথেষ্ট নয়, এছাড়াও আমাদের

কিছু করণীয় আছে যার দ্বারা আমরা এশিয়া মহাদেশের এই অঞ্চলে আমাদের উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করতে পারি। সেই জন্যই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকতম যন্ত্র বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে এগুতে হবে। ●

এই অতিরিক্ত ব্যবস্থাগুলো কার্যকরী করতে আরও অর্থের প্রয়োজন হবে। ১৯৭১-৭২ সালের বাজেটে প্রতিরক্ষাখাতে আমাদের ব্যয় ধরা হয়েছে ১২৪১ কোটি টাকা। সাধারণভাবে আমাদের প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় বাৎসরিক শতকরা ৫ ভাগ করে বাড়ছে। এই বৃদ্ধি অংশত মুদ্রাস্ফীতির জন্য এবং অংশত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বর্দ্ধিত ব্যয় এবং আমাদের দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য।

আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি ক্রমশ: ফলবতী হ'তে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং বলা যায় যে ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষাখাতে বিনিয়োগ প্রতিরক্ষা ব্যয় ও মোট জাতীয় উৎপাদনের হারকে ছাপিয়ে যাবে না।

১৯৬২ সালের চৈনিক আক্রমণের পরেই ১৯৬৩ সালে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় এক লাফে অনেকটা বেড়ে যায়। তখন থেকেই আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় একটানাভাবে বেড়ে চলেছে। কিন্তু মোট জাতীয় উৎপাদনের তুলনায় প্রতিরক্ষা ব্যয়ের হার, বৃদ্ধির বদলে হ্রাসের দিকেই যাচ্ছে। নীচের তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে :—

প্রতিরক্ষা ব্যয়

বৎসর	প্রতিরক্ষা ব্যয় (কোটি টাকায়)	প্রতিরক্ষা ব্যয় (মোট জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ হিসাবে)
১৯৬৩-৬৪	৮১৬ ১২	৪ ৫
১৯৬৪-৬৫	৮০৫.৩৮	৩ ৮
১৯৬৫-৬৬	৮৮৪.৭৬	৪.১
১৯৬৬-৬৭	৯০৮.৫৯	৩.৭
১৯৬৭-৬৮	৯৬৮.৪৩	৩.৩
১৯৬৮-৬৯	১০৩৩.৪৯	৩.৬
১৯৬৯-৭০	১১০৪.৭৪	৩.৫
১৯৭০-৭১	১১৫১.৫১	৩.৪
১৯৭১-৭২	১২৪১.৪৬	—.....—

পরিমাণের দিক দিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। কিন্তু মোট প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বিভিন্ন দিকে ব্যয় প্রায় একই আছে। যেমন, কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি ব্যয় প্রায় শতকরা ৫ ভাগ, পেট্রল ও ল্যুব্রিক্যান্ট বাবদ শতকরা ৪ ভাগ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বাবদ শতকরা প্রায় ৩১ ভাগ, বিবিধ নির্মাণ প্রকল্প বাবদ শতকরা ৯ ভাগ এবং গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি অন্যান্য সব বিষয়ে ব্যয় শতকরা ১৩ ভাগ। এর মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ১৯৬৩-৬৪ সালে যেখানে ব্যয় ছিল মোট প্রতিরক্ষা ব্যয়ের প্রায় শতকরা ০.৯ ভাগ—তা বর্ত্তমানে প্রায় শতকরা ১ ৬ ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সত্বেও অন্যান্য দেশ এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটায় যা ব্যয় করে তার তুলনায় এটা কিছুই নয়। যদি প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আমাদের স্বনির্ভরতা লাভ করতে হয়, তবে এই দিকটায় অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সমর-সম্ভার

১৯৫৪ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্য্যন্ত আমেরিকা পাকিস্তানকে তার যত সমরোপকরণের প্রয়োজন ছিল, তা বিনামূল্যে দিয়েছে। তাছাড়া পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের বুনিয়াদ প্রস্তুত করার জন্য সব কিছুই আমেরিকা দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। আমেরিকার দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণ যুদ্ধক্ষয় ও স্বাভাবিক ক্ষয় বাদে এখনও পরিপূর্ণভাবে বর্ত্তমান। ১৯৬৭ সালের পর আবার আমেরিকা পাকিস্তানকে স্বল্পমূল্যে যাবতীয় সমরোপকরণ দিতে আরম্ভ করেছে। চীনও গত পাঁচ বছরে পাকিস্তানকে বিনামূল্যে প্রায় ২০ কোটি ষ্টারলিং মূল্যের সমরোপকরণ দিয়েছে। এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, ১৯৭১-৭২ সালের পাকিস্তানী বাজেটে সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ (পাকিস্তানী টাকার অঙ্কে) ৩৪০ কোটি টাকা ধার্য্য হয়েছে বলে জানা গিয়েছে—যা তার মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ।

আমেরিকান পর্যাবেক্ষকদের মতে চীনের সমর ব্যয় প্রায় ৬০০০ কোটি টাকার মত অর্থাৎ তার মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৯ থেকে ১০ ভাগ। আমাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা রচনাকালে এই সব বাস্তব তথ্যের কথা ভুললে চলবে না। চীনের এই বিরাট সমর ব্যয়ের কারণ তার পারমাণবিক কর্মসূচী, ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচী ও যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ কর্মসূচী। অদূর ভবিষ্যতে চীনের সামরিক ব্যয় আরও বেড়ে যাবে কারণ, সে

তার পদাতিক বাহিনীকে অধিকতর সক্রিয়, বিমান বাহিনীর আক্রমণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নৌবাহিনীকে আরও সুদৃঢ় ও দক্ষ করার কাজে হাত দিয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া

আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পূর্ণ ব্যবহার যখন আমরা করতে পারব, তখনই আমাদের এই প্রতিরক্ষা ব্যয় ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বর্দ্ধিত ব্যয়ের জন্য ঈপ্সিত ফললাভ সম্ভব হবে। জাতীয় একীকরণের কাজে প্রতিরক্ষা বাহিনী একটা বিরাট বাহনের কাজ করে। যান্ত্রিক ও কারিগরী উন্নয়নের কাজেও তারা, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ও প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্পগুলির মাধ্যমে একই রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অতএব দীর্ঘ মেয়াদী ও সুষম প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে সুনির্ব্বাচিতক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে যথোপযুক্ত অগ্রাধিকার দিলে আমরা যে কেবল জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত হব তা নয়, পরন্তু এর থেকে আমরা যান্ত্রিক ও কারিগরী বিদ্যায় স্বনির্ভরতা লাভ করব—যার ফলে দেশে শিল্প স্থাপনায় একটা প্রবল প্রবণতা দেখা দেবে এবং দ্রুততর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করবে।

অদূর ভবিষ্যতে যদি অভাবনীয় বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে হয়ত আমাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলির কিছু রদবদল করতে হতে পারে এবং স্বদেশে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন করা উপস্থিত সম্ভব নয়, সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিদেশ থেকে আনবার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা করতে হতে পারে। আমাদের সীমান্তে ক্রমবর্দ্ধমান বিপদের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী থাকবার জন্য বর্ত্তমানে আমাদের বিদেশ থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র আনতে হচ্ছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কাজ যতই এগুবে আকস্মিক বিপদের মোকাবিলা করা ততই সহজ হবে। প্রসঙ্গক্রমে এটা মনে রাখা দরকার যে, বিদেশ থেকে যে সব অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়, সেগুলি আমাদের স্থায়ী ও মূল সম্পদ অথবা তার অংশ—তাই যতক্ষণ একই ধরণের অস্ত্রশস্ত্র না কিনতে হচ্ছে, ততক্ষণ উপরোক্ত ধরণের ক্রয় জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

আসন্ন বিপদের মোকাবিলার জন্য কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেনার বন্দোবস্ত করা বা দেশীয় উৎপাদন বাড়ান এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর হাতে নতুন ধরণের অস্ত্র তুলে দেওয়ার মত পর্য্যাপ্ত সময় আমাদের হাতে থাকে না। সুতরাং আসন্ন বিপদের মোকাবিলা, আমাদের বর্ত্তমান প্রতিরক্ষা শক্তি এবং এ পর্য্যন্ত সঞ্চিত অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ দিয়ে যে করেই হোক করতে হবে। যদি কোন যুদ্ধে আমরা এখন জড়িয়ে পড়ি তাহলে স্বভাবতই তা স্বল্পকালীন হবে। এই সমস্ত কারণে সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় বেড়ে যাবে।

এ ছাড়া আরও কিছু

১৯৬৫ সালের যুদ্ধ ব্যয় হিসাব করে দেখা গেছে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ কোটি টাকার মত অর্থাৎ এই টাকায় ২ টাকা ৫০ পয়সা দৈনিক হারে ১ কোটি উদ্বাস্তুর ২০ দিনের অন্ন যোগান যেত।

যুদ্ধজনিত প্রত্যক্ষ অপচয়গুলো ছল যেমন সৈন্য চলাচলের অতিরিক্ত ব্যয় ও যুদ্ধে নিয়োজিত যানবাহনের ক্ষতি, যুদ্ধ যদি শত্রুর মাটিতে হয়, তাহলে যুদ্ধজনিত পরোক্ষ অপচয়ের পরিমাণ আমাদের মাটিতে যুদ্ধ হওয়ার চেয়ে কম হয়। তাছাড়া শত্রুর মাটিতে যুদ্ধ হওয়ার অর্থই যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তি। স্বল্পকালীন তীব্র যুদ্ধে ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী না হলেও শান্তি এর চেয়ে সহস্রগুণে কাম্য। বিশেষ করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটা সত্য কারণ আমাদের বৈদেশিক নীতির ভিত্তিই হল শান্তি ও সহাবস্থান। সম্পূর্ণ সজাগ থেকে যে কোন বৈদেশিক আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য তৈরী থাকলেই শুধু শান্তি রক্ষা করা সম্ভব। সুতরাং জরুরী অবস্থার জন্য সৈন্যদের সদা প্রস্তুত রাখা ও তাদের সীমান্তে মোতায়েন করা সব সময়েই আর্থিক দিক থেকে বিবেচিত।

'এই সেই ভারত—যাহা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার শত শত বৈদেশিক আক্রমণ ও শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় সহিয়াও অক্ষয় আছে। এই সেই ভূমি যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য ও অমর জীবন লইয়া ভূপৃষ্ঠের যে-কোন পর্বত অপেক্ষাও অটলভাবে দণ্ডায়মান।''

—স্বামী বিবেকানন্দ

নতুন কর ব্যবস্থা কি ঘাট্‌তি পূরণ করবে ?

বিগত কয়েক মাস ধরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত একটানা জনস্রোত আমাদের অর্থনীতিতে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে তা কাটিয়ে ওঠবার জনাই গত ২২শে অক্টোবর সরকার তিনটি অর্ডিনান্স জারি করেছেন। মোট ৯৫ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে এখনও প্রায় ৬৫ লক্ষ মানুষ তাঁবুতে বসবাস করছেন। অক্টোবরের শেষ অবধি এঁদের জন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই খরচ হ'য়ে গেছে। ব্যয়ের অঙ্ক এ বছরের শেষাশেষি ৫০০ কোটি টাকায় পৌঁছবে বলে মনে হয়। অন্যান্য দেশ থেকে মাত্র ১৩০ কোটি টাকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে যার মধ্যে অর্দ্ধেকও এখনো এসে পৌঁছায়নি। পূর্ববঙ্গ থেকে জনস্রোত এখনও অব্যাহত আছে এবং এখনও প্রতিদিন ১৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ সর্বহারা এপারে চলে আসছেন। সরকারের অনুমান আগামী মাসের শেষাশেষি এই সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষতে দাঁড়াবে এবং যদি তাই হয় তা হ'লে, ব্যয়ের পরিমাণ ৭০০ কোটিতে দাঁড়াবে।

এই নতুন কর থেকে পাওয়া ৭০ কোটি টাকার রাজস্ব, এই বিরাট ব্যয়ের বোঝা আংশিকভাবে লাঘব করবে মাত্র। বাস্তবিক, এই ৭০ কোটি টাকা সহায় সম্বলহীন উদ্বাস্তুর তিন সপ্তাহের খরচ মাত্র।

নতুন কর বসানোর পিছনে উদ্বাস্তু আগমনই একমাত্র কারণ নয়। গত মে মাসের শেষে যে ২৩৫ কোটি টাকার এবং আগামী ডিসেম্বরের শেষে যে ৪৬৫ কোটি টাকার যে বাজেট ঘাট্‌তি দেখা দেবে, তা কিছু পরিমাণে লাঘব করবার জনাই এই নতুন করের বোঝা। কিন্তু ৭০ কোটি টাকার এই অতিরিক্ত রাজস্ব এই বিরাট ঘাট্‌তি লাঘবে সামান্যই সাহায্য করতে পারবে। দেশের অর্থনীতি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে দেশের নাগরিকগণকে কি পরিমাণ কর ভার বহন করতে হবে এটা তারই একটা ইঙ্গিত।

করগুলি কি ?

প্রথম অর্ডিন্যান্সে যে করের কথা বলা হয়েছে, সেই অনুযায়ী ১ টাকা বা তার ওপরে রেল ও অন্তর্দেশীয় বিমানে শতকরা ৫ ভাগ করে ভাড়া বৃদ্ধি। দ্বিতীয় অর্ডিনান্সে পোষ্ট কার্ড ও রেজিষ্ট্রীকৃত খবরের কাগজগুলি ছাড়া যাবতীয় পোষ্ট অফিস পরিবাহিত কাগজপত্রের দাম বাড়ল ৫ পয়সা করে। আর তৃতীয় অর্ডিনান্সে যাবতীয় ঋণ পত্র, বিনিময় পত্র ও বীমার দেয় কিস্তির উপর ১০ পয়সা হারে শুল্ক বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র পত্রিকার ওপর ২ পয়সা হারে শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, রাজ্য সরকারগুলিও রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর শীঘ্রই নতুন কর বসাবেন। ১৫ই নভেম্বর থেকে এই করগুলি কার্যকরী হয়েছে। এই সব কর থেকে রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতা সাপেক্ষে আগামী সাড়ে তিন মাসে ২৫ কোটি টাকা অর্থাৎ পুরো বছরে ৭০ কোটি টাকার মত পাওয়া যাবে।

করের এই উৎসগুলি থেকে অধিকতর আয়ের সম্ভাবনা বর্তমান এবং জনসাধারণের এক বিরাট অংশ এই করগুলির আওতায় পড়বেন—সুতরাং আয়ের অঙ্ক পূর্ব নির্ধারিত অঙ্ককেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু অধিকতর আয়ও ঐ বিরাট ব্যয়ের মাত্র আংশিক সুরাহা করতে পারবে। এখন ঐ বিরাট বাজেট ঘাট্‌তিতে এই করের প্রতিক্রিয়া কি হবে—তা দেখা দরকার।

ঘাট্‌তি পূরণ হবে কি করে ?

মে মাসের বাজেটে প্রায় ২৩৫ কোটি টাকার মত ঘাট্‌তি দেখানো হয়েছে। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই বন্যা ও খরায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিকে ১০০ কোটি টাকার সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। তাছাড়া নানান নতুন নতুন পরিস্থিতি উদ্ভবের ফলে বাজেটে ঘাট্‌তির পরিমাণ পূর্ব নির্ধারিত ৫০ কোটি টাকার মাত্রাকে ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে। এই মাসের গোড়ার দিকে উড়িষ্যায় সাইক্লোনের ফলে যে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছে—তার জন্যও কেন্দ্রীয় রাজকোষের ওপর যথেষ্ট চাপ পড়বে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী উড়িষ্যার সাইক্লোন বিধ্বস্ত জায়গাগুলি পরিদর্শনকালে প্রতিশ্রুতি দেন যে, ত্রাণ কার্য্যের জন্য টাকার অভাব হবে না। এ সব ছাড়া উদ্বাস্তুদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ তো আছেই। অনুমান করা যাচ্ছে যে ঘাট্‌তির পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকার অঙ্ককে ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং এই ৭০ কোটি টাকা দিয়ে এই বিরাট ঘাট্‌তি মেটানো যাবে না।

চতুর্থ যোজনার প্রথম তিন বছর ধরে একটানা ঘাটতি বাজেট চলেছে—তার ফলে হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি। পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ যোজনার পরিকল্পনাকালে স্থির করেছিলেন যে আমাদের অর্থনীতিতে বিপর্যয় না এনে উন্নতির সঙ্গে স্থায়িত্ব অর্জন করতে হ'লে বিশেষ করে স্থায়িত্ব অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে হলে মোট পরিকল্পনা কালে ৮০০ কোটি টাকার বেশী ঘাটতি হতে দেওয়া উচিত হবে না। কিন্তু যা দেখা যাচ্ছে এই বছরেই ঘাটতির পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

উদ্বাস্তু সমস্যা ছাড়াও আর একটা বড় সমস্যা হ'ল এই যে আমাদের অর্থনীতি এখনও বেশ দৃঢ় হয়ে ওঠে নি। কৃষি ক্ষেত্রেও কুটির শিল্পের অগ্রগতি নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ। কিন্তু বৃহৎ শিল্পের অবস্থা বেশ উদ্বেগজনক। এই বছরের প্রথম চার মাসে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগের বেশী বাড়ে নি। এই বছর জানুয়ারী থেকে এপ্রিল অবধি শিল্পোৎপাদনের সূচক ১৮৪.৭ এর বেশী এগোতে পারে নি। গত বছর এই সময় শিল্পোৎপাদনের সূচক ছিল ১৮৩। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল এই চার মাসের উন্নয়ন হারের সঙ্গে ১৯৭০ সালের ঐ সময়ের উন্নয়ন হারের তুলনা করলে শতকরা মাত্র ৬ ৪ ভাগ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। শিল্পে এই অধোগতির কারণগুলি পরিকল্পনা কমিশন অনুসন্ধান করে দেখছেন।

চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে, গত বছরের ঐ সময়ের তুলনায় নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা শতকরা ৯ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ১৮ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

দ্রব্য মূল্য সমস্যা

মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে আমাদের সামনে সবচেয়ে সাংঘাতিক সমস্যা হ'ল দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি। যে বছরে রেকর্ড পরিমাণ শস্যোৎপাদন হয়েছে সেই বছরেই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াটা কেমন যেন অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। যে সালের বাজেটে ধার্য করগুলির পরিমাণ ছিল সামান্য এবং সুনির্বাচিত ক্ষেত্রে; তাই এর দ্বারা দ্রব্য মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাবে না বলেই কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন। সরকারের হাতে টাকা পয়সা লেন-দেনের ভাণ্ডার রয়েছে, তাই অসাধু ব্যবসায়ীরা স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে ইচ্ছামত জিনিষের দাম বাড়াতে পারে না। তবে ঋণ দানের ক্ষেত্রে হয়তো কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে বিষয়টি এমনকি সরকারী মুখপাত্ররাও ব্যাখ্যা করেন নি—তা হ'ল সর্বজনবিদিত 'কালো টাকা'। 'কালো টাকা' আর একটা সমান্তরাল অর্থনীতির বুনিয়াদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, আজ আমাদের অর্থনীতির এই বিপর্যয়ের বা অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির কারণ হ'ল কালোটাকার লেনদেন, প্রচুর বাজেট ঘাটতি, আর রাজ্যগুলির বেহিসাবী খরচ। সামাজিক ন্যায় বিচার, স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুর্বতন সরকার বিপুল ভোটাধিক্যে আবার ক্ষমতায় আসীন। উদ্বাস্তু সমস্যা জনমানসে একটা স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতির সাড়া জাগিয়ে তুলেছে এবং এতে সরকারী সমর্থন রয়েছে। সরকারও সমাজের ধনী সম্প্রদায়ের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করে সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্রতী হয়েছেন।

চতুর্থ যোজনায় অতিরিক্ত ৩,১৯৮ কোটি টাকা সংগ্রহের কথা বলা হয়েছে—কেন্দ্র কর্তৃক (২,৩০০ কোটি টাকা) এবং রাজ্যগুলি কর্তৃক (১,০৯৮ কোটি টাকা)। এই অঙ্কটি সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্যে প্রয়োজনীয় মোট ১৫,৯০২ কোটি টাকার প্রায় এক পঞ্চমাংশ। যোজনার প্রথম তিন বছরে রাজ্যগুলি মোট ৭৭৭ কোটি টাকা সংগ্রহে সক্ষম হয়েছেন এবং বাকী দু বছরে সংগ্রহের জন্য ৩২১ কোটি টাকা রেখে দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে স্থির হয়েছে যে, চতুর্থ যোজনার বাকী দু বছরের প্রতি বছরে ১০০ কোটি টাকা ক'রে সংগ্রহ করতে না পারলে রাজ্যগুলির পক্ষে ১,০৯৮ কোটি টাকা তোলা সম্ভব হবে না।

গোপন ঐশ্বর্য্য

মুখ্য মন্ত্রী সম্মেলনে আলোচিত সমস্যাগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন নি বা এই সম্মেলনের পূর্ণ সুযোগ নেন নি। সংবাদপত্রে ও নানা জনসভায় কৃষি আয়ের ওপর এ পর্যন্ত কর না বসানোর জন্য প্রচুর হৈ-চৈ, বাগবিতণ্ডা হওয়া সত্ত্বেও মুখ্য মন্ত্রীগণ কৃষি আয়ের ওপর কর বসানোর বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। অধিকাংশ রাজ্যে বলবৎ নিয়ম অনুযায়ী কোন লোক চাষবাস ক'রে ১০,০০০ টাকা উপার্জন করলে কর দেবেন মাত্র ২০ টাকা, কিন্তু ঐ ১০,০০০ টাকা চাষবাস ছাড়া অন্য যে কোন উপায়ে রোজগার করলে তাকে কর দিতে হবে ৬০০ টাকা। মহারাষ্ট্র এবং এইরকম আর কয়েকটি রাজ্যে ৩৬,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি আয় কর—কাঠামোর সম্পূর্ণ বাইরে।

কৃষি আয়কর থেকে পাচ্ছে রাজ্যগুলির আয়ের পরিমাণ মোট প্রত্যক্ষ করের এক দশমাংশ, আর তা হচ্ছে রাজ্যগুলির আর্থিক

(৩য় কভারে দেখুন)
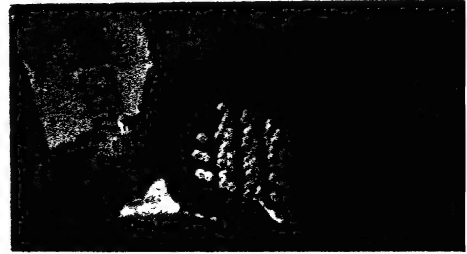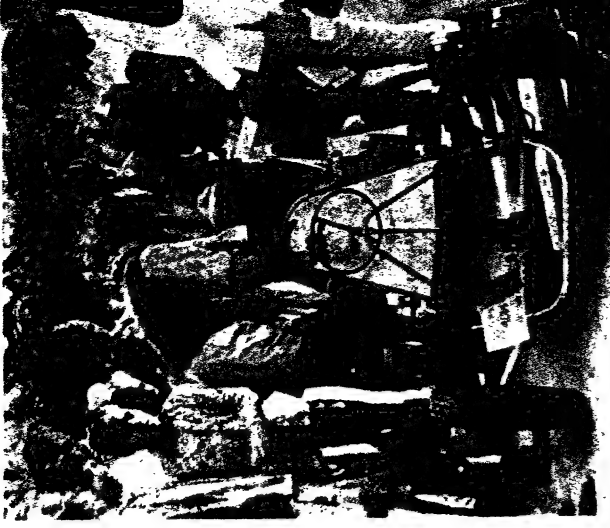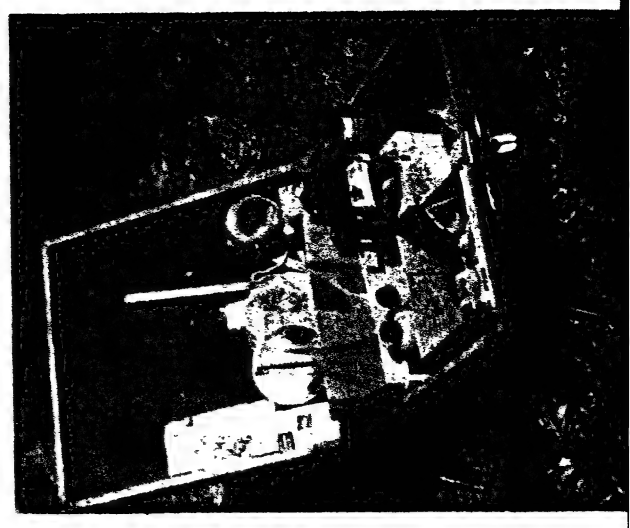
জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী

এবারের শীতে রাজধানীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল, স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন কারিগরী বিদ্যালয়ের কিশোর বিজ্ঞানীদের দ্বারা আয়োজিত এক বিজ্ঞান প্রদর্শনী। চাচা নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয় শিশু দিবসে অর্থাৎ পরলোকগত প্রধান মন্ত্রীর জন্মদিন ১৪ই নভেম্বরে।

দিল্লীর ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর সামিয়ানা দিয়ে ঢাকা মনোরম উদ্যানে ছবির মত সাজানো পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই মেলায় সারাদিন ধরে স্কুলের ছেলেরা দলে দলে এসে ভীড় জমায়। প্রদর্শনীর মুখ্য আকর্ষণ ছিল পণ্ডিতের সঙ্গে কথোপকথনরত নেহেরুজী ও আইনস্টাইনের একটি ফটোগ্রাফ। প্রদর্শনীটি চলে এক সপ্তাহ।

দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত স্কুল, কলেজের ছেলেরা অনেক দোকান খুলেছিল এই মেলায়। উৎসাহী কিশোর দল, উৎসুক দর্শকের প্রশ্নের উত্তর দেয় অতি সুস্পষ্ট ভাষায়, স্থির বিদ্যুৎ, গতিশীল বস্তুকনা, নানান দুর্লভ সব মেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণীর সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্যগুলো প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে। ভাবটা এমন যেন একজন আর এক জনকে টেক্কা দিতে চায়। প্রদর্শনীতে রাখা 'ডি এন এ' মলিকিউলের মডেলগুলি, নতুন রকমের স্বদেশী কম্পিউটর ইত্যাদি দেখলে মনে হয়, সুযোগ পেলে এরা কয়েক বছরের মধ্যে তাদের বড়দের ওপর টেক্কা দিতে পারবে। জলন্ধরের ডি এ ভি কলেজ অর্থাৎ দেশ বিভাগের আগে লাহোরের সেই কলেজটি যেখান থেকে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা ১৯৪৩ সালে তাঁর প্রথম বিজ্ঞান ডিগ্রী পেয়েছিলেন, সেই কলেজটিও দর্শকদের জন্য কয়েকটি বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রদর্শনীতে রাখে।

অধিকাংশ স্কুলেই এই প্রথম দিল্লী আসে। ৮ বছরের ছেলে সুরাটের মুকুর সে [illegible] বলে যে সে এ পর্যন্ত মাত্র গোটা ছয়েক দোকান ভাল করে দেখতে পেরেছে। পরে ক্লাশে পড়বার জন্যে প্রদর্শনীর আকর্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে তারা সংক্ষিপ্ত নোট লিখে রাখছে। মুকুর মনে করে যে প্রদর্শনীর রসায়ন বিভাগটি বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক।

আপনি যদি চান তাহলে মুকুর আর তার বন্ধুরা আপনার আঙুলে সূচ ফুটিয়ে একটু রক্ত বার করে নেবে এবং তারপর তারা আপনার রক্তের গ্রুপটি জানবার জন্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করবে। এরপর তারা আপনাকে আপনার রক্তের গ্রুপ জানিয়ে দেবে। রক্ত পরীক্ষায় যে যে রাসায়নিক পদার্থ লেগেছে এবং যে পদ্ধতিতে তা করা হয়েছে সে সম্বন্ধেও একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আপনাকে দিয়ে দেবে। প্রদর্শনীতে দেখাবার জন্যে তারা তাদের সঙ্গে আরও দু'তিনটি পরীক্ষার যন্ত্র নিয়ে এসেছে। তার মধ্যে একটা হল কাচের যন্ত্র যাতে পানীয় জলে কোন রকম দ্রবীভূত ময়লা থাকলে, তা ধরা পড়ে। মুকুরের কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায়, যে সে বড় হয়ে ডাক্তার হতে চায়।

এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় বিষয় হ'ল এই যে এইসব কিশোর মনের ঐকান্তিকতা যা সহজেই আপনার মন জয় করে নেবে। এই প্রদর্শনীতে ট্রানজিসটর, ফটো ইলেক্‌ট্রিক সেল এবং আরও নানান রকমের আধুনিক বিজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আপনি দেখতে পান। সবচেয়ে আনন্দ পাবেন একটি বছর বারো বয়সের ছেলেকে দেখে। তার প্যান্টের দুটো পকেট ভর্তি করেছে সে নানা রকমের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরী করার ছোটখাট মালমশলা দিয়ে। এই কিশোরের দল আপনাকে উদ্ভিদ এবং আপনার নিজের পাচন প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও একটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে।

এই প্রদর্শনীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হ'ল ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স এডুকেশন (NCSE)। বৈজ্ঞানিক খেলনাপাতির প্রদর্শনী করাই ছিল এঁদের প্রথম লক্ষ্য। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন যে এই ধরণের খেলনা তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে হাতে গোনা যায় তখন তাঁদের সে ধারণা বদলে গেল।

বৈজ্ঞানিক খেলনা তৈরী করার জন্য যেসব ছোট ছোট সংস্থা প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নাম করা হ'ল 'সন্ধ্যা-লোকের ডাইনামো'। ২৯ বছর বয়সের ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীহরি পরমেশ্বরণ, তাঁর ভাই এবং অন্য ছয় জন কর্মী নিয়ে, ১৯৬৪ সালে ২০,০০০ টাকা মূলধন দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। আজ তাঁদের কারখানায় কর্মী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ জন এবং বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্য এখন প্রায় ৮ লক্ষ টাকার মত। তাঁদের এই কারখানাটি হ'ল ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রথম কারখানা। তাদের তৈরী ইলেক্‌ট্রিকিটএর জন্য তাঁরা ইনভেনশন প্রোমোশন বোর্ড এর কাছ থেকে একটা পুরস্কারও পেয়েছেন। সাহায্য পাবার জন্যে অফিসের নানা জটিল ক্রিয়াকলাপের

তৃতীয় কভারে দেখুন

যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং আলোচনা-কালে এই দিকটির উপর আলোচনা চক্রে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট আর একটি ব্যাপার হচ্ছে যে সম্ভাব্য সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য আমাদের দেশীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি কতখানি সক্ষম। এই সমস্যাটি মোটেই একটি ছোট সমস্যা নয়।

এ ব্যাপারে প্রধানত: দু ধরণের অসুবিধা দেখা দিতে পারে যেমন—গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি করে সম্পদের উপযুক্ত বন্টন করা যায় এবং প্রকল্পগুলির সুষ্ঠুভাবে রূপায়ন কিরূপে সম্ভব হবে অধিকতর সম্পদ আহরণে এবং সম্পদের পূর্ণব্যবহার সক্ষমতা কি করে বাড়ান যায়, এই প্রচেষ্টা যে প্রতিষ্ঠানগুলি সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রথম নাম করতে হয় পারমানবিক শক্তি উদ্যোগের।

প্রাধান্য নির্দ্ধারণে আর একটা সম্ভাব্য সমস্যা হ'ল জনশক্তি—দক্ষ ও কুশলী লোকের অভাব এবং অল্প শিক্ষা প্রাপ্ত বা আদৌ শিক্ষণ প্রাপ্ত নয় এমন বেকারের আধিক্য।

গবেষণা কর্ম্মের সমন্বয়

সমন্বয় সাধনের কাজ উপযুক্তভাবে হ'লে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিনিয়োগ থেকে সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হবে এবং সক্রিয় ও সদিচ্ছাপূর্ণ সহযোগিতাই একমাত্র উপযুক্তভাবে সমন্বয়ের কাজ করতে পারে। এই দিকটিতে আরও উদ্দেশ্যপূর্ণ ও কার্য্যকারী সমন্বয় যাতে সম্ভব হয় সে জন্য নানান সুপারিশ করা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যে বিভিন্ন দিকে গবেষণার মধ্যে নিখুঁত যোগাযোগের অভাব গবেষণার একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পারস্পরিক যোগাযোগের চেয়ে অনেক বেশী। এই সমস্যার সমাধানকল্পে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সুতরাং দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় যে গবেষণা কেন্দ্রগুলি আছে, সেই সব জায়গায় স্থানীয় ভিত্তিতে আরও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনা চক্রের আয়োজন করতে হবে। স্থানীয় বিজ্ঞান সমিতিগুলির সহযোগিতায় এই আয়োজন করা সম্ভব হবে। ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে ইতিমধ্যে আয়োজিত এই ধরণের আলোচনা চক্রগুলি এই দিকে একটি সঠিক পদক্ষেপের সূচনা করেছে। এর ফলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণারত বিজ্ঞানীদের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময়ের একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'বে। গবেষণা প্রকল্পগুলির জাতীয় সূচীর সঙ্কলনে রত ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল সায়েন্টিফিক্ ডকুমেন্টেশন সেন্টারের কাজকর্মের ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করে দিতে হবে। কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে সরেজমিন পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত জাতীয় সূচকটি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং তা যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের কাজে লেগেছে।

গবেষণারত বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগাযোগের অভাব একটা দারুণ আকার ধারণ করেছে। এই অভাব মেটাবার একটি উপায় হ'ল গ্রীষ্মের সময় জাতীয় গবেষণাগারগুলিতে কাজ করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিজ্ঞানীদের আরও সুযোগ সুবিধা দানের বন্দোবস্ত করা। জাতীয় গবেষণাগারগুলিতে কর্মরত বিজ্ঞানীদেরও এই ধরণের সুযোগ সুবিধা দানের ব্যবস্থা করা দরকার। স্থান পরিবর্তন ও ঋণ ব্যবস্থার মত আরও শিক্ষা সম্পর্কীয় নানান ব্যবস্থার মাধ্যমে গবেষণারত ছাত্রদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করতে হবে। আলোচনা চক্রে আরও যে সব ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে, সেগুলো হ'ল গবেষণারত ছাত্রদের দেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, গবেষণাগারগুলিতে সময়ে সময়ে নতুন নতুন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, দামী যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহারে যাতে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

সমবেত বিজ্ঞানী মণ্ডলীর মতে মূল নীতি নির্ধারণের জন্য বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় জাতীয় কমিটিতে কয়েকজন স্থায়ী সদস্য নিয়োগ, তাদের সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত যান্ত্রিক ও প্রশাসনিক কর্মচারী নিয়োগ—যারা বিভিন্ন তথ্যগুলিকে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ ও সংকলন করতে সক্ষম, এবং তথ্য সরবরাহ ও প্রাপ্তির জন্য একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। এই জাতীয় কমিটির কাজ হবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারগুলির কাজের সমন্বয় সাধন করা এবং সরকারী ও বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কর্মরত বিবিধ গবেষণাগারের কাজেরসমন্বয় সাধন করা এবং ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের মত শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় জাতির কমিটির নিবিড়ভাবে যোগাযোগের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

কর্তব্যের রূপায়ন

কর্মী পর্যায়ে বিবিধ কাজের সমন্বয়ের অভাবের ফলেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং বিবিধ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় আশানুরূপ সাফল্যলাভ সম্ভব হচ্ছে না। একই পর্যায়ে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগীতা কোন পরিকল্পনার সাফল্যজনকভাবে রূপায়নে একান্তই প্রয়োজনীয়।

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষৎ কর্তৃক আরব্ধ সর্বভারতীয় সমন্বিত—গবেষণা প্রকল্পগুলিতে গৃহীত কতকগুলি নীতি ও পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গবেষণা কর্ম থেকে সুফল পেতে হলে গবেষণালব্ধ সুফলগুলির সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য একটি উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার—যার ফলে গবেষণালব্ধ ফলগুলি উৎপাদন ও সমগ্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে কতদূর কার্যকরী হবে এ সম্বন্ধে খবর নীতি-নির্ধারকগণ ও সাধারণ মানুষ উভয়ের কাছে একই সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। যে সব জায়গায় গবেষণার কোন সুযোগ-সুবিধা বর্তমানে নেই সেই সব জায়গায় বড় বড় গবেষণাগারগুলির শাখা স্থাপন করতে হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ সুফলগুলি যাতে শিল্পে উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, সেজন্য জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রকল্প রচনায় এবং প্রকল্প রূপায়ণের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানমূলক সমীক্ষা চালাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় জাতীয় কমিটি সরকারী প্রকল্পগুলির রূপায়ন এবং প্রকল্প-গুলির রূপায়নে যে সব বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলির দূরীকরণে কতদূর সাফল্যলাভ করা যাচ্ছে—সে সম্বন্ধে একটানাভাবে মূল্যায়নের কাজ করবেন।

বহুবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বলিত প্রকল্পগুলির সাফল্যের পেছনে যে সমস্ত কার্যকারণ ক্রিয়াশীল সেগুলি প্রকাশ করা হলে পারস্পরিক সহযোগীতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন প্রকল্প রচনার কাজে যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হওয়া যাবে।

বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের দেশান্তর গমন

আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের কি ভারতে কি বিদেশে উপযুক্তভাবে কি করে কাজে লাগানো যায়—এই প্রসঙ্গটি সম্মেলনের একটি অধিবেশনে আলোচিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে প্রায় ১০ লক্ষ কৃতি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ আছেন। তাদের মধ্যে প্রায় ১৫০০০০ জন ভারতবর্ষে বেকার জীবনযাপন করছেন এবং প্রায় ৩০,০০০ জন বিদেশে কর্মরত। একটি বিবরণ অনুযায়ী ভারতীয় কৃতি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি-বিদদের নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

করতে হবে এবং এখনো যারা কর্মহীন, তাদের উপযুক্ত কর্ম সংস্থান করতে হবে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁদের দান থেকে সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হয়েছেন, এই ধরণের যে সব বিজ্ঞানী বিদেশে কর্মরত আছেন—সমগ্র মানব জাতির জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁদের যুগান্তকারী প্রতিভা আরও জ্ঞান সংযোজন করবে—এই কথা মনে রেখেই তাঁদের স্বদেশে আনয়নের চেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু তাঁদের সাধনালব্ধ ফল যাতে আমাদের উপকারে আসে, সেজন্য তাঁদের স্বদেশে আসার এবং বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে কর্মরত বিজ্ঞানী সমষ্টিব্যাপারে এদেশে তাঁদের

শ্রেণী	মোট সংখ্যা	স্নাতকোত্তর শিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের সংখ্যার শতকরা হিসাব
বিজ্ঞান	৬,০০০	৮৪
প্রযুক্তি ও কারিগরী বিদ্যা	১৫,০০০	৪০
চিকিৎসা বিদ্যা	৯,০০০	৬৭

বর্তমানে সঞ্চিত সম্পদের যারা কতটা উপযুক্তভাবে বর্তমানের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কাজে লাগান যায়, এই উদ্দেশ্যে রূপায়িত যে কোন পন্থাই আমাদের উপকারে আসবে। যে সব পন্থা অবলম্বন করলে সবচেয়ে বেশী সুফল পাওয়া সম্ভব, স্বাভাবিকভাবেই সেগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। দেশে কর্মরত শতকরা ৮৩ জন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের উপযুক্তভাবে কাজে লাগানই এই বহির্গমন বন্ধ করার জন্য যে কোন পরিকল্পনায় একটি অত্যা-বশ্যকীয় অঙ্গ হিসাবে কাজ করবে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে এখনই বিদেশে কর্মরত বিজ্ঞানীদের স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত

অবস্থান দীর্ঘায়িত করার জন্য আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভারতবর্ষের ভাল ভাল গবেষণাগারগুলিতে ইতিপূর্বেই লব্ধ বিভিন্ন সাফল্যগুলি সম্বন্ধে অবগতির জন্য এদেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে যদি কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগার স্থাপন করা যায়, তাহলে বিদেশে কর্মরত খ্যাতনামা কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানীকে ভারতে আনয়ন করা সম্ভব হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আই. এ. ই. এবং এই ধরণের অন্য কতকগুলি আন্তর্জাতিক সংস্থা এশিয়া মহাদেশের সাতটি দেশে এই ধরণের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলির একটিও ভারতবর্ষে নেই। এই লক্ষ্যবিশিষ্ট একটি

প্রচেষ্টা শুধু বিদেশে কর্মরত নামী কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর ভারতে পুনরাগমনের ব্যবস্থাই করবে না, পরন্তু ভারতবর্ষে কর্মরত বিজ্ঞানীদের কাজকর্মের দিক থেকে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিক দানের ব্যাপারেও অনেক সুবিধার সৃষ্টি করবে।

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের বহির্গমন রোধ করার ব্যাপারে আমাদের প্রধান চেষ্টা হবে মধ্যম মানের প্রতিভাগুলিকে দেশে রাখার —যারা জাতির বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন এবং দেশে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মান উন্নয়নে সাহায্য করবেন।

বিজ্ঞানীদের যে সমিতিটি আছে তা প্রায় গত দশ বছর ধরে স্বদেশ প্রত্যাগত বিজ্ঞানীদের সাহায্য করে আসছে এবং আরও অনেককে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আই. আই. টি (কানপুর) এবং এই রকম প্রতিষ্ঠানগুলি আর বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স এবং এই ধরণের সংস্থাগুলি প্রার্থীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিদেশেই নেবার ব্যবস্থা করেছেন এবং এই সব প্রার্থীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন।

প্রকল্পের জন্য রচিত সুসম্পূর্ণ কর্মসূচী থেকে এই সব পৃথক পৃথক প্রচেষ্টা যদি নানাভাবে সাহায্য পায়, তাহলে লক্ষ্য সাধন আরও সহজতর হবে। প্রাধান্যযুক্ত প্রকল্পগুলির কাজ চালাবার জন্য অর্থাৎ প্রকল্পগুলির রূপায়ণের জন্য যে কর্মীগোষ্ঠিগুলি থাকবে সেইগুলির সদস্য হিসাবে কাজ করার জন্য যাতে যোগ্য ব্যক্তির সাহচর্য্য পাওয়া যায়—সে জন্যও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। প্রাণী বিজ্ঞানের আণবিক শাখার বা পদার্থের ধর্ম ও গুণ সম্বন্ধে গবেষণার কাজগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে করার বন্দোবস্ত করতে হবে। বিশুদ্ধ এবং ফলিত উভয় ক্ষেত্রেই গবেষণার ফলে প্রচুর পরিমাণে সুফল পাওয়া যাবে। কিন্তু তার জন্য যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ আরম্ভ করতে হবে। সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিগোষ্ঠির সহায়তা পেতে গেলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কাজগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে এগোতে হবে।

বিদেশে যে সব ভারতীয় বর্তমানে কর্মরত আছেন, তাঁদের বেশীর ভাগই হয় প্রযুক্তিবিদ আর নয় তো চিকিৎসক। ভারতবর্ষে দ্রুত শিল্পায়ন এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধার প্রসারের জন্য এই প্রযুক্তিবিদ ও চিকিৎসকদের মধ্যে গবেষণার কাজে লিপ্ত আছেন, এমন ব্যক্তিদের স্বদেশের আনয়নের ওপর বেশী জোর দিতে হবে কারণ এই ধরণের লোকের আমাদের দেশে যথেষ্ট অভাব আছে।

সর্বোচ্চ সৃজনী প্রতিভা

মেধাবী ব্যক্তিদের বহির্গমন রোধ করার ওপর জোর দিতে গিয়ে, বর্তমানে দেশে যে সব মেধাবী ব্যক্তি আছেন, তাঁদের প্রতিভার বিকাশ যাতে হয়—দেশে সেই রকম পরিবেশের সৃষ্টি করতে, যেন আমরা ভুলে না যাই। তাঁদের প্রতিভার বিকাশের পথে যে সমস্ত বাধাবিপত্তি বর্তমান—সেগুলি দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু মানুষের প্রতিভার চরম বিকাশ হয় ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে, সুতরাং এই বয়:সীমার মধ্যে আমাদের ছেলেদের সৃজনীক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার যাতে করা যায় —সে দিকে আমাদের সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে।

কাঁচের জিনিষপত্র তৈরীর কেন্দ্র

আগরতলার কাছে অরুন্ধতি নগরে কাঁচের জিনিষপত্র তৈরীর জন্যে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এখানে প্রতিদিন ২ টন করে কাঁচের জিনিষ তৈরী হতে পারবে। উত্তর পূর্ব ভারতে এটিই হোল প্রথম কাঁচের জিনিষপত্র তৈরীর কেন্দ্র।

তামাকের কাটুই পোকা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

বিহার মত একরকম কাটুই পোকার আক্রমণে তামাকের খুব ক্ষতি হয়। বিশেষ করে তামাকের চারা অবস্থায় এই পোকার আক্রমণ খুবই ক্ষতি করে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, এনডোসালফান অথবা কারবারিল প্রতিষেধক স্প্রে করে এই পোকা দমন করা যায়।

শতকরা ৩৫%ভাগ ইমালসান্ কনসেনট্রেট এর ৩০ মিলিলিটার মাত্রায় ২২ ৭৩ লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা কারবারিল এর ৫০ ডব্লিউ. পি. মাত্রা ২২.৭৩ লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরী করে তামাক ক্ষেতে স্প্রে করা উচিত।

নার্সারিতে প্রতি ১০ বর্গমিটার অনুপাতে এনডোসালফান মিশ্রণের ৩০ লিটার এবং ৪৫ লিটার 'কারবারিল' মিশ্রণ স্প্রে করা দরকার।

ইনস্ট্রুমেনটেশন লিমিটেডের লভ্যাংশ বৃদ্ধি

কোটার অবস্থিত ইনস্ট্রুমেনটেশন লি: গত বছর নীট লভ্যাংশ বৃদ্ধি করে সাত গুণ; ১৯৭০-৭১ সালে অপরেটিং লভ্যাংশ ছিল ২.১৪ কোটি টাকার ওপর। এই প্রথম কোম্পানীটি ইকুইটি শেয়ারের ওপর ৬ শতাংশ ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করেছে। কোম্পানীর হাতে এখন ২০ কোটি টাকা মূল্যের অর্ডার রয়েছে।

দ্রুত শিল্পায়নের ফলে কলুষ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। একটি শিল্পাঞ্চলের দৃশ্য

পৃথিবীর স্থলে ও জলে জীবের আবির্ভাব—তারপর উদ্ভিদ আর প্রাণী জগৎ পরস্পরের সঙ্গে একটি ভারসাম্য বজায় রেখে ক্রমশঃই বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধিজনিত এবং বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে সব সমস্যা আছে—তার মধ্যে পৃথিবীর স্থল, জল ও বায়ুমণ্ডল কলুষিত হওয়ার সমস্যাটি বোধ হয় সবচেয়ে ভয়াবহ। কি ভাবে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং কি উপায়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতকে নিরাপদ রাখা যায়—তার চিন্তায় বিশ্বের সমস্ত সভ্য সমাজ আজ চঞ্চল। এই প্রবন্ধে লেখক সেই সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

কলুষিত পৃথিবী

ডাঃ বনবিহারী ঘোষ

সারা বিশ্বের শিক্ষিত সমাজ আজ শঙ্কিত, সচকিত। মহাশূন্যে সৌরলোকের অন্যতম গ্রহ, আমাদের একমাত্র আবাসস্থল পৃথিবী, ক্রমশঃ মহা বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছে। এর আকাশ বাতাস, জল স্থল, মর্ত্যবাসীর অদূরদর্শী নানান কাজ-কর্মের ফলে এমনভাবে কলুষিত হয়ে উঠেছে, যে অনতিবিলম্বে এর প্রতি বিধান না করলে অদূর ভবিষ্যতে মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুধু বিপর্যস্ত হ'বে তাই নয়, হয়তো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বর্তমানের সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

অনেকেরই একথা অজানা নয় যে সুরুতে এই পৃথিবীতে উদ্ভিদ, প্রাণী বা জীব জগৎ বলতে যা বোঝায় তার- কিছুই ছিল না। ছিল শুধু অগ্ন্যুৎপাত, বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প, মেঘ, বর্ষা আর সৌরকিরণের উগ্র তাপ। এইরকম আবহাওয়ার মধ্যে কোনও কোনও বদ্ধ জলাশয়ে সমুদ্রের কোনও কোনও বিশেষ বিশেষ অংশে একটি "ঝোলের" মত পদার্থের সৃষ্টি হয়। তবে এর থেকে অনুরূপ উপাদানের সৃষ্টি হওয়ার

কোনও এক মহাক্ষণে "আদি জীবনের" সূত্রপাত হয় এই পৃথিবীতে। এরপরে এই সৃষ্টির ক্রম পরিবর্তন ঘটে চললো। ক্রমশ: উৎকৃষ্টতর প্রাণী, জীবজন্তু, মানুষ ও উদ্ভিদের সৃষ্টি হল। যাই হোক, কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী সকলেরই জন্য চাই বায়ু বা অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি দিয়ে তৈরী। এই সব অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি নিয়ে যে বায়ুস্তর তা পৃথিবীর ওপরে প্রায় ১০ কি: মি: পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এই বায়ুস্তরে যদি অন্য কোনও পদার্থের কলুষ আসে, যেমন কলকারখানা বা মোটর ইঞ্জিন নির্গত ধোঁয়া, ধূলিকণা ইত্যাদি পৃথিবী তার নিজস্ব প্রথায় বায়ু সঞ্চালন করে তা পরিশুদ্ধ ক'রে তোলে। কিন্তু এরও একটা সীমা আছে। মনুষ্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে, এই ধরণের শিল্প ব্যবসায়, কলকারখানা, মোটর গাড়ীর সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে প্রকৃত-পক্ষে এই সীমা নানান ভাবে অতিক্রান্ত হ'য়ে গেছে। এই সীমা লঙ্ঘনের ফলে, পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদ জগৎ এক কঠিন সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে।

পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ৭০ শতাংশই জল দিয়ে তৈরী। বায়ু স্তরের মত এখানেও একটা ভার সাম্য ছিল। কিন্তু শহরে আধুনিক জীবন যাত্রা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে চলায় নানান রকমের পরিত্যক্ত পদার্থ জঞ্জাল হ'য়ে এইসব স্থানে জমে এর আবিলতা ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছে। কল-কারখানা বা শহর বাসীদের নর্দ্দমার নোংরা জল—এইসব জলাশয় কলুষিত করে চলেছে। সমুদ্রে ভাসমান ফিটোপ্ল্যাঙ্কটন নামে যে উদ্ভিদ আমাদের পৃথিবীর বায়ু স্তরের অক্সিজেনের প্রায় এক পঞ্চমাংশ উৎপাদন করে, পৃথিবীর সমুদ্রে এইসব কলুষ গিয়ে পড়ায় তার অনেকাংশের বিনাশ ঘটেছে। এছাড়া অনেক কারখানার নোংরা জল পরিত্যক্ত আবর্জনা নাইট্রেট্ বা ফস্ফেট হয়ে এই সব জলাশয়ে পড়ে। অনেক অনাবশ্যক উদ্ভিদকে সার হিসাবে খাদ্য যোগাচ্ছে যার ফলে এদের বৃদ্ধি ঘটছে এবং জলে মিশ্রিত অক্সিজেনের ক্ষয় হ'য়ে চলেছে। জলাশয়ের মাছ, প্রাণীর বংশ ধ্বংস হচ্ছে। তাই এখানেও প্রকৃতির ভারসাম্যতার ব্যতিক্রম। এর সঙ্গে আছে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার বাসস্থান ও আহার সংস্থানের জন্য বন জঙ্গল কেটে শহর ও চাষ আবাদের জমি তৈরী করায় পশু উদ্ভিদ জগতের ক্রমে ক্রমে বিনাশ সাধন।

প্রায় দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীর জনসংখ্যা বোধ হয় ৫০ লক্ষের বেশী ছিল না। ১৮৫০ সালে দেখা গেল এই জন-সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১০০ কোটি হয়েছে এবং ১৯৩০ সালে এই সংখ্যা আরও দ্বিগুন বেড়ে গেল। বর্ত্তমানের হিসাবে প্রায় ৩৫০ কোটি এবং ২০০০ সাল নাগাদ

জারণ পুষ্করিণী থেকে নমুনা সংগ্রহ। এখানে দূষিত জল এসে পড়ে এবং প্রাকৃতিক উপায়ে তা বিশুদ্ধ হয়। কর্মীগণ পরীক্ষা করে দেখছেন জল কতটা বিশুদ্ধ হয়?

আশঙ্কা করা যাচ্ছে, এই জনসংখ্যা বেড়ে প্রায় ৭০০ কোটিতে দাঁড়াবে। এতগুলি লোকের বাসস্থান এবং আহারের সংস্থান করা এক বিপুল সমস্যা। কাজেই বন জঙ্গল কেটে ক্রমশ: জায়গা বাড়ান হচ্ছে এবং নানান রকম কেমিক্যাল সার প্রয়োগে কৃষি ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। এর সঙ্গে আছে এই সব ফসল ধ্বংসকারী পোকা মাকড়দের বিনাশের জন্য ডি. ডি. টি প্রভৃতি কেমিক্যালের প্রয়োগ। আহার সামগ্রীর সঙ্গে এই সব পদার্থ জীব জগতের শরীরে প্রবেশ করে নানান রকম অজানা বিপর্যয়ের সম্ভাবনার সৃষ্টি করে চলেছে। এর ওপর আছে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় নানান সামগ্রীর পরিত্যক্ত আধারগুলির বৃদ্ধি এবং পৃথিবী পৃষ্ঠের এখানে ওখানে সেই সব আধারের স্তূপিকৃত হওয়া।

বর্তমানের এই জীবন যাত্রা পদ্ধতির যদি পরিবর্তন না করা যায়, কল কারখানার বৃদ্ধি এবং কাজ কর্মের প্রণালী ও গতি যদি সংযত না করা যায়, পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, জল, স্থলের আবিলতা যদি এই হারে বেড়ে চলে, তাহলে পৃথিবীর জীব এবং উদ্ভিদ জগতের স্বাভাবিক আয়ু আর বেশী দিন নয়। এইজন্য সারা বিশ্বের শিক্ষিত জনগণ বিজ্ঞানী, জননেতা প্রভৃতি সকলেই আজ সচকিত, চিন্তাগ্রস্ত এবং শঙ্কিত, বিশেষ করে শহর ও শহরের আশপাশের বসবাসকারীদের জন্য। কারণ পৃথিবীর বড় বড় শহরে এই সঙ্কট ইতিমধ্যেই বহু রকমে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরণের শহরগুলির মধ্যে টোকিও, লস্ এঞ্জেলস্, লণ্ডন প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এই সব জায়গায় আকাশ, বছরের প্রায় অধিকাংশ সময় "স্মগ্" নামে এক রকম ধোঁয়াচ্ছন্ন থাকে। এই সব শহরের অধিবাসী এই আবিলতার মধ্যে নিঃশ্বাস

একটি গাঁয়ের কুয়ো। মহিলারা জল তুলতে ব্যস্ত কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। ময়লা দড়ি ও বাসনপত্র এবং নোংরা পায়ের জল কুয়োর মধ্যে পড়ে জল কলুষিত করছে

নাগপুর ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্মিত কলুষ নিরোধক পায়খানা। এগুলি সস্তা ও মজবুত

৩য় কভারে দেখুন

জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী

১৫ পৃষ্ঠার পর

থেকে কিছু পাবেনা তাদের অবশ্যই পোষাতে হয়েছে তবুও তার পক্ষ থেকে আর্থিক ঋণ আদায় করতে পেরেছেন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্কুলের ছেলেদের ব্যবহারের জন্য অনুমোদন লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ধরণের একটি খেলনা দিয়ে যার দাম হ'ল ৭৫ টাকা (স্কুলের জন্য ৬০ টাকা) প্রায় ১০২ রকমের সাধারণ বিজ্ঞানের পরীক্ষা করা যায়। এইসব খেলনা এবং স্কুলের ল্যাবরেটরীর কিছু যন্ত্রপাতি যার মধ্যে একটা হ'ল প্লাষ্টিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র যা যে কোন জিনিষকে ৬০ গুণ বড় করে দেখাতে পারে (দাম ১৫ টাকা মাত্র) মালয়েশিয়া এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রপ্তানি করা হয়।

এই মাইক্রোসকোপটি অবশ্য তৈরী করেছেন আমেদাবাদের কমিউনিটি সায়েন্স সেন্টার। এটি হ'ল বিক্রম ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্টের একটি শাখা প্রতিষ্ঠান। এই কর্মসূচীর আওতায় পড়ে স্কুল কলেজের ছেলেদের জন্যে জীববিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে বিশেষ ধরণের পাঠ্যক্রমের বন্দোবস্ত করা, শিক্ষকদের জন্যে এক বিশেষ ধরণের পাঠ্যক্রম বিজ্ঞান প্রদর্শনী শিক্ষা সহায়ক সরবরাহ এবং ছাত্রদের জন্যে সময়মত পরীক্ষাগারের বন্দোবস্ত করা।

বোম্বাই পৌর প্রতিষ্ঠান, টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের সহযোগিতায় এখন ছোট ছোট ছেলেদের জন্যে বৈজ্ঞানিক খেলনাপাতি এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটা যন্ত্র দিয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেদের পড়াশুনার সহায়ক হিসাবে প্রায় ১০০ রকমের বিভিন্ন পরীক্ষা করা যায়—এই যন্ত্রটির দাম হ'ল ১২৫ টাকা।

কলুষিত পৃথিবী

১৯ পৃষ্ঠার পর

প্রশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট বোধ করে শুধু তাই নয়, শ্বাস প্রশ্বাস জনিত নানান অসুখে আক্রান্ত হয়েও পড়ে।

ভারতবর্ষের শহরগুলিতেও এই সমস্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। কিছুদিন আগের এক সমীক্ষা থেকে দেখা যায় কলিকাতা কানপুর দিল্লী প্রভৃতি কয়েকটি শহরের আকাশের আবিলতা ১৯৫৭ সালের তুলনায় প্রায় শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কল কারখানা ছাড়াও মোটর গাড়ীর সংখ্যা এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে অচিরে একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে এই ধোঁয়া ক্রমে এইসব শহরের আবহাওয়া খুবই বিষাক্ত করে তুলবে এবং ভারতবর্ষের শহরবাসীর জীবন ও স্বাস্থ্য দুইই ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করে তুলবে।

কিন্তু পৃথিবীর মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে শিল্প চাষ কল কারখানার এই ধরণের বৃদ্ধির ও সম্প্রসারণের যেমন প্রয়োজন, তেমনি এগুলির বর্তমান কর্মধারার পরিবর্তন করারও প্রয়োজন নইলে অচিরে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য যে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার নাম ইকোলজী (Ecology)। এই বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানী, সমাজসেবী, রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতি সকলেই পৃথিবীর নানান দেশে নানান ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে চলেছেন। আমেরিকায় ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে অনেক কাজ করা হয়েছে। এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, হল মোটর গাড়ীর ধোঁয়া এবং পরিত্যক্ত জঞ্জাল পরিশোধিত করা ও তাকে অন্য অবস্থায় পুনর্ব্যবহার করা। বর্তমানে কতকগুলি পরীক্ষাধীন মডেল মোটর গাড়ী যে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড ধোঁয়া ছাড়ে তা ১৯৬০ সালের এ ধরণের মডেলের গাড়ীগুলির তুলনায় প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ কম। কতক রকমের জঞ্জাল যা কোনও রকমেই বিনষ্ট করা যায় না, সেগুলিকে আহরণ করে এক নূতন ধরণের বাড়ী তৈরীর সামগ্রী হিসাবে পুনর্ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ধরণের আরও নানান রকমের চেষ্টা চলেছে আমেরিকায়।

ভারতবর্ষেও সম্ভবতঃ খুব শীঘ্রই এই ধরণের কাজের জন্য আইন প্রণয়নের প্রস্তাব লোকসভায় আনা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে সরকারী বেসরকারী নানান সম্প্রদায় এবং বিজ্ঞান সংস্থা নানানভাবে ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা করেছেন এবং মতামতও প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু আইন করা এক কথা আর সেই অনুযায়ী কাজ করা আর এক কথা। এ বিষয়ে দায়িত্ব শুধু ভারত সরকারের একলার নয় দায়িত্ব সমস্ত মানুষের।

নতুন কর ব্যবস্থা

৯ পৃষ্ঠার পর

অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয়। বস্তুতঃ এবারে সমস্ত রাজ্যেই ঘাটতি বাজেট দেখা যায় এবং সব রাজ্যই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর পরিমাণে 'ওভার ড্রাফ্ট' নিয়েছে। এই রকম পরিস্থিতিতে পণ্য দ্রব্যের উপর বেশ মোটা রকমের কর বসিয়ে এবং সেচ ও উন্নয়ন করের হারবৃদ্ধি করে রাজ্যগুলির আর্থিক অবস্থা উন্নত করার কথা আমাদের চিন্তা করা কি সমীচীন নয়?

কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করার উদ্যোগে এখনই একটা পূর্ণাঙ্গ করসূচী নেওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। শিল্প প্রসার ও অধিকতর জাতীয় সঞ্চয়ের জন্য এবং মুদ্রাস্ফীতি প্রবণতা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আশু প্রয়োজন।

এই নতুন করগুলি বিরাট আর্থিক বোঝাকে অতি সামান্যই লাঘব করতে পারবে। কৃষি ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই করের বোঝা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট হয়ে গেছে। কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রের ধনী লোকদের ব্যক্তিগত আয় শুধু তাতে যোগ করবার এটাই উপযুক্ত সময়।

REGD NO. D-233

সুন্দরবনের জন্য বৈদ্যুতিকরণ পরিকল্প

সুন্দরবনের জন্য ৯১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার যে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ পরিকল্প পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ পেশ করেছেন, রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন তা মঞ্জুর করেছেন। এই পরিকল্প অনুযায়ী সুন্দরবন এলাকার ২০৭টি মৌজা বিদ্যুতায়িত হবে।

রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের এইটি হল অষ্টম পরিকল্প। ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ-এর জন্য অন্য সাতটি পরিকল্প ইতিমধ্যেই অনুমোদিত হয়ে গেছে। বলা হয়েছে যে আটটি পরিকল্পের সব কটি রূপায়িত হলে মোট ১ ৬৮৮টি মৌজা বিদ্যুতায়িত হবে এবং ৮ ৬৬৭টি অগভীর নলকূপ ও ৬০টি রিভার লিফ্ট্ ইরিগেশন পাম্প বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন কর্তৃক এ পর্যন্ত মঞ্জুরীকৃত আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ৫ কোটি ৮১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে।

দুর্গাপুরে মিনি স্টীল প্ল্যাণ্ট

দুর্গাপুরে একটি মিনি স্টীল প্ল্যাণ্ট এবং পুরুলিয়ায় একটি সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের জন্য লাইসেন্স ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন এ দুটির উদ্যোক্তা। দুর্গাপুরের এই কারখানাটি স্থাপনে ব্যয় হবে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং এখানে তৈরী হবে বিশেষ মানের ঢালাই না করা কাঁচা লোহা।

মিনি স্টীল প্ল্যাণ্টের জন্য প্রস্তাবিত আর্থিক পরিকল্পনায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকার একটি শেয়ার মূলধনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর মধ্যে প্রোমোটার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেকেরই ১৫ লক্ষ টাকা করে শেয়ার থাকবে। বাকী ৯০ লক্ষ টাকা ইকুয়িটি ও প্রেফারেন্স শেয়ার আই ডি বি আই, আই সি আই সি আই, এবং এল আই সি-র মধ্যে বণ্টন করা হবে। কার্যকরী মূলধন হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে ৪৫ লক্ষ টাকার ঋণ নেওয়া হবে।

দুর্গাপুর প্রস্তাবিত কারখানাটির জন্য মেশিনপত্র আমদানির লাইসেন্সও পাওয়া গেছে।

পল্লীঅঞ্চলে জীবনবীমার কাজ বৃদ্ধি

১৯৭১-৭২ সালে জীবনবীমা করপোরেশনের কাজ পল্লী অঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪৫ কোটি টাকার মতন। করপোরেশনের নতুন কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৩৬ কোটি টাকা থেকে ১২০৩ কোটি টাকায়। ঐ সময়ের মধ্যে ১৬ ১৬ লক্ষ পলিসি ছাড়া হয়। এর আগের বছর পলিসি ছাড়ার সংখ্যা ছিল ১৪ ০১ লক্ষ।

ঐ বছরেই জীবনবীমা করপোরেশনের হিসাবে বিনিয়োগ হয় ১৭৭ ৫৯ কোটি টাকা। এর আগের বছর বিনিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১০২৮ ৬৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩০৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয় গৃহনির্মাণের কাজে।

ধনধান্যে

পরিকল্পনার বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা, ও কারিগরী ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্রগতি হচ্ছে, তার খবর দেওয়াই হ'ল 'ধনধান্যে'র লক্ষ্য। এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যথার্থ রূপ তুলে ধরা 'ধনধান্যে'র অন্যতম উদ্দেশ্য।

নিয়মাবলী

ধনধান্যে প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে প্রকাশিত হয়।

ধনধান্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়।

'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃপ্রকাশ কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার করা হয়।

[illegible] অনুরোধ রক্ষা করা এবং কোনও রচনার প্রাপ্তি স্বীকৃতি জানানো সম্ভব নয়।

নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট লাগানো খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়, এই ঠিকানায় পাঠাবেন—

'বাঙলা'
যোজনা ভবন
পার্লামেন্ট স্ট্রীট,
নিউ দিল্লী—১

গ্রাহক ও [illegible]-
বিজনেস ম্যানেজার পাব্লিকেশন্‌স ডিভিশন,
পাতিয়ালা হাউস নতুন দিল্লী-১,
এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

"ধনধান্যে" পড়ুন
দেশকে জানুন

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী ক
নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক

প্রিন্টার্স, করোলবাগ,

* যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি   * পর্যটন একটি শিল্প   * বৃহত্তম সমস্যার মহত্তম সমাধান

ধন ধান্যে

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংলা সংস্করণ

তৃতীয় বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

৯ই জানুয়ারী ১৯৭২ : ১৯শে পৌষ ১৮৯৩

Vol III : No : 16 : Jan. 9 . 1972

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করা হয় না।

প্রধান সম্পাদক
দ্বারকা নাথ মুন্সী
সহ সম্পাদক
সমর ঘোষ
উপ-সম্পাদক
দিলীপ কুমার ঘোষ

সংবাদদাতাগণ
সুভাষ বসু (কলিকাতা)
এস. ভি রাঘবন (মাদ্রাজ)
বীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী (শিলং)
বসন্ত কুমার পিল্লে (ত্রিবান্দ্রাম)
অবিনাশ গোডবোলে (বোম্বাই)
ফোটো অফিসার
টি. এস. নাগরাজন
প্রচ্ছদ পট
সাঁচীর কারুকার্য্যের নিদর্শন

সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজনা ভবন পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নিউ দিল্লী-১
টেলিফোন : ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ ৩৮৫৪৮১/৪০২
টেলিগ্রাফের ঠিকানা : যোজনা, নিউ দিল্লী
চাঁদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১
চাঁদার হার : বার্ষিক ৫ টাকা, দ্বিবার্ষিক ৯ টাকা, ত্রিবার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

যুগবাণী

সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী কোন জাতির উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা ইতিহাসে লেখে না।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

এই সংখ্যায়

এবার স্বয়ম্ভরতা

বিগত বছরটির দিকে তাকিয়ে আমাদের উল্লসিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ এই বছরটিতে নানা দিকে নানা ক্ষেত্রে আমরা সাফল্য লাভ করেছি। এরমধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ হোল—পাকিস্তানের সঙ্গে ১৪ দিন ব্যাপী সংঘর্ষে আমাদের বিজয়। সংঘর্ষ আমরা বাধাইনি, পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে আমাদের রণে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করে। জাতীয় নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এবং নৃশংস বর্বর অত্যাচারে উৎপীড়িত ও বাস্তচ্যুত এবং পর দেশে আশ্রয় প্রার্থী অসংখ্য জনগণের মুক্তি যুদ্ধে সাহায্যের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত অস্ত্র ধারণ করে। ভারতের ভাগ্যাকাশের ইতিহাসে ১৯৭১ সালটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

একটি সংগ্রামে আমরা জয়লাভ করেছি বটে কিন্তু এক দীর্ঘ দিনের সংগ্রাম এখনও আমাদের সামনে—স্বাধীনতা লাভের দিন থেকেই এই সংগ্রামে আমরা লিপ্ত। এই সংগ্রাম হোল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে—আমাদের উন্নয়ন ও প্রগতির জন্যে পরমুখাপেক্ষী হওয়ার বিরুদ্ধে। বিগত ২৫ বছর ধরে আমরা যে কঠোর পরিশ্রম করে এসেছি এবং সম্প্রতি লব্ধ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এখন আমরা দারিদ্র্য ও পরনির্ভরতার বিরুদ্ধে সাফল্যলাভের সংগ্রাম শুরু কোরতে পারব। ১৯৭২ সাল হবে আমাদের কর্মযজ্ঞের বৎসর—সর্ব ক্ষেত্রে সর্ব স্তরে আমাদের এখন স্বয়ম্ভর হতে হবে এবং জনগণের জীবন-যাত্রার মান এক নতুন পর্যায়ে তুলে ধরতে হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গোড়ার কথা হোল স্বয়ম্ভর হওয়ার প্রচেষ্টা, বিদেশী সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থাকা নয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তাতে কোন সন্দেহই নেই। বস্তুতঃ গোড়ার দিকে বৈদেশিক সাহায্য ব্যাতি রেকে কোন দেশই বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না।

বৈদেশিক সাহায্য সম্বন্ধে সবার আগে যে কথাটি মনে রাখতে হয় তা'হলো এই যে এটা আসে ঋণের আকারে যা পরিশোধ কোরতে হয় সুদ সমেত। সুতরাং এককথায় বলা যায় একদিন না একদিন এই সাহায্যের অবসান ঘটাতেই হবে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে বিদেশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কাটিয়ে কূপমণ্ডূকের মত বসে থাকা। আসল উদ্দেশ্য হবে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা এবং আমদানি আস্তে আস্তে কমিয়ে দেওয়া। নিভরতা কমিয়ে দেওয়ার মানে এই নয় যে আমদানি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া। বরং কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির আমদানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায় সেক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানি থেকে পাওয়া অর্থ আমদানি করার জন্য দেওয়া যাবে। অর্থাৎ গোড়া থেকে সাহায্যের জন্য যে সম্পর্ক গড়ে উঠে, পরে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা এক নূতন সম্পর্কে পরিণত হয়। সেই সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখা দরকার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট শিল্পে কাজ চালিয়ে যেতে হলে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ অর্থনৈতিক দিক থেকে সুবিধাজনক।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষের পক্ষে এখন সে সময় সমুপস্থিত। বিদেশী সাহায্য গ্রহণের সম্পর্ক থেকে এখন ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। সৌভাগ্য বশতঃ বিগত দু দশকে শিল্প ও কারিগরি বিদ্যায় আমরা আমাদের বুনিয়াদ বেশ সুদৃঢ় করতে পেরেছি এবং আমাদের এখন প্রত্যয় জন্মেছে যে আমরা এখন অনায়াসে এই লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছি। বিগত তিন চার বছর সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষির দিক থেকে আমরা এখন স্বয়ংভর হয়ে উঠেছি। বর্তমানে সরকার এই বছর থেকে পি. এল. ৪৮০ অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বন্ধ করে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

আত্মনির্ভরতার যে লক্ষ্য আমাদের সামনে রয়েছে তাকে রূপ দিতে হলে আমাদের সর্বপ্রকারে সংযত হতে হবে। উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন অপচয়ই যেন না হয়। এই উদ্দেশ্যে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে তার মধ্যে মুখ্য শিল্পগুলিতে ব্যবহৃত কাঁচা মাল বণ্টন ও ব্যবহারে একটা সামঞ্জস্য রাখা তা সে কাঁচামাল দেশজই হোক অথবা বিদেশ থেকে আমদানি করাই হোক। সমস্ত সাধনের কাজ যদি সুষ্ঠুরূপে কার্যকরি করা যায় তাহলে উৎপাদন ব্যয় অনেক কম হয়ে যাবে এবং বিশ্ব বাজারে ভারতীয় পণ্য প্রতিযোগিতায় সমুখীন হতে পারবে। রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য এটা অত্যাবশ্যক, আরেকটি বিষয় যার উপর আজ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন তা'হোল প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনবোধে শিফ্ট বাড়িয়ে দেওয়া, অধিক সময় কাজের ব্যবস্থা করা, যাতে শিল্প পূর্ণ মাত্রায় উৎপাদনক্ষম হতে পারে। যেসব কারখানা ভাল ভাবে কাজকর্ম চালাতে পারছে না সেগুলির ভার গ্রহণ করে দক্ষতার সঙ্গে চালু করতে পারলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি রোধ করা, বিশেষ করে কৃষিজাত দ্রব্যাদি, কারণ কৃষিই হোল আমাদের প্রধান অবলম্বন। কৃষি পদ্ধতি ও শৈলীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন প্রয়োজন ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত আইন সুচারুরূপে কার্যকারী করার।

ঐতিহাসিক শহর—ঢাকা

গত ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা না করেই পাকিস্তান আমাদের বেশ কয়েকটি বিমান ঘাঁটি ওপর বোমা বর্ষণ করল। আমরা এ পর্যন্ত শুধু ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে পাকিস্তানী গোলাবর্ষণের জবাব দিয়েই আসছিলাম এবং তাদের অনুপ্রবেশবন্ধ করতেই ব্যস্ত ছিলাম। আমাদের বিমান ঘাঁটির ওপর এই ঝটিকা আক্রমণের পরেই, ৪ঠা ডিসেম্বর আমাদের সেনাবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করল। একের পর এক পাকিস্তানী সীমান্ত ঘাঁটির পতন হতে লাগল। ৮ই ডিসেম্বরের মধ্যেই ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী সম্মিলিতভাবে যশোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং সেই তথাকথিত দুর্ভেদ্য নগরী কুমিল্লা দখল করে নিল। এই জায়গাগুলি এবং অন্যান্য আরও কতকগুলি জায়গা দখল করার ফলে ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে প্রধান বাধাগুলি অপসারিত হল। ১১ই ডিসেম্বর যশোরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাজধানী। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, বাংলাদেশ সরকারকে এর আগেই ভারত ও ভুটান সরকার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আরও রক্তক্ষয় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আমাদের সেনাবাহিনীর প্রধান জে: মানেকশ' পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর অবশিষ্টাংশকে আত্মসমর্পণ করতে একাধিকবার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং এ কথাও বলেছিলেন যে আত্মসমর্পণ করলে তাঁদের জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী সম্মানজনক বন্দোবস্তের আয়োজন করা হবে। ১২ই ডিসেম্বর ঢাকার আশপাশে পূর্বনির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে ভারতীয় ছত্রী সৈন্য নামান হয়। ঢাকা দখলের লড়াই সুরু হ'ল। ভয় পেয়ে রাজ্যপাল এ. এম. মালিক এবং আরও অনেক প্রবীন সরকারী অফিসার এক সঙ্গে পদত্যাগ করলেন এবং নিরপেক্ষ এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ঢাকার পতন যে আসন্ন—তা আর কারও বুঝতে বাকী রইল না।

বুড়ি গঙ্গার (একদা পদ্মার একটি প্রধান শাখা) উত্তর তীরে দাঁড়িয়ে আছে এই রাজধানী ঢাকা। এখান থেকে প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণে বুড়ি গঙ্গা আর ধলেশ্বরী'র সঙ্গমস্থান। নারায়নগঞ্জ এবং গোয়ালন্দ ঘুরে কলকাতা থেকে ঢাকা হ'ল প্রায় ২৫৪ মাইল রাস্তা। সাধারণের মতে ঢাকার নাম করণ হয়েছে 'ঢাক গাছ' থেকে আবার অনেকে মনে করেন যে এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঢাকেশ্বরী যাঁর মন্দির এখনো এখানে বিদ্যমান, তাঁর নাম থেকেই হয়েছে ঢাকার নামকরণ। ঢাকাই হ'ল বাংলাদেশের বৃহত্তম নগর (এলাকা ২৮ বর্গমাইল)। ১৯৬১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী এর লোকসংখ্যা ছিল ৫,৫৬,৭১২ (পুরুষ—৩,৩১,৯০৭ এবং স্ত্রীলোক—২,২৪,৮০৫) এই লোকসংখ্যা ১৯৭১ সালে অনুমান করা যাচ্ছে দশ লক্ষের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

ভারতে বৃটিশ আগমনের বহু আগে থেকেই ঢাকার সমৃদ্ধির কথা সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখনকার দিনে ইউরোপের দেশগুলিতে ঢাকাই মসলিনের ব্যবসায় ছিল বেশ বাড়বাড়ন্ত অবস্থা, বিশেষ করে ফ্রান্সে। প্রায় ৫০ বছর আগে আবার নতুন করে এই বয়ন শিল্পের পত্তন হ'ল ঢাকায়। বিদেশে রপ্তানি হত বলে জামদানি ও কাশীদা তৈরীই প্রাধান্য পেল।

পূর্ব বাংলার আদি রাজধানি ছিল সোনার গাঁ। ১৬৮০ সালে তদানীন্তন গভর্ণর ইসলাম খাঁ রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান ঢাকায়। কারণ এখান থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপাত দমন করা সহজ ছিল। এই দস্যুরা বদ্বীপ এলাকায় প্রায়ই হানা দিয়ে লুঠতরাজ কোরত। যাইহোক অচিরে শহরটি বেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে এবং ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজরা এখানে কারখানা স্থাপন করে। ১৭০৪ সালে নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে আবার রাজধানী উঠে গেল মুর্শিদাবাদে। এর পরেও ঢাকায় বহু দিন ধরে নামে মাত্র এক নবাব রাজত্ব করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নবাবী দরবার সরে যাবার দরুণ ঢাকার সে গৌরবেরও অপমৃত্যু ঘটল।

ঢাকার অতীত গৌরবের বেশ দেখতে পাওয়া যায় সেখানকার কতকগুলি মনোরম স্মৃতি সৌধে। এগুলি এখনও সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে বিরাজ করছে যেমন লালবাগ দুর্গ। ১৬৭৮ সালে সম্রাট আওরংজেবের তৃতীয় পুত্র আজম শা এই দুর্গের গোড়া পত্তন করে ছিলেন, কিন্তু এটির নির্মাণকার্য শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। আর একটি মনোরম স্মৃতিস্তম্ভ হোল—শায়েস্তা খাঁর কন্যা বিবি পরীর সমাধি। ইনি সমাধিস্থ হন ১৬৮৪ সালে। কতকগুলি প্রসিদ্ধ মন্দির রয়েছে ঢাকায় যার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য হ'ল ঢাকেশ্বরী দেবীর

(৩য় কভারে দেখুন)

বৃহত্তম সমস্যার মহত্তম সমাধান

ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থী

পাকিস্তানের দখলকারী সৈন্যবাহিনীর পরাজয় এবং ঢাকায় আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারতবর্ষে আগত বাংলা দেশের শরণার্থীরা উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন। এঁদের জন্য ভারত সরকার স্বাধীন বাংলা দেশের সহযোগিতায় যে প্রত্যাবর্তন এবং পুর্ণ-বাসনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা করেছেন তা চালু হয় ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে। তবু ঘরে যাবার জন্য ব্যাকুল প্রায় দু লক্ষ শরণার্থী ইতিমধ্যেই তাদের জন্মভূমিতে ফিরে গেছেন। এই শীতের মধ্যে এক কোটি শরণার্থীকে যে শীতবস্ত্র, কম্বল প্রভৃতি বিতরণের ব্যবস্থা ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন তার থেকে গৃহ প্রত্যাগত বাংলা দেশবাসী যাও বঞ্চিত হবেন না। বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী মার্চের মধ্যেই সমস্ত শরণার্থীর ঘরে ফেরা সম্ভব হবে।

বৃহত্তম সমস্যা

গত ২৫ শে মার্চ থেকে বাংলা দেশের মুক্তি কামী জনসাধারণের উপর ক্রমবর্ধমান বর্বর অত্যাচার শুরু হয়। অসহায় শিশু থেকে বৃদ্ধ নর নারী যাও এই অত্যাচারে শিকার হওয়ায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক বিরাট উদ্বাস্তু প্রবাহ ভারত উপচে পড়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই উদ্বাস্তু প্রবাহ যেমন তুলনাহীন তেমনি ৯ মাস বিদেশে যাপনের পর স্বদেশে সসম্মানে ১ কোটি নর নারীর প্রত্যাবর্তনের কাহিনীও অতুলনীয়।

১৯৩৩ সাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) ফ্যাসিষ্ট হিটলারের অত্যাচারে ১০ লক্ষ ইহুদি জার্মানী ছেড়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালে প্যালেষ্টাইনে ইহুদি-আরব সংঘর্ষের ফলে ১০ লক্ষ আরব উদ্বাস্তু লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান এবং গাজা অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে পরবর্তী ৪ বৎসরের মধ্যে ভারতে বসবাসকারী উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৭৩ লক্ষ। এপ্রিল থেকে অক্টোবর (১৯৭১) মাত্র ৭ মাসের ব্যবধানে প্রাক্তন পাক্ প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খানের অত্যাচারে উৎসাদিত বাংলা দেশের শরণার্থীর সংখ্যা আগেকার সমস্ত রেকর্ডকে অতিক্রম করে দাঁড়ায় ৯৫ লক্ষ। যে মাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক শরণার্থী এসেছে ১ লক্ষ ২ হাজার, জুনে ৬৮ হাজার, এপ্রিলে ৫৭,০০০। অক্টোবরের পরেও শরণার্থীর স্রোত বন্ধ হয়নি যদি ও কমেছে প্রতিদিন ৭,০০০ হিসাবে। ৩১ অক্টোবরের হিসেব অনুযায়ী বাংলা দেশের সন্নিহিত ৪টি অঞ্চলে আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

পশ্চিম বঙ্গ	৭১	লক্ষ	শতকরা ৭৬
ত্রিপুরা	১৪	,,	শতকরা ১৫
মেঘালয়	৭	,,	শতকরা ৬
আসাম	৩	,,	শতকরা ৩
মোট	৯৫	,,	শতকরা ১০০

ভারসাম্য চ্যুতি

এই সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শরণার্থীদের বিপুল ভাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলি মারাত্মক ভাবে তাদের ভার সাম্য হারিয়ে ফেলে। পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় সমগ্র লোক সংখ্যার ১৬ শতাংশ, সীমান্তের ৮টি জেলায় লোক সংখ্যার ৩৯ শতাংশ। পশ্চিম বঙ্গে শরণার্থীদের ২৬ শতাংশ ২৪ পরগনা জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এত অধিক সংখ্যক আশ্রয় প্রার্থী অন্য কোন জেলায় ছিলনা। এর পরের স্থান যথাক্রমে পশ্চিম দিনাজ পুর (২৪ শতাংশ) ও নদীয়া (১৫ শতাংশ)। পশ্চিম দিনাজপুরে স্থানীয় অধিবাসী আর শরণার্থীর সংখ্যা হ'ল সমান সমান ১৪ লক্ষ করে। কুচবিহারে শরণাগতের সংখ্যা ৮ লক্ষ, স্থানীয় অধিবাসীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ হল আগন্তুক। মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার—এই ৫টি জেলাতে ৩৭ লক্ষ শরণার্থী, সারা পশ্চিম-বঙ্গের শরণার্থী সংখ্যার ৫০ শতাংশের ও বেশী। ১৯৭১ সালের সেন্সাসের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ঘনত্ব হল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০৭, মাত্র সাত মাসের মাসের উদ্বাস্তু প্রবাহে এই সংখ্যা ফেঁপে গিয়ে দাঁড়াল ৬০০।

তুলনামূলক ভাবে বলতে গেলে অল্প-সংখ্যক ত্রিপুরায় অবস্থা আরো শোচনীয়। উদ্বাস্তুদের নিয়ে মাত্র সাত মাসে ত্রিপুরার লোক সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। পাক্ বর্বরতার শুরুতে অনুমান করা হয়েছিল— পথের দুর্গমতা, জ্ঞাতগত বিচ্ছিন্নতা আবহাওয়ার প্রতিকূলতা এবং যাতায়াতের অসুবিধা হেতু মেঘালয়ে শরণার্থীদের ভীড় হবে না। কার্যতঃ দেখা গেল তবু প্রায়

এবং সম্মান রক্ষার জন্য দুর্গত নর নারী এ ব্যাপারে মোটেই দুষ্কর বলে মনে করেনি। মেঘালয়ের জনসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ, শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়াল ৭ লক্ষ।

কঠিন দায়িত্ব

এই এক কোটি বহিরাগত সর্বহারা শিশু ও নর নারীর আশ্রয়দান, ভরণপোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার নেওয়া সমস্যা সংকুল ভারতের পক্ষে কত বড় সিদ্ধান্ত ভবিষ্যত ইতিহাস একটি স্বর্ণাক্ষরে তার সাক্ষ্য বহন করবে। দুর্বার শরণার্থী প্রবাহের মুখোমুখি ভারতবর্ষকে দেখে অনেক সময় এমন ও মনে হয়েছে যে ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে হয়ত উদ্ধার কারীর ও জীবন্ত সলিল সমাধি হয়ে যাবে। ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিতাড়িত ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার উদ্বাস্তুর পুর্ণবাসন কার্য এখন ও অসমাপ্ত অন্তত: ১০ হাজার পরিবার আজও রিলিফ ক্যাম্পে পুর্ণবাসনের অপেক্ষায় দিন গুণছেন। এরিমধ্যে এল এই চরম দুর্যোগ, নবাগত এক কোটি শরণার্থীর জন্য দরকার হয়েছে খাদ্য পানীয় বস্ত্র, আবাসস্থান এবং চিকিৎসা। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় হয়েছে বিভিন্ন উপকরণ। শুধু শীতে পরিধেয় বস্ত্রের জন্যই ভারত সরকার বাড়তি খরচ করেছেন ৮ কোটি টাকা। বিতরণের জন্য কম্বল কিনতে হয়েছে ৪০ লক্ষ। এপ্রিল মাসে শরণার্থী শিবিরের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০। জুন মাসেই সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়াল—১২০০। উদ্বাস্তু শিবির খোলা হয়েছে সর্বত্র—স্কুল, ধর্মশালা, পলিটেকনিক, সমবায় বিপণি, সরকারী গৃহ কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। পশ্চিম বঙ্গে অক্টোবর মাসেও ১ হাজার স্কুল-গৃহ ছিল শরণার্থীদের আবাস স্থান যে জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন আবার ভাবনা কবে এই স্কুলের দরজা ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুলবে।

বাংলা দেশের শরণার্থীদের মোটামুটি দু ভাগে ভাগ করা যায়—যাঁরা উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন আর যাঁরা বাইরে আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আছেন। শেষোক্ত দের সংখ্যা তুলনায় খুবই কম। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গে ৫০ লক্ষ শরণার্থী আছেন উদ্বাস্তু শিবিরে আর ২ লক্ষ ২০ হাজার বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে। সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ভারতের ৭টি রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং বিহার) মোট ৮২৭টি শিবির আছে যার মধ্যে ১৭টির ভার নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার বাকীগুলি রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন। প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বেশী শিবিরের দায়িত্ব না নিলেও শরণার্থী সমস্যা বলে সমস্ত ব্যয় ভার কেন্দ্রই বহন করছেন।

বেসরকারী উদ্যোগ

দুর্গত শরণার্থীদের সাহায্য দেওয়ার জন্যে ভারতের জনসাধারণ অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। প্রায় ৩০টি সেবা প্রতিষ্ঠান উদ্বাস্তু শিবির চালাতে সরকারকে সাহায্য করেছে। অনাথ শিক্ষা শিবির পিতৃ-মাতৃহীন বালক বালিকাদের গৃহ শিল্প এবং কারিগরী শিক্ষা দেওয়ার কাজে সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৮টি অনাথ আশ্রম খোলা হয়েছে যেখানে ৪ বছর থেকে ১২ বছরের ছেলে মেয়ে আছে; যাদের আপন বলতে কেউ নেই। একটি ছোট মেয়ে আশ্রয় নিয়েছে যার চোখের সামনে তার বাপ মা, ভাই বোন শুদ্ধ পরিবারের পাঁচ জনকে পাক্ সৈন্যরা গুলী করে মেরেছে। এই সব অনাথ ছেলে মেয়েদের হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যাতে তারা দেশে ফিরে স্বাবলম্বী হয়ে নূতন জীবন শুরু করতে পারবে।

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক চক্র বাংলা দেশে সুপরিকল্পিত ভাবে যে গণ হত্যা শুরু করেছিল, তাকে ব্যর্থ করার জন্যই সামরিক ভাবে ভারতবর্ষ ১ কোটি নিরীহ শরণার্থীকে তার সীমিত শক্তি দিয়ে যথা সাধ্য সাহায্য করেছে। রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানব অধিকার বিধিভঙ্গের দোষে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই অনীহা প্রকাশ করেছে। এমন কি দুর্গত শরণার্থীদের বেলাও তারা তাদের অর্থ ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেয়নি। প্রয়োজনের তুলনায় বিদেশী সাহায্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলা চলে। ৭ মাসে ভারতবর্ষ ব্যয় করেছে ৪০০ কোটি টাকা। আর বিদেশী সাহায্য পাওয়া গেছে মাত্র ৩০ কোটি। শরণার্থীর এই বিপুল বোঝা ঘাড়ে নিয়ে যে অনিশ্চয়তার মধ্যে ভারতবর্ষ দিন কাটিয়েছে তার মূল্যায়ন করা সহজ সাধ্য নয়। স্থানীয় অধিবাসীদের সহানুভূতির প্রাচুর্য সত্ত্বেও শরণার্থীদের নিয়ে সামাজিক উদ্বেগের কারণ ঘটেছে। বিদ্যালয়গুলি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকায় অলস বিদ্যার্থীদের বিপথগামী হওয়া অসম্ভব ছিলনা। পশ্চিমবঙ্গের ২৫ লক্ষ বেকারের সঙ্গে শরণার্থী শিবিরে কর্মপ্রার্থী বিদেশীদের যে কোন মুহূর্তে সংঘর্ষ ঘটে যেতে পারত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়ার জন্য দুষ্কৃতিকারীরা সক্রিয় ছিলনা, একথা নিশ্চয় করে বলা চলেনা। বারুদ পদার্থ জমেই ছিল, আগুনলেগে যেতে পারত, কিন্তু লাগেনি, না লাগার কারণ রয়েছে ভারতীয় মূল্যবোধে। দুর্গত শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে দরিদ্র ভারত পালন করেছে মানবিক কর্তব্য এবং সম্পূর্ণ একক ভাবে এক মহৎ আন্তর্জাতিক দায়িত্ব। সর্বোপরি ভারতবর্ষ বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধকে জয়ী করে শরণার্থীদের পুনর্বাসন সমস্যার মহত্তম সমাধান করেছে।

ভারতের যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি

নিজের পায়ে নিজেকেই দাঁড়াতে হবে

এস. ক্যারিয়াল

চতুর্থ যোজনার মধ্যবর্তীকালীন রিপোর্টে দেখা গেছে যে, গত দু বছরে আমাদের অর্থনীতির প্রায় সমস্ত বড় বড় ক্ষেত্র-গুলিতেই আমরা বেশ পিছিয়ে পড়েছি। আমাদের এই সাম্প্রতিক পিছিয়ে পড়ার সঙ্গে আরও অনেকগুলো সমস্যা এসে, জড়ো হয়েছে, যেমন (১) শরণার্থীদের জন্য বিরাট অঙ্কের ব্যয় ভার (২) যুদ্ধের জন্য ব্যয় (৩) যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জিনিষপত্রের ক্ষয় পূরণের জন্য ব্যয় (৪) সীমান্ত রাজ্যগুলি, যেগুলিতে যুদ্ধের জন্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেগুলিকে সাহায্য দান (৫) অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনের জন্য বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দান (৬) বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণে ঘাটতি এবং কর্মচারী বেত-নের সাম্প্রদায়িক বৃদ্ধি হেতু উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয় ইত্যাদি।

প্রধানমন্ত্রীর কথায় বলতে হয় মধ্যবর্তী কালীন এই রিপোর্টে আমাদের আর্থিক সঙ্কটের সমস্যাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভাবেই দেখা দিয়েছে। অর্থনীতির যে সব ক্ষেত্রগুলি থেকে অতিরিক্ত আয়ের মোটা অংশ আসছে, সে সব ক্ষেত্র থেকে আরও অর্থ সংস্থান করার পথে সরকার যে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, মূলত: সেগুলি থেকেই এই সমস্যাটির উদ্ভব হয়েছে। শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের স্থিতিশীলতা অবশ্যই এর আর একটা কারণ। অনুমান করা যাচ্ছে যে, যোজনার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যে (পরিমাণ গত দিক দিয়ে) পৌঁছতে গেলে দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে—শুধু সেই মুদ্রা-স্ফীতিকে রোধ করার জন্যই প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজন হবে।

জাতি এখন এক অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলেছে। তাই এই সময়ে অধিকতর আত্মনির্ভরতা লাভের জন্য আমাদের চেষ্টা কঠোরতর করতে হবে। বর্তমানে এ ব্যাপারটা সকলের কাছেই একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে একমাত্র জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর এমন সব সর্তাধীনেই আমরা বৈদেশিক সাহায্য লাভ করতে পারি। প্রধানমন্ত্রীর কথায় বলতে হয় যে, বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া আমাদের একদিনও চলে না—এমন ধারণার উপর বশবর্তী হয়ে আমরা আমাদের জাতীয় উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করতে পারি না। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ কারী কোন দেশ যখন কোন সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলে, তখন সাহায্য দাতা দেশগুলি বৈদেশিক সাহায্যকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে গ্রহণকারী দেশকে তাদের হাতের ক্রীড়নক করে তোলে। তাছাড়া বৈদেশিক সাহায্যের উপর অত্যধিক নির্ভরতা গ্রহণকারী দেশের অর্থনীতিতে একটা অবাস্তব আত্মতুষ্টির ভাব সৃষ্টি করে এবং বৈদেশিক সাহায্য পেলেই বহির্দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সব সময় আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়কে দাঁড়াতে দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক কারণে যে সব অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়ক্ষতি হয়, বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে প্রধানত: সেই ক্ষয়ক্ষতিগুলির পূরণ করাই চলে। সুতরাং আমাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের উপর যাতে চাপ সৃষ্টি না হয় বরং সেই সঞ্চয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, সেই জন্য বিদেশের উপর নির্ভরতার মাত্রা আমাদের দি ১ দিন কমিয়ে [illegible] দরকার।

এর অর্থ হ'ল যে ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশে উৎপন্ন কাঁচা-মালের অধিকতর ব্যবহার এবং আমদানির পরিমাণ কমিয়ে ফেলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় সব রকম আমদানি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া।

অন্তর্দেশীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কতকগুলি নির্দিষ্ট জিনিষের উৎপাদনের উপর বেশী করে নজর দিতে হবে। যথা:, তুলা, কয়লা এবং কাঁচামালের উৎপাদন না বেড়ে যদি আতী

কম গুরুত্বপূর্ণ পণ্য সামগ্রীগুলির উৎপাদন বেড়ে চলে—তা হ'লে জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক বিপর্যায় রোধা যাবে না।

যোজনা মন্ত্রী শ্রী সুব্রহ্মনাম বলেছেন যে ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার ব্যাপারে রাজ্যগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা যদিও সুরু হয়ে গেছে তবুও চতুর্থ যোজনার বাকী বছরগুলির জন্য আমাদের নীতি কি হবে তা পুরোপুরি নির্দ্ধারণ করা, বর্তমান আর্থিক বছর শেষ না হ'লে সম্ভব হবে না। দেশের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে স্বনির্ভরতার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে—তাতে আর কারও সন্দেহই নেই।

বাংলাদেশকে সাহায্য দান যদিও আমাদের বাজেট বরাদ্দের একটা উল্লেখনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, তবুও এটা বলা যায় য—আমরা শুধু সাহায্যই করে যাব এবং তার পরিবর্তে আমরা কোন রকমেই উপকৃত হব না, একথা ঠিক নয়। ভৌগলিক এবং অর্থনৈতিক সত্তাকে স্বীকার করে না—এমন একটা রাজনৈতিক সীমানা রেখার জন্য ভারতকেও এতদিন বাংলাদেশের মতই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনকে জানিয়ে দিয়েছেন যে বাংলাদেশের কি পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন তা নিদ্ধারণের কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন সাহায্য দানের পরিমাণ যাই হোক এবং এই সাহায্য আমাদের অর্থনীতিতে যতই চাপ সৃষ্টি করুক তার জন্য উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের সম্পদের যতটা পরিমাণ ক্ষতি আশঙ্কা করা গিয়েছিল, ততটা ক্ষতি হয় নি। আর একটি কথা এই যে বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনীতি পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে চলবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যেমন ভারত থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি হওয়া কয়লা একদিকে বাংলাদেশের শিল্পোৎপাদনে সাহায্য করবে, অপর দিকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে জলপথগুলি আসামের জন্য সারা ভারতের পণ্য সামগ্রী বহন করে নিয়ে যাবে এবং তার ফলে পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হবে।

বড় বড় শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে আমরা পিছিয়ে পড়েছি

চতুর্থ যোজনার প্রথম দু বছরে আমাদের অর্থনীতিতে আমরা আশানুরূপ ফললাভ করতে পারি নি। মোট জাতীয় আয়ের হিসাবে দেখা যায় যে বর্তমান বৎসরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার আমাদের পূর্বপরিকল্পিত জাতীয় আয় বৃদ্ধি হারের চেয়ে অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে একটু কমই হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আমাদের জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল শতকরা ৫.৫ ভাগ। কারণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন ভাল হলেও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি নি। যোজনার মধ্যবর্তী কালীন রিপোর্টে দেখা গেছে যে অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমরা পিছিয়ে পড়েছি।

কৃষি

কৃষি ক্ষেত্রে গমের উৎপাদন বেশ সাফল্য জনক ভাবেই বেড়ে চলেছে। পণ্য শস্যের মধ্যে আখের উৎপাদনও বেশ সন্তোষজনক। কিন্তু দেশের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় খরিফ শস্য—ধান—এর উৎপাদন মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। তৈল বীজের উৎপাদনও মূল বৎসরের (যে বৎসরের উৎপাদনের ভিত্তিতে পরবর্তী বৎসরে উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি হিসাব করা হয় অর্থাৎ ১৯৬০ সাল) উৎপাদনের চেয়ে খুব সামান্যই বেশী হয়েছে। কিন্তু পাট, তুলো প্রভৃতি পণ্যশস্যের উৎপাদন চতুর্থ যোজনায় জন্য নির্দিষ্ট 'মূল বৎসরের' উৎপাদনের চেয়ে অনেক কম হয়েছে।

যোজনার প্রথম তিন বছরে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের যে লক্ষ্য স্থির হয়েছিল, তার মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ এবং সেচের সুবিধা পাওয়া জমির পরিমাণ যে হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়েছিল, তার মাত্র শতকরা ৪৪ ভাগ জমিতে এ পর্যান্ত সেচের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়েছে। সেচ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা পুরোপুরি কার্য্যকারী করা সম্ভব হয় নি কারণ প্রকল্পগুলির রূপায়ন ব্যায় কিছু পরিমাণে বেড়ে গেছে।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল, সে লক্ষ্যে পৌঁছবার আশাও এখন কম।

শিল্প

যোজনা কালে শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন বছরে শতকরা ৮-১০ ভাগ বৃদ্ধির জন্য লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়েছিল। কিন্তু এই মাত্রা ১৯৬৮-৬৯ সালে ছিল শতকরা ৬.৬ ভাগ এবং ১৯৬৯-৭০ সালে ছিল ৬.৯ ভাগ। ১৯৭০-৭১ সালে এই মাত্রা শতকরা ৩.৫ ভাগে নেমে এসেছে এবং ১৯৭১ সালের প্রথম অর্দ্ধে এই মাত্রা আরও নেমে গেছে।

কিন্তু শিল্পে অগ্রগতির পুরোপুরি হিসাব উপরের এই তথ্যগুলি থেকে জানা সম্ভব নয়। কারণ ১৯৬০ সালের পর (এই হিসাবের জন্য নির্দিষ্ট মূল বৎসর) থেকে যে সব অত্যাধুনিক শিল্প এবং

অন্যান্য যে সব নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমাদের শিল্প ক্ষেত্রে সেগুলির অবদান এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি।

বিদ্যুৎ

যোজনার প্রথম দু বছরে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়েছি। এর পেছনে প্রধান কারণ হ'ল বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির উন্নয়নে মন্থরগতি। প্রকল্পগুলির রূপায়নে যে সব যন্ত্রপাতি কাজে লাগে—সেই যন্ত্রপাতিগুলির উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি ঠিক সময়ে প্রকল্পগুলিকে তা সরবরাহ করতে পারে নি বলেই প্রধানতঃ প্রকল্পগুলির দ্রুত উন্নয়ন সম্ভবপর হয় নি। বিশেষ করে উত্তর ভারতে এই প্রধান প্রধান বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিকে উৎপাদনক্ষম করে তুলতে দেরী হওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দেয় এবং তার জন্য রাসায়নিক সার উৎপাদন এবং কাপড় কল শিল্পের মত বড় বড় শিল্পও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ২.৩ কোটি কিলো ওয়াট, কিন্তু ঐ সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২.১২ কোটি কিলো ওয়াটের বেশী হবে বলে মনে হয় না।

চতুর্থ যোজনাকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য এবং এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য :—

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	ইউনিট	চতুর্থ যোজনার লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য		১৯৭১-৭২ সালের লক্ষ্যমাত্রা (সম্ভাব্য সাফল্য)	১৯৭৩-৭৪ সালের সম্ভাব্য সাফল্য
	কৃষি সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রগুলি :—			১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১		
১.	খাদ্য শস্য	কোটি টন	১২.৯০	৯.৯৫	১০.৭৮	১১.২০	১২.২০—১২.৫০
২.	তৈলবীজ	,,	১.০৫	০.৭৭	০.৯১	০.৯৫	০.৯৫— ১.০০
৩.	আখ (গুড়)	,,	১.৫০	১.৩৮	১.৩২	১.৩৭	১.৩৫— ১.৪০
৪.	তুলা	কোটি গাঁইট	০.৮০	০.৫২	০.৫৬	০.৬২	০.৬২— ০.৬৬
৫.	পাট	,,	০.৭৪	০.৫৭	০.৪৯	০.৬৪	০.৬০— ০.৬২
	সারের ব্যবহার :—						
৬.	নাইট্রেট সার	কোটি টন	০.৩২	০.১৪	০.১৫	০.১৮	০.২৬
৭.	ফস্‌ফেট সার	,,	০.১৪	০.০৪	০.০৫	০.০৬	০.০৮
৮.	পটাসিয়াম সার	,,	০.০৯	০.০২	০.০২	০.০৩	০.০৫
	সেচ ও বিদ্যুৎ (বড় ও মাঝারি ধরণের)						
৯.	জল বিদ্যুৎ	কোটি কি: ওয়াট	২.৩২	১.৫৪	১.৬৫	১.৭৭	২.১২
১০.	পাম্প সেট	প্রতি হাজার	২৩৩৭	১৩০৪	১৬২৯	১৯৫৯	২৩৩৭

খনিজ দ্রব্য ও শিল্পোৎপাদন :—

বিষয়	ইউনিট					
ইস্পাত	কোটি টন	১.০৮	০.৬৪	০.৬১	০.৬৮	০.৮৩
ইস্পাত দ্রব্য	,,	০.৮১	০.৪৮	০.৪৫	০.৫৬	০.৬৭
বিশেষ ধরণের ইস্পাত এবং সংকর ধাতু	প্রতি হাজার টন	২২০	১৪০.৪	২০০.০০	২০০.০০	২৪৭.০০

বিষয়	ইউনিট						
অ্যালুমিনিয়াম	,,	২২০	১৩৪.০০	১৬৮.৭০	১৭৯.৮০		২১০.০০
তামা	,,	৩১.০	৯.৮	৯.৩৩	৯.৫		২৫.০০
দস্তা	,,	৭০.০০	২৩.৭	২৩.৪	৩০.৮		৩৮.০০
ধাতু বিদ্যা সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য ভারী যন্ত্রপাতি	,,	৭৫.০০	১৮.০০	২০.০০	২৫.০০		৪০.০০
টারবাইন (তাপবিদ্যুৎ)	কোটি কি: ওয়াট	০.১৩	০.০৩	——	——		——
টারবাইন (জল বিদ্যুৎ)	,,	০.১৭	——	——	——		——
সালফিউরিক এ্যাসিড	প্রতি হাজার টন	২৫০০	১১২৯	১১১৬	১৩৫০	.	১৭৫০
লৌহ আকরিক	কোটি টন	৫.১৪	২.৮০	২.৮০	৩.০০		৪.০০
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	,,	০.৮৫	০.৬৭	০.৭০	০.৭৫		০.৮৫
পরিশোধিত তৈল	,,	২.৬০	১.৬১	১.৮০	১.৯০		২.১০
কাগজ ও কাগজের বোর্ড	প্রতি হাজার টন	৮৫০	৭২৪	৭৫৬	৮০০		৮৫০
সিমেন্ট	কোটি টন	১.৮০	১.৩৮	১.৪৪	১.৫৫		১.৮০
কলে উৎপন্ন কাপড়	কোটি মিটার	৫১০	৪১৯	৪২০	৪৩০		৪৫০
পাটের জিনিষ পত্র	প্রতি হাজার টন	১৪০০	৯৪৪	১০৫০	১১০০		১৪০০

পরিবহন ও যোগাযোগ :-

বিষয়	ইউনিট	চতুর্থ যোজনায় লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য ১৯৬৯-৭০ ১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২ সালের লক্ষ্যমাত্রা (সম্ভাব্য সাফল্য)	১৯৭৩-৭৪ সালের সম্ভাব্য সাফল্য
জাহাজী পরিবহন ক্ষমতা	কোটি টন	০ ৩৫	০.২১ ০.২৪	০.২৫	০.২৮
শিক্ষা :—					
প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি	কোটি জন	১.৩৮	০.২২ ০ ২৮	০.২৬	০ ২৭
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র সংখ্যা (বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য শাখা)	,,	০.১০৮	০.০১৭ ০.০২২	০ ০১৭	০.০২২
জনস্বাস্থ্য :—					
হাসপাতালের বিছানার সংখ্যা প্রতি হাজার	,,	২৮১.৬	২৬২ ৪ ২৬৬ ০	২৭০ ০	

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের ভ্রমণস্পৃহাও বেড়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। যান্ত্রিক অগ্রগতি, যা দূরকে করেছে নিকট মানুষের ভ্রমণের আকাঙ্খায় যুগিয়েছে ইন্ধন। জীবন ধারণের উন্নতমান ভ্রমণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাই দেখা যায় পৃথিবীর বেশীর ভাগ উন্নত দেশগুলির মানুষেরাই দেশ ভ্রমণে বার হন। ঘোরেন এদেশ সেদেশ—দেশ থেকে দেশান্তর। আর পর্যটন এভাবে ব্যাপকতা লাভ করছে বলে শিল্প হিসাবে এর কদরও বেড়ে চলেছে। শুধু উন্নত দেশগুলিতেই নয়, উন্নয়নশীল অথচ পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় এমন দেশগুলিতেও পর্যটন শিল্প প্রসারতা লাভ করেছে। কারণ বেশী পর্যটক মানেই হল বেশী বৈদেশিক মুদ্রা। তাছাড়া ভ্রমণ মানুষে মানুষে মিলবার, দেশবাসী পরস্পরকে জানবার সব চাইতে কার্যকর মাধ্যম। তাই সম্প্রতি [illegible], আন্তর্জাতিক ভ্রমণ সংস্থা সমিতির এক বৈঠকে স্থির হয়েছে যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিশ্ব ভ্রমণ সংস্থা গঠন

এদেশে বিদেশী

অঞ্জন রায়

করা হবে। অর্থাৎ বিশ্বের পর্যটন নিয়ন্ত্রণ করবে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান।

ভারতবর্ষ তার শত শতাব্দীর পুরানো ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির জন্য বিদেশী পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে আছে। কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার অভাব এদেশে পর্যটক বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল হয় নি। ১৯৬৭ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটন বছর পালিত হয় বিশ্বব্যাপী। সে বছরে পৃথিবীতে মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ পর্যটক দেশ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এবং তার ভেতর মাত্র ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫শ ২৫ জন

খিলান মার্গ (কাশ্মীর)

মহীশূরের 'বৃন্দাবন গার্ডেন'

পর্যটক ভারতবর্ষে বেড়াতে আসেন। ১৯৬৮ সালের হিসাব হল পৃথিবীতে মোট ১ কোটি ৪১ লক্ষ জন এবং ভারতবর্ষে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮ শ' ২০ জন বেড়াতে এসেছিলেন। ১৯৬৯ সালে পৃথিবীতে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ জন এবং ভারতবর্ষে আসেন ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭ শ ২৪ জন।

১৯৭০ সালে ভারতবর্ষে পর্যটক এসেছিলেন ২৮০,৮২১ জন। ১৯৬৯ সালের তুলনায় বেড়েছে ১৪.৮%। বলা বাহুল্য, পর্যটকদের মধ্যে আমেরিকানরাই (মহাদেশ অর্থে) সংখ্যায় বেশী। ১৯৬৯ সালে ভারতে মোট পর্যটকদের মধ্যে ৫২,৮৩৬ জনই ছিলেন আমেরিকান। ১৯৭০ সালের মোট পর্যটকদের মধ্যে আমেরিকান ছিলেন ৫৮,৭৯৩ জন। পর্যটন মারফৎ ভারত সরকারের আয় হয়েছে ১৯৬৯ সালে ৩৩ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা। ১৯৭০ সালের আয় ছিল প্রায় ৩৮ কোটি টাকা। অথচ এই এশিয়ারই ছোট্ট দেশ জাপানে শুধু ১৯৭০ এই আমেরিকান এসেছিলেন ৩ লক্ষ জন।

আমেরিকান ভ্রমণ-সংস্থা সমিতির মাসিক মুখপত্র 'এ-এস-টি-এ ভ্রমণ সংবাদ' এর একটি সাম্প্রতিক সংখ্যায় ভারতে পর্যটন, এর সুবিধা-অসুবিধা, পর্যটকদের

মহীপুরের চয়শালা' মন্দিরের ভাস্কর্য

অভিযোগ—ইত্যাদি নিয়ে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন উক্ত পত্রিকার একজন সম্পাদক শ্রী রিচার্ড নেপ্রেটি। নিউইয়র্ক স্থিত ভারতীয় পর্যটন দফতরের আঞ্চলিক ডিরেক্টর শ্রী এস এল শাইন্দ এবং এয়ার ইণ্ডিয়ার ক্যানাডা ও মার্কিন মুলুকের সেলস ম্যানেজার শ্রী ফ্রাঙ্ক মারটিনের বক্তব্য উক্ত রচনার প্রধান উপজীব্য। পর্যটন নিয়ে ভারতের সম্ভাবনা, ভারতে পর্যটক দের সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হয়।

বারাণসীর গঙ্গায় সূর্যোদয়

সমস্যা গুলির কয়েকটি ছিল নিম্নরূপ :

১। হোটেল : পর্যটকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ভারতীয় হোটেলগুলিতে ১০,০০০ শয্যা আছে। আরো ২০,০০০ অতিরিক্ত শয্যার (অবশ্যই উন্নতমানের) আশু প্রয়োজন। ৪০টি নতুন হোটেল হয় নির্মিত হচ্ছে আর নয়তো পরিকল্পিত হয়েছে। এয়ার ইণ্ডিয়া নিজেই হোটেল তৈরী করছে বোম্বাইতে ২টি, কলকাতা ও দিল্লীতে ১টি করে। 'ভারতীয় পর্যটন

(৩য় কভারে দেখুন)

দ্রব্য মূল্যের ঊর্দ্ধগতি

গত কয়েক বছর ধরে দ্রব্যমূল্যের একটি অস্বস্তিকর ঊর্দ্ধগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষ থেকে অক্টোবর মাসের শেষ অবধি পাইকারী দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি হয়েছে শতকরা ৪.০ ভাগ এবং নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর মূল্য সূচক যেখানে মে মাসে ছিল ২২৪, তা সেপ্টেম্বরে হয়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৮.। গত বছরের দ্রব্য মূল্যের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে পাইকারী দ্রব্যমূল্যের সাধারণ সূচকের ঊর্দ্ধগতি হয়েছে শতকরা ৪.৫ ভাগের মত।

দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্দ্ধমুখী প্রবণতাটিকে রোধ করার জন্য সরকার কিছু সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। গত ১৬ই নভেম্বর অর্থমন্ত্রী পার্লামেন্টে এক বিবৃতি দিয়ে বলেন যে এই প্রসঙ্গে সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে আছে 'নিয়ন্ত্রিত মূল্যের কাপড়ের উৎপাদন বাড়ানো এবং প্রতি মিটার কাপড়ে খুচরা বিক্রয়ের দাম ছাপিয়ে দেওয়ার জন্য কাপড় কলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া; বিক্রয়ের ব্যাপারে ফেরফের বন্ধ করার জন্য উৎপাদন ও দ্রব্য মূল্যের ঊর্দ্ধগতি রোধ করতে এখনই বিদেশ থেকে তুলো আমদানি করতে হয়। অন্যান্য আর যে সব জিনিষ বিদেশ থেকে আমাদের আমদানি করতে হয়, তার মধ্যে আছে কিছু বিশেষ ধরণের ইস্পাত এবং খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় এমন কিছু তেল জাতীয় জিনিষ। এসব ছাড়াও অনেক গুলি পণ্য দ্রব্যের ওপর অর্থ বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য আইনের কিছু সংশোধনের মাধ্যমে কতকগুলি পণ্যের অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য অসাধু ব্যবসায়ীরা যে কৃত্রিম মূল্য বৃদ্ধি করে থাকেন, তা রোধ করা হয়েছে। মূল্য বৃদ্ধি রোধে আরও যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ। শরণার্থীদের ভরণ পোষণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, সরকার কর্তৃক বিবিধ দৃঢ় ও কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দ্রব্য মূল্যের ঊর্দ্ধগতি অন্ততঃ কিছু পরিমাণে রোধ করা যাবে। কিন্তু এটা খুবই সত্য কথা যে অর্থনৈতিক ও কিছু আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেই শুধু এই পরিস্থিতির পুরোপুরি মোকাবিলা করা যাবে না। সুতরাং মূল্যমান স্থিতিশীল রাখতে গেলে এবং একটি বলিষ্ঠ অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে আমাদের কলকারখানার এবং ফসলের ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতেই হবে। খাদ্য শস্য উৎপাদনে বিশেষ করে ধান ও গম উৎপাদনের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আমরা ইতিমধ্যেই লাভ করেছি এবং তুলা, ডাল এবং তৈলবীজ ইত্যাদি পণ্য-শস্য উৎপাদনের ব্যাপারে স্বয়ংভরতা আমাদের এখনও লাভ করতে হবে। নতুন ধরণের সংকর বীজ উৎপাদনের জন্য গবেষণার কাজ আগেই শুরু হয়েছে এবং অধুনা গবেষণা কাজ যে ভাবে আরও জোরদার করা হয়েছে, তাতে আশা করা যায় যে অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যেই আমাদের আশা পূর্ণ হবে।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের গতি কোন পথে?

অধুনা ভারতের বে-সরকারী উদ্যোগে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদিও আমাদের শিল্পোদ্যোগগুলিতে বৈদেশিক অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ আগের তুলনায় বেড়েছে কিন্তু অনুবন্ধিত বৈদেশী মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে ইতিমধ্যেই কমতে শুরু করে দিয়েছে। শিল্পের নিয়ন্ত্রণ বৈদেশীদের হাত থেকে ক্রমশই মুক্ত হোক এবং সেই সঙ্গে বৈদেশিক অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ দেশে বেড়ে চলুক প্রধানতঃ সরকার কর্তৃক এই নীতি গ্রহণের ফলেই বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের ধরণ আজ এই মোড় নিয়েছে। কতকগুলি নির্দিষ্ট শিল্প ক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ুক সরকারের ইচ্ছা এই ধরণের কিছু একটা হলেও, গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে মোট বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ মোটামুটি একটা স্থিতিশীল অবস্থা নিয়েছে।

১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প সম্বন্ধীয় লাইসেন্স

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আঁরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

ভেবে দেখুন

আপনার মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ'ক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুলতে। কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়?

সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হ'ল, সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে প্রিয়, রবারের জন্মনিরোধক। নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে জন্মনিরোধের জন্যে বহুকাল ধরে লোকে নিরোধ ব্যবহার ক'রে আসছেন। আপনিও নিরোধ ব্যবহার করুন না?

সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায়

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ, রবারের জন্মনিরোধক
মনোহারী দোকান, মুদীর দোকান, কেমিষ্টের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায়

davp 71/119

কারিগরদের জন্য আরও কাজ

গ্রামীণ শিল্প প্রকল্পের অগ্রগতি

গত কয়েক বছরের গ্রামীণ শিল্প প্রকল্প কর্মসূচীর কাজকর্ম থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে গ্রাম এলাকায় শিল্পায়ন একটা শক্ত কাজ হলেও তা অসম্ভব নয় এবং বেকারী দূরী করণে এটা একটা বড় অস্ত্র হিসাবে কাজ করতে পারে। এর সৃজনী ক্ষমতা এবং কর্ম দক্ষতা থেকে আমাদের স্থির প্রত্যয় হয়েছে যে জাতীয় কর্মসূচীকে এই ব্যবস্থা এক নূতন রূপ দিতে চলেছে।

নানান ধরনের অবস্থার মধ্যে, নির্দিষ্ট গ্রাম্য এলাকাগুলিতে আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্প গঠনের জন্যে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রচেষ্টা শুরু হয় প্রায় ৮ বছর আগে। সেই থেকেই শুরু হয়েছে গ্রামীণ শিল্প প্রকল্প সূচীর কাজ। গ্রাম্য এলাকায় অব্যবহৃত কর্মশক্তির দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামোকে শক্তিশালী করা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে একে প্রয়োগক্ষম ক'রে তোলার জন্য কার্যকারী ব্যবস্থা উদ্ভাবন করাই হ'ল এই কর্মসূচীর সব চেয়ে বড় কাজ।

যে সব জায়গায় এর কাজ সুরু হয়েছে, সেখানকার বেকারী সমস্যার উপর এই প্রচেষ্টা কি কোন রেখাপাত করতে পেরেছে? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে যে কর্মসূচী এবং কাঠামোর মধ্যে এই সংস্থা কাজ করছে, তার উপর একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

এর গঠন ও প্রকৃতি এমনই যে কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্মসূচী ও লক্ষ্য নিয়ে এই প্রকল্পটিকে কাজ করতে হয়। এর উদ্যোক্তা হোল কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রই রাজ্যগুলিকে কর্মী ও অর্থ দিয়ে পুরো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পল্লী এলাকায় শিল্পোন্নয়ন সম্বন্ধে পর্যালোচনা, নীতি ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে উপদেশ দান এবং গ্রামে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে উপযুক্ত এবং প্রয়োগক্ষম কর্মসূচী সম্বন্ধে সুপারিশ করার জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে গ্রামীণ শিল্প পরিকল্পনা কমিটি নামে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করার ব্যবস্থা রাখা আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ বিভিন্ন রাজ্যের শিল্প দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রীগণ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ ছাড়াও সুখ্যাত সামাজিক এবং সাংগঠনিক চিন্তাকর্মী ও খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্‌গণও এই কমিটিতে আছেন।

গঠন ও আকার

এই ব্যবস্থারই একটা অংশ হিসাবে প্রত্যেক রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একটি রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি এবং প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একটি ক'রে প্রকল্প কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির কাজ হ'ল প্রকল্পের কর্মসূচী সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে নির্দেশ দেওয়া, এর বিষয় বস্তু ও আকার অনুমোদন করা এবং প্রকল্প এলাকার অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত উন্নয়ন কার্যসূচীগুলির সমন্বয় সাধন করা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত শিল্প মন্ত্রীর অধীনে গঠিত রাজ্য উপদেষ্টা কমিটিগুলিতে থাকেন স্থানীয় বেসরকারী ব্যক্তিগণ এবং উন্নয়ন দপ্তরের জেলাস্তরের অধিকারিকগণ।

বিভিন্ন কার্যক্রমের খসড়া তৈরী ও রূপায়ণের জন্য প্রকল্প অধিকারিকের অধীনে যন্ত্রবিদ্, অর্থনীতিবিদ্ এবং পরিকল্পনাবিদ্‌দের নিয়ে একটি বিশেষ সাহায্য সংস্থা গঠন করা হয়েছে। সর্ব ভারতীয় বোর্ড ও রাজ্য সরকারগুলির স্বাভাবিক কার্যক্রমের অন্তর্গত যে সব উন্নয়ন কর্মসূচীর কাজ চলেছে সেগুলিকে সাহায্য করার জন্য প্রতিটি প্রকল্পে তার নিজস্ব অর্থ ভাণ্ডারের সাহায্যে পুষ্ট কতকগুলি পাতি প্রয়োজনীয় কর্মসূচী রয়েছে। প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যসূচীর রূপায়ণ বা কি ধরণের শিল্প গড়ে উঠবে, কি কি পন্থা নেওয়া হবে ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম থাকে না বরং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সজীব এমন সব ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য নতুন নতুন চিন্তা ও প্রচেষ্টাকে এই প্রকল্প কর্মসূচী উৎসাহ দিয়ে থাকে।

প্রকল্পগুলির স্বরূপ কি ?

বিভিন্ন অঞ্চলের হরেক রকমের অবস্থার পর্যালোচনা থেকে নিবিড় ভাবে ক্ষুদ্র শিল্পায়নের জন্য যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়েছিল তার ভিত্তিতে প্রথমে ৪৫ টি

এলাকা বেছে নেওয়া হয়। পরে বড় বড় পর্যায় শিল্প কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি আরও ৪ টি এলাকা এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান অবস্থায় তিন থেকে পাঁচ লক্ষ লোক প্রত্যেক প্রকল্পের আওতায় পড়ে। তিন থেকে পাঁচটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক নিয়ে তৈরী এক একটি প্রকল্প এলাকা। এইরকম ২৩৪ টি ব্লকের অন্তর্গত ৩৪ হাজারের বেশী গ্রামে এইসব প্রকল্পের কাজ চলছে। নতুন ও পুরাতন সব ধরনের ক্ষুদ্র শিল্পই এই নিবিড় শিল্পায়ন প্রচেষ্টার আওতায় পড়ে, অবশ্য যে সব গ্রামে ১৫০০০ এর কম লোকের বাস সেই সব গ্রাম উক্ত প্রকল্প এলাকার আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম কয়েক বছরে উন্নয়নমূলক কাজ-গুলি এই রকম (১) কর্মীদের দক্ষতার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করা (২) উৎপন্ন সামগ্রীর মান উন্নয়ন করা (৩) যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা ও মূল অর্থ ভাণ্ডার থেকে কম সুদে অগ্রিম ঋণদান (৪) কারি-গরী বিষয়ে উপদেশদান। এই উন্নয়ন-মূলক কাজগুলির মাধ্যমে সকলের জন্য কাজের সুবিধার বন্দোবস্ত করাই ছিল এই কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য।

সাফল্য

নতুন কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, নতুন বিনিয়োগ ইত্যাদি উন্নয়ন কার্যের যে সব নানান দিক আছে, সে দিক দিয়ে বিবেচনা করলে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকে না। ১৯৭১ সালের মার্চের শেষাশেষি প্রকল্পগুলির সাহায্য পুষ্ট নতুন ও পুরাতন শিল্প কেন্দ্র-গুলিতে ১,৩৩,৩৪৩ টি নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। শুধু ১৯৭০-৭১ সালেই শতকরা ১৪.৬ ভাগ কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। এই সাফল্য লাভ বড় কম কথা নয়, বিশেষ করে যখন এই প্রকল্পগুলি অনেক দূরে অনুন্নত এলাকায় কাজ ক'রে চলেছে যেখানে শিল্প সৃষ্টির উপযুক্ত ভিত্তি বা আবহাওয়া কোনটাই নেই। প্রায় ১৫ টি জেলা জুড়ে এই ৪৯ টি প্রকল্পের কাজ চলছে। গত আট বছরে জেলা প্রতি গড়ে ৮,৮৮৯ গুলি কর্মসংস্থান এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমেই হয়েছে।

নতুন শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টি বা বর্তমান কেন্দ্রগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত এইসব কেন্দ্রের সংখ্যা ১৯৭০ সালের মার্চে ছিল ২৮৬৪১। ১৯৭১ সালের মার্চে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০,১৭১এ অর্থাৎ এক বছরে শতকরা ৫.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রায় শতকরা ৪০ ভাগই হল আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারকারী ক্ষুদ্র শিল্পগুলি। ১৯৭০ সালের মার্চ অবধি মোট ১৬.৬৮ কোটি টাকা বিনিয়োগের তুলনায় ১৯৭১ সালের মার্চ মাস অবধি মোট বিনিয়োগ হয়েছে ১৮.৫৮ কোটি টাকা (৮.৬৪ কোটি টাকার স্থায়ী মূলধন এবং ৯.৯৪ কোটি টাকার কার্যকরী মূলধন) অর্থাৎ মূলধন বিনিয়োগ শতকরা ১১.৩ ভাগ বৃদ্ধি, এর মধ্যে প্রকল্পের অর্থ ভাণ্ডার থেকে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ৬.৯৪ কোটি টাকা এবং ঋণ হিসাবে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া দিয়েছেন মোট ৪.৭৫ কোটি টাকা। বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ ৬.৯০ কোটি টাকার মত—এটা হয় তাঁদের নিজেদের সঞ্চয় না হয় তাঁদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবদের শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ সংস্থান।

১৯৬৪-৬৫ সালে যেখানে বাৎসরিক উৎপাদন সামগ্রীর পরিমাণ ছিল ৮৯ লক্ষ টাকা, গত সাত বছরে তা ৩০ গুণ বেড়ে ১৯৭০-৭১ সালে হয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ কোটি টাকা। ১৯৭০ সালে যে সব কেন্দ্র উৎপাদনক্ষম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে সেই রকম বিভিন্ন কেন্দ্রের মোট উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য ছিল ২১.৭৪ কোটি টাকা, এক বছরে তা শতকরা ২৩.৮ ভাগ বেড়ে ১৯৭০-৭১ সালে হয়েছে ২৬.৯১ কোটি টাকা।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

প্রকল্প এলাকার জন্য যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তা উপস্থিত চালু রয়েছে এবং এই সূচী কর্মরত এবং নবীন কর্মী এই দু'শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন মেটাবে। ৪৯-টি প্রকল্প এলাকায় প্রায় ২৫০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিভিন্ন বৃত্তির শিক্ষা দিয়ে চলেছে। এই কর্মসূচী অনুযায়ী ১৯৭১ সালের মার্চ অবধি প্রায় ৪০,০০০ ব্যক্তি প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। এ পর্যন্ত এক লক্ষের বেশী যাঁরা সাধারণ ভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনতে অসমর্থ তাঁরা এই আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত সাধারণ কর্ম সুযোগ সুবিধা কেন্দ্রগুলি থেকে গ্রহণে সমর্থ হয়েছেন।

একটা নির্ভীক নীতি গ্রহণের জন্যই প্রধানতঃ গত এক বছরে এই কর্মসূচী অনুযায়ী এই বিরাট সাফল্য অর্জন সম্ভব। এই নীতির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হল ; স্মল ইণ্ডাস্ট্রীস সার্ভিস ইন্‌ষ্টিটিউটগুলির দ্বারা কারিগরী জ্ঞান ও পরামর্শ দান—এই উদ্দেশ্যে স্মল ইণ্ডাস্ট্রীস সার্ভিস ইন্‌ষ্টিটিউট-গুলিকে তাদের যন্ত্রকুশলীদের প্রায়ই প্রকল্প এলাকাগুলিতে পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজের গতি দ্রুততর করার জন্য প্রকল্প অধিকারিকদের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দান প্রকল্প এলাকাগুলিতে শিল্পকেন্দ্র গুলির ব্যবহারের জন্য কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য দেশী ও আমদানীকৃত কাঁচা মাল নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া। কতকগুলি অত্যন্ত দুস্থ এলাকার শিল্পোন্নয়নের জন্যে উপযুক্ত আব-হাওয়া সৃষ্টি, শিল্পে বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের সংস্থান আধুনিক

কারখানার উৎপাদন নিয়ে প্রায় ১৫০ রকমের শিল্প অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়োগের বিস্তার করা, শিল্প শ্রমিকদের বেতনহারের উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস টানা, ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রসার ইত্যাদি হচ্ছে কর্মসূচীর ক্রমশঃ উৎকর্ষের লক্ষণ।

জাতীয় কর্মসূচী

এই কর্মসূচীর সাফল্য এবং গ্রামাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও নিযুবকদের চাকুরি সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে ভারত সরকার গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে এখন এই কর্মসূচীকে পরীক্ষামূলক অবস্থা থেকে জাতীয় কর্মসূচীতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমগ্র গ্রাম ভারত পর্যায়ক্রমে প্রায় ২৫ বছরে এই কর্মসূচীর আওতায় আসবে। আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রত্যেকটিতে কেন্দ্রীয় সরকার ৫০টি জেলার জন্য আর্থিক সাহায্য দেবেন। প্রত্যেক পরিকল্পনার শেষে এই প্রকল্পগুলির ভার রাজ্য সরকারগুলির হাতে ন্যস্ত করা হবে এবং ৫০ টি ক'রে নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪৯টি প্রকল্পের কাজ বর্তমান আর্থিক বছর থেকে নিছক প্রকল্প এলাকা থেকে সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে পড়বে। এ ছাড়া আরও পাঁচটি নতুন প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হবে-এর মধ্যে একটি হবে হরিয়ানায়, যেখানে এখনও কোন প্রকল্পের কাজ হয় নি এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ মহীশূর এবং গুজরাটে, ঐ সব রাজ্যে বর্তমানে যে সব আর্বান গ্রামীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ সমিতি আছে, তাদের সহযোগে বাকী চারটির কাজ শুরু হবে। চতুর্থ যোজনার শেষ অবধি কেন্দ্রীয় সরকার ৫৪টি প্রকল্পের অর্থভার বহন করবেন। তারপর এই গুলির কাজ চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব রাজ্য সরকার-গুলি নেবেন। এই সঙ্গে পঞ্চম যোজনার জন্য নির্দিষ্ট ৫০টি নতুন প্রকল্পের প্রাথমিক কাজও শুরু হয়েছে। সাধারণ নীতি হ'ল, কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে, এলাকাগুলির যান্ত্রিক অর্থনৈতিক দিক থেকে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে শিল্প পরিকল্পনা রচনা ইত্যাদি ব্যাপারে সমস্ত শক্ত কাজ চতুর্থ যোজনায় বাকী কয় বছরেই ক'রে ফেলা, যাতে পরবর্তী যোজনার ঠিক শুরুতেই বিভিন্ন কর্মসূচী রচনায় ও রূপায়ণে কোন বিলম্ব না হয়।

রাজ্য পিছু বণ্টন

নতুন প্রকল্পগুলির বণ্টন ব্যবস্থায় মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার প্রত্যেকটিতে ৪টি ক'রে, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও মহীশূর রাজ্যের প্রত্যেকটিতে তিনটি ক'রে, জম্মু ও কাশ্মীর কেরল, উড়িষ্যা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, গুজরাট এবং দেশের রাজ্যের প্রত্যেকটিতে ২টি ক'রে এবং হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, আসাম, মেঘালয় নাগাল্যাণ্ড, পাঞ্জাব ও কেন্দ্রশাসিত আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দাদরা ও নগরহাভেলী, লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় এবং আমিনদীভি দ্বীপপুঞ্জ, পণ্ডিচেরী ও মণিপুর অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে ১টি ক'রে প্রকল্পের ব্যবস্থা থাকবে।

রাজ্য সরকারগুলিকে তাঁরা নতুন প্রকল্পের জন্য যে সব জেলার নাম সুপারিশ করেছেন, সেইসব জেলা সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্য এবং সেখানকার যান্ত্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক বিবরণ পাঠাতে বলা হয়েছে এবং জেলা মনোনয়নের ব্যাপারে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং রীতি নীতি নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন উপস্থিত অনুন্নত জেলাগুলির যে তালিকা তৈরী করেছেন, তার অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলিতেই প্রকল্পগুলি কার্যকরী হবে। বেসরকারী শিল্পোদ্যোক্তাদের এই সব এলাকায় শিল্পস্থাপনে কতকগুলির বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। এই সুযোগ সুবিধাগুলি হল নতুন ক্ষেত্রগুলিতে ৫০লক্ষ টাকা অবধি মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ এককালীন আর্থিক সাহায্য এবং সুবিধাজনক হারে শিল্পভিত্তিক অর্থসাহায্য, সমস্ত বর্তমান ও নতুন ক্ষেত্রগুলির জন্য বিভিন্ন হারে পরিবহণের জন্য অর্থসাহায্য, জম্মু ও কাশ্মীর, আসাম, মেঘালয় নাগাল্যাণ্ড এবং কেন্দ্রশাসিত মণিপুর ত্রিপুরা ও দেশের মত দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে নতুন শিল্পস্থাপনের জন্য কাঁচা মাল ও যন্ত্রপাতি আমদানীর বিশেষ সুবিধা।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন

১১ পৃষ্ঠার পর

নীতি' অনুযায়ী ১৯৫৬ সালের শিল্প সংক্রান্ত সরকারী প্রস্তাবে সরকারী উদ্যোগে নিয়োগের জন্য যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র-গুলিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সে গুলি ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে যেখানে অধিক পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগের দরকার সেই সব ক্ষেত্রে এবং মূল শিল্পগুলির ক্ষেত্রে দেশীয় বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী শিল্পপতিদের শিল্প স্থাপনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। কয়েক মাস পরে ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে দেশীয় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বিদেশী শিল্পপতিদের বিশেষ বিশেষ সামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, পূর্বে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও শিল্প স্থাপন ও শিল্প সম্প্রসারণের জন্য আহ্বান জানান হয়েছে। ভারতে যে সমস্ত পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের সুবিধা আছে, সেই বিশেষ বিশেষ পণ্য সামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন সেই অনুসারেই, মূল শিল্প এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ যুক্ত ক্ষেত্রগুলি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও বেসরকারী উদ্যোগে ও বৈদেশিক

(১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছোবড়ার রপ্তানি বাড়াতে হবে
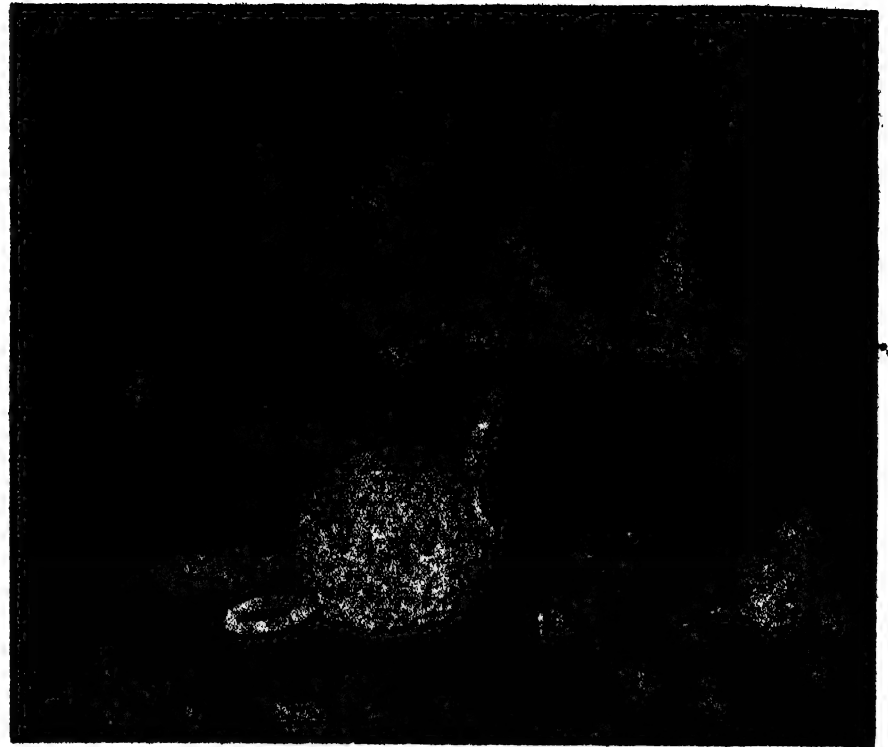
ছোবড়া থেকে তৈরী কতকগুলি ঘর সাজানোর জিনিষ

বাণিজ্যিক কারণে ছোবড়ার উৎপাদন প্রধানতঃ ভারতবর্ষেই একটি শিল্প হিসাবে মর্যাদা পেয়েছে। বর্তমানে ছোবড়া রপ্তানী আমাদের একরকম এক চেটিয়া কারবার এবং এখন বছরে আমরা গড়ে প্রায় ৪৫০০০ টন ছোবড়া বিদেশের বাজারে রপ্তানী করি। সারা পৃথিবীর ২,৮৬,০০০ টন ছোবড়া উৎপাদনের মধ্যে ভারতেই উৎপন্ন হয় প্রায় ১,৬০,০০০ টন, তারপরেই সিংহলের স্থান, বাৎসরিক উৎপাদন ১,০০,০০০ টন। অবশ্য ছোবড়ার দড়ি, ছোবড়া বোনা, তোষকের ছোবড়া ইত্যাদি সিংহলই রপ্তানি করে বেশী—এই ধরনের ৯৫,০৩০ টনের মধ্যে সারা পৃথিবীর রপ্তানি পণ্যের মধ্যে প্রায় ৮৫,০০০ টনই সিংহল থেকে বিদেশের বাজারে যায়। এই জিনিষগুলির উৎপাদন বাড়াবার জন্য সিংহল ছাড়া ফিলিপাইন, টানজানিয়া এবং কেনিয়া বেশ সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। এই দেশগুলোর বাৎসরিক উৎপাদন এখন ৫০০ থেকে ৬,০০০ টনের মধ্যে।

ছোবড়ার জিনিষপত্র ইউরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি থেকে রপ্তানিও হয়। ই. ই. সীর দেশগুলি ১৯৬৮-৬৯ সালে যেখানে এই ধরনের জিনিষ পত্র রপ্তানি করেছে মাত্র ৪,০০০ টনের মত সেখানে ঐ সময়ে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৭,০০০ টন। রবারমিশ্রিত ছোবড়ার মুখ্য রপ্তানিকারক দেশগুলি হচ্ছে পশ্চিম জার্মানী জাপান এবং ইটালী। বিশ্বের মোট উৎপাদন ৫০০০০ টনের শতকরা ৯০ ভাগ এই দেশগুলিতে উৎপন্ন হয়। বিশ্বের বাজারে রবারমিশ্রিত ছোবড়া রপ্তানি অবশ্য সামান্যই।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে ভারতে ছোবড়া শিল্প প্রধানতঃ কেরলেই সীমাবদ্ধ। ভারতের বাৎসরিক নারকোল উৎপাদন হ'ল ৪৮০ কোটি। এর মধ্যে কেরলে, ১৮০ কোটি নারকোল ছোবড়ার উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং মাত্র ১০ কোটি নারকেল অন্যান্য রাজ্যগুলিতে ব্যবহৃত হয় এই উদ্দেশ্যে। কেরল এবং ভারতবর্ষের বাকী অংশের ছোবড়াজাত জিনিষপত্রের উৎপাদনের পরিমাণ হ'ল যথাক্রমে ১৫,০০,০০০ টন এবং ১০,০০০ টন। ছোবড়া শিল্প মূলত শ্রম ভিত্তিক তাই প্রায় ৫০০,০০০ লোক এই শিল্প থেকে জীবিকা অর্জন করতে পারেন। কেরল ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত রাজ্যে এই শিল্প ক্রমশই বিস্তার লাভ করে—সেগুলি হ'ল মহীশূর, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিম বঙ্গ, উড়িষ্যা, গুজরাট, গোয়া, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

এই শিল্প থেকে দেশ যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হওয়া সত্বেও, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে, এই শিল্প ব্যবস্থায় কিছু

আলেপ্পির বন্দর থেকে রপ্তানি হবার জন্য লরিতে ছোবড়া বোঝাই করা হচ্ছে

আমূল পরিবর্তন এখনই করা দরকার। সমীক্ষাকারীদের চোখে যে সব গুরুতর সমস্যা ধরা পড়েছে, সেগুলো হচ্ছে (১) দেশে ছোবড়া শিল্পের উন্নয়ন ও গবেষণার কোন বন্দোবস্ত প্রায় নেই বললেই হয়। (২) ১৯৬১-৬৬ সালে ছোবড়া রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৮ কোটি টাকার মত কিন্তু ১৯৬৬-৭১ সালে ছোবড়ার উৎপাদন এবং সেই সঙ্গে উৎপাদিত রপ্তানির পরিমাণ ১৪ কোটি টাকার বেশী বাড়ে নি। (৩) রবার, ভাইনীল, পলী প্রোপিলীন এবং তোষক তৈরীর জন্য অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের রপ্তানির ফলে ছোবড়া রপ্তানির বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। (৩) ই. ই. সীর তুলনায় ভারতে উৎপন্ন ছোবড়া রূপ ও গুণগত দিক দিয়ে এবং মূল্যমানীতে নিম্ন-মানের। ছোবড়াকে একটা ভাল রপ্তানি পণ্যে পরিণত করার জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আগ্রহেরও যথেষ্ট অভাব আছে।

রপ্তানি উন্নয়নের জন্য সুপারিশ, গবেষণা ও উন্নয়ন

এই ব্যাপারে প্রথম কথা হ'ল এই যে, ই. ই. সীর দেশগুলিতে ছোবড়া উৎপাদনে যে সমস্ত আধুনিক কলাকৌশল কাজে লাগান হয়েছে, ভারতীয় ছোবড়া উৎপাদনকারীদের পক্ষে সেগুলি গ্রহণ করা আশু কর্তব্য। গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের লক্ষ্য হবে কি ক'রে আরও সস্তায় আরও ভাল ছোবড়া উৎপাদন করা যায় এবং উৎপন্ন সামগ্রীর আরও ভাল ব্যবহার কি ক'রে করা যায় সেই সম্বন্ধে চেষ্টা চালান। ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ৩২.৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণার জন্য একটি ত্রিবার্ষিক কর্মসূচী রূপায়ণের কথা ভাবছেন।

উৎপাদন

এই প্রতিষ্ঠানের মতে আরও ভাল কাজের পরিবেশ সৃষ্টি ও উৎপাদন বাড়াতে হ'লে ছোবড়া শিল্পে যে সমবায় সমিতিগুলি আছে, তাদের পুনর্জীবিত করে তোলা প্রয়োজন। এই জন্য ১৩৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং ২১,০০০ যুবককে নিয়ে ২১টি আদর্শ প্রকল্প গড়ে তোলার কথা ভাবা

ছোবড়ার আঁশ তৈরী করার জন্য আগে ছোবড়া রদ্দুরে শুকাতে হয়

হচ্ছে। এর বিকল্প আর একটি কর্মসূচীতে ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৪,০০ জন শ্রমিকের সহযোগিতায় একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথাও বলা হয়েছে।

কলে বোনার ব্যবস্থা

কম দামী অথচ বেশ উচ্চ মানের ছোবড়ার জিনিষপত্র সস্তা ধরনের ছোবড়া থেকে উৎপাদন করার জন্য সিংহল সম্প্রতি মেশিনে ছোবড়া বোনা আরম্ভ করেছে। সিংহলের এই প্রতিযোগীতার সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য কেন্দ্রীয় ছোবড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান মেশিনে ছোবড়া বোনার ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার সুপারিশ করেছেন। মেশিনে ছোবড়া বোনার এই কর্মসূচীটির রূপায়নে তিন বছর ধরে ব্যয় করা হবে ৩,৩৪,০০০ টাকা।

রং বেরং-এ এর সব জিনিষপত্র তৈরী করবার জন্য এবং এই সব রংগুলো যেন পাকা রং হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই সমীক্ষাতে সমগ্র ছোবড়া শিল্পকে সাহায্য করার জন্য একটি 'কেন্দ্রীয় রং ঘর' স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে একটা ২২ লক্ষ টাকার প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে।

ছোবড়ার তৈরী জিনিষপত্রের জন্য বাজার তৈরী করতে হবে :—ইউরোপের দেশগুলিতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ চালিত তাঁতে বোনা ছোবড়ার জিনিষপত্রের মত উন্নত ধরণের ঘন বুনানীযুক্ত জিনিষপত্র যাতে আমাদের দেশে কলে বোনা যায় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের দাম শতকরা ১১ থেকে ১৭ ভাগ কমানো যায় সেজন্য যে সমীক্ষা চালান হয়েছিল, তাতে যে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, সেটি হ'ল প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন ব্যবস্থার কার্য্যকারিতা এবং তার ফলে উদ্ভূত উৎপাদনজনিত অসুবিধাগুলিকে দূরীকরণের জন্য আদর্শ প্রকল্প হিসাবে দুটি কেন্দ্র খোলা।

সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে ইউরোপের উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে

উপযুক্ত পরিমাণে সহযোগীতা লাভের জন্য দেশীয় উৎপাদনকারীদের একটি সংঘ থাকা একান্তই দরকার। রাসায়নিক বস্ত্র দিয়ে তৈরী এই ধরণের ব্যবহারে লাগে এমন জিনিষপত্রগুলিতে ছোবড়ার মত শব্দ রোধ করার ক্ষমতা নেই। আমেরিকা ও কানাডার বিক্রেতাদের সঙ্গে দামের ব্যাপারে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ান সম্ভব হবে। দেশের অভ্যন্তরে ছোবড়াজাত জিনিষপত্রের যে চাহিদা আছে, তা মেটানোর জন্য 'কয়ার বোর্ড' একটি সম্পূর্ণ বিক্রয় বিভাগও খুলেছেন।

কেরলের এই স্বর্ণ সূত্রটিকে বিদেশের বাজারে আমরা বরাবর রপ্তানি ক'রে আসছি। দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ছোবড়া একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে দেখা যাচ্ছে। শুধু ঘর সাজাবার জন্যই নয়, তাছাড়াও ছোবড়া অনেক কাজে লাগে। ছোবড়া শিল্প থেকে প্রত্যক্ষভাবে (৫ লক্ষ) মানুষ তাদের রুজি রোজগার করছেন এবং পরোক্ষভাবে কেরলের সমুদ্র উপকূল বাসীদের (প্রায় ১০ লক্ষ) অন্ন এই শিল্পের উপরই নির্ভর করছে।

ছোবড়া যন্ত্রে যোগান দেবার আগে গোড়ার দিকের কাজগুলো যেমন আঁশ ভেজান, ধোলাই করা ইত্যাদি কাজগুলো গ্রামের কুটির শিল্পীরাই করে থাকে। বলতে গেলে এক রকম এই কুটির শিল্পীরাই হ'ল ছোবড়ার উৎপাদন কারী—এরা যাতে পয়সা কড়ি একটু ভাল পায়, সেজন্য ১৯৫০-৫১ সালে রাজ্য সরকার এই শিল্পকে সহযোগীতা দেওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি প্রাথমিক ব্যবস্থা নিয়েছেন। এই শিল্পের ইতিহাসে এটা হল একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এরপর থেকেই সমবায় সমিতি-গুলির আনুকূল্যে এই শিল্পের বেশ উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে কেরালায় ১৯০ টি সমবায় সমিতি আছে, এদের মধ্যে আলেপ্পি, কুইলন, কোচিন এবং কালিকটে অবস্থিত চারটি ছোবড়া বিক্রয় সমিতিও গড়া হয়েছে। এই চারিটি ছোবড়া বিক্রয় কেন্দ্রের মধ্যে আলেপ্পির বিক্রয় কেন্দ্রটিই সবচেয়ে বড়। এই বিক্রয় সমিতিগুলি যুক্তদেশ, বৃটেন, আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া, জাপানী প্রভৃতি দেশগুলি থেকে এমনকি কোন কোন সময় সারা বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করেও ছোবড়া জাতীয় জিনিষপত্র রপ্তানির জন্য অর্ডার পান

১৯৫১ সালের মার্চ মাসে আলেপ্পির কেন্দ্রীয় ছোবড়া বিক্রয় সমবায় সমিতিটির সৃষ্টি হয়। সংস্থাটির সদস্য হ'ল ১৮০ টি সমবায় সমিতি। এই কেন্দ্রীয় সংস্থাটি গ্রামীণ সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ছোবড়ার তৈরী জিনিষপত্রগুলি বিক্রয় করে থাকে। এই কেন্দ্রীয় সমিতিটি ছোবড়া ও ছোবড়ার জিনিষপত্রগুলি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করে এবং তার ফলে এই সমবায় সমিতিগুলি এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যবসায়ী-দের হঠাৎ দাম পড়ে যাওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। কেন্দ্রীয় সমিতিটির এই কার্যকারী ভূমিকা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে ছোবড়া শিল্পের শ্রমিকদের এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতিগুলির কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় সমিতি সম্প্রতি একটি আপদ কালীন অর্থ প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। শ্রমিকদের দেওয়া চাঁদা এবং কেন্দ্রীয় সমিতির দেওয়া টাকার উপরই নির্ভর করছে এই কর্মসূচীর রূপায়ণ। এই কর্মসূচী অনুযায়ী শ্রমিকেরা বা তাদের নিকট আত্মীয় স্বজনেরা আপদে বিপদে আর্থিক ঋণ পাবেন।

এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয়ার্থ ছোবড়ার জিনিষপত্র রাখবার জন্য ৪০,০০০ বর্গ ফুট মেঝের দুটি গুদামঘর আছে। তাছাড়াও গুদামের জন্য এই পরিমাণ জায়গা ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি পাঁচ বাঁধার হাইড্রলিক মেশিন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বলিত এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এখন এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যার ফলে এই সংস্থা বর্তমানে রপ্তানি ব্যবসায়ী-দের সঙ্গে বিক্রয়ের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন

(৮ পৃষ্ঠার পর)

মূলধনের সাহায্যে শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পণ্য সামগ্রী রপ্তানির জন্য বর্তমানে যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, তা হ'ল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রীর বর্তমান উৎপাদনের চেয়ে আগামী তিন বছরে যে বর্ধিত উৎপাদন হবে, তার শতকরা ৭৫ ভাগ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রের উৎপন্ন সামগ্রীর শতকরা ৬০ ভাগ রপ্তানি করার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গেই ভারত সরকার শিল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি নির্মাণ, বিমান ও বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধীয় শিল্প পণ্য উৎপাদন ইত্যাদি যে সমস্ত ব্যাপারে যান্ত্রিক জ্ঞানের জন্য এখন ভারতকে শিল্পোন্নত দেশগুলির উপর নির্ভর করতে হয়। সেই ক্ষেত্রগুলিতে শিল্প স্থাপনের জন্য বৈদেশিক সহযোগীতা লাভের ব্যাপারে অদ্যাপি বর্তমান বিধিনিষেধগুলিকে শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কোন নির্দিষ্ট শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে বৈদেশিক সহযোগীতা লাভের শর্তগুলি সেই বিশেষ শিল্পের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঠিক করতে হবে।

পারমানবিক গবেষণা

কৃষি ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে

গত ২৯ শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী নতুন দিল্লীতে একটি পারমানবিক গবেষণাগারের উদ্বোধন করেছেন। পারমানবিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার অর্থই হ'ল আমাদের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির পথে আমরা আর এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। কৃষিতে ইতিমধ্যে আমরা আধুনিক যন্ত্রবিদ্যা ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ করেছি, শুধু তাই নয় কৃষিতে এগুলির ব্যাপক ব্যবহারও হতে শুরু করেছে। এ পর্যন্ত যা সাফল্য লাভ করা গেছে, তা সত্যিই গর্ব করার মত। এখন আমরা সেই অদূর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আছি, যখন দেশের খাদ্য উৎপাদন আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে উঠবে এবং তারপরই আমাদের লক্ষ্য হবে খাদ্য শস্য এবং পণ্য শস্য উভয়েরই গুণগত দিক থেকে কি করে মান উন্নয়ন করা যায় সেই চেষ্টা চালান। কৃষি ও পশু পালনের নানাবিধ ক্ষেত্রে 'রেডিও আইসোটোপ' এবং 'রেডিয়েশন কৌশল' প্রয়োগের মাধ্যমে পারমানবিক গবেষণাগার আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এর প্রাথমিক কাজ হবে চাষের জন্য জমি পরীক্ষা, শস্য ক্ষেতে সার ও জলের যৌথ ক্রিয়া, একই জমিতে নতুন নতুন শস্য চারা রোপন, শস্য ক্ষতিকারক পোকা মাকড় ধংস করা, খাদ্য শস্য মজুত থাকার ক্ষমতা, বড় আকারের শস্য দানা উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার কাজ চালান।

ভারতবর্ষে 'রেডিয়েশন' এবং 'রেডিও আইসোটোপ সম্বন্ধে গবেষণাগার কাজ চালাবার জন্য ১৯৬৫ সালে ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এই ব্যাপারে এইটাই হ'ল আমাদের প্রথম পদক্ষেপ। গবেষণাগার কাজ অবশ্য সুরু হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে। ১৯৬০ সালে এই ধরণের গবেষণার কাজ চালাবার জন্য সুযোগ সুবিধাগুলির ব্যবস্থা করা হয় এবং "গ্যামা গার্ডেন" প্রতিষ্ঠা করা হয়—যা ধান ও গম চাষের জন্য জমিতে কখন ও কি ভাবে সার প্রয়োগ করতে হবে সে সম্বন্ধে সময়মত মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে থাকে। খুব শীঘ্রই "রেডিও আইসোটোপ" ও "রেডিয়েশন" সম্বন্ধে গবেষণা ও কৃষি ক্ষেত্রে এইগুলির অধিকতর প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ইউ. এন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের জন্য যে বিশেষ অর্থভাণ্ডার আছে তার সাহায্যে ১৯৬৮ সালে একটি নতুন প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে, যার ফলে আশা করা যাচ্ছে যে ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ভাবা আনবিক গবেষণা কেন্দ্র, ভারতীয় ধাত্রী বিদ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় দুগ্ধ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার সুযোগ সুবিধা আরও বেড়ে যাবে। ভারতীয় কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট নানাবিধ ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সাফল্য জনক সমাধানকল্পে গবেষণাপ্রাপ্ত সুফলগুলিকে যাতে সবচেয়ে লাভজনকভাবে ব্যবহার করা যায়, সেজন্য গবেষণার বিভিন্ন শাখা এবং প্রতিষ্ঠানের কাজ কর্মের সমন্বয়ের কথাও এই প্রকল্পে বলা হয়েছে।

কৃষি উন্নয়নে 'পারমানবিক কৌশল' এর সাফল্য জনক ব্যবহার সম্বন্ধে আজ আর কারো সন্দেহ নেই। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভারতীয় কৃষক সমাজের কল্যাণে "পারমানবিক গবেষণাগারটি" উৎসর্গ করা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কারণ কৃষিতে নিয়োজিত বিবিধ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলিকে আরও কার্য্যকারী ও ফলদায়ক করে তোলার জন্য এবং আমাদের সমস্যাগুলির নিরসনে, বিজ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে পরিকল্পনাগুলিকে আরও অর্থময় করে তোলার জন্য এই ল্যাবরেটরী শীঘ্রই একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর রূপায়নে ব্রতী হবে। কিন্তু আরও ভাল এবং আরও বেশী উৎপাদনই আমাদের একমাত্র সমস্যা নয়। আমরা দেখে আসছি যে যাবতীয় নতুন সুযোগ সুবিধাগুলির থেকে প্রাপ্ত সুফলগুলি পর্য্যন্ত সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত অংশের কল্যাণেই ব্যায়িত হয়েছে যারা এই সুফলগুলি গ্রহণে বরাবরই তৎপর ছিলেন। সমাজের দুর্বলতর অংশের ভাগে এই সুফলগুলির সামান্য অংশই পড়েছে। ফলে বিত্তবান এবং বিত্তহীন দরিদ্র কৃষকের মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমশই উঠেছে বেড়ে। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে যেখানেই বৈষম্য বর্তমান বা বর্দ্ধমান সেখানেই তৎপরতার সঙ্গে যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা

(৪র্থ কভারে দেখুন)

এদেশে বিদেশী

১০ পৃষ্ঠার পর

উন্নয়ন সংস্থাও ৯টি হোটেল তৈরীর পরিকল্পনা করেছে।

২। যান-বাহন: ভারতের স্থল পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত। তাছাড়া এ্যাভিস, হার্ৎস প্রভৃতি বিদেশী ভাড়া-গাড়ি কোম্পানীর মত কোন সংস্থা এবং উন্নত মানের মোটর-গাড়িও আমাদের দেশে নেই। ভারতীয় পর্যটন উন্নয়ন সংস্থা অবশ্য ১০০টি বিদেশী 'লাক্সারী কার' আমদানি করেছে। কিন্তু মোটর চালাবার উপযুক্ত রাস্তা কই? অনেক পর্যটক হাওয়া গাড়ি চড়ে (স্থল পথে) বেড়াতে ভালোবাসেন।

মন্দিরের ছবি নেওয়ার জন্য কর এবং গাইডিং-এর অনুপস্থান নিয়েও পর্যটকদের অভিযোগের কথা জানা গেল। মজার কথা, দিল্লীর লালকেল্লা, কাশ্মীরের স্কী-ফিল্ড, কোভালমের সমুদ্র সৈকতের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র কলকাতার বাসিন্দাদের কথাও স্মরণ করা হয়েছে।

আর লাভজনক নয় বলে গোটা ছয়েক আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা দমদমের বদলে বোম্বাইকেই বিরতির-স্থল বেছে নিয়ে এখান থেকে উঠে গিয়েছে। কিন্তু কলকাতায় বিদেশী পর্যটকদের আসাতো কমছে না। ১৯৭০-এ ২৭,৭৯৯ জন বিদেশী কলকাতায় এসেছিলেন। আগের বছরের তুলনায় তা ৯.৯ শতাংশ বেশী। কলকাতার অভিজ্ঞতম গাইড শ্রী সুনীল কুমার দাঁ বলছিলেন—"ভাই, আজ ১৭ বছর গাইডের কাজ করছি। দেখলুম, সব বিদেশীরই কলকাতায় আসবার উদ্দেশ্য ঐ এক—কেবল মানুষ দেখা।"

ঐতিহাসিক শহর ঢাকা

২ পৃষ্ঠার পর

মন্দির। এটি স্থাপিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। এখানে আরও যা আছে তা হ'ল বর্মার প্যাগোডা এবং শ্যামদেশের কারুকার্য খচিত বৌদ্ধ বিহার। আধুনিক অট্টালিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল কার্জন হল, হাই কোর্ট, কৃষি সংস্থা, জাতীয় সংগ্রহশালা, কেন্দ্রীয় সচিবালয়, সাধারণ গ্রন্থাগার এবং সরকারী কলা কেন্দ্র। অন্যান্যের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান হোল বলদা বাগ। এখানে নানা রকমের দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া দেখা যায়।

প্রগতিশীল ও সম্প্রসারমান এই ঢাকা শহরটি হ'ল বাংলা দেশের একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র। আশপাশ দিয়ে বহু নদী বয়ে যাওয়ায় ফলে মাটি সুজলা সুফলা এবং নদীবন্দর নারায়ণগঞ্জ সন্নিকটে থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের খুবই সুবিধা এখানে। প্রধান রপ্তানী পণ্য হোল—পাট, তৈল বীজ ও চামড়া; আর আমদানী করা হয় লবণ, কেরোসিন তেল ইত্যাদি। চাল এবং অন্যান্য পণ্যেরও বেশ ব্যবসা চলে।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক কলকারখানাও গজিয়ে উঠেছে। সেখানে মেসিন টুল, সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি তৈরীর কারখানা, রাসায়নিক দ্রব্য, তামাক, রবার, রেশম, কার্পাসজাত দ্রব্য এবং কাঁচের জিনিষপত্র তৈরী হয়। তাছাড়া কতকগুলি পাট কলও রয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের মধ্যে আছে—স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাজ, শাঁখের ওপর নক্সা, নৌকো তৈরী, দেশলাই, জুতা ও সাবান তৈরী ইত্যাদি। ১৯৬৩-৬৪ সালে একমাত্র ঢাকা জেলাতেই রেজিষ্ট্রী করা শিল্প সংস্থা ছিল ২,৩৭০। বাংলা দেশের মোট শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে এগুলির সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক।

শহর থেকে ১০ মাইল দূরে কুর্মিটোলায় রয়েছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বা সৈন্যাবাস। এটি ৭ বর্গ মাইল ব্যাপী। এখান থেকে শুরু হয়েছে একটি জঙ্গল যা উত্তরে একশো মাইল গিয়েছে টাঙ্গাইল পর্যন্ত।

ঢাকা জেলার পরিধি হোল ২৮৮২ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা (১৯৬১)-৫০,৯৫,৭৪৫। জেলাটির তিন দিকে রয়েছে মেঘনা, পদ্মা ও যমুনা। এ ছাড়া আছে ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা এবং লাক্ষ্যা নদী। প্রধান শস্য হোল ধান এবং তার পরেই পাট।

ঢাকা শহর থেকে ১৫ মাইল দূরে রয়েছে এক প্রাচীন শহর বিক্রমপুর। এটি ছিল (৮-১৩ শতাব্দী) বাংলার হিন্দু শাসকগণের প্রাচীন রাজধানী।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ঢাকা পূর্ব বাংলার রাজধানী হয়। পাকিস্তানী শাসকগণের শোষক রূপ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং ইয়াহিয়া খাঁনের মধ্যে আলোচনা ভেঙ্গে যাবার পর পাক সেনাবাহিনী ২৫শে মার্চ যখন নিরীহ জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ ও ধ্বংস লীলা শুরু করে তখন এই শহরের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জনগণই ছিলেন তাদের প্রধান লক্ষ্য।

নিজের নাম ঠিকানা লেখা এবং উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগানো খাম সঙ্গে না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

REGD. NO. D-233

বিশ্ব ইতিহাসে অপূর্ব একক আচরণ

যুদ্ধের মাঝখানে মানব কল্যাণ

ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষের সর্বাত্মক তৎপরতা স্থগিত রেখে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে বিপর্যস্ত বিদেশীদের সরিয়ে নেবার সুযোগ দিয়ে ভারত মানব কল্যাণ মূলক কাজে যে চরম নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে বিশ্ব ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার।

কেবল ঢাকা থেকেই বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪০০ জন বিদেশীকে সরিয়ে নেবার সুযোগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে ছিলেন ১১৪ জন মার্কীন, বৃটিশ, জাপানী, ইতালীয় বেলজিয়াম এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি দেশের নাগরিক। ১২ই ডিসেম্বর বৃটিশ বিমান বহরের তিনটি। সি-১৩০ বিমানে করে এদের ঢাকার বিপজ্জনক এলাকা থেকে কলকাতায় আনা হয়। বিমানগুলি দুবার ঢাকায় গিয়ে এদের নিয়ে আসে।

সেই সময় ভারতীয় সেনা ও মুক্তি বাহিনী নানান দিক থেকে ঢাকার দিকে সবেগে এবং চরম আঘাত হানবার জন্যে প্রস্তুত।

মাত্র কয়েকশত ব্যক্তিকে সরিয়ে নেবার জন্যে এই চরম মুহূর্তে বিশ্বের কোন সেনাবাহিনী ও তাঁদের সেনাধ্যক্ষ [illegible] গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা স্থগিত রাখতে [illegible] হবেন ?

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে ১১ই ডিসেম্বর ঢাকায় অবস্থিত বন্দরের কর্তৃপক্ষ এই অপসরণ কার্যে বাধা দেন এবং কোন বিমানকে ঢাকায় অবতরণ করতে দিতে অস্বীকার করেন। বস্তুতঃ একটি কানাডীয় বোয়িং কলকাতা থেকে ঢাকায় যায় কিন্তু বিমানটিকে ঢাকায় নামতে দেওয়া হয়নি। গোড়ায় অবিশ্যি পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ বিমানটিকে ঢাকায় অবতরণ করতে দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে ইসলামাবাদ থেকেও ৭৮ জন বিদেশীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়। ১২ ডিসেম্বর ১০টি বিমান চাকলালা বিমান বন্দর দিয়ে এদের সরিয়ে নিয়ে যায়। আর এই চাকলালা বিমান বন্দর থেকেই পাকিস্তানী বিমানগুলি, পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ভারতীয় বাহিনী এবং পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীরের নিরীহ বে-সামরিক ব্যক্তিদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। এই বিমানগুলির মধ্যে ৬টি ছিল বৃটিশ, ২টি রুশ, ১টি সুইস্ এবং একটি কানাডীয়।

ভারতীয় বিমান বহর যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন—ডিসেম্বর ৭,১১ এবং ১২,—সেই সময়ের মধ্যে ১৪ বার বিমান উড়তে দেওয়া হয়। বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪ হাজার নাগরিক এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া কিছু সংখ্যক ইতালীয় ও বেলজিয়ামকে স্থলপথে নিরাপদে পাকিস্তানী রাজধানী থেকে চলে যেতে দেওয়া হয়।

ভারত স্বেচ্ছায় এই মানব কল্যাণ মূলক কাজের জন্যে সর্বদা দেয়। [illegible] পাকিস্তান এই কাজে সহযোগিতা [illegible] দূরের কথা, এই সময়ের সুযোগ [illegible] পাকিস্তানী বিমান বন্দরগুলিতে সাম[illegible] সরবরাহ নামায় এবং করাচী বন্দ[illegible] চারদিকে মাইন বসায়।

বহির বিভাগ মন্ত্রকের কাছে লেখা চিঠি[illegible] রাষ্ট্র সংঘ এবং কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র [illegible] তের এই কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশ[illegible] করেছেন।

অনুরূপভাবে, ভারতীয় নৌবহর বি[illegible] সাবধানতা অবলম্বন করে যাতে নিরপে[illegible] জাহাজ গুলির কোন ক্ষতি না হয়। [illegible] পেক্ষ জাহাজগুলি যাতে নিরাপদে ক[illegible] বন্দর ছেড়ে যেতে পারে সে উদ্দেশ্যে বহর তাঁদের তৎপরতা বন্ধ রাখেন এবং জাহাজগুলিকে নিরাপদ স্থানে যাবার [illegible] বার বার সতর্ক করে দেন।

পারমাণবিক গবেষণা

২০ পৃষ্ঠার পর

গ্রহণ করতে পারি, সে জন্য সর্[illegible] আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। অধি[illegible] উৎপাদন এবং আরও পুষ্টিকর খাদ্য পাদনের পৃথক পৃথক প্রকল্পের মোট [illegible] জোর দিতে হবে শুধু মাত্র এইগুলি পরিমাণে প্রায় ভারতের বৃহত্তর জনস[illegible] জীবনে সুখশান্তি এনে দিতে পারবে, ওপর।

ডিরেক্টর, পাবলিকেশন্‌স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডিরেক্ট প্রিন্টার্স, করোলবাগ, নতুন দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত।